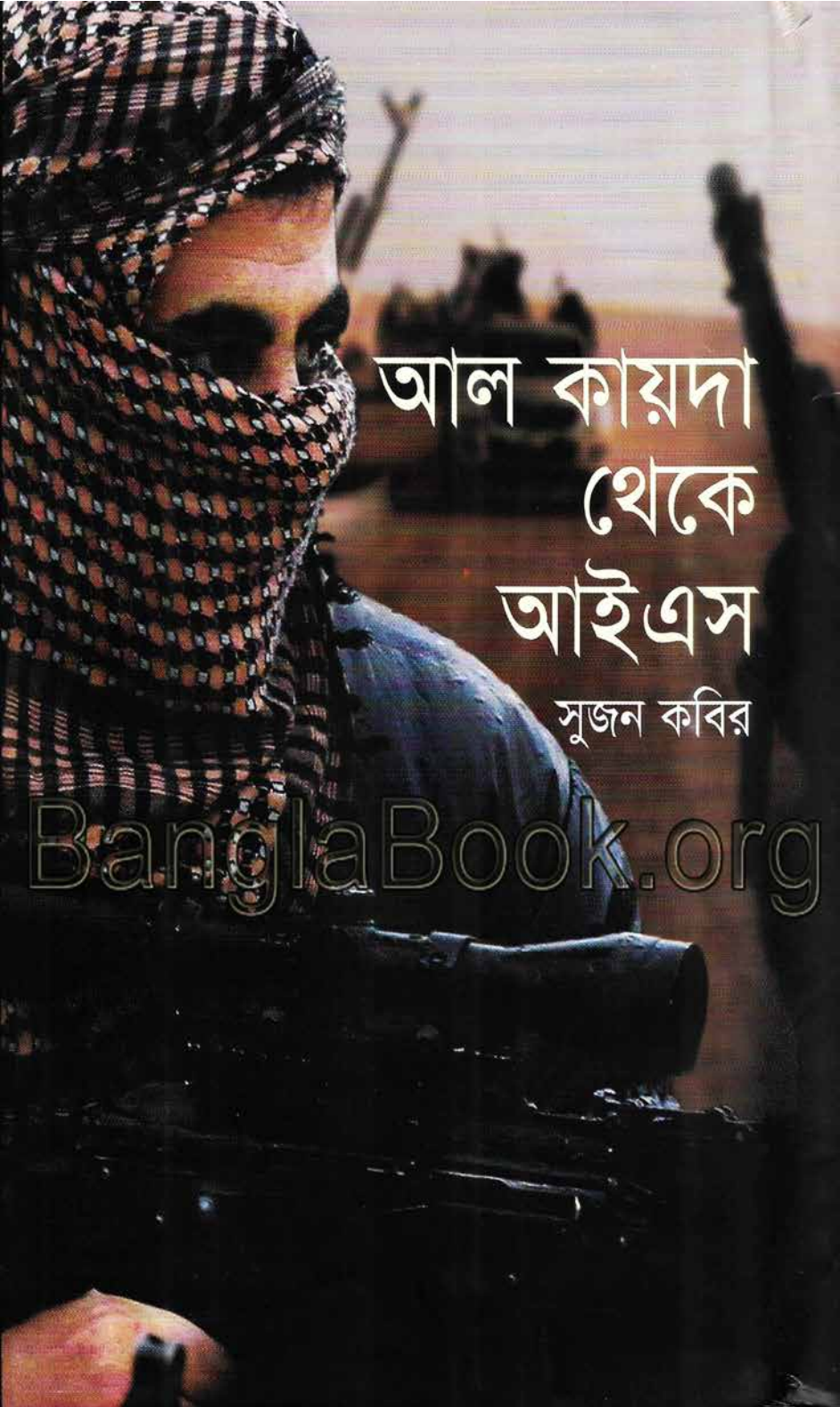

BanglaBook.org

আল কায়দা, তালেবান, তেহরিক-ই তালেবান, বোকো হারাম, আল শাবাব কিংবা হালের আই এস। জনমনে ত্রাস সৃষ্টি করা এই নামগুলোর উত্থানের পেছনে কি কেবলই কিছু উগ্রপন্থী দায়ী? না। লেখক প্রমাণ করেছেন, ধর্মীয় বলে বলিয়ান কোনো গোষ্ঠির হাত ধরে পৃথিবীতে জঙ্গিবাদের বিস্তার হয়নি। বরং নব্বই দশক থেকে আজ পর্যন্ত বিভিন্ন রাষ্ট্রশক্তির অর্থ আর অস্ত্রের মদতে জঙ্গিবাদ নামের বিষ বৃক্ষটিকে বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। পাকিস্তান থেকে আফগানিস্তান কিংবা ইরাক থেকে সিরিয়া; কারা জ্বালিয়ে দিল জঙ্গিবাদের আগুন? অনুচ্চারিত সেই সত্যের ওপরই আলো ফেলেছেন লেখক। তুলে ধরেছেন ষড়যন্ত্রের নানা ঘটনা পরম্পরা। নাইন ইলাভেনে সন্ত্রাসী হামলা থেকে শুরু করে আইএস জঙ্গি উত্থান পর্যন্ত চোদ্দ বছরের ধারাবাহিক ষড়যন্ত্রকে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার ঢং-এ তুলে ধরেছেন সুজন কবির। বাংলায় এমন বই এই প্রথম।

www.BanglaBook.org

সুজন কবির। দেশের টিভি সাংবাদিকতায় একটি পরচিত মুখ। প্রথম প্রজন্মের একুশে টেলিভিশন দিয়ে শুরু। তারপর একে একে এনটিভি, বাংলাভিশন, যমুনা (প্রথম উদ্যোগ) এটিএন নিউজ এবং সর্বশেষ একাত্তর টেলিভিশন। ২০০৩ সালে ইরাক যুদ্ধ নিয়ে এনটিভিতে তাঁর প্রতিদিনের রিপোর্টগুলো জনপ্রিয় হয়েছিল। বাংলাভিশনের জনপ্রিয় টকশো 'সংবাদ প্রতিদিন' উপস্থাপনা করেছেন অনেকদিন। অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার স্বীকৃতি হিসেবে ২০০৭ সালে পেয়েছেন টিআইবি পুরস্কার। কাজ করেছেন সাহিত্য-সংস্কৃতি আর পরিবেশ নিয়েও। টেলিভিশনে দীর্ঘ চোদ্দ বছরের ক্যারিয়ারে সুজন কবির যা-ই করেছেন তাঁর আগ্রহের বিষয় ছিল আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। এই বই তাঁর সেই দীর্ঘ সাংবাদিকতা চর্চারই একটি ফসল।

www.BanglaBook.org

আল কায়দা থেকে আইএস

সুজন কবির

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

অনুবাদ সহায়তা
আফসানা শাওন
বর্ণা তারানা

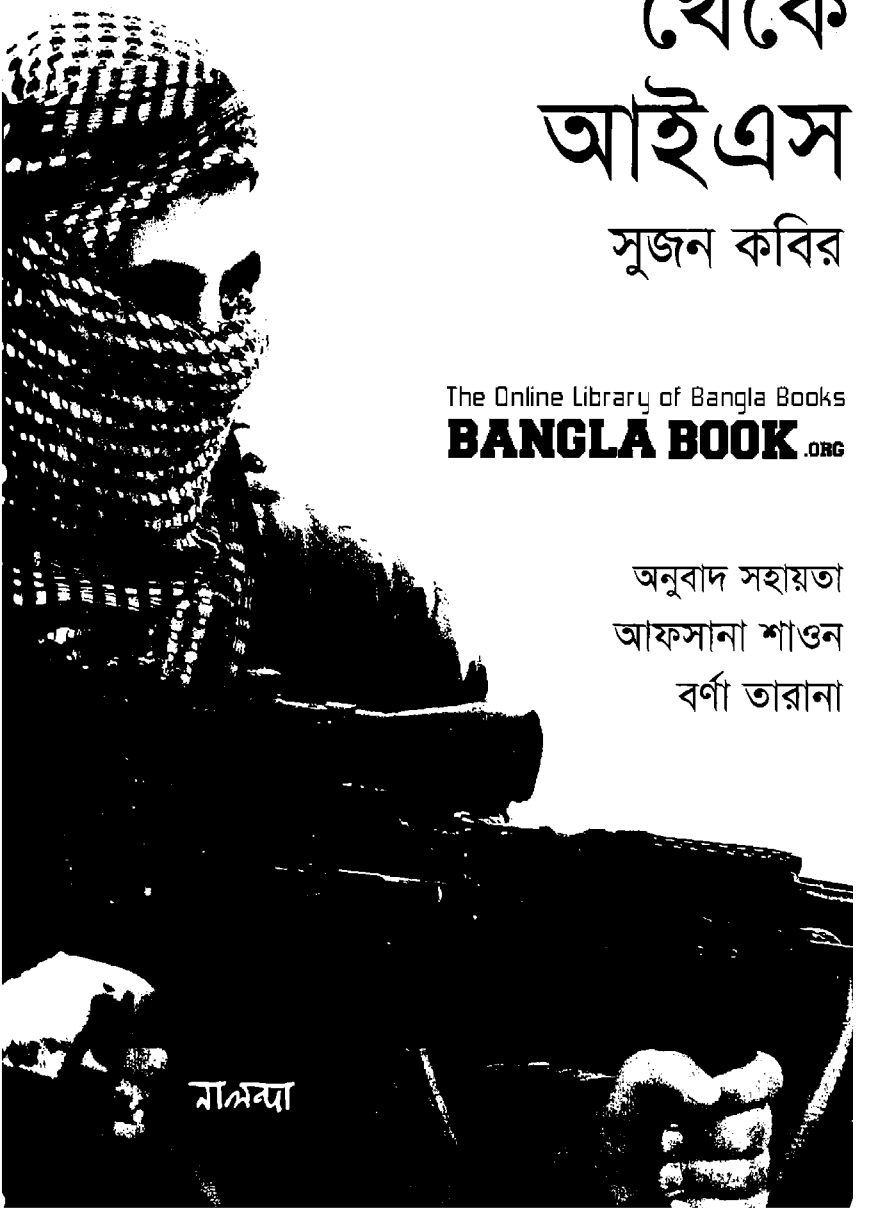

আল কায়দা থেকে আইএস	সুজন কবির
অনুবাদ সহায়তা	আফসানা শাওন ও বর্ণা তারানা
প্রকাশক	রেদওয়ানুর রহমান জুয়েল
	নালন্দা ৩৮/৪ বাংলাবাজার
	(মান্নান মার্কেট) ৩য় তলা ঢাকা-১১০০
ফোন	০২-৯৫৯০৬১৭
প্রচ্ছদ	আজহার হক
প্রথম প্রকাশ	ফেব্রুয়ারি ২০১৫
মুদ্রণ	ঢাকা প্রিন্টার্স
বর্ণবিন্যাস	নালন্দা কম্পিউটার বিভাগ
মূল্য	৫০০.০০ টাকা মাত্র
যুক্তরাজ্য পরিবেশক	সঙ্গীতা লিমিটেড ২২ ব্রিকলেন
যুক্তরাষ্ট্র পরিবেশক	মুক্তধারা জ্যাকসন হাইট নিউ ইয়র্ক
ভারতে পরিবেশক	নয়া উদ্যোগ, বই কারিগর

©	Writer
Al Kayda Theke I S	Sujon Kabir
Publisher	Redwanur Rahman Jewel
	Nalonda 38/4 Banglabazar
	(Mannan Market) 2nd Floor Dhaka-1100
Phone	02-9590617
Cover Design	Azhar Haque
First Published	February 2015
Printer	Dhaka Printers
Compose & Makeup	Nalonda Computer Department
Price	500.00 Taka Only
ISBN	978-984-91248-3-2
email	nalonda_10@ yahoo.com

The Online Library of Bangla Books

BANGLA BOOK .ORG

উৎসর্গ

রুহান ও তার মা

আমার লেখালেখিতে বিঘ্ন না ঘটালে যাদের ভালো লাগে না

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

সূ চি

নাইন-ইলাভেন ও ক্লাসিফায়েড ২৮ পৃষ্ঠা # ১৩

আফগানিস্তান
জঙ্গিবাদের বীজতলায় যুক্তরাষ্ট্র, পাকিস্তান ও সৌদি আরব # ৩৯

আরব বসন্ত আসেনি এসেছে আইএস # ১০৫

আইএস এবং ইসলাম
আত্মস্বীকৃত খলিফা বাগদাদি ও আইএস-এর প্রতি ১২৬ জন ইসলামি চিন্তাবিদের খোলা চিঠি # ২৭১

সাক্ষাৎকার পর্ব # ৩০৭
সিনেটর বব গ্রাহাম (প্রথম কিস্তি)
সিনেটর বব গ্রাহাম (দ্বিতীয় কিস্তি)
সিনেটর বব গ্রাহাম (তৃতীয় কিস্তি)
আলি আল-আহমেদ
ড. নাফিজ আহমেদ
লরেন্স উইলকারসন
টোবি জোন্স
আইএস সৌদি আরবের হাতিয়ার

আলি আল-আহমেদ, সৌদি পণ্ডিত ও সৌদি রাজনৈতিক বিশ্লেষক # ৩২৩

পেন্টাগনের একটা নীতি ছিল, বিভক্ত করো ও শাসন করো
ড. নাফিজ আহমেদ, লেখক, সাংবাদিক, বিশ্লেষক # ৩৩১

পূর্বকথন

এক ফেসবুক বন্ধু তাঁর স্ট্যাটাসে লিখেছিলেন 'আইএস যোদ্ধারা খুব নিষ্ঠাবান মুজাহিদ'। মন্তব্যে আমি লিখেছিলাম 'ধর্মের উদ্দেশ্য হলো অসভ্য মানবজাতিকে সভ্য করে তোলা। মানবিক করে তোলা। ধর্মের নামে কেউ যদি বর্বরতা আর অমানুষিকতার আশ্রয় নেন তাহলে তো তিনি মানুষই হতে পারলেন না। যিনি মানুষ হবার যোগ্যতাই অর্জন করলেন না, তার আবার কিসের ধর্ম, কিসের জিহাদ?' এই জবাব পেয়ে আমাকে তুলোধুনো করেছিলেন ওই ফেসবুক বন্ধু ও তাঁর অনুসারিরা। পাল্টা কোনো জবাব দেইনি। কারণ ফেসবুকে ধর্মের বাহাস বৃথা। তাতে কোনো মীমাংসা হয় না বরং জট পাকায়। আমি এই আইএস অনুরক্তদের সম্পর্কে একটু অনুসন্ধানে নামলাম। যা পেলাম তাতে আমি বিস্মিত হতভম্ব। আইএস-এর বর্বরতার ছবিগুলো শেয়ার করে তাঁরা মন্তব্য করেছেন, 'ঠিকই আছে শিয়া কুর্দী আর খ্রিস্টানদের এভাবেই মারা উচিৎ। এরা সুন্নিদের ওপর বহু অত্যাচার করেছে।' আইএস-এর খিলাফত নিয়ে আশাবাদী কেউ কেউ মন্তব্য করেছেন 'অবশেষে নিপীড়িত মুসলিমের জন্য একটি খিলাফত এসেছে। যে কোনো মূল্যে এই খিলাফতকে এগিয়ে নিতে হবে'। সেই রাতেই সিদ্ধান্ত নিলাম এভাবে নয় জবাব দিতে হবে অন্যভাবে, বই লিখে। আর এটাই এই গ্রন্থের জন্মকথা।

দীর্ঘদিন আন্তর্জাতিক সম্পর্ক নিয়ে কাজ করার সুবাদে আমি টের পাই, খুব কম মানুষ এমনকি খুব কম পাঠকই জঙ্গিবাদের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। মনে প্রশ্ন জেগেছিল, এই মানুষরা যদি জানতেন, আইএস যোদ্ধারা ধর্মের বলে বলিয়ান কোনো মুজাহিদ নন বরং যুক্তরাষ্ট্র সৌদি আরব আর ইসরাইলের সম্মিলিত ষড়যন্ত্রের ফলাফল এবং তাদের মূল উদ্দেশ্যটা জিহাদ বা খিলাফত নয়, বরং মুসলিমদের ভাইয়ে ভাইয়ে দাঙ্গা

বাঁধানো; তাহলে কি বাংলাদেশের মতো একটি উদার মুসলিম দেশের কোনো মানুষ আইএস-এর প্রতি এমন শর্তহীন সমর্থন ব্যক্ত করতেন ? সম্ভবত না। সে-কারণেই আইএস তথা জঙ্গিবাদের শেকড় উন্মোচনের চেষ্টাই ছিল এই গ্রন্থের অন্যতম উদ্দেশ্য। সেই সুবাদে বিস্মৃত নানা ইতিহাসের ওপর আরও একবার আলো ফেলবার চেষ্টা করেছি। এই চেষ্টা কতটা সফল হলো সেই বিচারের ভার পাঠকের হাতে।

শুরু করেছি নাইন-ইলাভেনের সন্ত্রাসী হামলার ঘটনা দিয়ে। বিশ্ব রাজনীতির খোলনলচে পাল্টে দেওয়া ওই ট্রাজেডিকে ঘিরে আজও নানা প্রশ্নের উত্তর খুঁজছে মানুষ। ওই ঘটনায় যুক্তরাষ্ট্রের দীর্ঘ দিনের বন্ধু সৌদি আরবের জোরালো ভূমিকার কথা অস্বীকার করেন না মার্কিন রাজনীতিবিদরাও। অনেক বিশ্লেষকই বিশ্বাস করেন, আজকের উত্তাল বিশ্ব পরিস্থিতির মূল শেকড়টা নাইন-ইলাভেন ট্রাজেডিতে। ওই ঘটনাকে পুঁজি করে শুরু হওয়া সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধ গত একযুগে ধারাবাহিকভাবে বিশ্বকে অনিরাপদ করেছে, বসবাসের অযোগ্য করেছে। আফগান যুদ্ধের ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, ধর্মীয় কোনো গোষ্ঠির হাত ধরে এই পৃথিবীতে জঙ্গিবাদের বিস্তার হয়নি। বরং যুগে যুগে বিভিন্ন রাষ্ট্র শক্তির অর্থ-অস্ত্রের মদতে জঙ্গিবাদ নামের বিষবৃক্ষটিকে বাড়তে দেওয়া হয়েছে। আফগানিস্তান ইরাক আর চলমান সিরিয়া সেই প্রমাণই দেয়।

আমি বিশ্লেষক নই, সাংবাদিক। তথ্য তুলে ধরাই আমার কাজ। সেটাই করেছি। তাই বলে ইতিহাসের কাঠখোট্টা কোনো পুনরাবৃত্তি নয় বরং ইতিহাসের নানা কালপর্বে জঙ্গিবাদকে ঘিরে যুক্তরাষ্ট্র ইসরাইল পাকিস্তান আর সৌদি আরবসহ আরব দেশগুলোর ষড়যন্ত্রের নানা ঘটনা পরম্পরা তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। তথ্যের সাথে তথ্যের মেলবন্ধন ঘটিয়েছি। চেষ্টা করেছি গল্পের মতো করে ইতিহাসের অনুচ্চারিত সেইসব সত্যকে সামনে নিয়ে আসার। মার্কিন সরকারের ডিক্লাসিফায়েড বিভিন্ন দলিলপত্র থেকে শুরু করে দুনিয়ার বরেণ্য সাংবাদিকদের অনুসন্ধানী প্রতিবেদন, আলোচিত নানাগ্রন্থ আর শত শত ওয়েবসাইটের সাহায্য নিয়েছি এবং সূত্র উল্লেখ করেছি। স্বীকার করছি সব লেখায় সূত্র উল্লেখের এই ধারাবাহিকতাটি রক্ষা করা যায়নি।

নাইন-ইলাভেন থেকে আইএস জঙ্গি উত্থান পর্যন্ত ইতিহাসের পথে চৌদ্দ বছরের এই ভ্রমণে পাঠক নিজেই আবিষ্কার করবেন, কীভাবে আফগানিস্তান ইরাক আর সিরিয়ার মতো দেশগুলোতে জঙ্গিবাদের বীজতলা গড়া হয়েছে। কীভাবে আইএস-এর মতো ভয়ঙ্কর একটি জঙ্গিগোষ্ঠির উত্থান ঘটানো হয়েছে।

BanglaBook.org

ইসলামের খণ্ডিত আর মনগড়া ব্যাখ্যাই জঙ্গিবাদের প্রধান অস্ত্র। আমি বিশ্বাস করি সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধ নয় বরং জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে লড়তে হবে কোরআন-হাদিসের সঠিক ব্যাখ্যা দিয়ে। সেই কাজটাই করেছেন বিশ্বের বরেণ্য ১২৬ জন ইসলামি স্কলার। আইএসকে দেওয়া খোলা চিঠিতে তাঁরা কোরআন হাদিসের আলোকে ব্যাখ্যা করেছেন, কেন আইএস-এর কমর্কাণ্ড ইসলামবিরোধী। এই গ্রন্থে সেই চিঠির হুবহু অনুবাদ যুক্ত করা হয়েছে—যা ইসলামের নামে সকল উগ্রপন্থার বিরুদ্ধে প্রামাণ্য একটি দলিল এবং মোক্ষম একটি জবাব হয়ে থাকবে।

বইটি লেখার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বন্ধু স্বজন আর সহকর্মীদের পরামর্শ আমাকে উৎসাহ যুগিয়েছে। সহকর্মী আফসানা শাওন ও বর্ণা তারানা তাঁদের পেশাগত আর পারিবারিক ব্যস্ততা পাশ কাটিয়ে অনুবাদে সাহায্য করেছেন। ভোর চারটা-পাঁচটা পর্যন্ত লেখালেখি'র যন্ত্রণা মেনে নিয়ে সাহায্য করেছেন আমার পরিবারের সদস্যরাও। প্রকাশক বন্ধু জুয়েল নানা যন্ত্রণা সহ্য করে শেষ মুহূর্তেও বইটি প্রকাশের ঝঞ্ঝাট মাথায় নিয়েছেন। এঁদের সবার কাছে আমার অসীম কৃতজ্ঞতা। পাঠকের যৌক্তিক পরামর্শ ভবিষ্যতে এই বইটির সম্ভাব্য নতুন কোনো সংস্করণে আমাকে উৎসাহ যোগাবে। ধন্যবাদ।

সুজন কবির

sujonkabir@gmail.com
কাজিপাড়া, মীরপুর
১৯ জানুয়ারি ২০১৫

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

নাইন-ইলাভেন ও ক্লাসিফায়েড ২৮ পৃষ্ঠা

নাইন-ইলাভেনের ঘটনা নিয়ে ২০০৩ সালের—জুলাই-এ একটি রিপোর্ট দিয়েছিল কংগ্রেসের যৌথ তদন্ত কমিটি। ঘটনার আগে পরে বিদেশের গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর তৎপরতাই ছিল এই রিপোর্টের বিষয়বস্তু। ওই রিপোর্টের ২৮ পৃষ্ঠার একটি পরিচ্ছেদ আজও প্রকাশ করতে দেওয়া হয়নি। কি ছিল ওই রিপোর্টে?

ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের সেই জায়গাটিতে এখন লেজার বিম

নাইন-ইলাভেন ও জর্জ বুশের রহস্যজনক আচরণ
কী আছে ক্লাসিফায়েড আটাশো পৃষ্ঠায়
সৌদি রাষ্ট্রদূত প্রিন্স বানদারের ভূমিকা
কি বলেছেন সিআই-এ'র সাবেক পাইলট
লাসভেগাস ফ্লোরিডা সান্তিয়াগোতে সৌদি গোয়েন্দাদের
তৎপরতা–আনোয়ার আল আওলাকির ভূমিকা
আহমেদ শাহ্ মাসুদের রহস্যময় মৃত্যু
সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধের সূচনা

১০ সেপ্টেম্বর ২০০১। পূর্ব নির্ধারিত একটি সফরে ফ্লোরিডা এসেছেন প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশ। উঠেছেন মেক্সিকো উপসাগরের তীরবর্তী কোরাল দ্বীপের একটি রিসোর্টে। ফ্লোরিডার সারাসোটা এলাকার একটি অবকাশ যাপন কেন্দ্র এটি। হোয়াইট হাউসের ভাষায়, প্রেসিডেন্টের এই 'সফট প্রোগ্রাম'টি ঠিক হয়েছিল আগস্ট মাসে। কর্মকর্তারা অনুষ্ঠানটির সময়সূচি প্রকাশ করেছেন ৭ সেপ্টেম্বর। আর সেদিনই আরও দুজন মানুষ ফ্লোরিডার সারাসোটা'য় বেড়াতে যান। তাদের একজন মোহাম্মদ আতা, আরেকজন মারোয়ান আল শেহ্হি। বলা বাহুল্য, এই দুজনই নাইন-ইলাভেন ট্রাজেডি'র বিমান ছিনতাইয়ের দুই নায়ক। প্রেসিডেন্ট বুশের কোরাল দ্বীপ থেকে মাইল দুয়েক দূরে হলিডে ইনন-এ ড্রিংক আর ডিনার সেরেছেন ওই দুজন। বলছি ১০ সেপ্টেম্বর রাতের কথা। ফ্লোরিডার রিপাবলিকান দলের নেতাদের সাথে ডিনারে অংশ নিলেনে প্রেসিডেন্ট। সাথে ছিলেন ছোট ভাই জেব বুশ। প্রেসিডেন্ট ঘুমাতে গেলেন রাত ১০টায়। রিসোর্টের ছাদে তখন প্রহরায় ছিল ভূমি থেকে আকাশে নিক্ষেপযোগ্য একটি মিসাইল। আর নিঃশব্দে আকাশে টহল দিচ্ছিল AWACS (Airborne Warning and Control System) এর একটি বিমান। সেই রাতে প্রেসিডেন্টের কোন নিরাপত্তা হুমকি ছিল, নাকি এটাই স্বাভাবিক ব্যবস্থা, তা নিয়ে কখনও কোনো ব্যাখ্যা দেয়নি হোয়াইট হাউস। (Fighting Back: The War on Terrorism-From Inside the Bush White House, by Bill Sammon)

সেই রাতে আরও একটি ঘটনা ঘটেছে। জয়নাল আবেদিন ওমর নামে সারাসোটার এক সুদানি বাসিন্দা পুলিশের কাছে অভিযোগ করেছেন, সাইদ আল ঘামদি (ফ্লাইট নাইনটি থ্রি'র ছিনতাইকারি—যিনি সৌদি এয়ারলাইন্সে চাকরি করতেন) নামে মধ্যপ্রাচ্যের কোনো এক দেশের বাসিন্দা যিনি জানেন যে, প্রেসিডেন্ট এখন সারাসোটায় রয়েছেন। সেই লোক একটি কফি শপে বসে বুশকে হত্যার হুমকি দিয়েছে। খবরটা তখনই এফবিআইকে জানিয়েছে পুলিশ। রাতেই সারাসোটার দুটি অ্যাপার্টমেন্টে তল্লাশি চালায় এফবিআই। তবে কাউকে আটক বা হুমকিমূলক কিছু পাওয়া যায়নি।

পরদিন ১১ সেপ্টেম্বর। প্রেসিডেন্টের ঘুম ভেঙেছে ভোর ৬টার কিছু আগে। শর্টস, টিশার্ট আর জগিং-সু পরে বেরিয়ে পড়লেন বুশ। সঙ্গে এক

BanglaBook.org

সাংবাদিক বন্ধু আর এক নিরাপত্তা কর্মকর্তা। ভোরের আলো আধারিতে মেক্সিকো উপসাগরের সৈকত ধরে বুশ যখন চার মাইলের সীমানা ছুলেন, রিসোর্টের গেটে তখন ছোট্ট একটা জটলা। মধ্যপ্রাচ্যের কোনো এক দেশের দুজন নাগরিককে ঘিরে আছে প্রেসিডেন্টের নিরাপত্তারক্ষীরা। তারা একটি টিভি চ্যানেলের ক্রু। প্রেসিডেন্টের সাক্ষাৎকার চাইছেন। খবরটা রিসোর্টের গোয়েন্দা কর্মকর্তাদের জানানো হলো। তাদের কেউ একজন বাইরে এসে দুই সাংবাদিককে হোয়াইট হাউসে প্রেসিডেন্টের প্রেস উইংয়ের সাথে কথা বলতে বললেন। সাংবাদিকদের ভ্যানটি ঘুরে চলে গেল।

পাঞ্জশির-এর সিংহ খ্যাত আহমেদ শাহ্ মাসুদের মৃত্যুদিবস ৯ সেপ্টেম্বর আজও আফগানিস্তানে সাধারণ ছুটি পালিত হয়

এর ঠিক দুদিন আগে সাক্ষাৎকারপ্রার্থী দুই সাংবাদিকের হাতে খুন হয়েছেন আফগানিস্তানের তালেবান বিরোধী লড়াইয়ের—নর্দান অ্যালায়েন্সের নেতা আহমেদ শাহ্ মাসুদ। আরব নিউজ ইন্টারন্যাশনালের সাংবাদিক পরিচয়ে তিউনিশিয়ার দুই ব্যক্তি আগস্ট থেকেই মাসুদের একটি সাক্ষাৎকারের জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছিলেন। মাসুদের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা জামসেদ বলেছেন, একটা ইন্টারভিউয়ের সুযোগ পেতে লোক দুটি রীতিমত পায়ে ধরছিল। শেষ পর্যন্ত ৯ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় সময় দেওয়া হলো। কে জানত বড়সড় একটা ভিডিও ক্যামেরাকেও বোমা বানিয়ে আত্মঘাতী হামলা হতে পারে? মারাত্মক আহত মাসুদকে সামরিক হেলিকপ্টারে করে তাজিকিস্তানের একটি হাসপাতালে নেওয়া হলো। তবে তার আগেই মারা গেছেন তালেবান জঙ্গিদের জন্য আতঙ্ক হয়ে ওঠা মাসুদ। নর্দান অ্যালায়েন্সের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র আব্দুল্লাহ (বর্তমানে আফগানিস্তানের প্রধান নির্বাহী) স্বাক্ষরিত এক বিবৃতিতে ওই হামলার জন্য আল কায়দা এবং পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআই'কে দায়ি করা হয়েছিল। তবে বিবৃতিটি এসেছে ১৪ সেপ্টেম্বর। তার আগ পর্যন্ত গোপন রাখা হলো আহমেদ শাহ্ মাসুদের মৃত্যু সংবাদ। কেন এই গোপনীয়তা? মাসুদের মৃত্যুর সাথে কি তবে নাইন-ইলাভেন ট্রাজেডির কোনো যোগ ছিল? আফগান মুক্তি আন্দোলনের এই প্রভাবশালী নেতা; আফগানিস্তানের সাধারণ মানুষ যাকে ভালোবেসে 'পাঞ্জশির-এর সিংহ' নামে ডাকত—তিনি বেঁচে থাকলে হয়তো অন্যরকম হত আফগানিস্তানের আজকের ইতিহাস।

জগিং সেরে রিসোর্টে ফিরে ব্রেকফাস্ট সেরেছেন প্রেসিডেন্ট বুশ। কর্মকর্তাদের সাথে নাশতা সেরে বসেছেন রোজকার ইনটেলিজেন্স ব্রিফিং-এ। তবে রোজকার হলেও আজকের ব্রিফিংটা জরুরি। আগস্ট থেকেই সন্ত্রাসী হামলার একটা সতর্কতা ছিল। সেটা আরও গুরুতর হয়ে হাজির হয়েছে। যদিও ব্রিফিং-এ সুনির্দিষ্ট কোনো হুমকির তথ্য প্রমাণ হাজির করা হয়নি।

সময় তখন সকাল ৮টা। ততক্ষণে প্রথম বিমানটি অর্থাৎ আমেরিকান এয়ারলাইন্সের ফ্লাইট ইলাভেন বোস্টনের লোগান বিমানবন্দর ছেড়ে আকাশে উড়েছে। ৮টা ১৩ মিনিটে সেটি আকাশের ৩৫ হাজার ফুট উপরে। কিন্তু সমস্যা হলো বিমানটি এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলের নির্দেশ অমান্য করে সোজা একশো ডিগ্রি ঘুরে নিউ ইয়র্কের দিকে রওনা হয়েছে। বলাবাহুল্য যোগাযোগের রেডিও ট্রান্সপন্ডারটিও বন্ধ করে দিয়েছে পাইলট। রেডিও বন্ধ হবার আগেই ককপিটের কিছু কথাবার্তা এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলে রেকর্ড হয়েছে। যেমন—'দয়া করে কেউ নড়বে না। আবারো বলছি কেউ বোকার মতো নড়তে যাবেন না। আমরা এয়ারপোর্টে ফিরে যাচ্ছি'। এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোল নিশ্চিত

BanglaBook.org

ফ্লাইট ইলাভেন হাইজ্যাক হয়েছে। কিন্তু তারপরও (NORAD) নো রেডিও ঘোষণা করা হলো না। প্রসঙ্গত NORAD ঘোষণা হলে হাইজ্যাক হওয়া বিমানকে বলপূর্বক নামিয়ে আনার চেষ্টা করে সামরিক বিমান। সাতাশ মিনিট পর ৮টা ৪০ মিনিটে NORAD ঘোষণা করল বোস্টন এয়ার ট্রাফিং কন্ট্রোল। ততক্ষণে ফ্লাইট ইলাভেন নিউ ইয়র্কের আকাশে—ছুটছে ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার লক্ষ্য করে।

৮টা ২০ মিনিটে শেষ হলো প্রেসিডেন্টের ব্রিফিং। তিনি রেডি হয়ে গাড়িতে চড়লেন ৮টা ৩৫ মিনিটে। ভিআইপি পাসিং-এর জন্যে সারাসোটা বে'র রাস্তা আটকে দিয়েছে পুলিশ। ৮টা ৫০ মিনিটে আটকে পড়া গাড়ির জটলায় সকালের সেই ভ্যানটা। ভ্যানের জানালা দিয়ে মাথা বের করে, মধ্যপ্রাচ্যের কোনো এক দেশের দুজন মানুষ আকাশে মুঠি পাকিয়ে বলছিল 'বুশ তুমি নিপাত যাও'। গাড়িটা এবং গাড়ির মানুষ দুজন ছিলেন সকালে প্রেসিডেন্টের সাক্ষাৎকারপ্রার্থী সেই দুই সাংবাদিক। পরে এফবিআই তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করেছে। কিন্তু এ বিষয়েও কোনো তথ্য জানানো হয়নি।

BanglaBook.org

৯ টা ৬ মিনিটে প্রেসিডেন্টকে কানে কানে খবরটা জানালেন চিফ অব স্টাফ এন্ডি কার্ড

৯ টা বাজার কিছুক্ষণ আগে সারাসোটার এলিমেন্টারি (Emma E. Booker Elementary School) স্কুলে প্রবেশ করলেন বুশ। ৯টা ০২ মিনিট, স্কুলের সেমিনার কক্ষে শিশুদের গল্প শোনাচ্ছেন প্রেসিডেন্ট। গল্পের নাম 'পোষা ছাগল'। এর ঠিক পনের মিনিট আগে সকাল ৮টা ৪৫ মিনিটে অর্থাৎ প্রেসিডেন্ট যখন গাড়িতে তখন ৯২ জন যাত্রীসহ নিউ ইয়র্কের ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের উত্তর টাওয়ারের ৯৩ থেকে ৯৯ তলার মধ্যে ঢুকে পড়েছে আমেরিকান এয়ারলাইন্সের ছিনতাই হওয়া প্রথম বিমান ফ্লাইট ইলাভেন। ৯টা

০৩ মিনিটে ৭৫ থেকে ৮৫ জন যাত্রী নিয়ে দক্ষিণ টাওয়ার ভেদ করে আমেরিকান এয়ারলাইন্সের আরও একটি বোয়িং ওয়ান সেভেনটি ফাইভ। এরও তিন মিনিট পর ৯টা ০৬ মিনিটে ক্লাশরুমে ঢুকে প্রেসিডেন্টকে কানে কানে খবরটা জানালেন চিফ অব স্টাফ এন্ডি কার্ড। সময় নিলেন দুই সেকেন্ড। খবরটা শুনে কিছুক্ষণ ভাবলেশহীন তাকিয়ে রইলেন বুশ। এন্ডি কার্ডকে পাল্টা কোনো প্রশ্ন করলেন না, কোনো নির্দেশনা দিলেন না, কোনো সামরিক পদক্ষেপ বা পেন্টাগনের তৎপরতা সম্পর্কে কিছু জানতেও চাইলেন না। প্রেসিডেন্ট ফিরে গেলেন বাচ্চাদের সাথে গল্পে। বিশ্বজুড়ে টিভির পর্দায় যখন ব্রেকিং নিউজ: 'ইউএসএ ইজ আন্ডার এ্যাটাক' প্রেসিডেন্ট তখন উচ্চস্বরে পড়ছিলেন "But-the-goat-did-some-things-that-made-the-girl's-dad-mad." দশ মিনিট পর ৯টা ১৬ মিনিটে ক্লাশরুম থেকে বেরিয়ে পূর্ব নির্ধারিত বক্তব্যে প্রেসিডেন্ট জানালেন, "Ladies and Gentlemen, this is a difficult moment for America..." তখন ৯ টা ৩১। বক্তব্য শেষে বাচ্চাদের সাথে ফটোসেশনেও অংশ নিলেন বুশ। ৯ টা ৩৩ মিনিটে ফ্লোরিডার সারাসোটা এয়ারপোর্টে ছুটল প্রেসিডেন্টের গাড়িবহর। ৯টা ৫৫ মিনিটে ফ্লোরিডার আকাশে উড়লো প্রেসিডেন্টের বিমান এয়ারফোর্স ওয়ান। তার দুই পাশে তখন আরও দুটি সামরিক বিমানের প্রহরা। প্রায় একঘন্টা এসটি উদ্দেশ্যহীনভাবে আকাশে উড়ে নেব্রাস্কার একটি সেনাঘাঁটিতে অবতরণ করে। নেব্রাস্কা থেকে থেকে লুইজিয়ানা পরে ওয়াশিংটনে ফিরে এসেন প্রেসিডেন্ট বুশ।

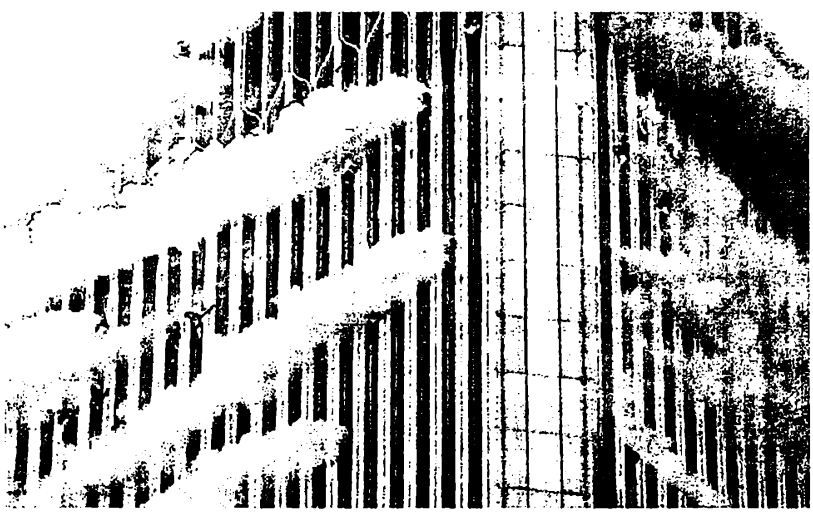

ওয়ার্ল্ড ট্রেডসেন্টার ধসে পড়ার আগে ভবনের কার্নিশে অসংখ্য মানুষের বেঁচে থাকার প্রাণান্ত চেষ্টা

যুক্তরাষ্ট্রের পাগলাটে চিত্র পরিচালক মাইকেল মুরের প্রামাণ্য ছবি 'ফারেন হাইট নাইন-ইলাভেন'-এর দর্শক মাত্রই জানেন পৃথিবীর ইতিহাসে ভয়াবহ এক সন্ত্রাসী হামলার ঘটনায় ৯টা ০৬ মিনিট থেকে ৯টা ৩১ মিনিট পর্যন্ত প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশ বিশাল এক প্রশ্নের জন্ম দিয়েছেন। 'দেশ সন্ত্রাসী হামলার কবলে পড়েছে' এমন একটি ঘোষণা জাতিকে দেবার আগে বা পরে তাঁকে মোটেও তৎপর মনে হয়নি। এমনকি তিনি অগুত্বপূর্ণ সেই পূর্ব নির্ধারিত অনুষ্ঠান, বক্তব্য কিংবা ফটোসেশন কোনোটাই বাতিল করেননি।

বিশ্ব ইতিহাসের মোড় ঘুরিয়ে দেওয়া নাইন-ইলাভেনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে হাজারো ষড়যন্ত্র তত্ত্বের ভিড়ে ঠাঁই করে নিয়েছিল বুশের ওই মুহূর্তটিও। যা কিনা অনেকের কাছেই 'রোম পুড়ছে আর নিরো বাঁশি বাজাচ্ছেন' এমন উপমার সমার্থক হয়ে উঠেছিল। প্রেসিডেন্ট বুশ সেদিন কেন জাতির অমন দুর্যোগ মুহূর্তে মহামূল্যবান পঁচিশ মিনিট একটি অগুরুত্বপূর্ণ কাজে ব্যয় করলেন? ৮টা ৪৫ মিনিটে ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের দক্ষিণ টাওয়ারের দশটি তলা ভেদ করে যখন বিশাল একটি বোয়িং ভেতরে ঢুকে গেছে এবং তার আগে ৮টা ৪০ মিনিটে বোস্টন এয়ার ট্রাফিং কন্ট্রোলের নো-র‍্যাড ঘোষণা থেকে জানা গেছে যে ফ্লাইট ইলাভেন ছিনতাই হয়েছে তখনও অত্যাধুনিক লিমুজিনে বসে প্রেসিডেন্ট কিছুই জানতে পারলেন না? নাইন-ইলাভেনের আগে পরে অন্তত পাঁচটি চার্টার্ড বিমানে করে শতাধিক সৌদি নাগরিক বিভিন্ন গন্তব্যের উদ্দেশ্যে যুক্তরাষ্ট্র ছেড়েছে। তারা কারা? কেন তাদের বিশেষ ব্যবস্থায় যুক্তরাষ্ট্র ত্যাগের

BanglaBook.org

সুযোগ করে দেওয়া হলো? ১১ সেপ্টেম্বর সকালে মধ্যপ্রাচ্যের যে দুই লোক প্রেসিডেন্টের সাক্ষাৎকার চাইলেন তারা কারা? কেন ঘটনার আগের রাতে ফ্লোরিডার সারাসোটায় প্রেসিডেন্টের রিসোর্টের ছাদে মিসাইলের প্রহরা ছিল? তাহলে কি সেখানে কোনো নিরাপত্তা সতর্কতা জারি ছিল? সতর্কতা থেকে থাকলে সেটি গোপন রাখা হলো কেন? তাহলে কি নাইন-ইলাভেনের ঘটনায় ফ্লোরিডার সারাসোটা'র বিশেষ কোনো যোগ আছে?

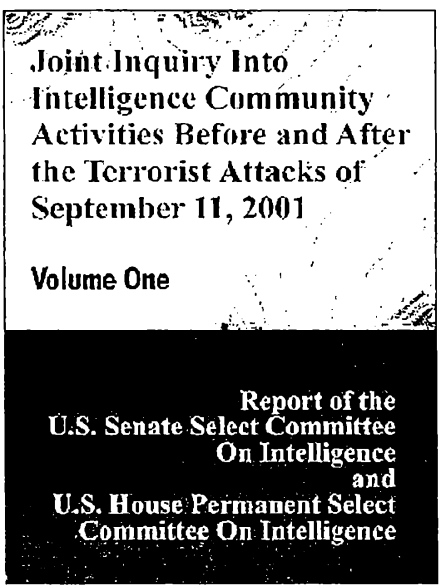

ফ্লোরিডার সাবেক গভর্নর সিনেটর বব গ্রাহাম ও কংগ্রেসের যৌথ তদন্ত কমিটির রিপোর্ট

কংগ্রেসের যৌথ তদন্ত কমিটির (9/11 REPORT: JOINT CONGRESSIONAL INQUIRY) রিপোর্ট অন্তত সেটাই বলছে। হামলাকারিদের অন্তত তিনজন সারাসোটার একটি অ্যাপার্টমেন্টে থাকতেন। সেখানে তল্লাশি চালিয়ে এফবিআই কি জেনেছে সেটা জানা যায়নি। তবে এটা নিশ্চিত হওয়া গেছে, জয়নাল আবেদিন ওমর নামে যে সুদানি লোকটি সেই রাতে প্রেসিডেন্ট বুশের নিরাপত্তার কথা ভেবে উদ্বিগ্ন হয়ে পুলিশকে জানিয়েছিলেন, তাকে আর কোথাও দেখা যায়নি।

নাইন-ইলাভেনের ঘটনা নিয়ে ২০০৩ সালের জুলাই-এ একটি রিপোর্ট দিয়েছিল কংগ্রেসের যৌথ তদন্ত কমিটি। ঘটনার আগে পরে দেশ বিদেশের গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর তৎপরতাই ছিল এই রিপোর্টের বিষয়বস্তু। কিন্তু রিপোর্টটির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং বলা হয় সবচে আসল অংশটাই প্রকাশ করতে দেওয়া হয়নি। ওই রিপোর্টে ২৮ পৃষ্ঠার একটি পরিচ্ছেদ ছিল। যেখানে নাইন-ইলাভেনের ঘটনায় সৌদি আরব তথা সৌদি রাষ্ট্রদূত প্রিন্স বানদারের ভূমিকা, সৌদি গোয়েন্দা সংস্থা ও যুক্তরাষ্ট্রে তার একাধিক এজেন্টের রহস্যময় উপস্থিতি, ঘটনার এক বছর আগে থেকে লস এঞ্জেলেস, সান্তিয়াগো, লাস্ ভেগাস আর সারাসোটায় তাদের আনাগোনা এবং এফবিআই সিআইএ'র রহস্যময় নীরবতা এইসব কিছুই ওই রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু রিপোর্টের সেই পরিচ্ছেদটি প্রকাশ করতে দেয়নি বুশ প্রশাসন। কথিত 'ক্লাসিফায়েড'-এর মোড়কে আজও গোপন রাখা হয়েছে বিশ্ব ইতিহাসের বর্বরতম একটি ষড়যন্ত্রের দলিল।

BanglaBook.org

অনেকদিন ধরেই কংগ্রেসের যৌথ তদন্ত কমিটি'র ওই 'ক্লাসিফায়েড' অংশটুকু প্রকাশের দাবি জানিয়ে আসছে যুক্তরাষ্ট্রের মানুষ। প্রতিবছর নাইন-ইলাভেন বার্ষিকী এলেই এই দাবি জোরালো হয়ে ওঠে। নাইন-ইলাভেনের তথ্য লুকানো কালো অধ্যায়টিকে প্রতিবছর যিনি যুক্তরাষ্ট্রের আত্মভোলা বিস্মৃতিপ্রবণ জাতির সামনে তুলে ধরেন, তিনি ফ্লোরিডার সাবেক গভর্নর-সিনেটর বব গ্রাহাম। কংগ্রেসের দ্বি-দলীয় যৌথ তদন্ত কমিটির প্রধান ছিলেন তিনি। যেহেতু 'গোপন তথ্য ফাঁস না করার শপথ' নিয়েছেন তাই রিপোর্টের ক্লাসিফায়েড অংশটি নিয়ে সরাসরি কোনো মন্তব্য থেকে বরাবরই বিরত থেকেছেন বব। কিন্তু তিনি বিশ্বাস করেন অন্তরালের ঘটনা তা যত অবিশ্বাস্য আর বেদনাদায়কই হোক না কেন আসল ইতিহাস জানবার অধিকার জনগণের আছে। তাই সেই তথ্য প্রকাশের দাবিতে দশ বছর ধরে একটি আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন বব গ্রাহাম। এই আন্দোলনের নাম—'Reopening of the 9/11 investigation'. সবশেষ নাইন-ইলাভেন বার্ষিকীতেও ওই রিপোর্টের

২৮টি পৃষ্ঠা জাতির সামনে প্রকাশ করতে প্রেসিডেন্ট ওবামার প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। সাবেক এই সিনেটর বলছেন, 'এটা নিশ্চিত নাইন-ইলাভেনের ঘটনায় সৌদি আরবের রহস্যময় ভূমিকা ছিল। হামলাকারী ১৯ জনের মধ্যে ১৫ জনই সৌদি নাগরিক। তাদের কারো কারো সাথে সরাসরি সৌদি কানেকশান ছিল। এফবিআইও সেটা জানত। সন্ত্রাসীদের অন্তত তিনজন স্বপরিবারে ফ্লোরিডার সারাসোটায় বিলাসি জীবন-যাপন করেছেন। তিনটি বিলাসবহুল গাড়ি ব্যবহার করত তারা। এফবিআইএ এটাও জানত যে সারাসোটায় এমন কিছু মানুষের আনাগোনা আছে যারা যুক্তরাষ্ট্রের জন্য হুমকি। এখানে এমন অনেক বিষয় আছে যা আমার পক্ষে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। আবার সারাসোটার সন্ত্রাসীদের বিষয়ে আমি এমন কিছু তথ্য জানি যা এফবিআই জনগণকে জানতে দিতে চায় না। সরকারও এই তথ্য প্রকাশ করতে চায় না। কারণ প্রতিবছর আমরা তাদের কাছে (সৌদি আরব) বিলিয়ন বিলিয়ন ডলারের অস্ত্র বিক্রি করছি।' (বব গ্রাহামের সাক্ষাৎকারের বিস্তারিত পড়ুন সাক্ষাৎকার পরিচ্ছেদে) বলে রাখা ভালো, সিনেটর বব গ্রাহাম সেই তথ্য প্রকাশ না করলেও সেটি গোপন থাকেনি। তার অনেকখানিই ফাস হয়েছে।

বলা হয়েছে হামলায় জড়িত ১৯ ছিনতাইকারি যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন ফ্লাইটিং ক্লাবে ভর্তি হয়ে এক ইঞ্জিন বিশিষ্ট ছোট বিমান চালিয়ে পাইলটের প্রশিক্ষণ নিয়েছে। এবং নাইন-ইলাভেনের দিন বোয়িং ছিনতাই করে হামলা চালিয়েছে। প্রশ্ন হলো কেউ এক ইঞ্জিনের ছোট্ট বিমান চালাতে পারলেই কি চার ইঞ্জিনের বিশাল বোয়িং উড়িয়ে নিতে পারেন? অভিজ্ঞ পাইলট ফিলিপ মার্শাল বলেছেন অসম্ভব। ছিনতাই হওয়া চারটি বিমানের ছিনতাইকারি পাইলটদের বিমান ওড়ানো দেখে সিআইএ'র সাবেক পাইলট ফিলিপ মার্শালের একবারও মনে হয়নি যে তারা এক ইঞ্জিনের আনাড়ি কোনো পাইলট। তাহলে কি এই ছিনতাইকারিরা ধারণার চাইতেও বেশি অভিজ্ঞ? 'বিন লাদেন যুক্তরাষ্ট্রে হামলা চালাতে বদ্ধপরিকর' এবং সম্ভাব্য হামলাটি হবে ছিনতাই করা একাধিক যাত্রীবাহী বিমানকে মিসাইলের মতো ব্যবহার করে। এমন কিছু সুনির্দিষ্ট গোয়েন্দা রিপোর্ট আগস্টেই প্রেসিডেন্ট বুশকে জানানো হয়েছে। সেই রিপোর্টের পর কী ব্যবস্থা নিয়েছিল যুক্তরাষ্ট্রের মতো একটি পরাশক্তির শক্তিশালী গোয়েন্দা দপ্তর? আজও এই প্রশ্নগুলোর কোনো উত্তর মেলেনি। নাইন-ইলাভেন ট্রাজেডির দিন প্রেসিডেন্ট বুশের রহস্যময় আচরণ নিয়ে কোনোদিন প্রশ্ন তোলেনি যুক্তরাষ্ট্রের মূলধারার কথিত স্বাধীন গণমাধ্যম। অপেক্ষাকৃত ছোট আকারের যেসব গণমাধ্যমের কৌতূহলী সংবাদকর্মীরা এই যৌক্তিক প্রশ্নগুলো তুলেছেন তাদের চাকরি হারাতে হয়েছে। যেমন নিজের

প্রাণটাই হারিয়েছেন সিআইএ-র সাবেক পাইলট এবং নাইন-ইলাভেন রহস্যের গবেষক ফিলিপ মার্শাল। কে এই ফিলিপ মার্শাল?

৮০'র দশক থেকে পরবর্তী দীর্ঘসময় মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ'র হয়ে কাজ করেছেন ফিলিপ। ইরানের সাথে যুক্তরাষ্ট্রের (বুশের বাবা জর্জ এইচ ডব্লিউ বুশ তখন ভাইস প্রেসিডেন্ট) গোপন কন্ট্রা চুক্তি, যার আওতায় গোপনে ইরানকে অস্ত্র (যদিও ইরানের কাছে অস্ত্র বিক্রির ব্যাপারে তখন যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞা ছিল) দেওয়ার বিনিময়ে তেহরানে জিম্মি হওয়া গুরুত্বপূর্ণ মার্কিন কর্মকর্তাদের মুক্ত করেছিল যুক্তরাষ্ট্র। একই দশকে নিকারাগুয়ার বিপ্লবী সান্দানিস্তা সরকারকে উৎখাতে কন্ট্রা বিদ্রোহীদের অর্থ ও অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করেছিল সিআইএ। এমনকি কন্ট্রা বিদ্রোহীরা যাতে অবৈধ কোকেইন বিক্রি করে অস্ত্র কিনতে পারে সে জন্যে মাদক চোরাচালানের রুটও গড়ে দিয়েছিল সিআইএ। ইরান ও নিকারাগুয়ায় সিআইএ'র এমন অনেক বেআইনি কর্মকাণ্ডের নীরব সাক্ষী ছিলেন ফিলিপ মার্শাল।

তবে ইরান বা নিকারাগুয়া নয়। তাকে নাড়িয়ে দিয়েছিল নাইন ইলাভেন ট্রাজেডি। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত নাইন-ইলাভেনের নির্ভুল নিখুঁত আর চৌকষ ধ্বংসযজ্ঞ কৌতূহলী করে তুলেছিল এই পাইলটকে। সিআইএ'র মতো দাপুটে একটি সংস্থার পাইলট বিশেষ করে সবরকম বোয়িং চালানোয় অভিজ্ঞ মার্শালের মনেও জেগেছিল হাজারো প্রশ্ন।

নাইন-ইলাভেন ষড়যন্ত্র নিয়ে ফিলিপ মার্শালের সেই বই

BanglaBook.org

দুই সন্তানসহ ফিলিপ মার্শাল

সবার আগে তিনি যে প্রশ্নটি করেছিলেন সেটা হলো 'সরকারি ভাষ্য বলছে, বিশ্বের অন্যপ্রান্তের কোনো এক গুহায় বাস করা কিছু ভূত (বিন লাদেন ও তার সহযোগী) আমাদের মাটিতে আমাদেরই পুরো সামরিক প্রতিষ্ঠানকে নাকে দড়ি দিয়ে ঘুরিয়ে দক্ষযজ্ঞ কাণ্ড ঘটিয়ে চলে গেল। আর আমরা কিছুই জানলাম না কিছুই করলাম না। এটা নিছক ছেলে ভুলানো গল্প ছাড়া আর কিছু না।' নাইন-ইলাভেন ট্রাজেডি নিয়ে দশ বছরের গবেষণার পর ২০১২ সালের ফেব্রুয়ারিতে প্রকাশিত হয় ফিলিপ মার্শালের সাড়া জাগানো বই, The Big Bamboozle: 9/11 and the War on Terror'. এই বইয়ে কংগ্রেসের যৌথ তদন্ত দলের অপ্রকাশিত ২৮টি পৃষ্ঠার বেশকিছু অংশ ফাঁস করেছেন ফিলিপ। প্রসঙ্গতঃ মার্শালের সাথে সাবেক সিনেটর বব গ্রাহামের হৃদ্যতা ছিল।

বইটিতে মার্শাল বলেছেন, বিন লাদেন কিংবা আল কায়েদা'র কোনো জুজু নয়। এক ইঞ্জিনের ছোট্ট বিমান নিয়ে প্রশিক্ষণ চালানো কয়েকজন আনাড়ি পাইলটও নয়। বরং ১৯ জন হামলাকারিকে টানা ১৮ মাস ধরে ট্রেনিং দিয়ে দুনিয়া কাঁপানো এই হামলার জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। লাস ভেগাস আর ফ্লোরিডাসহ যুক্তরাষ্ট্রের তিনটি রাজ্যে চলেছে তাদের প্রশিক্ষণ। বিন লাদেনের মুখোশের আড়ালে হামলার কৌশল প্রণয়ন, অর্থায়ন আর হামলাকারিদের প্রশিক্ষণ দিয়েছে সৌদি আরব। হামলার আগেই সবদিক থেকে সেটি সফল করার মতো সমস্ত ডেমোনেস্ট্রেশান সম্পন্ন করা হয়েছিল। আর হামলার আগে পরে নানাভাবে নিষ্ক্রিয় থেকে প্রকারান্তরে হামলাকারিদেরই সাহায্য করেছে বুশ প্রশাসন। কংগ্রেসের যৌথ তদন্ত কমিটির প্রধান পোর্টার গশ (রিপাবলিকান দলের কংগ্রেসম্যান পরে ২০০৪ সালে সিআইএ'র ডিরেক্টর) ফিলিপ জেলিকো (নাইন-ইলাভেন কমিশনের প্রধান) এবং এফবিআই ডিরেক্টর রবার্ট মুলার (৪

BanglaBook.org

সেপ্টেম্বর ২০০১ সালে নিয়োগপ্রাপ্ত) এই তিনজনের রহস্যজনক ভূমিকা ও সত্য আড়াল করার চেষ্টা নিয়েও বেশ কিছু তথ্য প্রমাণ তুলে ধরেছেন ফিলিপ মার্শাল।

এই ছবিই বলে দেয় কেবল সৌদি রাষ্ট্রদূত নয় তারচেয়েও বেশি কিছু ছিলেন প্রিন্স সুলতান বিন বানদার আল ফয়সাল

এই ষড়যন্ত্রের দৃশ্যমান সূচনাটা ছিল ২০০০ সালের জানুয়ারি মাসে ওয়াশিংটনের সৌদি দূতাবাসে। নাইন-ইলাভেনের ঘটনায় যে মানুষটির সবচে বেশি যোগাযোগ পাওয়া যায় তিনি হলেন ওয়াশিংটনে দুই দশকের (১৯৮৩ থেকে ২০০৫) সৌদি রাষ্ট্রদূত এবং কূটনৈতিক কোরের ডিন প্রিন্স সুলতান বিন বানদার আল ফয়সাল। ঠোঁটের কোণে সিগার আর অনৈসলামিক পানীয়'র

ভক্ত খোশমেজাজি এই মানুষটি একাধারে সিনিয়র বুশ, বিল ক্লিনটন এবং জর্জ বুশ অর্থাৎ ডেমোক্রেট রিপাবলিকান দুই দলের চার প্রেসিডেন্টের শাসনামলেই দাপুটে রাষ্ট্রদূত ছিলেন। সম্ভবত সেটা এ কারণে যে যুক্তরাষ্ট্রের প্রবল প্রতাপশালী রাজনৈতিক পরিবার অর্থাৎ বুশ পরিবারের দুই দশকের বন্ধু তিনি। এই বন্ধুত্ব এতটাই প্রগাঢ় ছিল যে টেক্সাসে বুশ পরিবারের খামার বাড়ি, প্রেসিডেন্টের ক্যাম্প ডেভিডের অবকাশ যাপন কেন্দ্র এমনকি হোয়াইট হাউসেও প্রিন্স বানদারের সপরিবারে যাতায়াতের জন্যে কোনো পূর্ব অনুমতির দরকার হত না। ২০০৪ সালে প্রিন্স বানদারের বিলাশবহুল ব্যক্তিগত বিমান A-340-এ আয়োজন করা হয় এইচ ডব্লিউ বুশের ৮০তম জন্মদিন। সেখানে বুশ সিনিয়র মজা করে প্রিন্সকে, বানদার বুশ নামে আখ্যায়িত করেছিলেন। যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতিতে প্রভাব বিস্তার করা প্রিন্স বানদার সম্পর্কে অনুসন্ধানী সাংবাদিক বব উডওয়ার্ড তার State of Denial গ্রন্থে লিখেছেন—'বুশ তাঁর বাবা সিনিয়র বুশকে বললেন, আমি প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। জবাবে বুশের বাবা বলেছেন, তুমি প্রিন্স বানদারের সাথে কথা বলো। বুশ তাই করলেন। প্রিন্সের সাথে দেখা করে তিনি বললেন, বাবা আমাকে বলেছেন আমি মনস্থির করার আগে যেন আপনার সাথে কথা বলি। সেই জর্জ বুশ যখন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট তখন প্রিন্স বানদার যেন রীতিমত ভাইস প্রেসিডেন্ট।

হোয়াইট হাউসের প্রেসিডেন্ট দপ্তর কিংবা ক্যাবিনেটে বিনা নোটিশ-বিনা এপয়েন্টমেন্টে বানদারের ছিল অবাধ যাতায়াত। হোয়াইট হাউসের কর্মকর্তারা মজা করে তাকে 'টপ গান' নামে ডাকতেন। বলা হয় ২০০৩ সালে মার্কিন প্রেসিডেন্ট তাঁর ইরাক যুদ্ধের পরিকল্পনাটা প্রথম যার কাছে প্রকাশ করেছিলেন, তিনি প্রিন্স বানদার। কেবল সৌদি আরব নয়। তার প্রভাব ছিল পুরো মধ্যপ্রাচ্যে। যুক্তরাষ্ট্রের সাথে মধ্যপ্রাচ্যের সম্পর্কের যে কোনো সংকটে, সেটা ৮৪ সালে ইরানের কন্ট্রা-অপারেশনে বিপুল অঙ্কের অর্থ দেওয়া থেকে শুরু করে ৯০ সালে ইরাকের কুয়েত দখল করা, প্যান আমেরিকান বিমানে লিবিয়ার হামলা, ১৯৯৩ সালে বৈরুতে বোমা হামলা এবং মেরিন সেনাদের প্রত্যাহার এমনি নানা সংকটে ছায়ার মতো হোয়াইট হাউসের পাশে ছিলেন প্রিন্স বানদার। যেমনটা ছিলেন নাইন-ইলাভেনের দিন বিকেলবেলা জর্জ বুশের সাথেও। প্রিন্স বানদার আর প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশকে তখন একসাথে হোয়াইট হাউসের বেলকনিতে সিগার টানতে দেখা গেছে। সেদিন যুক্তরাষ্ট্রের আকাশ যখন নো ফ্লাই জোন, তখন প্রিন্স বানদারের অনুরোধে রীতিমত বিশেষ প্রহরায় বিন লাদেনের পরিবারসহ যুক্তরাষ্ট্রে থাকা শতাধিক সৌদি পরিবারকে গোপনে যুক্তরাষ্ট্র থেকে পালিয়ে যাবার সুযোগ করে দেওয়া হয়।

BanglaBook.org

২০০৫ সালের জুনে রহস্যজনকভাবে প্রিন্স বানদারকে যুক্তরাষ্ট্র থেকে প্রত্যাহার করে নেয় রিয়াদ। সেইসাথে শেষ হয় প্রিন্স বানদারের ২২ বছরের কূটনীতিক জীবন। যদিও বানদার বলেছেন তিনি স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করেছেন। তবে ধারণা করা হয় নাইন-ইলাভেনের ঘটনায় কংগ্রেসের যৌথ তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট প্রিন্স বানদারের কূটনৈতিক জীবন অবসানে ভূমিকা রেখেছিল। কেবল নাইন-ইলাভেনের হামলাকারিদের মদত দেওয়াই নয় ২০০৪ সাল পর্যন্ত ওয়াশিংটনে যুক্তরাষ্ট্রের সৌদি দূতাবাস এবং রিগস ব্যাংকের মাধ্যমে আল কায়দা থেকে শুরু করে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সন্ত্রাসী অর্থায়নের কুশীলবদেরও একজন ছিলেন তিনি। যদিও হদিস পায় কংগ্রেসের যৌথ তদন্ত কমিশন। ধারণা করা হয় এরপর তাকে আর ওয়াশিংটনে রাখাটা নিরাপদ মনে করে নি রিয়াদ।

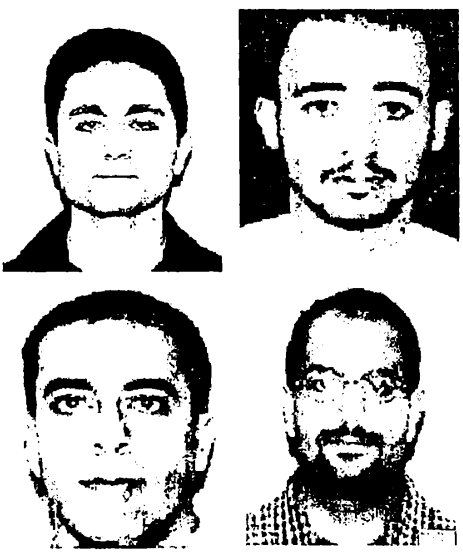

চার ছিনতাইকারি পাইলট মোহাম্মদ আতা, হানি হানজৌর, জিয়াদ সামির জারাহ ও মারওয়ান আল সেহহি

মার্শাল তার বইয়ে বলেছেন, ২০০০ সালের জানুয়ারিতে লস এঞ্জেলসের সৌদি কনস্যুল অফিসে আসেন দুই হামলাকারি—খালিদ আল মিহদার এবং নাওয়াফ আল হাযমি। কনস্যুল অফিশিয়াল ফাহাদ আল থুমাইরি তাদের সেখানে বরণ করেন। পরে সান্তিয়াগোর একটি রেস্টুরেন্টে তাদের সাথে দেখা করেন সৌদি গোয়েন্দা এজেন্ট ওমর আল বায়োমি। আর তাদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করার কাজটি করেন আরেক সৌদি এজেন্ট ওসামা বাসনান।

তার হাত দিয়েই জানুয়ারি থেকে শুরু করে বিভিন্ন সময় প্রিন্স বানদার ও তার স্ত্রী কয়েক কিস্তিতে হামলাকারিদের ১ লাখ ৩০ হাজার মার্কিন ডলারের চেক হস্তান্তর করেন। যদিও প্রিন্সের দাবি ছিল এই টাকা বাসনানের অসুস্থ স্ত্রীর চিকিৎসার সাহায্যে দেওয়া হয়েছে। হামলাকারিদের বাসাভাড়া থেকে শুরু করে ব্যবস্থাপনার সব দায়িত্ব পালন করেন বাসনান। একই সময় আল কায়দার মার্কিন গুরু আনোয়ার আল আওলাকির সাথে হামলাকারিদের বৈঠক ও পরে পার্টির আয়োজন করেছিলেন বাসনান। নাইন-ইলাভেন কুশীলবদের অন্যতম আওলাকির সাথে ওয়াশিংটনের সৌদি দূতাবাসেরও ঘনিষ্ট যোগাযোগ ছিল। এমনকি প্রিন্স বানদারের সাথে বিভিন্ন অনুষ্ঠানেও দেখা গেছে আওলাকিকে।

নব্বয়ের দশকে যুক্তরাষ্ট্রে আসেন ইয়েমেনের নাগরিক আওলাকি। ভর্তি হন কলোরাডো কলেজের সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ। ৯৩ সালে আফগান মুজাহিদদের সাথে রুশ বিরোধী লড়াইয়ে যোগ দিয়ে ফিরে আসেন ৯৪ সালে। আওলাকি তার কলোরাডোর বন্ধুদের বলেছিলেন আফগানিস্তানের মানুষের দারিদ্রের সংগ্রাম তার জীবনের লক্ষ্যকে পাল্টে দিয়েছে। তখন থেকেই আওলাকির উগ্রপন্থার সূচনা। ৯৬ সালে ক্যালিফোর্নিয়ার সান্তিয়াগোতে 'মসজিদ আর রিবাত আল ইলসাম'-এ ইমামতির আড়ালে উগ্রপন্থার প্রচার শুরু করেন তিনি। তুখোড় ইংরেজি জানা এবং ধর্মীয় বয়ানে সুবক্তা আওলাকির তখন দুই-তিনশো অনুসারি। নাইন-ইলাভেনের দুই ছিনতাইকারি নওয়াফ আল হাযমি এবং খালিদ আল মিহদারকে তিনিই সৌদি গোয়েন্দা এজেন্ট বায়োমি'র সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন বলে তদন্তে বেরিয়ে এসেছে। প্রসঙ্গতঃ যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক দপ্তর পেন্টাগনে আছড়ে পড়েছিল এই দুই ছিনতাইকারির বিমান। ২০০১ সালের জানুয়ারি থেকে 'দার আল হিজরাহ' মসজিদে ইমামতির মধ্য দিয়ে ওয়াশিংটনে বসবাস শুরু করেন আওলাকি। সেটা ছিল নাইন-ইলাভেন ষড়যন্ত্রের কুশীলবদের তৎপরতা শুরুর সময়। এখানেও মসজিদ এবং কল্যাণমূলক কাজে অর্থসংস্থানের আড়ালে আওলাকির বিরুদ্ধে জঙ্গি অর্থায়ণের প্রমাণ পাওয়া গেছে। অথচ হামলার পর হঠাৎ করেই উদারপন্থী একজন মুসলিম স্কলার হিসেবে আবির্ভুত হলেন আওলাকি। বিশ্লেষকরা বলেন, সেই ট্রাজেডির পর মার্কিন মুল্লুক জুড়ে যখন মুসলিম বিরোধী ক্ষোভ, ঘৃণা তখন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাকি মুসলিম দুনিয়ার সেতুবন্ধন রচনার কাজটি করানো হয়েছিল আওলাকিকে দিয়ে। হয়তো সে কারণেই টুইন টাওয়ার ধ্বসে পড়ার দিন নিউ ইয়র্ক টাইমসসহ বিভিন্ন গণমাধ্যমে দেওয়া সাক্ষাৎকারে আওলাকি বলছিলেন 'কোনো মুসলমান কোনোদিন এমন কাজ

BanglaBook.org

করতে পারে না। যদি কেউ করেও থাকে তবে তিনি অবশ্যই ইসলামকে বিকৃত করছেন'। নাইন-ইলাভেনের দুদিন পর এফবিআই চার দফায় মোট আটবার আওলাকিকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে। আবার ছেড়েও দিয়েছে। কথিত আছে তাকে ছেড়ে দেওয়ার পেছনে কাজ করেছেন রিপাবলিকান দলের কয়েকজন কংগ্রেসম্যান।

পেন্টাগনে হামলার জন্য দুই সন্ত্রাসীকে রিক্রুট করেছিলেন আনোয়ার আল আওলাকি

জিজ্ঞাসাবাদে যুক্ত এক এফবিআই সদস্য পরে কংগ্রেসের তদন্ত কমিটিকে বলেছে 'আমার মনে হয়েছে আওলাকি হলেন সেই মানুষ যিনি জানেন আসলে কী হয়েছে এবং কারা এর পেছনে আছে'। অথচ আওলাকি ততক্ষণে চিরতরে যুক্তরাষ্ট্র ছেড়েছেন। যোগ দিয়েছেন আল কায়েদায়। এবং একের পর এক যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমা দুনিয়ায় হামলা চালানোর ভিডিও প্রচার করে যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম শত্রুতে পরিণত হয়েছেন। আওলাকি হলেন প্রথম মার্কিন নাগরিক যাকে পাওয়ামাত্র হত্যার ঘোষণা দিয়েছিল সিআইএ।

BanglaBook.org

২০১১ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর ইয়েমেনের প্রত্যন্ত এক পাহাড়ি এলাকায় সকালের নাশতা করছিলেন আল কায়দা নেতা আওলাকি ও তার কয়েকজন অনুসারি। তাদের কয়েকগজ দূরেই পড়েছিল প্রথম মিসাইলটি। আওলাকি ও তার অনুসারিরা দৌড়ে গাড়িতে ওঠেন। চলন্ত সেই গাড়িতেই দ্বিতীয় দফা ড্রোন হামলায় তিন সহযোগিসহ মারা যান আনোয়ার আল আওলাকি। এর ঠিক এক বছর আগে মার্কিন জনগণকে অবাক করেছিল আরেকটি খবর। আওলাকির রিক্রুট করা যে দুই ছিনতাইকারি (নওয়াফ আল হাযমি ও খালিদ আল মিহদার) বিমান নিয়ে পেন্টাগনে আছড়ে পড়েছিল, সেই পেন্টাগনেই নাইন-ইলাভেনের দিন লাঞ্চের দাওয়াত পেয়েছিলেনে আওলাকি। যদিও নয়বছর পর সেই ঘটনা আর মনেই করতে পারেননি সাবেক সামরিক সচিব টমি হোয়াইট। তবে এফবিআই'র সাবেক এক এজেন্ট বলেছেন, 'সেদিন দুপুরে আওলাকির পেন্টাগনে প্রবেশ করা নিয়ে অনেক ঝামেলা হয়েছিল। ব্যাপারটা অনেকদূর গড়িয়েছিল।'

বলছিলাম ছিনতাইকারি খালিদ আল মিহদার এবং নাওয়াফ আল হাযমি'র কথা। ডিসেম্বরে সান্তিয়াগোতে তাদের সাথে যোগ দেন আরও একজন। তার নাম হানি হানজৌর। বলা হয় তিনিও ছিলেন আওলাকির অনুরক্ত। ২০০০-এর জুনে ফ্লোরিডার সারাসোটায় অবস্থান নেন তিন হামলাকারি, মোহাম্মদ আতা, মারওয়ান আল সেহহি আর জিয়াদ জারাহ। একটি বাংলো বাড়িসহ অন্তত দুটি অ্যাপার্টমেন্টে তারা বিলাসবহুল জীবনযাপন করতেন। সেখানে অভিযান চালিয়ে আনকোরা একটি ক্রাইসলার গাড়িও এফবিআই জব্দ করেছিল। অথচ কংগ্রেসের যৌথ তদন্ত দলের সমন সত্ত্বেও (subpoena) এ ব্যাপারে কোনো সাক্ষ্য দিতে রাজি হয়নি এফবিআই।

BanglaBook.org

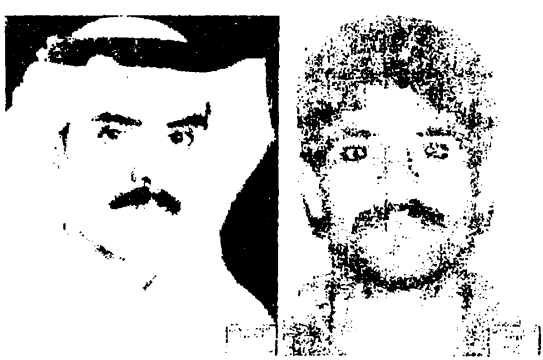

দুই ছিনতাইকারি খালিদ মিহদার ও নওয়াফ হাজমি

দুই সৌদি গোয়েন্দা ওমর আল বায়োমি ও ওসামা বাসনান

এত বড় একটা ঘটনা, যেখানে বিমানকে মিসাইলে পরিণত করা হয়েছে সেখানে ফিলিপ জেলিকো নেতৃত্বাধীন নাইন-ইলাভেন কমিশন কোনো পাইলটের সাক্ষ্য নেয়নি। বিমান চালনায় ২০ বছরের অভিজ্ঞতা দিয়ে সিআইএ'র সাবেক পাইলট মার্শাল বলেছেন, বিভিন্ন প্রজন্মের বোয়িং ওড়ানোর অভিজ্ঞতা না থাকলে অমন নিখুঁত টার্গেট নিয়ে লক্ষ্য বস্তুতে বিমান দিয়ে আঘাত করা সম্ভব নয়। তাই প্রশিক্ষণ কাজে এক ইঞ্জিনের ছোট্ট বিমান নয়। বরং চার ইঞ্জিনের বোয়িং চালানোর প্রশিক্ষণই পেয়েছে হামলাকারিরা। আর এই প্রশিক্ষণ দিয়েছে সৌদি আরব।

নাইন-ইলাভেনের ছয়মাস আগে ছিনতাই হওয়া চারটি বিমানের ছিনতাইকারি চার পাইলট মোহাম্মদ আতা, হানি হানজৌর, জিয়াদ জারাহ এবং মারওয়ান আল সেহহি যুক্তরাষ্ট্রের লাসভেগাসে যান। সেখানকার পিনাল এয়ার পার্কটি তখন ব্যবহার করত সিআইএ এবং প্রাইভেট মার্সেনারি কোম্পানি ব্লাক ওয়াটার। সেই এয়ার পার্কে তখন বোয়িং ৭৫৭ এবং ৭৪৭ মডেলের বেশ কিছু বিমান ওঠা-নামা করত। একই সময় সেখানে যাতায়াত ছিল সদ্য সৌদি এভিয়েশান প্রধান হওয়া প্রিন্স তুর্কী আল ফয়সালের। এক বছরেরও বেশি সময় পর্যন্ত লাস ভেগাসের পিনাল এয়ার পার্কে তাদের রহস্যময় যাতায়াত ছিল।

১৯ সেপ্টেম্বর লাসভেগাস থেকে ৪৬ জন সৌদি নাগরিকসহ ৬৯ জন যাত্রী নিয়ে জেনেভার উদ্দেশ্যে ছেড়ে যায় একটি ডিসি এইট। ২০ সেপ্টেম্বর ১৮ জন সৌদি নাগরিক নিয়ে ইংল্যান্ডের উদ্দেশ্যে ছেড়ে যায় আরও একটি বোয়িং ৭২৭। ২৩ সেপ্টেম্বর মাত্র ৩৪ জন যাত্রী নিয়ে প্যারিসের উদ্দেশ্যে ছেড়ে যায় একটি জাম্বো লকহেড L-101 বিমান। বিমানটির যাত্রীদের একজন ছিলেন

BanglaBook.org

সৌদি গোয়েন্দা প্রধান তুর্কি। অথচ ওই বিমানের যাত্রী ধারণক্ষমতা ছিল চারশ। কেবল লাসভেগাস নয়। প্রায় একই সময়ে নিউ ইয়র্ক বোস্টন আর ওয়াশিংটন থেকেও সৌদি হাই-অফিশিয়ালসদের নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র ছেড়ে যায় আরও তিনটি চার্টার্ড বিমান। ২০০১ সালের বসন্তে যুক্তরাষ্ট্রে তুর্কির এই উপস্থিতিকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে মার্শাল বলছেন, দীর্ঘ ২৪ বছর সৌদি গোয়েন্দা সংস্থার প্রধান হিসেবে কাজ করার পর ২০০১ সালের আগস্টে রহস্যজনকভাবে তাকে সৌদি এভিয়েশানের প্রধান হিসেবে নিয়োগ দিয়ে প্রকারান্তরে যুক্তরাষ্ট্রে তার অবাধ বিচরণের সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে। এভিয়েশান প্রধান হিসেবে তুর্কির দায়িত্বের জায়গা থেকেই তার পক্ষে সৌদি বোয়িং এবং প্রশিক্ষকদের যুক্তরাষ্ট্রে হাজির করা সহজ ছিল। বলাবাহুল্য কারো কোনো জিজ্ঞাসাবাদ ছাড়া খুব সহযেই যুক্তরাষ্ট্র ত্যাগের সুযোগ পান তুর্কি, গোয়েন্দা এজেন্ট বায়োমি ও বাসনান।

সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ ও তার প্রশাসনের বিরুদ্ধে এমন একটি গুরুতর এবং তার ভাষায় 'দিবালোকের মতো সত্য' প্রকাশ করা নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিলেন ফিলিপ মার্শাল। তিনি বলতেন নাইন-ইলেভেনের গোয়েন্দা ব্যর্থতা অথবা ইচ্ছাকৃত ব্যর্থতা নিয়ে তাঁর হাতে আরও কিছু বোম ফাটানো তথ্য রয়েছে। যা নিয়ে তিনি আরও একটি বই প্রকাশ করতে যাচ্ছেন। বইটির সম্পাদনার কাজও চলছিল। ২০১২ সালের ফেব্রুয়ারিতে The Big Bamboozle প্রকাশের ঠিক একবছর পর ২০১৩ সালের ফেব্রুয়ারিতে ফিলিপ ও তার দুই সন্তানের রহস্যজনক মৃত্যু হলো। ক্যালিফোর্নিয়ার সান্তা বারবারা'র বাড়ির দরজায় পাওয়া গেল ফিলিপ মার্শালের গুলিবিদ্ধ মৃতদেহ। গুলিবিদ্ধ দুই সন্তানের দেহ পাওয়া যায় বাড়ির ভেতরে। পোষা কুকুরটি পড়েছিল বেডরুমে। তাদের সবার মাথায় একটি করে গুলি করা হয়েছে। তদন্ত শেষে সান্তা বারবারা পুলিশ জানাল, স্ত্রীর সাথে ব্রেক আপের পর থেকে মানসিক যন্ত্রণায় ভোগা ফিলিপ মার্শাল দুই সন্তানকে খুন করে নিজেও আত্মঘাতী হয়েছেন। তবে যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল সিকিউরিটি ইন্টেলিজেন্সের সাবেক কর্মকর্তা ওয়েইন ম্যাডসেন যিনি ফিলিপ মার্শালের রহস্যজনক মৃত্যুর পর নিজে থেকে এই ঘটনার তদন্ত করেছেন। তার মতে 'ফিলিপের মৃত্যু মোটেই আত্মহত্যা ছিল না, এটা পেশাদার খুনিদের কাজ। এই হত্যাকাণ্ড কেবল ফিলিপ যা প্রকাশ করেছেন তার জন্যে নয় বরং তিনি যা প্রকাশ করেননি তার জন্যে।'

বলে রাখা প্রয়োজন, কংগ্রেসের তদন্ত কমিটির গোপন করা আঠাশ পৃষ্ঠা প্রকাশের দাবিতে রিপাবলিকান দলের কংগ্রেস সদস্যদের সমালোচনার মুখে

BanglaBook.org

বুশ বলেছিলেন 'এই তথ্য প্রকাশ পেলে যুক্তরাষ্ট্রের সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধ মুখ থুবড়ে পড়বে। বিশ্বব্যাপী মার্কিন আধিপত্য খর্ব হবে।' (The Newyorker, The Twenty-Eight Pages)। যথার্থই বলেছেন প্রেসিডেন্ট বুশ। কারণ ওই আঠাশ পৃষ্ঠা প্রকাশ হওয়া মানে নাইন-ইলাভেন মিথ্যে, লাদেন মিথ্যে, আফগান-ইরাক যুদ্ধ সবই মিথ্যে। কেবল নাইন-ইলাভেন নয়, ইতিহাসের প্রায় প্রতিটি কালপর্বে এমন হাজারো মিথ্যে আর ষড়যন্ত্রের জন্ম দিয়েছে সিআইএ তথা যুক্তরাষ্ট্র। যুগে যুগে 'ক্লাসিফায়েড' শব্দের আড়ালে লুকিয়ে রাখা হয়েছে ষড়যন্ত্রের সেইসব দলিল। ফিলিপ মার্শাল কিংবা বব উডওয়ার্ডের মতো সত্যানুসন্ধানি যেসব মানুষ ষড়যন্ত্রের প্রকৃত সত্যকে মানুষের মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছেন তাদের কাজকে 'কন্সপিরেসি থিউরি'র নামে অগ্রাহ্য করবার চমৎকার এক রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা—সেও যুক্তরাষ্ট্রেরই আবিষ্কার।

বলছিলাম আফগান মুক্তি আন্দোলনের নেতা আহমেদ শাহ মাসুদের কথা। একটা সময় ছিল যখন আফগানিস্তানের মানুষের ঘরের দেওয়াল থেকে শুরু করে গাড়ির ড্যাশবোর্ড পর্যন্ত সর্বত্র ঝুলানো থাকত আহমেদ শাহ মাসুদের ছবি। তার প্রথম মৃত্যুবার্ষিকীতে লাখো মানুষের ভিড়ে সামলাতে বিশাল স্টেডিয়ামে শোকসভার আয়োজন করতে হয়েছিল। এমন আকাশচুম্বি জনপ্রিয়তার মধ্যদিয়ে একজন জাতীয় বীরে পরিণত হওয়াটাই মাসুদের জন্যে কাল হয়েছিল। কারণ তিনি বেঁচে থাকলে তার মাতৃভূমিকে যুক্তরাষ্ট্রের কথিত সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধের রণাঙ্গণ বানানো এত সহজ হত না। এবং তালেবান বিরোধী যুদ্ধে নিশ্চিত বিজয়ের পর মার্কিনপন্থী একটি পুতুল সরকারকে ক্ষমতায় বসানো যেত না। এই দুটি সূত্রের আড়ালেই লুকিয়ে আছে মাসুদ হত্যার রহস্য। আগেই বলেছি তালেবান জঙ্গিদের কাছে আতঙ্ক হয়ে উঠেছিল নর্দান এলায়েন্স। তার ওপর আফগানিস্তানে সুন্নি জঙ্গিদের উত্থানের অজুহাতে সম্ভাব্য মার্কিন প্রভাব ঠেকাতে মরিয়া ইরান-রাশিয়া উভয়ের কাছ থেকেই অর্থ ও অস্ত্র সাহায্য পাচ্ছিলেন মাসুদ। হিউম্যান রাইটস ওয়াচের 'আঞ্চলিক অস্ত্র বাণিজ্য' বিষয়ক এক রিপোর্ট বলছে—১৯৯৮ সালে ইরান থেকে আসা বিপুল পরিমাণ অস্ত্রের একটি শিপমেন্ট আটক হয় কিরগিস্তানে। অস্ত্রগুলো ছিল রাশিয়ার তৈরি। আর তা যাচ্ছিল নর্দান এলায়েন্সের কাছে। অন্যদিকে তালেবান এবং আল কায়দাকে মদত দিয়ে প্রকারান্তরে যুক্তরাষ্ট্রের জন্য রণভূমি ও তার ছায়া শত্রু নির্মাণের মহাযজ্ঞটা সারছিল পাকিস্তানের সামরিক গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআই। মাসুদের মৃত্যুর সাথে সিআইএ'র সরাসরি জড়িত থাকার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি ঠিকই। তবে নব্বই দশক জুড়ে আফগানিস্তানে রুশ বিরোধী লড়াইয়ে তালেবান আল কায়দা আর আইএসআই'র প্রতি

BanglaBook.org

যুক্তরাষ্ট্রের প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সমর্থন আর মদত দেওয়ার কথা কারো অজানা নয়। মাসুদ হত্যার ঘটনায় আন্তর্জাতিক বিভিন্ন তদন্তে উঠে এসেছে আইএসআই'র নাম। দুই হামলাকারিকে ভূয়া পাসপোর্ট তৈরি করে দেওয়া থেকে শুরু করে তাদের প্রয়োজনীয় সব সাহায্য এসেছিল আইএসআই থেকে। ২০০১ সালের আগস্ট এবং সেপ্টেম্বরে আইএসআই প্রধান লে. জেনারেল মাহমুদ আহমেদের ঘন ঘন ওয়াশিংটন সফর নানা প্রশ্নের জন্ম দিয়েছিল। মাসুদ হত্যাকাণ্ডের দুদিন পর অর্থাৎ নাইন-ইলাভেন ট্রাজেডির দিনটিতেও ওয়াশিংটনেই ছিলেন স্বয়ং আইএসআই প্রধান। বৈঠক করেছেন সিআইএ প্রধান ও স্টেট ডিপার্টমেন্টের কর্তা ব্যক্তিদের সাথে। সেদিনই তার ওয়াশিংটনে উপস্থিতিকে নেহাত 'কাকতালিয় নয়' বলে মন্তব্য করেছিল কংগ্রেসের তদন্ত কমিশনও।

প্রশ্ন ওঠে নিজ দেশের তিন হাজার মানুষের মর্মান্তিক মৃত্যু বিনিময়ে কি পেল যুক্তরাষ্ট্র? উত্তর হলো অন্তহীন যুদ্ধ আর নতুন শতকের নয়া আধিপত্যবাদ। যা পাল্টে দিয়েছে বিশ্ব রাজনীতির খোলনলচে। এই একটা মাত্র ঘটনাকে পুঁজি করে তৈরি করা নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার বা নতুন বিশ্ব ব্যবস্থায় ওলট-পালট হয়ে গেল আন্তর্জাতিক সম্পর্কের সকল হিসাব নিকাশ। যা আগামি কয়েক দশকের জন্যে যুক্তরাষ্ট্রকে আধিপত্যবাদের ফসল ঘরে তোলার এক মোক্ষম সুযোগ এনে দিয়েছে। ভবিষ্যতের অন্তহীন সময়ের জন্যে নাইন-ইলাভেন যেন যুক্তরাষ্ট্রের জন্যে এক কোমর ডিম পাড়া হাঁস। তারই নজির পাওয়া গেল ঠিক নাইন-ইলাভেনের পরদিন।

১২ সেপ্টেম্বর রাতেই জাতির উদ্দেশ্যে দেওয়া ভাষণে নতুন যুদ্ধের ইঙ্গিত দিয়ে প্রেসিডেন্ট বুশ বলেছেন 'The deliberate and deadly attacks which were carried out yesterday against our country were more than acts of terror.They were acts of war.' সে রাতেই সিআইএ প্রধান, প্রতিরক্ষামন্ত্রী আর পেন্টাগনের সামরিক কর্মকর্তাদের আফগান যুদ্ধের ছক প্রস্তুত করার নির্দেশ দিলেন প্রেসিডেন্ট।

যার চূড়ান্ত ঘোষণা আসে ২০ সেপ্টেম্বর রাত ৯ টায়। জাতির উদ্দেশ্যে দেওয়া ভাষণে বুশ বললেন, 'pursue nations that provide aid or safe haven to terrorism. Every nation in every region now has a decision to make:Either you are with us or you are with the terrorists.We will not tire, we will not falter and we will not fail.' সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধ নামের অন্তহীন এক অন্যায় যুদ্ধের সূচনা সেখান থেকেই। যে যুদ্ধের নির্দিষ্ট কোনো ভূখণ্ড নেই। নেই কোনো সীমা-পরিসীমা।

BanglaBook.org

যে যুদ্ধ আজ পাক-আফগান সীমান্তে তো কাল ইয়েমেনের প্রত্যন্ত কোনো দরিদ্র জনপদে। যখন তখন যে কোথাও শুরু হতে পারে অনির্দিষ্ট এই যুদ্ধ। আক্রান্ত হতে পারে যে কেউ।

আফগানিস্তানে গণকবর

মার্কিন বিমান হামলায় ব্যবহার করা নিষিদ্ধ ক্লাস্টার বোমায় ঝলসে যাওয়া আফগান শিশু

যেমন ২০০১ সালের ৭ অক্টোবর আক্রান্ত হলেন আফগানিস্তানের তোরাবোরা'র পাহাড়ি জনপদের দরিদ্র মানুষ। একদিকে তারা আল কায়দা তথা তালেবানের নির্মম শাসনের শিকার অন্যদিকে মার্কিন বোমা'র লক্ষ্যবস্তু। ৭ ডিসেম্বর মাত্র দুমাসের মধ্যে তালেবান শাসনের পতন আর আত্মসমর্পনের মধ্য দিয়ে মাসুদমুক্ত আফগানিস্তানে রচিত হয় দীর্ঘমেয়াদি মার্কিন

দখলদারীত্ব। নাইন-ইলাভেনের মহাষড়যন্ত্রের জটিল সমীকরণ যারা বোঝেন তারা জানেন তালেবান বা আল কায়দা খতম করা নয় বরং দখলদারীত্বের নামে ভূ-রাজনৈতিক ক্ষমতাবলয়ের আধিপত্যই যুক্তরাষ্ট্রের একমাত্র এবং চূড়ান্ত লক্ষ্য। আর দীর্ঘমেয়াদি সেই লক্ষ্যের পথ ধরে ঠিক দুবছরের মাথায় দুনিয়ার ঘাড়ে সওয়ার হয় আরও একটি রনাঙ্গণ—ইরাক। এটা নিশ্চয়ই বলার অপেক্ষা রাখে না যে নাইন-ইলাভেনের বহুমুখী ষড়যন্ত্রের পথ ধরেই রচিত হয়েছে আল কায়দা এবং আজকের আইএস-এর জন্ম-ঠিকুজি।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

আফগানিস্তান

জঙ্গিবাদের বীজতলায় যুক্তরাষ্ট্র, পাকিস্তান ও সৌদি আরব

লাদেনের সেই 'গর্তে' পালা করে মুজাহিদদের গেরিলা প্রশিক্ষণ দিতে আসতেন পাকিস্তান আর যুক্তরাষ্ট্রের সেনা কর্মকর্তারা। গেরিলাযুদ্ধ আত্মঘাতী হামলা গাড়িতে বিস্ফোরক লুকিয়ে হামলা—এইসব কৌশলই আইএসআই আর সিআইএ'র কাছ থেকে শিখেছিল জঙ্গিরা। সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধের নামে প্রতিবছর যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার পাচ্ছে পাকিস্তান ও তার সেনাবাহিনী। তাই টিকে থাকে সোনার ডিম পাড়া হাঁস—তালেবান।

রুশ বিরোধী লড়াইয়ের নামে আফগান জঙ্গিদের সিআই-এর সাহায্য ও প্রশিক্ষণ

আফগান শিশুদের জন্যে যুক্তরাষ্ট্র প্রণীত জিহাদি বই

আফগান রণাঙ্গনে সৌদি আরব ও আইএআই'র তৎপরতা

দেশান্তরি লাদেনের জঙ্গি হয়ে ওঠা

আল কায়দার যাত্রা

মোস্ট ওয়ান্টেড লাদেন

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

২০১৪ সালের জুনে মার্কিন দৈনিক ওয়াশিংটন পোস্ট একটি খবর ফাঁস করেছে—'বিন লাদেনের পুতুল তৈরি করছে মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ'। দানবীয় চেহারার এই লাদেন পুতুল তৈরির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বিখ্যাত খেলনা নির্মাতা প্রতিষ্ঠান হাসব্রো এক্সিকিউটিভকে। চীনে চলছে এই পুতুল বানানোর কাজ। ভয়ঙ্কর চেহারার লাদেন পুতুলকে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে ছড়িয়ে দেবার পরিকল্পনা সিআইএ'র। উদ্দেশ্য ছোটবেলা থেকেই শিশুদের মনে লাদেনরূপী জঙ্গিদের বিরুদ্ধে ঘৃণা তৈরি করা।

আল কায়দা তথা বিন লাদেনের জন্ম রহস্য যারা জানেন এই খবর তাদের কাছে সাম্প্রতিক ইতিহাসের সবচেয়ে সেরা কৌতুক। সেটা এ কারণে যে ২০১৪ সালের দানবীয় লাদেন পুতুলই শুধু নয়। রক্ত মাংসের একজন লাদেন আর আল কায়দা নামের ভয়ঙ্কর একটি দানবীয় সংগঠনের জন্মদাতা যুক্তরাষ্ট্র ও তার দীর্ঘদিনের বন্ধু সৌদি আরব। পুরো ৮০'র দশক থেকে শুরু করে নতুন শতাব্দি'র সূচনা পর্যন্ত দুই দশকে অর্থ, অস্ত্র আর প্রশিক্ষণ দিয়ে কিভাবে একটু একটু করে বিন লাদেন ও আল কায়দা নামের এই ফ্রাঙ্কেনস্টাইন তৈরি করা হলো সেই তথ্য এখন অনেকটাই প্রকাশ্য। সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ার পতন আর সেই পতনের পর নয়া শত্রু হিসেবে জঙ্গিবাদের উত্থান; ইতিহাসের এই দুই পর্বেই যুক্তরাষ্ট্রের সিআইএ ও সৌদি আরবের প্রাণের বন্ধু ছিলেন বিন লাদেন। এমনকি এই বন্ধুত্ব অটুট ছিল নাইন-ইলাভেনের সূচনা লগ্নেও। ফ্রান্সের ফাঁস হওয়া গোয়েন্দা তথ্য অন্তত সেটাই বলেছে।

২০০১ সালের নভেম্বরে বিশ্বের প্রভাবশালী গণমাধ্যমগুলোতে ছাপা হওয়া একটা খবর দুনিয়াজুড়ে তোলপাড় সৃষ্টি করেছিল। খবরটা হলো—'বিন লাদেনের সাথে সিআইএ এজেন্টের সাক্ষাত'। সময়টা ছিল নাইন-ইলাভেন ট্রাজেডির মাত্র দুমাস আগে। ৪ জুলাই ব্যক্তিগত একজন চিকিৎসক, একজন নার্স ও চার দেহরক্ষি নিয়ে পাকিস্তানের কোয়েটা থেকে দুবাইয়ে আসেন বিন লাদেন। তার শরীরের অবস্থা ভালো নয়। তিনি হেপাটাটিস সি-তে ভুগছেন। সেই সাথে কিডনিতে ইনফেকশান। নিয়মিত কিডনি ডায়ালাইসিস করাতে হচ্ছে তাকে। লাদেন ভর্তি হয়েছেন দুবাইয়ের একটি আমেরিকান হাসপাতালের ইউরোলজি বিভাগে। সেখানেই তার সাথে দেখা করতে আসেন দুবাইয়ে থাকা সিআই-এর এক উর্ধতন কর্মকর্তা। প্রথমে ওই হাসপাতালের লিফটে, পরে তাকে লাদেনের রুমের দিকে যেতে দেখা গেছে। এর কদিন পরই ওই সিআইএ অফিসারকে ওয়াশিংটনে ডেকে পাঠানো হয়। তারপর আসেন আরও একজন সিআইএ এজেন্ট। দশদিন ওই হাসপাতালে ছিলেন

BanglaBook.org

বিন লাদেন। এই দশদিনে সৌদি আরবের আরও কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তার আনাগোনা, দেখা গেছে ওই হাসপাতালে। তাদের একজন সৌদি গোয়েন্দা প্রধান প্রিন্স তুর্কী আল ফয়সাল। নাইন-ইলাভেনের আগে পরে যুক্তরাষ্ট্রে তুর্কীর রহস্যময় তৎপরতার কথা পাঠক আগেই জেনেছেন। মূলত ৮০'র দশক থেকেই আফগান মুজাহিদ এবং বিন লাদেনের সাথে তুর্কির যোগাযোগ। (The Guardian, Thursday 1 November 2001)

দানবিয় চেহারার লাদেন পুতুল ও আফগানিস্তানে রুশ বিরোধী লড়াইয়ে বিন লাদেন

লাদেনের অবস্থা তখন রীতিমত সংকটাপন্ন। ডাক্তাররা বলছিলেন তিনি বড়জোর দুই কি তিন বছর বাঁচবেন। নিয়মিত কিডনি ডায়ালাইসিসের জন্য তাকে একটি বহনযোগ্য মেশিন আফগানিস্তানের কান্দাহারে নিয়ে যাবার পরামর্শ দিয়েছেন ডাক্তাররা। তবে দুবাইয়ের এই রিপোর্ট নয়—বরং গোয়েন্দা তথ্য ফাঁস হওয়া নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিল যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমা নেতারা। খবরটা বরাবরই জোর গলায় অস্বীকার করেছিল যুক্তরাষ্ট্র। যেমনটা অস্বীকার করা হয়েছিল টুইন টাওয়ারে হামলা-হামলার পরপর অনেক তথ্য। ফরাসি গোয়েন্দাদের কাছ থেকে এই তথ্য ফাঁস হওয়াকে কেন্দ্র করে ফ্রান্স ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে তখন অনেকখানি জল ঘোলা হয়েছিল। সে অন্য ইতিহাস। আমরা একটু ফিরে যেতে চাই আরও অতীতে ১৯৮৬ সালের বসন্তে।

BanglaBook.org

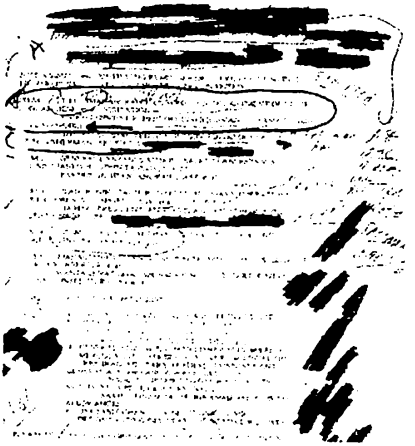

টিম ওসমান বা ওসামাকে স্ট্রিঙ্গার মিসাইল দেওয়ার বিষয়ে স্টেট ডিপার্টমেন্টের অনুমোদনপত্র

ক্যালিফোর্নিয়ার শেরমান ওকসের হিলটন হোটেল। ওই হোটেলে উঠেছেন প্রায় সাড়ে ছয় ফিট লম্বা প্রভাবশালী এক আফগান মুজাহিদ। সিআইএ-র খাতায় তাঁর পরিচিতি 'টিম ওসমান' নামে। হোটেলে তার সাথে দেখা করতে গেছেন এফবিআই'র স্পেশাল এজেন্ট গুন্ডারসন, মিশেল রিকনোসকুইটো ও স্টেট ডিপার্টমেন্ট কর্মকর্তা রালফ ওলবার্গ। তাদের প্রথমজন অর্থাৎ গুন্ডারসন কেবল এফবিআই'র স্পেশাল এজেন্টই নন। একই সঙ্গে সিআইএ ও ন্যাশনাল সিকিউরিটি সার্ভিসেরও একজন জাঁদরেল এজেন্ট। দ্বিতীয়জন নিউট্রনিক বোমার জনক (পারমাণবিক নয় কিন্তু বিধ্বংসী এই বোমা ব্রিফকেস এমনকি ছোট্ট একটি পার্সেও বহনের উপযোগি করেছেন তিনি) এবং

BanglaBook.org

মিসাইল প্রযুক্তির বিশেষজ্ঞ মিশেল রিকনোসকুইটো। গুরুত্বপূর্ণ কাজে তার সাহায্য নিয়ে থাকে সিআইএ। আর তৃতীয়জন হলেন যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্টের আফগান ডেস্কের কর্মকর্তা রালফ ওলবার্গ। তার আরেকটা পরিচয় হলো মার্কিন অস্ত্র ব্যবসায়ি এবং স্টেট ডিপার্টমেন্টের সাথে দেন দরবারের সমন্বয় করেন তিনি। এই তিন কর্মকর্তার হাই প্রোফাইলই প্রমাণ করে টিম ওসমানের সাথে বৈঠকটার গুরুত্ব।

১৯৮৩ সালে হোয়াইট হাউসে আফগান মুজাহিদদের সাথে বৈঠক করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট রিগান

আফগান রণাঙ্গনে রুশ সেনাদের হাতে ধরাশায়ী হচ্ছে আফগান মুজাহিদরা। বিশেষ করে রুশ বিমান আর হেলিকপ্টার গানশিপের হামলায় নাস্তানাবুদ মুজাহিদরা। তাদের জন্য দরকার আধুনিক অস্ত্র। আর সে জন্যেই টিম ওসমানের সাথে এই বৈঠক। এফবিআই এজেন্ট গুস্তারসন একটি নতুন অস্ত্রের কথা বললেন। এর নাম হলো ম্যানপ্যাডস (MANPADs, Man Portable Air Defense Systems) অর্থাৎ বহনযোগ্য আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা। যার আরেক নাম স্ট্রিঙ্গার মিসাইল। চীনের তৈরি 107 MM rocket system কে কাঁধে বহনযোগ্য মিসাইলে রূপ দিয়েছেন অর্থাৎ একটি প্রটোটাইপ তৈরি করেছেন মিশেল রিকনোসকুইটো। আকাশে ছোঁড়ার পর এটি নিজে থেকেই শত্রু বিমানের ওপর আঘাত হানবে। মুজাহিদরা এমন একটা অস্ত্র পেলে আফগান রণাঙ্গনে রাশিয়ার আকাশ প্রতিরক্ষা গুড়িয়ে দিতে পারবে। মিসাইল সিস্টেমটি যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে নিয়ে যাবার জন্য স্টেট ডিপার্টমেন্ট ও প্রতিরক্ষা বিভাগের বিশেষ অনুমতি দরকার। সেটা সমস্যা নয়। সমস্যা হলো অস্ত্রটি নির্মাণ এবং আফগানিস্তান পর্যন্ত পৌঁছানোর কাজটা কঠিন। তারও সমাধান দিলেন গুস্তারসন এবং ওলবার্গ। প্রোটোটাইপটি অনুসরণ করে মিসাইলটি বানানোর কাজ হবে পাকিস্তানের কোনো একটি

BanglaBook.org

সমরাস্ত্র কারখানায়। পরে পাকিস্তান থেকেই অস্ত্রের চালান পৌঁছে যাবে মুজাহিদদের হাতে। এমন একটি সিদ্ধান্ত নিয়েই রণাঙ্গনে ফিরে যান 'টিম ওসমান'। বলাবাহুল্য সিআইএর 'টিম ওসমান' ছদ্মনামের আড়ালের মানুষটি আর কেউ নন, ওসামা বিন লাদেন।

পরের একবছরে আফগান মুজাহিদদের হাতে পৌঁছে যায় পনেরশো থেকে দুই হাজার ম্যানপ্যাডস তথা স্ট্রিঙ্গার মিসাইল। রুশ বিমান প্রতিরক্ষার জন্য আতঙ্কের কারণ হয়ে উঠেছিল এই অস্ত্র। কারণ এর ধ্বংসক্ষমতা প্রায় ৮০ শতাংশ। বলা হয় স্ট্রিঙ্গার মিসাইলের কারণেই টার্নিং পয়েন্টে পৌঁছে যায় রুশ বনাম আফগান মুজাহিদদের ধর্মযুদ্ধ।

স্ট্রিঙ্গার মিসাইলে রুশ হেলিকপ্টার গানশিপ ঘায়েল

১৯৭৯ সালের ২৪ ডিসেম্বর রাশিয়ার দখলে যায় আফগানিস্তান। সে বছরই আফগান মুজাহিদদের সাথে সিআইএ'র দৃশ্যমান এবং প্রাতিষ্ঠানিক সেতুবন্ধন গড়ে ওঠে। ১৯৭৯ সালের ৩ জুলাই আফগান মুজাহিদসহ রুশ বিরোধীদের গোপন সাহায্য দেওয়া বিষয়ে একটি নির্দেশনামায় সই করেন প্রেসিডেন্ট কার্টার। বিন লাদেনের সাথে যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্কের দৃশ্যমান সূচনাও সে বছরই। ২২ বছর বয়সি বিন লাদেন তখন সৌদি আরবে প্রায় তিনশ মিলিয়ন ডলারের পারিবারিক ব্যবসা ছেড়ে আফগান রণাঙ্গনে মুজাহিদ হওয়াটাকেই নিজের ভবিতব্য বলে মেনে নিয়েছেন। প্রভাবশালী কোটিপতি পরিবারের সন্তান এবং সৌদি রাজপরিবারের কন্ট্রাকশান কাজের জন্য নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার ছিলেন লাদেন। সেই সুবাদে রাজপরিবারের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের সাথে লাদেন পরিবারের সখ্যতা ছিল। ধারণা করা হয় সেই সূত্রেই তার সাথে গোয়েন্দা প্রধান তুর্কী আল ফয়সাল এবং ওয়াশিংটনের

BanglaBook.org

সৌদি রাষ্ট্রদূত প্রিন্স বানদারের সাথে সম্পর্ক গড়ে উঠে। সৌদি আরবের হাত ধরেই পাকিস্তানের সামরিক গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআই'র সাথেও লাদেনের সহযোগিতার সম্পর্ক তৈরি হয়। যা দিনে দিনে প্রগাঢ় হয়ে ওঠে আফগান রণাঙ্গনে।

(বা থেকে পাশাপাশি) আফগান রণাঙ্গণ আইএসআই প্রধান মে.জে. হামিদ গুল এবং সিআইএ প্রধান উইলিয়াম ওয়েবস্টার ১৯৮৭

১৯৮০ সালের তরুণ বিন লাদেন

বলছিলাম ৭৯ সালের কথা। সে বছরই প্রথমবারের মতো যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে মুজাহিদদের ৫ লাখ ডলার সমপরিমাণ সাহায্য দেওয়া হয়। গেরিলাদের একটি প্রশিক্ষণ শিবির পরিদর্শনে আসেন যুক্তরাষ্ট্রের তৎকালীন ন্যাশনাল

সিকিউরিটি সার্ভিসের এডভাইজার Zbigniew Brzezinski. সেখানে বিন লাদেনের সাথে দেখা করে রুশ বিরোধী লড়াইয়ে তার অবদানের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন ব্রেজেজিনিস্কি। লাদেনকে তিনি যা বলেছিলেন তা হুবহু এরকম:

পাক আফগান সীমান্তের খোস্ত এলাকায় থাকতেন লাদেন। এলাকাটি আইএসআই ও তার মদতপুষ্ট বিভিন্ন মুজাহিদ বাহিনীর বিচরণক্ষেত্র। মস্কোর বিরুদ্ধে-এই লড়াই যা কিনা মুজাহিদদের কাছে আল্লাহর রাস্তায় পবিত্র লড়াই, সেই লড়াইয়ে মিশর, পাকিস্তান, লেবানন, সিরিয়া তথা মধ্যপ্রাচ্য থেকে আসা তুরুণ জিহাদিদের এক ছাদের তলায় নিয়ে এসেছিল। 'জিহাদ আর মুজাহিদ'দের পেছনে অকাতরে খরচ করতে দ্বিধা করতেন না লাদেন। কোটিপতি হয়েও থাকতেন কুঁড়ে ঘরে আর দশজন মুজাহিদের সাথে। তার এই সাধাসিধে জীবন-যাপন আর মিষ্টভাষী ব্যবহার অনুপ্রাণিত করেছিল লড়াইয়ে যোগ দেওয়া হাজারো যুবককে। আরব মুজাহিদদের জন্যে মাসে তিনশ ডলার করে ভাতার ব্যবস্থা করেছিলেন লাদেন। ধর্মযুদ্ধ জিহাদে আফগান রণাঙ্গনে ঝাঁপিয়ে পড়া শত শত যোদ্ধার থাকা খাওয়া আর প্রশিক্ষণের জন্য পাক-আফগান সীমান্তের খাইবার পাকতুন খাওয়ায় ট্রেনিং ক্যাম্প করেছিলেন। সেই ক্যাম্প নির্মাণের জন্য রীতিমত সৌদি আরব থেকে নিজের কোম্পানির বুলডোজার আর আধুনিক নির্মাণ যন্ত্রপাতি আফগানিস্তানের দুর্গম পাহাড়ি এলাকায় হাজির করেছিলেন লাদেন। ক্যাম্পের নাম দিয়েছিলেন 'সিংহের গর্ত' (Lion's Den). লাদেনের সেই 'গর্তে' পালা করে মুজাহিদদের গেরিলা প্রশিক্ষণ দিতে আসতেন পাকিস্তানি আর যুক্তরাষ্ট্রের সেনা কর্মকর্তারা। নগরকেন্দ্রিক গেরিলাযুদ্ধ, বোমার বেল্ট কোমরে বেঁধে আত্মঘাতী হামলা, গাড়িতে বিস্ফোরক লুকিয়ে হামলা, রাস্তায় মাইন পেতে রাখা, স্ট্রিঙ্গার মিসাইল দিয়ে হেলিকপ্টার গানশিপ ঘায়েল করা, কোড ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যবহার করে রেডিও ম্যাসেজ আদান-প্রদান, শত্রু অভিযানের মুখেও আত্মগোপনের কৌশল; এইসবই জঙ্গিরা শিখেছিল আইএআই ও সিআইএ'র কাছ থেকে। এই প্রশিক্ষণ পেয়েছিলেন বিন লাদেন নিজেও (Coll, Steve.Ghost Wars. 2004). এ কথা নির্দিধায় বলা যায় যে ইরাক সিরিয়া ইয়েমেন লেবানন নাইজেরিয়া কিংবা সোমালিয়ার এ যুগের জঙ্গিরা আজ যে কৌশলগুলো ব্যবহারের মাধ্যমে তাদের জঙ্গি তৎপরতা জারি রেখেছে, তার গুরুদায় অবশ্যই যুক্তরাষ্ট্র তথা সিআইএ'র।

'We know of their deep belief in God, and we are confident their struggle will succeed.That land over there is yours, you'll go back to it one day because your fight will

BanglaBook.org

prevail, and you'll have your homes and your mosques back again. Because your cause is right and God is on your side'.

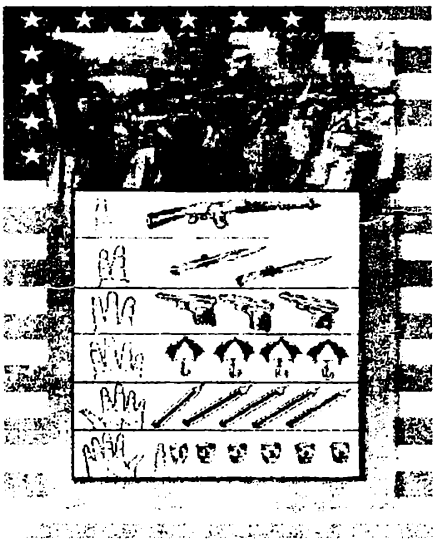

جهاد

اکثر اوقات درین انسان ها قسم جنگ و مخالفت ها
بمیان می آید که باثر آن خسارات مالی و جانی بانسانها پیدا
میشود . اگر این جنگ ها و جدل ها درین مردم بخاطر قوم ، وطن ،
منطقه و یا بسبب اختلاف زبان بوجود آمده باشد ، و برای ترقی

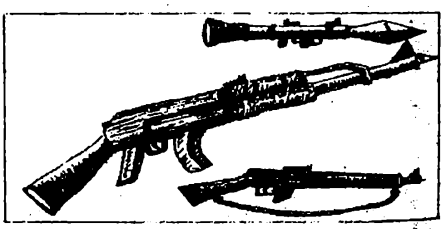

আফগান শিশুদের জন্য সিআইএ প্রণীত জিহাদি বই

বিন লাদেন তথা ধর্মীয় উগ্রপন্থার পেছনে সিআইএ'র প্রশিক্ষণ ও সামরিক সহযোগিতা আরও বেগবান হয়ে ওঠে ১৯৮১ সালে প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রিগ্যান ক্ষমতায় আসার পর। তখন থেকে আফগান রণাঙ্গনে রুশ বিরোধীদের মার্কিন মদত দেওয়ার বিষয়টি একরকম প্রকাশ্য হয়ে ওঠে। ১৯৮৩ সালে হোয়াইট

হাউসে উগ্রপন্থী আফগান মুজাহিদদের আমন্ত্রণ জানিয়ে গোপনীয়তার সকল আগল ভেঙে দিয়েছিলেন প্রেসিডেন্ট রিগ্যান। সে সময় মোট তিনটি স্তরে আফগান মুজাহিদদের সাহায্য দিতে শুরু করে যুক্তরাষ্ট্র। মিলিটারি লজিস্টিক, টেকনোলজি এবং ইডিওলজি অর্থাৎ আদর্শভিত্তিক সমর্থন। সাহায্যের এই তৃতীয় ধাপটি ছিল অদ্ভুত-অকল্পনীয়। আফগান মুজাহিদদের জন্য মার্কিন সহায়তা যেন নেহাত মিলিটারি সাপ্লাইয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে দীর্ঘমেয়াদি ভূ-রাজনৈতিক ও মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব তৈরি করে সেটাই ছিল আদর্শভিত্তিক এই সমর্থনের উদ্দেশ্য। আরেকটু খোলাসা করে যদি বলি, আফগানিস্তানের মাটি যেন জিহাদ তথা ধর্মযুদ্ধের স্বর্গরাজ্য হয়ে ওঠে তার একটা সুদূর প্রসারি ছক বাস্তবায়নের জন্যই ছিল যুক্তরাষ্ট্রের কথিত এই 'আদর্শভিত্তিক সমর্থন'।

নিরন্ন আফগানদের মুখের অন্ন কিংবা শিশুর পুষ্টি নিশ্চিত করা নয় বরং দরিদ্র এই ভূখণ্ডের ভবিষ্যত প্রজন্মকে কট্টর উগ্রবাদি করে তোলার পেছনে কোটি কোটি ডলার খরচ করেছিল যুক্তরাষ্ট্র। পাক-আফগান এলাকাগুলোতে গড়ে তোলা হয়েছিল অসংখ্য মাদ্রাসা। সেই মাদ্রাসাগুলোতে বিনামূল্যে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে জিহাদি বই। যে বইয়ের মূল দর্শনটাই হলো বেহেশতে অনন্ত সুখের লোভ দেখিয়ে শিশু মনে জিহাদ এবং জিহাদিদের প্রতি সহানুভূতি তৈরি করা। কেমন ছিল সিআইএ প্রণীত আফগান শিশুদের সেই পাঠ্যক্রম—তার কিছু উদাহারণ দেওয়া যাক। শিশুদের যোগ অঙ্ক শেখানো হত অস্ত্র আর গুলির সংখ্যা নিয়ে। বিয়োগ অঙ্ক শেখানো হত নাস্তিকের মাথার হিসেব করে। যেমন—5 guns + 5 guns = 10 guns. 15 bullets—0 bullets = 5 bullets. ১০ জন নাস্তিকের মধ্যে ৫ জন এক মুজাহিদের হাতে নিহত হলো, আর কতজন বেঁচে রইল।" শিশুদের ইংরেজি অক্ষর জ্ঞান দেওয়া হত এভাবে: A for Allah, J for jihad. Our religion is Islam. The Russians are the enemies of the religion of Islam

এছাড়া জিহাদে শহীদ হলে কী হয়, শহীদ জিহাদির গল্প, একে ফর্টি সেভেন রাইফেল, বুলেট, সশস্ত্র জিহাদি আর মিসাইলের ছবি আঁকা এসব পাঠ্যপুস্তক পাক-আফগান জুড়ে বিনামূল্যে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য ১৯৯৪ সাল পর্যন্ত এক দশকেই ৫১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার খরচ করেছিল যুক্তরাষ্ট্র। আফগানিস্তানকে দেওয়া শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচির আওতায় প্রতিবছর ছাপা হত অন্তত ৫০ লাখ জিহাদি বই। তবে এই সাহায্য সরাসরি সিআইএ'র মাধ্যমে না দিয়ে ইউএস এআইডি এবং ইউনিসেফের মাধ্যমে দেওয়া হত। কোনো বিশেষ ধর্মকে উৎসাহিত করা যুক্তরাষ্ট্রের আইনে নিষিদ্ধ হলেও আফগানিস্তানের বেলায় ওই আইন খাটেনি। বরং এর স্বপক্ষে যুক্তি হিসেবে ইউএস এআইডি'র

BanglaBook.org

তরফ থেকে বলা হলো, 'রুশ নিয়ন্ত্রিত আফগানিস্তানের ধর্মনিরপেক্ষ বাতাবরণ থেকে শিক্ষার্থীদের মুক্ত করতেই ওই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল'। (Washington Post March 23, 2002) শুধু তাই নয় বিশ্বের বিভিন্ন দেশের কট্টর ও উগ্র ধর্মবিশ্বাসে বিশ্বাসী তরুণরা যাতে আফগান রণাঙ্গনে ঝাঁপিয়ে পড়ে তার জন্যে বিশ্বব্যাপী সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন ও সংবাদ বিজ্ঞপ্তি প্রচার করা হত। এর খরচও যোগাতো সিআইএ ।

১৯৮৪ সালে আফগানিস্তানে মাকতব-আল-খিদমার বা এমএকে নামের একটি সংগঠন গড়েছিলেন বিন লাদেন। কাকতালীয় হলেও একই বছর প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হক পাকিস্তানে শরীয়া আইন চালু করেছিলেন। মূলত সেটা ছিল সিআইএ'র পরামর্শে পাক-আফগান অঞ্চলে যোদ্ধাদের জন্যে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির জন্যে পাকিস্তান তথা আইএসআই'র আরও একটি আত্মঘাতী পদক্ষেপ। ঠিক পরের বছর আফগান মুজাহিদদের জন্যে বরাদ্দ করা সাহায্যের ঝাঁপিটি আরও একধাপ উদার করেছিলেন প্রেসিডেন্ট রিগ্যান। ১৯৮৫ সালের মার্চে 'ন্যাশনাল সিকিউরিটি'র আওতায় মুজাহিদদের জন্যে সামরিক ও আদর্শভিত্তিক সাহায্য বাড়ানোর নির্দেশনামায় (National Security Decision Directive 166) সই করেছিলেন তিনি। যার আওতায় ১৯৮৭ সাল পর্যন্ত আফগান মুজাহিদদের দেওয়া অস্ত্রের পরিমাণ দাঁড়িয়েছিল ৬৫ হাজার টন। দুবছর আগে ৮৩ সালে এর পরিমাণ ছিল মাত্র ১০ হাজার টন। ১৯৮২ থেকে ১৯৯২ সাল পর্যন্ত দশ বছরে বিন লাদেনের জঙ্গি গ্রুপ এমএকেসহ বিশ্বের ৪৩টি মুসলিম দেশের অন্তত ৩৫ হাজার উগ্র মুসলিম যুবককে জিহাদি ট্রেনিং দিয়েছে সিআইএ। এসব যোদ্ধার প্রশিক্ষণ ও আনুসঙ্গিক খরচের জন্য দেওয়া হয়েছে ৫শ মিলিয়ন ডলার। পাকিস্তানের আইএসআইএ'র হাত ধরে এসব সাহায্য মুজাহিদদের কাছে পৌঁছানো হত। রাওয়ালপিণ্ডিতে আইএসআই'র হেডকোয়ার্টারে রহস্যময় মার্কিন নাগরিকদের অবাধ যাতায়াত ছিল তখন রোজকার বিষয়। (The Washington Post, July 1992).

কেবল মার্কিন মদতই নয়। একইভাবে সৌদি আরবসহ মধ্যপ্রাচ্যেরও পূর্ণ সহযোগিতা পেয়েছিল আফগান মুজাহিদরা। শুধু আরব বিশ্ব থেকেই প্রতিমাসে ২৫ মিলিয়ন ডলারের সাহায্য আসত আফগানিস্তানে। সৌদি রেড ক্রিসেন্ট, কুয়েত রেড ক্রিসেন্ট, ইসলামিক রিলিফ অর্গানাইজেশান, মুসলিম ওয়ার্ল্ড লীগ এমনি নানা ধর্মীয় দাতব্য সংস্থার ব্যানারে পাকিস্তানের পেশোয়ার হয়ে অর্থাৎ আইএসআইএ'র হাত ঘুরে এই টাকা কথিত ধর্মযুদ্ধের রসদ যোগাতো। অর্থায়ণের এই পুরো বিষয়টি সমন্বয় করতেন বিন লাদেন। যুক্তরাষ্ট্রের যোগান

দেওয়া অস্ত্রের বাইরেও এত বিপুল সংখ্যক অর্থের অনেকটাই অস্ত্র কেনার পেছনে ব্যবহার করেছে মুজাহিদরা। এটিও সমন্বয় করতেন লাদেন। (Report for Congress: Saudi Arabia: Terrorist Financing Issues.—14 September 2007)

আফগান রণাঙ্গনে হাজারো জিহাদি তরুণের আদর্শ ছিলেন বিন লাদেন। আর লাদেনের আদর্শ ছিলেন আব্দুল্লাহ ইউসুফ আজ্জাম। তিনি যখন জেদ্দার কিং আব্দুল আজিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাষক, তখন সেই বিশ্বদ্যালয়ের ছাত্র বিন লাদেন। পরে সেখান থেকেই পাকিস্তান হয়ে আফগানিস্তান। বলা হয় লাদেনকে রাজপ্রাসাদ থেকে জিহাদের পথে টেনে এনেছিলেন তিনি। তাঁর পরামর্শেই মাকতব-আল-খিদমার নামের সংগঠনটি গড়ে তোলেন লাদেন। এ সময় প্রায় প্রতিবছর একবার যুক্তরাষ্ট্রে সফর করেছেন আজ্জাম। নিউ ইয়র্কের ব্রুকলিনে এমএকে'র একটি শাখাও খুলেছিলেন তিনি। সংগঠনের অর্থ আর সদস্য সংগ্রহের জন্যে যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় সবকটা বড় বড় শহরে সফর করে বেড়াতেন এই উগ্রপন্থী মুজাহিদ নেতা। বলা হয় এসব সফরে তার সাথে সিআইএসহ উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তাদের সাথেও বৈঠক হত। একজন ব্যক্তি লাদেনের এমন দুর্ধর্ষ নেটওয়ার্ক এবং ক্রমশ অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠা; এইসব কিছুই জানা ছিল এবং এর পেছনে হাওয়া যুগিয়েছিল সিআইএ (Wright Lawrence.The Looming Tower. 2006

কানাডার অটোয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মাইকেল চসোদুভস্কি ও তার সাড়া জাগানো বই, আমেরিকাস ওয়ার অন টেররিজম

রাশিয়ার পতনের দ্বারপ্রান্তে সিআইএ'র বিতর্কিত এসব কর্মকাণ্ডকে যুক্তরাষ্ট্রের সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধের সুদূর প্রসারি ছক নির্মাণের উপলক্ষ হিসেবেই

দেখছেন কানাডার অটোয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মাইকেল চসোদুভস্কি। তার সাড়া জাগানো বই America's war on Terrorism -এ চসোদুভস্কি ভুরি ভুরি প্রমাণ দিয়ে বলেছেন ১৯৭৯ সাল থেকে ২০০১ সালের অক্টোবরে সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধের সূচনা পর্যন্ত পাকিস্তানের আইএসআই, যুক্তরাষ্ট্রের সিআইএ এবং সৌদি গোয়েন্দা সংস্থা (Saudi General Intelligence Directorate GID) এই তিন পক্ষ মিলে আফগান রণাঙ্গনকে বহুমুখী ষড়যন্ত্রের এক বীজতলায় পরিণত করেছিল। ১৯৭৯ সালে কার্টার প্রশাসনের হাত ধরে শুরু হওয়া এই ষড়যন্ত্র পরবর্তী প্রত্যেকটি সরকার বিনাপ্রশ্নে অনেকটা ধারাবাহিক টিভি সোপের মতোই নিত্য-নতুন মাত্রায় টেনে নিয়ে গেছেন। কার্টারের হাত ধরে আফগানিস্তানে জঙ্গিবাদের যে ছোট্ট বীজটি রোপিত হয়েছিল, রিগ্যান সরকারের সময় সেটি পরিপুষ্ট এক বৃক্ষ। আর সেই বিষ বৃক্ষকে রীতিমত মহিরুহ করে গড়ে তুলেছেন বুশ সরকার।

কিশোর বিন লাদেন

অতিপরিচিত বিন লাদেন

জুডো প্রশিক্ষণের পোষাকে তরুণ লাদেনের একটি বিরল ছবি

কিন্তু কখন কিভাবে যুক্তরাষ্ট্রের প্রকাশ্য শত্রু হয়ে উঠলেন বিন লাদেন? দৃশ্যমান ঘটনা পরম্পরা বলছে ১৯৮৮ সালে আফগান যুদ্ধ শেষ হওয়া এবং পরের বছর পাকাপাকিভাবে রুশ বাহিনীর সর্বশেষ ট্যাংকটিও আফগান রণাঙ্গণ ত্যাগ করা পর্যন্ত বিন লাদেনের সাথে যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্কের কোনো ঘাটতি ছিল না। ৮৯ সালে বিজয়ের আনন্দ নিয়েই সৌদি আরব ফিরেছিলেন লাদেন। উদ্দেশ্য ছিল কিছুদিন পারিবারিক ব্যবসা দেখাশুনা করা। দীর্ঘ যুদ্ধের ক্লান্তিসহ নানা কারণে সেই সময়টায় আফগানিস্তানে মুজাহিদদের সংখ্যা ছিল পড়তির দিকে। এই সময় লাদেনের সংগঠন মাকতব-আল-খিদমার বা এমএকে কার্যক্রমেও কিছুটা ভাটা পড়ে। প্রসঙ্গত মাকতব-আল-খিদমার সদস্যরা যুদ্ধের সবরকম প্রশিক্ষণ নিলেও, সরাসরি রণাঙ্গনে লড়াই করত না। বরং রণকৌশল নির্ধারণ, মুজাহিদদের বিভিন্ন গ্রুপের সাথে আন্তঃযোগাযোগ, অর্থায়ন এবং ব্যবস্থাপনার গুরুদায়ীত্ব পালন করত এই সংগঠন। এই কাজে বিন লাদেন তার নিজের ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের সাফল্যের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়েছিলেন (Coll Steve.Ghost Wars. 2004).

কিন্তু এমএকে নিয়ে সম্ভবত তৃপ্ত ছিলেন না লাদেন। ১৯৮৯ সালে মিসরের শল্য চিকিৎসক আইমান আল জাওয়াহিরির ঘনিষ্ট মাত্র ১৫ জন অনুসারি নিয়ে সৌদি আরব থেকে ফোনেই আল কায়দা (যার অর্থ হলো বেইজ বা ঘাঁটি) গঠনের ঘোষণা দেন লাদেন। আল কায়দা গঠনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে পরে এক সাক্ষাৎকারে বিন লাদেন বলেছিলেন, তিনি কেবল রাশিয়ার বিরুদ্ধেই লড়তে আসেননি। বরং জিহাদের জন্য লড়তে এসেছিলেন। আফগানিস্তানে রাশিয়ার পতনের মধ্য দিয়ে সেই লড়াইয়ের কেবল একটি পর্যায় শেষ হয়েছে। কিন্তু তার আসল জিহাদের শুরুটা হয়নি। আর সেই লক্ষ্যেই আল কায়দার জন্ম। অর্থাৎ আফগান-আরব মুজাহিদদের জন্যে দেওয়া মার্কিন অস্ত্র আর প্রশিক্ষণ কেবল রাশিয়ার পতনের মধ্যেই থেমে থাকেনি। বরং নতুন উদ্যমে নতুন লক্ষ্য নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল মুজাহিদরা। আর তা হলো দেশে দেশে সশস্ত্র পন্থায় জিহাদের জন্য কাজ করা। প্রসঙ্গত যুক্তরাষ্ট্র কি জানত না যে তাদের দেওয়া হাজার হাজার টন অস্ত্র কেবল মস্কোর বিরুদ্ধেই কাজ করবে না বরং পুরো বিশ্ব তথা মুসলিম সমাজকে এক নতুন সংকটের দিকে নিয়ে যাবে? অধ্যাপক মাইকেল চসোদুভস্কি বলছেন, সম্পূর্ণ জেনে বুঝেই আফগান রণাঙ্গণের সন্ত্রাসকে দীর্ঘমেয়াদে কাজে লাগানোর বিশাল এক ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিল যুক্তরাষ্ট্র।

এরই মধ্যে একটি ঘটনা পাল্টে দেয় লাদেনের শত্রুর নিশানা। ১৯৯০ সালের ২ আগস্ট কুয়েত আক্রমণ করে বসেন ইরাকি প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম

BanglaBook.org

হেসেন। এই আক্রমণের সমুচিত জবাব দিতে যুক্তরাষ্ট্রের সাহয্য চাইল সৌদি আরব। মক্কা মদিনার পবিত্র ভূমিতে মার্কিন সেনা উপস্থিতি মেনে নিতে পারেননি লাদেন। বাদশা ফাহাদ ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর সাথে দেখা করে সৌদি আরবের মাটিতে মার্কিন সেনাদের ডেকে না আনার অনুরোধ জানান লাদেন। যুক্তরাষ্ট্রের ওপর নির্ভর না করে বরং নিজস্ব সেনা আর আরব যোদ্ধাদের নিয়ে একটি বাহিনী গঠন করে ইরাককে মোকাবেলার আহবান জানিয়েছিলেন লাদেন। কিন্তু এ বিষয়ে তাকে নাক না গলানোর উপদেশ দিয়ে সরকারের তরফ থেকে প্রচ্ছন্ন হুমকি দেওয়া হলো। বিষয়টি নিয়ে আলেমদের সাথে কথা বলেন তিনি। এবারও লাদেনের ওপর প্রভাব বিস্তার করেছিলেন তার গুরু আজ্জাম। আলেমদের ফতোয়া আর আজ্জামের পরামর্শ আবারো তাকে আফগান রণাঙ্গণে ঠেলে দেয়। শত্রু এবার এক সময়কার জিহাদের মিত্র যুক্তরাষ্ট্র। চার হাজার আরব যুবককে নিয়ে জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন লাদেন। প্রথম বাধা এলো সৌদি গোয়েন্দা সংস্থার তরফ থেকে। জেদ্দায় একরকম অন্তরীণ করা হলো লাদেনকে। অথচ এই সংস্থাটিই তাকে রুশ বিরোধী জিহাদে সবরকম সাহায্য করেছিল। এর কিছুদিন পরই মদিনার চারশ মাইল দূরে সৌদি আরবের দাহরানে ঘাঁটি গেড়ে মার্কিন জড়ো হয় যুক্তরাষ্ট্রের 82 Airborne Division-এর হাজার হাজার সেনা।

সে বছরই সৌদি গোয়েন্দা সংস্থার চোখ ফাঁকি দিয়ে ব্যক্তিগত বিমান ও দেহরক্ষীদের নিয়ে পাকিস্তানে আশ্রয় নেন লাদেন। একই বছরের নভেম্বরে যুক্তরাষ্ট্রের নিউজার্সিতে এফবিআই একটি অভিযান চালিয়ে আলী মোহাম্মদ নামে এক ব্যক্তিকে আটক করে। যিনি ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে বোমা হামলার পরিকল্পনা করছিলেন। নিজেকে তিনি আল কায়দার সদস্য বলে দাবি করেন। সেটাই ছিল আলকায়দার প্রথম কোনো সন্ত্রাসী পরিকল্পনা।

কিন্তু পাকিস্তান গিয়েই লাদেন বুঝতে পারেন আইএসআই তাকে সৌদি সরকারের হাতে তুলে দেওয়ার ষড়যন্ত্র করছে। এ সময় একাধিকবার লাদেনকে অপহরণের চেষ্টা করা হয়। কিন্তু আইএসআই'র কিছু শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধু তাকে রক্ষা করেন। যেমনটা রক্ষা করেছিলেন প্রায় একযুগ পর্যন্ত। সেই শুভাকাঙ্ক্ষীদের পরামর্শেই পাকিস্তান ছেড়ে আবারো আফগানিস্তানে ফিরে আসেন লাদেন। আফগানিস্তান ততদিনে নরকতুল্য পরিস্থিতিতে পৌঁছে গেছে। ইসলামের শত্রু রাশিয়ার আগ্রাসন শেষ হলেও আফগানিস্তানে সংঘাত থামেনি। এবার ইসলামের বন্ধু মুজাহিদরাই বহুধারায় বিভক্ত হয়ে একে অপরের রক্ত ঝরাতে শুরু করেছে। মাত্র কবছর আগের 'আল্লাহর পবিত্র ভূমি'র এমন নরকতূল্য পরিস্থিতি লাদেনকে ব্যথিত করেছিল। সেই সংঘাত থামাতে

ব্যর্থ লাদেন ৯১ সালে (মতান্তরে ৯২ সাল) ছদ্মবেশে একটি চার্টার্ড প্লেনে করে অনুসারীদের নিয়ে আফগানিস্তান ছেড়ে সুদানে পাড়ি জমালেন।

দাহরান সেনা ঘাঁটিতে মেরিন সেনা

২৩ নভেম্বর ১৯৯০ সালে সৌদি আরবে সেনাদের মাঝে প্রেসিডেন্ট বুশ সিনিয়র

তবে জিহাদের ভূমি হিসেবে তিনি সুদানকে বেছে নেননি। বরং ওই মুহূর্তে তার একটি নিশ্চিত আশ্রয় দরকার ছিল। যা সুদানের ইসলামি সরকারই তাকে দিতে পারে। খার্তুমে একটি বাড়ি কিনে সেখানে বসবাস শুরু করেন লাদেন। দরিদ্র এই দেশটিতে রাস্তাঘাট নির্মাণের মতো অবকাঠামো খাতে প্রথমে নিজে পরে নিজের ভাইসহ অনেক সৌদি ব্যবসায়িকে বিনিয়োগে

উৎসাহি করেছিলেন লাদেন। আফগানিস্তানের মতো এখানেও অত্যাধুনিক বুলডোজার হাজির করে পাহাড় কেটে রাস্তা বানালেন লাদেন। আফগানিস্তানে ফেলে আসা অনেক ভক্ত অনুরাগি তখন সুদানে এসে লাদেনের সাথে এই কাজে হাত মিলিয়েছিল। কিন্তু এই নিঃস্বার্থ বন্ধুটি যে বিপদের কারণ হতে পারেন সেটি হয়তো জানা ছিল না সুদানের হাসান আল তুবাই সরকারের।

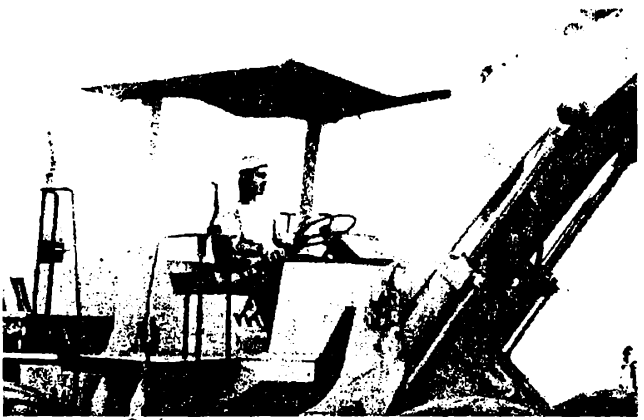

সুদানে রাস্তা নির্মাণের কাজ করছেন লাদেনের বড় ছেলে আবদুল্লাহ

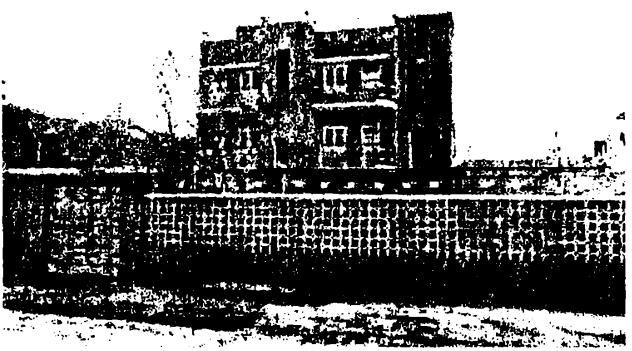

খার্তুমে লাদেনের বাড়ি

এই বিপদ ডেকে এনেছিলেন লাদেন নিজে। সুদানেও তিনি সৌদি আরব বিরোধী প্রচার প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। যা আবারো ক্ষিপ্ত করেছিল বাদশা ফাহাদকে। ১৯৯৪ সালে লাদেনের নাগরিকত্ব বাতিল করে সৌদি সরকার। সেইসঙ্গে লাদেন তার পরিবারের কাছ থেকে বার্ষিক ৭০ লাখ ডলারের যে অনুদান পেতেন সেটাও বন্ধ করার নির্দেশ জারি হয়। সে বছরই সোমালিয়া ও ইয়েমেনের মার্কিন দূতাবাসে হামলার ঘটনায় আফগান মুজাহিদদের সংশ্লিষ্টতা

খুঁজে পায় সিআইএ। এবং হামলার পরিকল্পনাকারি হিসেবে লাদেনকে দায়ী করে যুক্তরাষ্ট্র। পরের বছর ৯৫ সালে রিয়াদের মার্কিন ঘাঁটিতে বোমা হামলার ঘটনায় হামলাকারির স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে লাদেনকে দায়ী করে সৌদি সরকার।

ক্রমশ সৌদি ও যুক্তরাষ্ট্রের প্রকাশ্য শত্রুতে পরিণত হন লাদেন। ৯৫ সালে সিআইএ জানতে পারে লাদেনকে দেশ থেকে বহিষ্কার করার ব্যাপারে সৌদি'র সাথে আলোচনা করছে সুদান সরকার। যদিও এই আলোচনা ছিল সুদানের ওপর সৌদি সরকারের অব্যাহত চাপের ফল। কিন্তু লাদেনের প্রতি কৃতজ্ঞ সুদান তাকে অমন নির্দয়ভাবে বহিষ্কার করতে চাইছিল না। আবার সৌদি আরবের প্রত্যক্ষ আর যুক্তরাষ্ট্রের পরোক্ষ চাপও সমলাতে পারছিল না। এরই মধ্যে খার্তুমে গুপ্ত ঘাতকদের একটি হত্যা চেষ্টা ভণ্ডুল করে দেন লাদেন। তিনি বুঝতে পারছিলেন খার্তুম ক্রমশ তার জন্য বিপদজনক হয়ে উঠছে। ৯৬ সালের মার্চে সৌদি গোয়েন্দাদের সাথে সুদানের নিরাপত্তা বাহিনীর এক গোপন বৈঠকের ওপর নজরদারি চালায় সিআইএ। বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয় লাদেনকে সৌদি আরবের হাতে তুলে দেবে সুদান। তবে বিনিময়ে তাকে ক্ষমা করে নাগরিকত্ব ফিরিয়ে দিতে হবে। একই সময় লাদেনকে আটক করতে খার্তুমে একটি অভিযান পরিকল্পনা করছিলেন সিআইএ কর্মকর্তা Billy Waugh তবে রহস্যজনক কারণে সেই অভিযানের অনুমতি দেয়নি পেন্টাগন। শেষ পর্যন্ত সৌদি এবং যুক্তরাষ্ট্রের চোখে ধুলো দিয়ে (অথবা দুই দেশের গোপন ইশারায়) ৯৬ সালের ১৮মে তিনশ অনুসারিসহ একটি চার্টার্ড বিমানে করে খার্তুম ছাড়লেন লাদেন।

গন্তব্য এবার আফগানিস্তানের জালালাবাদ। তালেবান প্রতিষ্ঠাতা মোল্লা ওমর তখন প্রতাপশালী নেতা। সে বছরই সেপ্টেম্বরে কাবুলসহ দেশের বড় একটি এলাকা দখলে নিয়ে ওই অঞ্চলকে Islamic Emirate of Afghanistan বলে ঘোষণা দেন তিনি। প্রসঙ্গত মোল্লা ওমরের সেই ক্ষণস্থায়ী দেশকে সবার আগে স্বীকৃতি দিয়েছিল পাকিস্তান, তারপর সৌদি আরব ও আরব আমিরাত। লাদেনকে সর্বোচ্চ নিরাপত্তা দেওয়ার অঙ্গিকার করেছিলেন মোল্লা ওমর। আফগাস্তিান গিয়েই যুক্তরাষ্ট্রের দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে যুক্তরাষ্ট্র ও তার স্বার্থের ওপর আঘাত হানতে অনুসারিদের নির্দেশ দেন লাদেন। এরপরই বিন লাদেন বিষয়ে আলাদা একটি ইউনিট চালু করে সিআইএ। যার প্রধান ছিলেন Michael Scheuer. বসে নেই সৌদি সরকারও। আটক নয় বরং বার বার লাদেনকে হত্যার চেষ্টা করছিল সৌদি গোয়েন্দারা। সৌভাগ্যক্রমে জালালাবাদেও হত্যাকারিদের

BanglaBook.org

আরও একটি চেষ্টা ব্যর্থ করে মোল্লা ওমরের পরামর্শে কান্দাহারে চলে আসেন লাদেন। পরে জানা যায় সৌদি গোয়েন্দাদের ওই গোপন অভিযানের খবর লাদেনের কাছে ফাঁস করেছিল আইএসআই। পরের বছর ৯৭ সালে কান্দাহারে লাদেনের বাসভবনে কমান্ডো হামলা চালিয়ে তাকে তুলে নেওয়ার পরিকল্পনা করে সিআইএ। তিন ডজন কমান্ডো সেনাকে এ জন্য প্রশিক্ষণ দিয়ে প্রস্তুত করা হয়। শুধু দিনক্ষণের বাকি। বলাবাহুল্য এই খবরওটিও আগেই ফাঁস হয়ে যায় এবং এবারো নাটের গুরু আইএসআই। লাদেন এবং জঙ্গিবাদ বিস্তারের প্রশ্নে আইএসআই'র এই দ্বিমুখী নীতি অর্থাৎ ডাবল এজেন্টের ভূমিকা ছিল বরাবরের। প্রশ্ন থেকে যায় সিআইএ'র ছায়াসঙ্গি আইএসআই'র এই ভূমিকা কি কোনো গোপন সন্ধির ফল? কার স্বার্থে বারবার লাদেনকে রক্ষা করেছে আইএস আই?

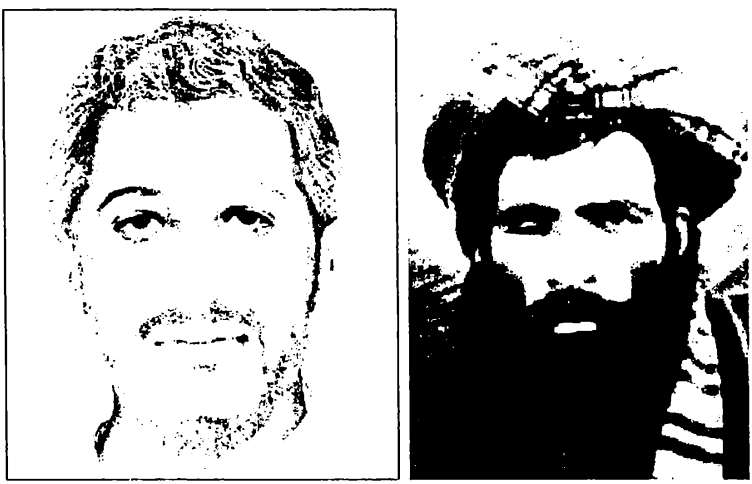

এফবিআই'র গোপন রিপোর্টে বিন লাদেনের ডিজিটালাইজড স্কেচ এবং তালেবান প্রতিষ্ঠাতা মোল্লা ওমর

৯৮ সালের ফেব্রুয়ারিতে বিন লাদেন ও তাঁর অন্যতম সহযোগী আইমান আল জাওয়াহিরি যৌথভাবে জারি করা এক ফতোয়ায় বলেন, 'যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে জিহাদ করা প্রতিটি মুসলমানের জন্য ফরয। শিগগির যুক্তরাষ্ট্র তার উপযুক্ত ফল পাবে।' সে বছরই আগস্টে কেনিয়া ও তানজানিয়ার মার্কিন দূতাবাসের সামনে ট্রাক বোমা হামলায় শতাধিক মানুষের মৃত্যু হয়। এই হামলার পর এফবিআই'র মোস্ট ওয়ান্টেড তালিকার দশ নম্বরে উঠে আসে বিন লাদেনের

BanglaBook.org

নাম। একই বছরের ডিসেম্বরে প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটনের কাছে দেওয়া গোপন প্রতিবেদনে সিআইএ জানায় যুক্তরাষ্ট্রে বিমান ছিনতাই করে হামলা চালানোর প্রস্তুতি নিচ্ছে আল কায়দা। ২০০০ সালের শেষদিকে United States National Security Council-এর প্রধান রিচার্ড ক্লার্ক এক রিপোর্টে জানিয়েছেন আল কায়দা যুক্তরাষ্ট্রে সিরিজ হামলার পরিকল্পনা করছে। পরের বছরই নিউ ইয়র্কের টুইন টাওয়ারে হামলার ঘটনা। এবং এই হামলার পরিকল্পনা ও তা বাস্তবায়নের লাদেনকেই দায়ী করে যুক্তরাষ্ট্র। বিন লাদেন তখন আফগানিস্তানের তোরাবোরা এলাকার অজ্ঞাত কোনো এক গুহায় আত্মগোপন করেছেন। ১৬ সেপ্টেম্বর ২০০১ সালে ধারণ করা একটি ভিডিও টেইপে বিন লাদেন টুইন টাওয়ারে হামলায় জড়িত থাকার কথা অস্বীকার করেন।

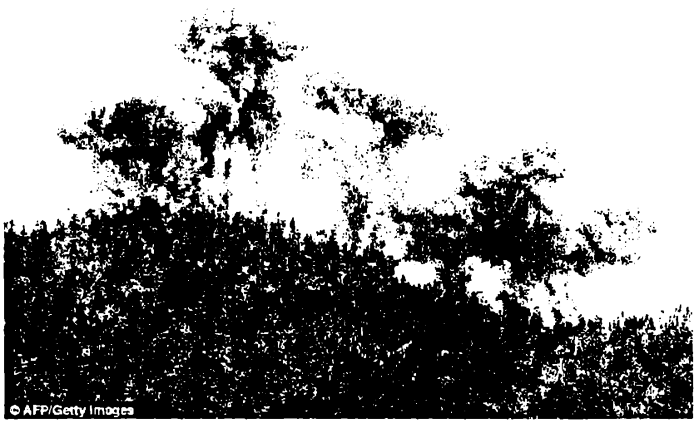

১৪ ডিসেম্বর ২০০১ আফগানিস্তানের তোরাবোরা পাহাড়ি এলাকায় মার্কিন বিমান হামলা

মাইকেল চসোদুভস্কি তার America's war on Terrorism বই এ ২৪ সেপ্টেম্বর পাকিস্তানের উর্দু ভাষি পত্রিকা Ummat-এ ছাপা হওয়া বিন লাদেনের একটি সাক্ষাৎকারের কথা উল্লেখ করেছেন। এই সাক্ষাৎকারে লাদেন বলেছেন: 'আমি আগেই বলেছি আমি এই হামলার সাথে জড়িত নই। একজন মুসলিম হিসেবে পারতপক্ষে আমি মিথ্যে বলা এড়িয়ে চলি। নিরপরাধ মানুষ এবং নারী-শিশু হত্যায় আমি বিশ্বাসী নই। ইসলামে এমনকি যুদ্ধ ক্ষেত্রেও নারী শিশু হত্যার ব্যাপারে কঠোর নিষেধাজ্ঞা আছে। নারী শিশুদের হত্যা নির্যাতন করা তো যুক্তরাষ্ট্রের কাজ। যেটা তারা ফিলিস্তিনে করছে। আমরা

BanglaBook.org

যুক্তরাষ্ট্রের সিস্টেমের বিরুদ্ধে, মানুষের বিরুদ্ধে তো নই। তাদের শত্রু দরকার। তাই তারা অনেকদিন ধরেই ওসামা আর তালেবানের বিরুদ্ধে প্রপাগান্ডা ছড়িয়ে তাদের শত্রু বানানোর কাজে নেমেছিল। এবং শেষতক এই ঘটনা ঘটল। আমরা যুক্তরাষ্ট্রের এসব প্রপাগান্ডার বিরুদ্ধে। অন্য দেশের রাজনীতিকে মর্টগেজ নিয়ে তাদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা হরণের বিরুদ্ধে। যুক্তরাষ্ট্রের গণমাধ্যমের এসব প্রপাগান্ডা আমাকে বিস্মিত করে। আমি অবাক হয়ে লক্ষ করি কিভাবে একটা দেশ প্রপাগান্ডা ছড়িয়ে তার নিজের দেশের মানুষকেই জিম্মি করছে। সন্ত্রাসের আতঙ্ক ছড়িয়ে নিজ দেশের মানুষের বিরুদ্ধেই আবার সেই আতঙ্ককে ব্যবহার করছে।'

ঘোড়সওয়ার লাদেন

এই সাক্ষাতকারের চার বছর পর ২০০৪ সালের নভেম্বরে মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের মাত্র দুদিন আগে নাটকীয়ভাবে বিন লাদেনের আরও একটি ভিডিও টেপের উদয় হলো। সেই টেইপে লাদেন নাইন-ইলাভেনে হামলার দায়

স্বীকার করে বিবৃতি দিয়েছেন। এমন এক সময় ওই টেপ গণমাধ্যমে প্রচার করা হলো, যখন বিতর্কিত ইরাক যুদ্ধের কারণে সমালোচকদের তোপের মুখে বুশ। জনমত জরিপও পড়তির দিকে। টেপটি হাজির হবার পর সেটিকে প্রচারণার মোক্ষম হাতিয়ারে পরিণত করে দ্বিতীয় মেয়াদের জন্য ক্ষমতা নিশ্চিত করেছিলেন বুশ। অন্তত এই কারণে লাদেন এবং আল কায়দা'র ভিডিও বার্তাগুলোকেও সন্দেহের চোখে দেখেন অনেক গবেষক। এমন অনেক গবেষকই প্রশ্ন করেছেন, নাইন-ইলাভেন পরবর্তী সময়ে 'লাদেন ও আল কায়দার' ভিডিও টেইপগুলো কেন বারবার শুধুমাত্র 'অয়েল শেখদের' গড়া আল-জাজিরা টিভি চ্যানেলের হাতেই পড়ত? আর 'এক্সক্লুসিভ' ব্যান্ডে সেই টেইপ প্রচার করত প্রভাবশালী এই আরব টিভি চ্যানেল।

নাইন-ইলাভেন ট্রাজেডির পর ২০০১ সালের অক্টোবরে যুক্তরাষ্ট্রের সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধের প্রথম রণাঙ্গন আফগানিস্তানে নিয়োজিত হলো এক লাখ মার্কিন সেনা। মাত্র দুই মাসের যুদ্ধেই পতন হলো মোল্লা ওমর নেতৃত্বাধীন পাঁচ বছরের তালেবান সরকারের। কান্দাহার কাবুল আর জালালাবাদ ছেড়ে দুর্গম পাহাড়ি এলাকায় ফিরে গেল জঙ্গিরা। কিন্তু যে লক্ষ্য নিয়ে এই যুদ্ধের সূচনা অর্থাৎ আল কায়দা ও তালেবান জঙ্গিদের নিশ্চিহ্ন করা; আফগানিস্তানে এক যুগেরও বেশি সময়ের মার্কিন দখলদারিত্ব সেই জঙ্গিদের নির্মূল করতে পারেনি। বরং তালেবানের পাশাপাশি উদয় হয়েছে হাক্কানী নেটওয়ার্ক কিংবা তেহরিক-ই-তালেবানের মতো নিত্য নতুন হাজারো জঙ্গি গোষ্ঠির। যারা এখনও অতীতের যে কোনো সময়ের তুলনায় আরও বেশি সক্রিয়, আরও বেশি শক্তিশালী। কেন মার্কিন যুদ্ধের এক দশকেও আফগান জঙ্গিরা নির্মূল হলো না কিংবা লাদেন জাওয়াহিরির মতো মোস্ট ওয়ান্টেড সন্ত্রাসীরা ধরা পড়ল না এই প্রশ্নের আড়ালেই লুকিয়ে ছিল যুক্তরাষ্ট্রের সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধের আসল উদ্দেশ্য। যার উত্তর খুঁজছিলেন সাংবাদিক কারলোত্তা গল।

পাকিস্তান ও আফগানিস্তানে যুক্তরাষ্ট্রের বিশেষ দূত রিচার্ড হলব্রুক একবার বলেছিলেন, We may be fighting the wrong enemy in the wrong country...' আর কেউ বুঝুক বা না বুঝুক এই কথার গুরুত্ব বুঝতে পেরেছিলেন নিউ ইয়র্ক টাইমসের আফগান ব্যুরো প্রধান কারলোত্তা গল। জঙ্গিবাদের শেকড় সন্ধানে প্রায় একদশক পাক-আফগান সীমান্ত এলাকায় কাটিয়ে একটি বই লিখেছিলেন কারলোত্তা। বইয়ের নামটি ধার করেছিলেন রিচার্ড হলব্রুকের সেই কথা থেকে The wrong enemy. অনুসন্ধানী সাংবাদিকতায় নতুন মাত্রা যুক্ত করা এই বই পুলিজ্জার পুরস্কার পেয়েছিল। নাইন-ইলাভেন হামলার পর থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত পাকিস্তান-আফগানিস্তানে

BanglaBook.org

যুক্তরাষ্ট্রের সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধ ও জঙ্গিবাদের বিস্তার নিয়ে গভীর অনুসন্ধানে কারলোত্তা দেখিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধের অন্যতম সহযোদ্ধা পাকিস্তানের সামরিক গোয়েন্দা বাহিনী 'আইএসআই' কিভাবে নিত্য নতুন সন্ত্রাসী গোষ্ঠির জন্ম দিয়ে চলেছে। আবার সেই সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধেই রণাঙ্গনে যুদ্ধ জিইয়ে রেখেছে যুক্তরাষ্ট্র। একটি মাত্র কথায় সেই পরিহাসের প্রতিই ইঙ্গিত করেছিলেন রিচার্ড হলব্রুক।

২০০৬ সালের ডিসেম্বরের কোনো একদিন পাক-আফগান সীমান্তের কোয়েটায় আত্মঘাতী এক তালেবান জঙ্গির পরিবার পরিজনের সাক্ষাৎকার নিয়েছিলেন কারলোত্তা। ওই জঙ্গির স্বজনরা বলছিলেন, কিভাবে তাদের মাদ্রাসা পড়ুয়া সরল ছেলেটিকে সেনাবাহিনীর লোকেরা আত্মঘাতী হামলাকারিতে পরিণত করেছিল। সেই হামলাকারির ভাই কারলোত্তাকে বলছিলেন, পাক-আফগান সীমান্ত এলাকায় যত তালেবান দেখছেন তাদের সবাই 'আইএসআই তালেবান'। আইএসআই'র সাহায্য ছাড়া এখানকার কারো পক্ষে সীমান্তপাড়ি দিয়ে আফগানিস্তান যাওয়া অসম্ভব। একজন তালেবান কমান্ডার আফগান রণাঙ্গন ছেড়ে পাকিস্তানে চলে এসেছিলেন। তাকে আটকের পর আইএসআই হুমকি দিয়েছিল 'মৃত্যু অথবা আমেরিকার বিরুদ্ধে লড়াই' এই দুটোর একটিকে বেছে নিতে হবে। সেই তালেবান কমান্ডারকে বেঁচে থাকার জন্য আফগান রণাঙ্গণকেই বেছে নিতে হয়েছিল।

BanglaBook.org

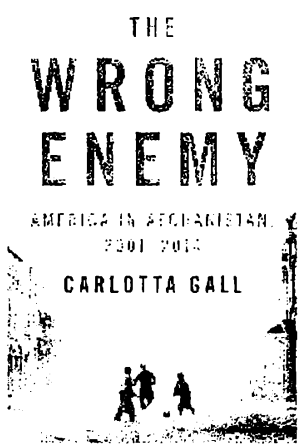

নিউ ইয়র্ক টাইমসের সাংবাদিক কারলোত্তা গল ও তাঁর সাড়া জাগানো অনুসন্ধান The wrong enemy

যথারীতি কারলোত্তার এই অনুসন্ধান পদে পদে আইএসআই-র বাঁধার মুখে পড়েছিল। ওয়াজিরিস্তানে কারলোত্তার হোটেল রুমের দরজা ভেঙে তার নোটবুক ল্যাপটপ আর সেলফোন জব্দ করেছিল সাদা পোষাকের আইএসআই সদস্যরা। যখন তার হাতব্যাগটিও ওরা ছিনিয়ে নিচ্ছিল তখন বাধা দেন কারলোত্তা। তাকে ঘুষি দিয়ে মাটিতে ফেলে দেওয়া হয়। আইএসআই আর তালেবান লিংক নিয়ে কাজ করাই ছিল তার অপরাধ। কারলোত্তা বলছিলেন, নিউ ইয়র্ক টাইমসের মতো একটি প্রভাবশালী প্রতিষ্ঠানের সাংবাদিক হওয়ায় হয়তো তিনি বেঁচে গিয়েছিলেন। কিন্তু পাকিস্তানের আরেক সাংবাদিক সালিম শাহজাদ বাঁচতে পারেননি। আইএসআই-ও গোপন তৎপরতার তথ্য ফাঁস করার অপরাধে ঊর্ধতন এক সেনা কর্মকর্তার নির্দেশে সালিমকে ইসলামাবাদ থেকে তুলে নেওয়া হয়। পরদিন তার লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। নির্মম নির্যাতনের চিহ্ন ছিল সালিমের সারাদেহে।

বইটিতে কারলোত্তা বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্র হয়তো কখনও এই সত্যের মুখোমুখি হয়নি যে (অথবা যুক্তরাষ্ট্র সত্য আড়াল করেছে) পাক আফগান অঞ্চলে ওয়াশিংটনের সবচে প্রভাবশালী বন্ধুটিই (আইএসআই) আসলে তার দুর্ধর্ষ শত্রু। কারলোত্তার ভাষায় পাকিস্তানের অ্যাবোটাবাদে পাক সেনাদের নাকের ডগায় বছরের পর বছর বিন লাদেনের উপস্থিতি গোপন করেছিল আইএসআই। পাকিস্তানের সাবেক বেসামরিক গোয়েন্দা প্রধান ইজাজ শাহ'র উদ্ধৃতি দিয়ে কারলোত্তা বলছেন, ওই গ্রামে একটি কুকুরের উপস্থিতিটা পর্যন্ত আইএসআই'র নজর এড়ায় না। অথচ তারা লাদেনের উপস্থিতির খবর জানতেন না! এটি রীতিমত অবিশ্বাস্য। আর সিআইএ'র পক্ষেই বা এটা কিভাবে সম্ভব যে অ্যাবোটাবাদে লাদেনের উপস্থিতির খবর তাদের জানা ছিল না! যদি সত্যি সিআইএ'র ওই তথ্যটি জানা না থাকে তাহলে বলতে হবে লাদেনের মৃত্যুর আগ পর্যন্ত এগার বছর ধরে ভুল রণাঙ্গনে একটি ভুল যুদ্ধ পরিচালিত করে আসছে যুক্তরাষ্ট্র। যে যুদ্ধে প্রাণ গেছে অন্তত ৭০ হাজার আফগানি'র; দুই হাজার তিনশ আমেরিকানসহ তিন হাজার চারশ বিদেশি সেনার। যে যুদ্ধের মাসোহারা হিসেবে ২০০১ সাল থেকে ১৩ সাল পর্যন্ত ওয়াশিংটনের কাছ থেকে ২০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার সাহায্য পেয়েছে পাকিস্তান। যে টাকার বেশিরভাগটাই গেছে আইএসআই তথা সামরিক খাতে। আরও অনেকের মতো এই সাংবাদিকও একটি কমন প্রশ্ন ছুঁড়েছেন। তা হলো, আইএসআই কি যুক্তরাষ্ট্রের সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধের দীর্ঘ একযুগে ডাবল এজেন্টর মতো বিশ্বাসঘাতকের ভূমিকা পালন করে গেছে? নাকি সিআইএ'র ছককষা পথেই হেটেছে? জটিল এই গোলক ধাঁধার উত্তর হয়তো কখনই মিলবে না।

BanglaBook.org

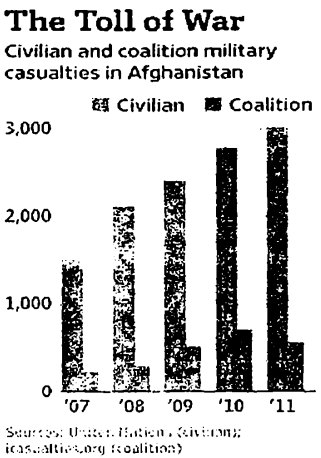

আফগান যুদ্ধে সামরিক, বেসামরিক মানুষের মৃত্যুর পরিসংখ্যান

আফগান যুদ্ধে সামরিক, বেসামরিক এবং শিশুদের প্রিয় খেলা যুদ্ধ

কিন্তু সত্যিটা বরাবরই মিথ্যার মোড়কে অস্বীকার করার চেষ্টা করে আসছে যুক্তরাষ্ট্র। এই সত্য উপেক্ষা করার কোনো উপায় নেই যে, বিন লাদেন বা আল কায়দার সন্ত্রাসের বীজ আফগানিস্তানের উর্বর জমিনে বপন করেছিল সিআইএ। এ প্রসঙ্গে মার্কিন টিভি চ্যানেল সিএনএন-এর একটি সূত্র উল্লেখ করা যেতে পারে। নাইন-ইলাভেন ট্রাজেডির পর পয়লা অক্টোবর ২০০১ সালে

সিএনএন এর জনপ্রিয় ল্যারি কিং লাইভ অনুষ্ঠানে ওয়াশিংটনে নিযুক্ত সৌদি রাষ্ট্রদূত প্রিন্স বানদার বিন সুলতান স্বীকার করেছিলেন, আফগান রণাঙ্গনে বিন লাদেনকে মদত দিয়েছিল যুক্তরাষ্ট্র। সেই অনুষ্ঠানে প্রিন্স বানদার যা বলেছিলেন তা হবহু তুলে ধরা হলো:

Bandar bin Sultan:

This is ironic. In the mid '80s, if you remember, we and the United. Saudi Arabia and the United States were supporting the Mujahideen to liberate Afghanistan from the Soviets. He [Osama bin Laden] came to thank me for my efforts to bring the Americans, our friends, to help us against the atheists, he said the communists. Isn't it ironic?

Larry King:

How ironic. In other words, he came to thank you for helping bring America to help him.

Bandar bin Sultan:

Right.

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় কট্টরপন্থী কোনো জিহাদি কিংবা হঠাৎ গজিয়ে ওঠা কোনো বিপ্লবী গ্রুপের হাত ধরে পৃথিবীতে ধর্মীয় উগ্রপন্থার বিস্তার হয়নি। বরং আফগান রণাঙ্গনে সিআইএ'র হাত ধরেই রোপিত হয়েছিল জঙ্গিবাদের বীজ। অর্থ অস্ত্র আর প্রশিক্ষণের তেল-জল দিয়ে আফগান রণাঙ্গনকে জিহাদের বীজতলা হিসেবে প্রস্তুত করেছিল যুক্তরাষ্ট্র। সেই বীজতলা আজ ঝাড়ে-বংশে বিশাল এক মহিরুহ হয়ে দুনিয়া জুড়ে শেকড় বিস্তার করেছে। ৮০'র দশকে যে আফগান শিশুটি সিআইএ প্রণীত জিহাদি বই পড়ে জিহাদকেই বেহেশত লাভের মূলমন্ত্র বলে জেনেছে, আজ সে ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছরের তরুণ যুবক। যুক্তরাষ্ট্রের দেওয়া কালাশনিকভ রাইফেল কিংবা স্ট্রিঙ্গার মিসাইল কাঁধে সেই যুবকের নিশানা হয়তো এখন মার্কিন চিনুক অথবা অ্যাপাচি হেলিকপ্টার। আফগান যুবকদের জঙ্গি করে তোলার এই পিতৃদায় কিভাবে অস্বীকার করবে যুক্তরাষ্ট্র আর তার সিআইএ? তাদের শিখিয়ে দেওয়া পদ্ধতিতেই আত্মঘাতী হামলা, রাস্তার পাশে পেতে রাখা বোমা হামলা আর ট্রাক বোমা হামলায় ইরাক, সিরিয়া, লিবিয়া ইয়েমেন আর আফগানিস্তানের লাখো মানুষের প্রাণ যাচ্ছে। আবার তাদের বিরুদ্ধেই চলছে যুক্তরাষ্ট্রের সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধ নামের

এক নিরন্তর লড়াই। এক সময় যে যুদ্ধের নিশানা ছিল আফগানিস্তানের কান্দাহার-কাবুল খোশত কিংবা ওয়াজিরিস্তান; সেই একই যুদ্ধের নিশানা আজ আরও ব্যাপক আরও বিধ্বংসী। ইরাক, সিরিয়া অথবা তুর্কী সীমান্তে সেই লড়াইয়ে পরাশক্তিরূপী ত্রাতার ভূমিকায় আজ নতুন চেহারা নিয়ে উপস্থিত যুক্তরাষ্ট্র। পাল্টে গেছে শত্রুর মুখোশও। বিন লাদেন বা জাওয়াহিরির আড়ালে সেই মুখোশটা এবার আত্মস্বীকৃত এক নিষ্ঠুর খলিফা আবু বরক আল বাগদাদি'র। নিষ্ঠুরতার বিচারে আল কায়দা আর তালেবানও যাদেরকে জঙ্গি বলে, সেই আইএসও কি তবে সিআইএ'র সৃষ্টি? এই প্রশ্নের উত্তরের জন্য ফিরে তাকাতে হবে ইরাক-সিরিয়ার বহুমুখী আর বহুধা বিভক্ত নৈরাজ্যের এক রক্তাক্ত গোলক ধাঁধার দিকে।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

ইরাক
নতুন শতকের গোয়ের্নিকা

১৯৩৭ সালে স্পেনের গোয়ের্নিকা শহরে নাৎসিদের গণহত্যার প্রতিবাদে শিল্পী পিকাসো এঁকেছিলেন তাঁর বিখ্যাত শিল্পকর্ম 'গোয়ের্নিকা'। পিকাসোর সেই ছবি আজও পৃথিবীর তাবত গণহত্যার বিরুদ্ধে প্রতীক এক প্রতিবাদ। একের পর এক মিথ্যা গল্প সাজিয়ে ইরাক আগ্রাসন শুরু করেছিল যুক্তরাষ্ট্র। লাখো মানুষকে হত্যার মধ্য দিয়ে সেই ইরাক যেন নতুন শতকের গোয়ের্নিকা।

শিল্পী পিকাসোর অমর শিল্পকর্ম গোয়ের্নিকা আজও মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধের এক নিরব প্রতিবাদ

ইরাক যুদ্ধের ষড়যন্ত্র এবং PNAC
বিল ক্লিনটনের **Iraq Liberation Act** বিল
রামসফেল্ডের গোপন মেমো
ইরাক ও বুশের ষড়যন্ত্র
ইরাক ও ব্লেয়ারের ষড়যন্ত্র
জাতিসংঘের অস্ত্র পরিদর্শক হ্যান্স ব্লিক্স
ইরাক: শক অ্যান্ড অ এবং মার্কিন হত্যাযজ্ঞ
হাববুশ চিঠি কেলেঙ্কারি

২৬ জানুয়ারি ১৯৯৮। ওয়াশিংটনে প্রজেক্ট ফর আ নিউ আমেরিকান সেঞ্চুরী (PNAC) নামে একটি সংগঠনের যাত্রা শুরু হলো। নতুন শতকের চ্যালেঞ্জ সামনে রেখে ভবিষ্যতের আমেরিকা গড়তে কাজ করবে এই সংগঠন। আমেরিকার রাজনীতি অর্থনীতি পররাষ্ট্রনীতিকে নতুন শতকের উপযোগী করে ঢেলে সাজানো এবং ভবিষ্যত নিরাপত্তায় নতুন সম্পদ ও জ্বালানির উৎস সন্ধানে সরকারের সাথে দেন-দরবার করবেন সংগঠনটির নেতারা। Neo Conservative Think Tank নামে পরিচিত এই গ্রুপে আছেন বহুজাতিক তেল কোম্পানি হেলিবার্টনের সিইও ডিক চেনি, ডোনাল্ড রামসফেল্ড, ফ্লোরিডার গভর্নর জেব বুশ (বুশের নির্বাচনে ফ্লোরিডা কেলেঙ্কারির জনক এবং জর্জ বুশের ছোট ভাই) পল উলফউইটজ আর তার সহকারি ল্যুইস লিব্বি। তাদের সবাই প্রেসিডেন্ট এইচ ডব্লিউ বুশ অর্থাৎ বুশ সিনিয়রের প্রভাবশালী কর্মকর্তা ছিলেন। পরে প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশের কর্মকর্তা হয়েছেন। পর্দার আড়ালে এই সংগঠনের আরও একটি পক্ষ ছিল। যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতি বিশেষ করে রিপাবলিকান রাজনীতির কট্টর প্রভাবক ইসরাইল লবি।

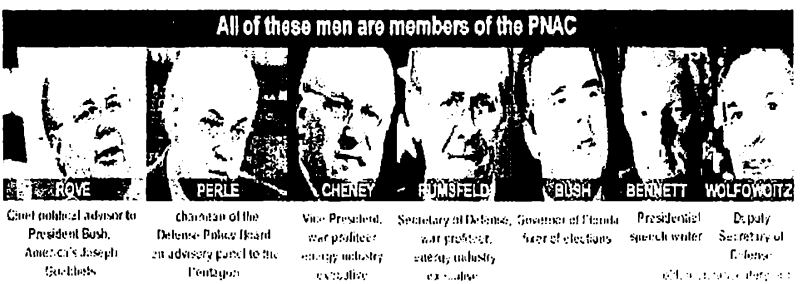

প্রজেক্ট ফর আ নিউ আমেরিকান সেঞ্চুরি'র নিও কনজারভেটিভ থিংক ট্যাংক-এর শীর্ষ কুশীলব'রা

স্নায়ুযুদ্ধ পরবর্তী বিশ্বে আমেরিকার একক প্রভাব ও আধিপত্যের পাশাপাশি ভবিষ্যত জ্বালানি নিরাপত্তা নিয়ে শঙ্কিত এই প্রভাবশালী কর্মকর্তারা ক্ষমতাসীন ডেমোক্র্যাট প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটনকে একটি ঐতিহাসিক পরামর্শ দিলেন। আর তা হলো 'ইরাকে সাদ্দাম যুগের পরিবর্তন'। তাদের ভাষায় সাদ্দাম তথা ইরাক ক্রমশ ভবিষ্যত মধ্যপ্রাচ্যের জন্য হুমকি হয়ে উঠছেন। যুক্তরাষ্ট্রের অব্যাহত হুমকি সত্ত্বেও দুদুবার সাদ্দাম কুয়েত আক্রমন করছেন। ৯৩ সালের ১৪ এপ্রিল সদ্য বিদায়ী প্রেসিডেন্ট এইচ ডব্লিউ বুশ কুয়েত সফরে গেলে তাকে হত্যার চেষ্টা করেছে ইরাকি গোয়েন্দা বাহিনী। বুশের ওপর গাড়িবোমা হামলার চেষ্টা নস্যাৎ করে দিয়েছে কুয়েতের গোয়েন্দারা। খবরটা ফলাও করে গণমাধ্যমে প্রচার করেছিল যুক্তরাষ্ট্র।

BanglaBook.org

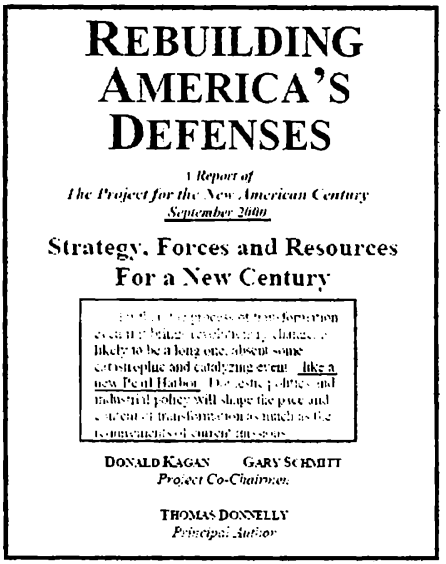

REBUILDING AMERICA'S DEFENSES

A Report of
The Project for the New American Century
September 2000

Strategy, Forces and Resources
For a New Century

[redacted] likely to be a long one, absent some catastrophic and catalyzing event – like a new Pearl Harbor. Our military, political and industrial policy will shape the pace and extent of transformation as much as the [redacted]

DONALD KAGAN GARY SCHMITT
Project Co-Chairmen

THOMAS DONNELLY
Principal Author

ESTABLISH FOUR CORE MISSIONS for U.S. military forces:

- defend the American homeland;
- fight and decisively win multiple, simultaneous major theater wars;
- perform the "constabulary" duties associated with shaping the security environment in critical regions;
- transform U.S. forces to exploit the "revolution in military affairs."

To carry out these core missions, we need to provide sufficient force and budgetary allocations. In particular, the United States must:

MAINTAIN NUCLEAR STRATEGIC SUPERIORITY, basing the U.S. nuclear deterrent upon a global, nuclear net assessment that weighs the full range of current and emerging threats, not merely the U.S.-Russia balance.

RESTORE THE PERSONNEL STRENGTH of today's force to roughly the levels anticipated in the "Base Force" outlined by the Bush Administration, an increase in active-duty strength from 1.4 million to 1.6 million.

REPOSITION U.S. FORCES to respond to 21st century strategic realities by shifting permanently-based forces to Southeast Europe and Southeast Asia, and by changing naval deployment patterns to reflect growing U.S. strategic concerns in East Asia.

প্রজেক্ট ফর আ নিউ আমেরিকান সেঞ্চুরি'র রিপোর্ট

এই অপরাধে সে মাসেই বাগদাদে সাদ্দামের গোয়েন্দা বাহিনীর সদর দপ্তরে টমাহক মিসাইলের হামলা চালায় যুক্তরাষ্ট্র। পরদিন জাতীর উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে হামলার পক্ষে যুক্তি দিয়ে প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন বলেছিলেন—'সাদ্দাম আমাদের সাবেক প্রেসিডেন্টকে হত্যার ষড়যন্ত্র করেছে। এ ব্যাপারে নিশ্চিত তথ্যের ভিত্তিতেই বাগদাদে হামলা হয়েছে। এমন সন্ত্রাসী তৎপরতা হলে আবারো হামলা হবে'। ২০০২ সালে টেক্সাসের এক অনুষ্ঠানে ইরাক সম্পর্কে

বলতে গিয়ে প্রেসিডেন্ট বুশও সাদ্দামকে ইঙ্গিত করে বলেছেন: 'এ হলো সেই লোক, যে কিনা আমার বাবাকে হত্যার ষড়যন্ত্র করেছে।' কিন্তু সত্যিই কি সাদ্দাম হোসেন বুশ সিনিয়রকে হত্যার চেষ্টা করেছিলেন?

বাগদাদে ওই হামলার পর ইরাকের জাতীয় টেলিভিশনে দেওয়া ভাষণে সাদ্দাম জোর গলায় এ ধরনের ষড়যন্ত্রের খবর নাকচ করে দেন। ইতিহাস স্বাক্ষ্য দেয় সাদ্দাম মিথ্যে বলেননি। বরং মিথ্যে বলেছিলেন প্রেসিডেন্ট ক্লিনটন, সিআইএ এবং জর্জ বুশ। ২০০৪ সালে বাগদাদের পতন হলে ইরাকের গোয়েন্দা দপ্তর থেকে ছয় লাখ পৃষ্ঠা গোয়েন্দা নথি জব্দ করেছিল মার্কিন বাহিনী। সেই নথি তন্ন তন্ন করে খুঁজেও বুশ সিনিয়রকে হত্যা চেষ্টার কোনো ষড়যন্ত্র খুঁজে পায়নি যুক্তরাষ্ট্র। পায়নি এমন অনেক কিছুই যা বরাবর দাবি করা হয়েছিল।

বলছিলাম 'প্রজেক্ট ফর আ নিউ আমেরিকান সেঞ্চুরি'র (PNAC) কথা। নতুন শতাব্দিতে দুই নিও কনজারভেটিভ থিংক ট্যাঙ্ক; পল উলফউইটজ আর তার সহযোগী ল্যুইস লিব্বি বিশ্বব্যাপী মার্কিন আধিপত্য বিস্তারের একটি নীল নকশা প্রস্তুত করছিলেন। 'American Grand Strategy' নামের এই নীল নকশার প্রস্তাবনায় দুই থিংক ট্যাঙ্ক বলছিলেন, কী করে মধ্যপ্রাচ্যের রাজনীতির খোলনলচে পাল্টে দেওয়া যায় এবং সামরিক উপস্থিতির মাধ্যমে উপসাগরীয় অঞ্চলসহ বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় যুক্তরাষ্ট্রের স্থায়ী প্রভাব প্রতিপত্তি বাড়ানো যায়। আর তার উপায় হিসেবে তারা বলেছেন, 'একাধারে একাধিক যুদ্ধে বিজয় অর্জন করাটাই হবে 'অন্তর্গত মিশন' (সে জন্যই কি তবে নাইন-ইলাভেন ট্রাজেডি আর একাধারে আফগান-ইরাকে যুদ্ধ?)। তবে একা নয়। আমেরিকার কথিত এই গ্লোবাল লিডারশিপ অর্জনের লড়াই যাতে প্রশ্নবিদ্ধ না হয় সেজন্য যুক্তরাজ্যসহ ইউরোপের সম্ভাব্য বন্ধুদেরও সাথে রাখার পরামর্শ ছিল পল-লিব্বি'র। সেখানে মধ্য এশিয়ায় প্রভাব বাড়ানো'র (আফগান?) গুরুত্ব যেমন দেওয়া হয়েছে তেমনি এক ইরাককে কেন্দ্র করে পুরো মধ্যপ্রাচ্যের রাজনীতিতে যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাব বিস্তারের কৌশলও বাতলে দেওয়া হয়েছে। ছক কষা হয়েছে সাদ্দাম পরবর্তী ইরাকের পুনর্গঠন তথা ঠিকাদারি আর তেলের নিয়ন্ত্রণ নিয়েও। Sunday Herald January 2001.

Neo Conservative Think Tank দের স্বার্থে প্রথম পদক্ষেপটা কিন্তু কোনো রিপাবলিকান প্রেসিডেন্ট নেননি। নিয়েছেন ডেমোক্র্যাট প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন। ৩১ অক্টোবর ১৯৯৮ সালে Iraq Liberation Act নামে একটি বিলে সই করেছিলেন প্রেসিডেন্ট ক্লিনটন। আর সেদিনই নির্ধারিত হয়ে আজকের ইরাক এবং ইরাকি প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেনের ভাগ্য। মধ্যপ্রাচ্যের

BanglaBook.org

বর্তমান উত্তাল পরিস্থিতির পেছনেও সম্ভবত সেটাই ছিল প্রথম পদক্ষেপ। তবে খুব বেশিদিন ডিক চেনি আর রামসফেল্ডদের অপেক্ষায় থাকতে হয়নি। পরের কাজটা সহজ করে দিয়েছে মার্কিন জনগণের ভোট। ২০ জানুয়ারি ২০০১ সালে হোয়াইট হাউসের ক্ষমতায় এলেন রিপাবলিকান প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশ। ভাইস প্রেসিডেন্ট হলেন ডিক চেনি, আর প্রতিরক্ষামন্ত্রী ডোনাল্ড রামসফেল্ড।

দেশে গণতন্ত্র আছে মার্কিন জনগণকে এই কথাটি মনে করিয়ে দিতে প্রতিবছরই গোপন থাকা কিছু সরকারি নথি প্রকাশ (Declassified) করে থাকে যুক্তরাষ্ট্র। যেমন সম্প্রতি প্রকাশিত এমন এক নথিতে জানা গেছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর হিটলারের দাগি সব নাৎসি অপরাধীদের মস্কোর বিরুদ্ধে গোয়েন্দাবৃত্তিতে কাজে লাগিয়েছিল সিআইএ। এমনকি কয়েকজন নাৎসি যুদ্ধাপরাধীর বিচার কাজে প্রভাব বিস্তার করেছিল ওয়াশিংটন। এমন বেশকিছু নাজি নেতাকে ছদ্ম পরিচয়ে যুক্তরাষ্ট্রে থাকার ব্যবস্থা করে নিয়মিত মাসোহারা দেওয়া হত। তেমনি জর্জ বুশের ইরাক যুদ্ধ বিষয়ক কিছু গোপন দলিল, যা কিনা Sensitive But Declassified করেছে National Security Archive. এই নথি বলছে হোয়াইট হাউসের দায়িত্ব নিয়েই প্রেসিডেন্ট বুশ সবার আগে যে কাজটা করেছিলেন, সেটি হলো ইরাক বিষয়ে একটি পলিসি নির্ধারণ। সদ্য বিদায়ী প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটনের Iraq Liberation Act বিলটির আওতায়, 'Origins of the Iraq Regime Change Policy' নামে একটি কৌশল গ্রহণ করেছিলেন বুশ। যা ছিল ইরাক যুদ্ধের ক্ষেত্র প্রস্তুত আর বহুমুখী ষড়যন্ত্রের প্রথম পদক্ষেপ।

সময়টা ২৩ জানুয়ারি ২০০১। তখনও নাইন-ইলাভেন ঘটেনি। ইরাকের কথিত গণবিধ্বংসী অস্ত্রের প্রসঙ্গ আসেনি। মাত্র দুদিন আগে প্রেসিডেন্ট হলেন বুশ। এদিন হোয়াইট হাউসে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ, জাতীয় নিরাপত্তা সংস্থা এনএসএ, ফেডারেল ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশান এফবিআই এবং সামরিক দপ্তর পেন্টাগনের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের সাথে বৈঠকে বসেছেন বুশ। আলোচনার বিষয় ইরাক। প্রেসিডেন্টের ভাষায় 'যুক্তরাষ্ট্রের গৃহীত নীতি হলো ইরাকের প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেনকে ক্ষমতাচ্যুত করে গণতান্ত্রিক সরকার গড়তে হবে।' প্রেসিডেন্ট আরও বলেছেন, 'বাগদাদের দীর্ঘ দিনের হুমকি মোকাবেলায় সর্বোত্তম পন্থা হলো নতুন গণতান্ত্রিক সরকার গঠন। যে সরকার তার নিজ দেশের মানুষের প্রতি এবং আঞ্চলিক শান্তিরক্ষার প্রতি দায়বদ্ধ থাকবেন'। একই সঙ্গে সামরিক অভিযানের সম্ভাব্যতা খতিয়ে দেখতে সিআইএ প্রধান জর্জ টেনেটকে ইরাকে গোয়েন্দা কার্যক্রম বাড়ানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন বুশ।

BanglaBook.org

স্মরণ করা যাক বুশ প্রশাসনের সাবেক অর্থমন্ত্রী পল ও'নীলের বক্তব্য। ২০০৪ সালে মার্কিন টেলিভিশন সিবিএস-এর জনপ্রিয় অনুষ্ঠান সিক্সটি মিনিটস এ দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে পল বলেছেন হোয়াইট হাউসের দায়ীত্ব গ্রহণের পরদিনই ইরাকে সামরিক হামলা চালানোর পরিকল্পনা নিয়ে কাজ শুরু করেছিলেন প্রেসিডেন্ট বুশ। ইরাকের বিরুদ্ধে সামরিক পদক্ষেপ গ্রহণই শুধু নয় সাদ্দাম পরবর্তী ইরাকের তেল সম্পদের নিয়ন্ত্রণ এবং নতুন তেলক্ষেত্রের খনন কাজের জন্য বিশ্বের ত্রিশ থেকে চল্লিশটি দেশের ঠিকাদারদের সাথে যোগাযোগের কাজও শুরু করে দিয়েছিল বুশ প্রশাসন। ও'নীল বলেছেন সেদিন তিনি বিস্মিত হয়েছিলেন এই ভেবে যে, 'যৌক্তিক কোনো কারণ ছাড়াই ইরাকের বিরুদ্ধে কেন সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে? সেদিন এ বিষয়ে জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিলের কোনো কর্মকর্তাই প্রেসিডেন্ট বুশকে একটাও প্রশ্ন করেননি'! ইরাকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়ে সেই বৈঠকে প্রেসিডেন্টের শেষ কথা ছিল 'যাও একটা কোনো রাস্তা বের করো'। পরে ২০০২ সালে বুশ যখন যুক্তরাষ্ট্রের ধনিকশ্রেণি ও কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানগুলোকে দ্বিতীয়বারের মতো কর মওকুফের সুবিধা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন, তখন ওই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে ৩১ ডিসেম্বর পদত্যাগ করেছিলেন ও'নীল।

BanglaBook.org

ইরাকের জলন্ত তেলক্ষেত্রের সামনে ব্লেয়ারের হাস্যোজ্জল সেলফি

ফিরে তাকাই একই সময়ের ইরাক পরিস্থিতির দিকে। নতুন বছরের সূচনা পর্বে অর্থাৎ ৩১ ডিসেম্বর ২০০০ সালের বিকেলে বাগদাদে আকস্মিক এক সামরিক

কুচকাওয়াজের আয়োজন করেন ইরাকি প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেন। রাশিয়ার নির্মিত শতশত যুদ্ধ বিমান, ট্যাঙ্ক, মিসাইল, এন্টি মিসাইল আর লাখো সেনার অংশগ্রহণে ওই কুচকাওয়াজ দিয়ে শত্রু শিবিরে একটা কৌশলি বার্তা দিতে চেয়েছিলেন সাদ্দাম। ন্যাশনাল গার্ডের আত্মঘাতী স্কোয়াডের কুচকাওয়াজ আর ইসরাইল বিরোধী পোস্টার দিয়ে উস্কানি দিয়েছেন ইসরাইল-যুক্তরাষ্ট্রকেও। তারচেয়েও ইঙ্গিতপূর্ণ ছিল কুচকাওয়াজের সূচনা পর্বটি। বাগদাদের প্রেসিডেন্ট প্রাসাদের বেলকনিতে দাঁড়িয়ে নিজের রাইফেল থেকে আকাশে গুলি ছোঁড়ার মধ্যদিয়ে কুচকাওয়াজ উদ্বোধন করেছিলেন সাদ্দাম হোসেন। যাকে প্রতিকী হুমকির বার্তা হিসেবেই ধরে নিয়েছেন মার্কিন কর্তাব্যক্তিরা।

গুলি চালিয়ে কুচকাওয়াজ উদ্বোধন করছেন সাদ্দাম

এর সাতমাস পর ২৭ জুলাই ২০০১। জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের একটি বৈঠকের বিষয়ে প্রেসিডেন্ট বুশের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা কন্ডোলিজ্জা রাইসকে একটি মেমো পাঠিয়েছেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী ডোনাল্ড রামসফেল্ড। মেমোতে রামসফেল্ড বলছেন "সীমিত আকারের কোনো অবরোধ দিয়ে সাদ্দাম সরকারকে দুর্বল করা যাবে না। নব্বয়েইর দশক থেকে এ ধরনের অবরোধ ছিল এবং তা উপেক্ষা করে আসছেন সাদ্দাম হোসেন। এমনকি নো ফ্লাই জোনও। বরং তার আচরণ এবং প্রতিবেশীদের সাথে তার সম্পর্ক প্রমাণ করছে গত একবছরে সে আরও শক্তিশালী হয়েছে। আমাদের এবং যৌথবাহিনীর বিমানকে গুলি করে নামানো হয়েছে। যা বিপদজনক ইঙ্গিত দিচ্ছে। সাদ্দাম স্বয়ং আকাশে গুলি চালানোর মধ্য দিয়ে এই বার্তাই দিচ্ছেন

BanglaBook.org

যে, তার আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা আগের চেয়ে শক্তিশালী। আর সে কারণেই ইরাকের উন্মত্ততাও বেড়েছে। বাস্তবিক তারা কি করছে তার সব তথ্য জোগাড় করাটাও কঠিন হয়ে পড়েছে। কারণ ইরাক তার ফাইবার অপটিক ব্যবস্থার উন্নতি ঘটিয়েছে।"

এই পরিস্থিতিতে ইরাকের বিরুদ্ধে সম্ভাব্য করণীয় প্রসঙ্গে প্রতিরক্ষামন্ত্রী রামসফেল্ড মেমোতে প্রস্তাব করেছেন—'সুনির্দিষ্টভাবে ইরাকের ফাইবার অপটিক লিংক, রাডার ব্যবস্থা এবং কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ সম্পদের ওপর হামলা বা অভিযান চালানোর মধ্য দিয়ে আমাদের পাইলটদের ওপর আঘাত হানার একটা জবাব দেওয়া যেতে পারে সাদ্দামকে। এবং সম্ভাব্য সেসব লক্ষ্যবস্তু বাগদাদের আশেপাশেই আছে।' মেমোতে মোট সাতদফা প্রস্তাবের শেষটিতে রামসফেল্ড বলেছেন 'উপসাগরীয় অঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ দুই দেশ ইরাক-ইরান। দুই দেশই একে অপরের শত্রু। ইরাকের দুর্ভাগ্য হলো দেশটি সাদ্দামের মতো একজন অপশাসকের হাতে পড়েছে। আর ইরান পড়েছে ধর্মগুরুদের হাতে। দুই শাসক যদি আমার শত্রুর শত্রু মানে আমার বন্ধু এমনটা ভেবে বসে তাতে সংকট বাড়বে। তাই সাদ্দামকে যদি সরিয়ে দেওয়া যায় তাহলে গোটা অঞ্চলেই আমাদের অবস্থান জোরদার হয়।'

এর দুমাস পরই ঘটে গেল দুনিয়া কাঁপানো সেই ঘটনা নাইন-ইলাভেন ট্রাজেডি। যুক্তরাষ্ট্রের ভাষায় ওই হামলায় জড়িত সন্ত্রাসী আল কায়দা ও তার নেতা বিন লাদেন। এবং এর উপযুক্ত তথ্য-প্রমাণ যুক্তরাষ্ট্রের হাতে আছে; তাৎক্ষণিকভাবেই গণমাধ্যমকে ইঙ্গিত দিয়েছিলেন প্রেসিডেন্ট বুশ। অমন একটি ঘটনার পর যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম পদক্ষেপ হবার কথা ছিল আল কায়দার বিরুদ্ধে। কিন্তু না, নাইন-ইলাভেন ট্রাজেডির পর বুশ প্রশাসনের প্রথম পদক্ষেপ ছিল ইরাকের বিরুদ্ধে। ১১ সেপ্টেম্বর পেন্টাগনে সন্ত্রাসী হামলার পাঁচ ঘণ্টা পর দুপুর ২টা ৪০ মিনিটে, প্রতিরক্ষামন্ত্রী ডোনাল্ড রামসফেল্ড তার প্রশাসনিক কর্মকর্তার উদ্দেশে একটি মেমোতে লিখেছেন, 'my interest is to hit Saddam.judge whether good enough [to] hit S.H. [Saddam Hussein] at same time. পাশাপাশি রামসফেল্ড এটাও উল্লেখ করেছেন Hard to get a good case. রামসফেল্ডের প্রশাসনিক কর্মকর্তা বুঝে নিলেন, সাদ্দামকে নাইন-ইলাভেনে জড়ানো কঠিন কিন্তু তারা (বুশ প্রশাসন) চাইছেন এই সন্ত্রাসী হামলাকে আশ্রয় করে ইরাকে হামলা হোক (CBS News, September 2002).

এর দশদিন পর উচ্চপদস্ত কর্মকর্তাদের এক গোপন (Classified) বৈঠকে প্রেসিডেন্ট বুশ বলেছিলেন, 'U.S. intelligence community had

BanglaBook.org

no evidence linking the Iraqi regime of Saddam Hussein to the 9/11 attacks and that there was scant credible evidence that Iraq had any significant collaborative ties with Al Qaeda'. অর্থাৎ নাইন-ইলাভেনের ঘটনায় সাদ্দাম হোসেন জড়িত থাকার কোনো প্রমাণ মেলেনি। এবং ইরাকের সাথে আল কায়দার যুক্ত থাকার ব্যাপারেও পর্যাপ্ত তথ্য প্রমাণ নেই। একই আভাস মেলে পরের বছরের আরও একটি গোয়েন্দা রিপোর্টে। ২০০২ সালের ফেব্রুয়ারিতে প্রতিরক্ষা দপ্তরের গোয়েন্দা রিপোর্টেও বলা হয়েছে, 'আল কায়দার ষড়যন্ত্রের সাথে সাদ্দাম হোসেনের যুক্ত থাকার সুনির্দিষ্ট কোনো প্রমাণ মেলেনি'। কিন্তু ভেতরের এই খবরগুলো কখনও মার্কিন জনগণকে জানতে বা বুঝতে দেয়নি বুশ প্রশাসন। বরং ইরাক বিরোধী প্রচার প্রপাগান্ডা জারি রাখার মধ্যদিয়ে সাদ্দাম হোসেনকে গণশত্রুতে পরিণত করার উপর্যুপরি চেষ্টা চালিয়ে গেছে বুশ প্রশাসনের কর্মকর্তারা। ২০০২ সালের জানুয়ারিতে প্রেসিডেন্ট বুশ 'ইরাক ইরান এবং উত্তর কোরিয়াকে যুক্তরাষ্ট্রের জন্য হুমকি উল্লেখ করে এই তিন দেশকে axis of evil বলে মন্তব্য করেছিলেন। এমনকি ২০০৩ সালের ১৮ মার্চ ইরাকে যুদ্ধ শুরুর একদিন আগে কংগ্রেসের কাছে দেওয়া সাক্ষ্যে শপথ নেওয়া সত্ত্বেও (যা ইমপিচ বা অভিসংশন যোগ্য অপরাধ) মিথ্যে বলেছিলেন বুশ। প্রেসিডেন্ট তার স্বাক্ষ্যে বলেছিলেন 'including those nations, organizations, or persons who planned, authorized, committed, or aided the terrorist attacks that occurred on September 11, 2001.' অর্থাৎ বুশের ভাষায় 'ইরাক নাইন-ইলাভেনের সন্ত্রাসী হামলার পরিকল্পনা, অনুমোদন, অর্থায়ণ এবং সংগঠিত করেছিল'। বলা বাহুল্য বুশ ও তার প্রশাসনের মদতপুষ্ট মার্কিন গণমাধ্যমের অব্যাহত প্রচার প্রপাগন্ডার বদৌলতে সেই সময়টায় যুক্তরাষ্ট্রের শতকরা ৬৯ ভাগ নাগরিকই বিশ্বাস করতেন সাদ্দাম হোসেনও নাইন-ইলাভেনের সন্ত্রাসী হামলায় জড়িত।

নাইন-ইলাভেনের ঘটনাকে আশ্রয় করে বুশ প্রশাসন যখন ইরাকে যুদ্ধ বাঁধানোর মরিয়া চেষ্টার অংশ হিসেবে বহুমুখী ষড়যন্ত্রের জাল বুনছে, তখন একই রকম চেষ্টা দেখা গেছে ব্রিটেনের ব্লেয়ার প্রশাসনেও। 'প্রজেক্ট ফর আ নিউ আমেরিকান সেঞ্চুরি'র (PNAC) পরামর্শটি আরও একবার স্মরণ করা যেতে পারে। নিও কনজারভেটিভ থিংক ট্যাঙ্কদের পরামর্শ ছিল 'বিশ্বব্যাপী আমেরিকার কথিত এই গ্লোবাল লিডারশিপ অর্জনের লড়াই যাতে প্রশ্নবিদ্ধ না হয় সেজন্য যুক্তরাজ্যসহ ইউরোপের সম্ভাব্য বন্ধুদেরও সাথে রাখা'।

২৩ জুলাই ২০০২। বৃটিশ গোয়েন্দা সংস্থা এমআই সিক্স প্রধান রিচার্ড ডিয়ারলাভ-এর সাথে বৈঠকে বসেছেন টনি ব্লেয়ার। বৈঠকে ডিয়ারলাভ

BanglaBook.org

প্রধানমন্ত্রীকে জানালেন, প্রেসিডেন্ট বুশ সামরিক অভিযানের মধ্য দিয়ে সাদ্দাম হোসেনকে ক্ষমতাচ্যুত করতে চান। এবং আন্তর্জাতিক অঙ্গনে এই অভিযানকে বৈধতা দিতে সাদ্দামের বিরুদ্ধে ভয়ঙ্কর সন্ত্রাসীদের মদত দেওয়া এবং গণবিধ্বংসী অস্ত্র মজুতের অভিযোগ এনেছেন। বুশের এই নীতির আলোকে গোয়েন্দা তথ্য প্রস্তুত করতে ডিয়ারলাভকে নির্দেশ দিয়েছিলেন ব্লেয়ার। অর্থাৎ সাদ্দামের হাতে 'ব্যাপক গণবিধ্বংসী অস্ত্র' আছে কিনা সেই সত্যতা যাচাই করা নয়, বরং বুশের নীতির আলোকে গোয়েন্দা তথ্য প্রস্তুতির এই নির্দেশের সার কথা হলো গোয়েন্দা তথ্য সাজানো। যা বুঝে নিতে অসুবিধে হয়নি এমআই সিক্স প্রধানের।

আগস্ট ২০০২। ভাইস প্রেসিডেন্ট ডিক চেনি সাদ্দাম হোসেনের বিষয়ে এক বৈঠকে যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক সামরিক কর্মকর্তাদের হুঁশিয়ার করে দিয়ে বললেন, 'সাদ্দাম পুরো মধ্যপ্রাচ্যে ভয়ঙ্কর রকম প্রভাব বিস্তার করে চলেছে। এবং ইরানের মতো সাদ্দামও যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরাইলের পারমাণবিক অস্ত্র সক্ষমতার বিতর্কটা সামনে আনতে পারে। এটা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, তার হাতে ব্যাপক বিধ্বংসী অস্ত্র রয়েছে।' একই মাসে ইরাক বিষয়ে একটি কমিটি গঠন করলেন বুশ প্রশাসনের কর্তা ব্যক্তিরা। যার নাম—White House Iraq Group (WHIG). যে গ্রুপটি পরবর্তী সময়ে খুব ধীরে ধীরে প্রচার প্রচারণার মধ্য দিয়ে ইরাক যুদ্ধের ক্ষেত্র রচনা করেছে এবং সিএনএন'এর মতো গণমাধ্যমগুলোর মাধ্যমে জনমনে ইরাক যুদ্ধের যৌক্তিকতা সৃষ্টি করেছে।

ফিরে তাকাই আরও কিছু নথির দিকে। এল বারাদি ও হ্যান্স ব্লিক্স নেতৃত্বাধীন জাতিসংঘের অস্ত্র পরিদর্শকরা যখন ইরাকের বাগদাদসহ বিভিন্ন এলাকায় ব্যপক বিধ্বংসী অস্ত্রের সন্ধানে আঁতি-পাতি করে অনুসন্ধান চালিয়েও সন্দেহজনক কোনো অস্ত্র ভাণ্ডারের সন্ধান পাচ্ছেন না তখনই যুদ্ধের দিনক্ষণ চূড়ান্ত করে ফেলেছেন বুশ-ব্লেয়ার।

৩১ জানুয়ারি ২০০৩ সালে ওয়াশিংটন সফরে বুশ-ব্লেয়ারের একান্ত বৈঠকের আলাপচারিতা নোট করেছিলেন ব্লেয়ারের পররাষ্ট্র বিষয়ক প্রধান উপদেষ্টা ডেভিড ম্যানিং। বৈঠকে দুই নেতার আলাপে আরও একবার নিশ্চিত হওয়া গেছে, ইরাকে ব্যাপক গণবিধ্বংসী অস্ত্র বা অপ্রচলিত কোনো অস্ত্রের সন্ধান পাওয়া যায়নি। তারপরও বুশ ব্লেয়ারকে জানিয়ে দিলেন মার্চেই বাগদাদে বিমান হামলা শুরু হবে। প্রয়োজনে জাতিসংঘকে উপেক্ষা করেই হামলা চালাতে চান বুশ। তারপরও ভবিষ্যতের আইনি জটিলতা মোকাবেলা এবং যুদ্ধের পক্ষে বিশ্ব জনমত গড়তে কিছু অভিনব বিকল্প উত্থাপন করেছিলেন

BanglaBook.org

বুশ। যার একটি হলো যুক্তরাষ্ট্রের একটি গোয়েন্দা বিমানকে (ইউ-টু) জাতিসংঘের সাদা রঙে রাঙিয়ে ইরাকের ওপর দিয়ে উড়িয়ে নেওয়া হবে। সাদ্দামের সেনাবাহিনী যদি বিমানটিতে গুলি করে বসে তাহলে ইরাকে হামলার একটি উপলক্ষ্য পাওয়া যাবে। প্রসঙ্গত: তখন বিদেশি বিমানের জন্য ইরাকের আকাশকে নো ফ্লাই জোন ঘোষণা করেছিলেন সাদ্দাম হোসেন। ব্লেয়ারকে আরও দুটি বিকল্প জানালেন বুশ। ইরাকের কথিত গণবিধ্বংসী অস্ত্র নিয়ে সাদ্দামকে আলোচনার প্রস্তাব দেওয়া যেতে পারে। সম্ভাব্য ওই আলোচনার কোনো একটি খুঁত ধরে হামলার উপলক্ষ্য পাওয়া যেতে পারে। সবশেষ বিকল্পটি হলো, সাদ্দামকে গুপ্ত হত্যার চেষ্টা করা। এ সময় ব্লেয়ার প্রেসিডেন্ট বুশকে নিঃশর্তভাবে আশ্বস্ত করেছিলেন যে যুক্তরাষ্ট্রের এই লড়াইয়ে তিনি বুশের সাথে আছেন। অথচ হোয়াইট হাউসে এই বৈঠকের একমাস পর ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৩ সালে হাউস অব কমন্সে দাঁড়িয়ে মিথ্যে বলেছিলেন ব্লেয়ার। তিনি বলেছেন: 'Even now, we are prepared to go the extra step to achieve disarmament peacefully.' অর্থাৎ কথিত গণবিধ্বংসী অস্ত্র থেকে সাদ্দামকে নিরস্ত্র করতে তারা সর্বশেষ পদক্ষেপ নিতে যাচ্ছেন। যা হবে শান্তিপূর্ণ। The New York Times, March 2006.

BanglaBook.org

ইরাক ইস্যুতে বুশ-ব্লেয়ারের ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদে লন্ডনে যুদ্ধ বিরোধী র‍্যালিতে যোগ দেয় অন্তত ২০ লাখ মানুষ

মার্চ ২০০৩ সালে যুদ্ধের আগ মুহূর্তে পার্লামেন্টের অনুমোদন প্রশ্নে উদ্বিগ্ন ছিল ব্লেয়ার প্রশাসন। যার প্রমাণ পাওয়া যায় আরও একটি নথিতে। ব্রিটিশ পররাষ্ট্র দপ্তরের রাজনৈতিক বিষয়ক পরিচালক পিটার রিকেটস, পররাষ্ট্রমন্ত্রী

জ্যাক স্ট্রকে লেখা এক মেমোতে বলেছেন, 'যুদ্ধের পক্ষে জনমত এবং পার্লামেন্টের অনুমোদনের জন্য আমাদের এই বলে আশ্বস্ত করতে হবে, ইরাক বিশ্বশান্তির জন্য এতটাই হুমকি যে, সেখানে আমাদের সেনা না পাঠানোটাই বরং বাজে কাজ হবে।' এসব তৎপরতার পরই ব্লেয়ার সরকার ইরাক যুদ্ধ পূর্ব একটি গোয়েন্দা রিপোর্ট প্রকাশ করে। যাতে বলা হয়েছে, 'মাত্র ৪৫ মিনিটের নোটিসে ইরাক সরকার ব্যাপক গণবিধ্বংসী রাসায়নিক অথবা জীবাণু অস্ত্রের হামলা চালাতে সক্ষম।' ব্রিটেনের কথিত এই গোয়েন্দা রিপোর্ট ব্যাপকভাবে গণমাধ্যমে প্রচার করা হয়। আর এই মিথ্যা রিপোর্টকে ভিত্তি করেই যুদ্ধে জড়ানোর বিষয়ে ১৮ মার্চ হাউস অব কমন্সের অনুমোদন আদায় করে নেন ব্লেয়ার। বলাবাহুল্য ব্লেয়ার প্রশাসনের এই '৪৫ মিনিট তত্ত্ব'র পুরোটাই ছিল মিথ্যা এবং জাতির সঙ্গে প্রতারণা। যা পরে প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু হাউস অব কমন্সে দাঁড়িয়ে জাতির সাথে প্রতারণার দায়ে ব্লেয়ারকে কখনও কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়নি। যেমনটা বুশকেও নিতে হয়নি কংগ্রেসকে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়ার দায়। তবে ইরাকে অন্যায় যুদ্ধের বিরুদ্ধে রাজপথে প্রতিবাদ জানিয়ে ব্লেয়ারকে 'না' বলেছিলেন লন্ডনের অন্তত ২০ লাখ মানুষ। ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৩ সালে ইরাক নিয়ে বুশ ব্লেয়ারের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে মার্চের ওই যুদ্ধ বিরোধী র‍্যালি আজও আগ্রাসনের বিরুদ্ধে বিশ্বের সচেতন মানুষের গণরায় হিসেবে ইতিহাসে জায়গা করে আছে। দ্বিতীয় দফা নির্বাচনে ভোট চাইতে গিয়ে এক তরুণীর কাছে অপমানিত হতে হয়েছে ব্লেয়ারকে। দৃশ্যটি আজও অনেক টিভি দর্শকের মনে থাকবার কথা। করমর্দনের জন্যে ওই তরুণীর দিকে হাসিমুখে হাত বাড়িয়েছিলেন ব্লেয়ার। তরুণীটি জবাব দিয়েছে: 'আপনার হাতে ইরাকের লাখো মানুষের রক্ত। কোনো খুনির সাথে আমি হাত মিলাই না'। পরিহাস: সেই ব্লেয়ার আজ মধ্যপ্রাচ্য শান্তির বিশেষ দূত।

ইরাক যুদ্ধ নিয়ে বুশ ব্লেয়ারের নীতিহীন পদক্ষেপ আর মিথ্যার ইতিহাস নিয়ে একটি বই প্রকাশ করেছিল ব্রিটিশ আইনজীবী ও মানবাধিকার কর্মী ফিলিপ স্যান্ডস। Lawless World নামের ওই বইয়ে তিনি তুলে ধরেছেন কিভাবে ধারাবাহিক ষড়যন্ত্রের মধ্য দিয়ে সকল আন্তর্জাতিক আইন উপেক্ষা করে একেকটি অন্যায় যুদ্ধের মধ্য দিয়ে মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধকে উস্কে দিয়ে আসছে যুক্তরাষ্ট্রসহ বিশ্বের ক্ষমতাধর দেশগুলোর নেতারা। হোয়াইট হাউসে বুশ ব্লেয়ারের 'ক্লাসিফায়েড' বৈঠকের প্রসঙ্গটিও এই বইয়ে উঠে এসেছে। ২০০৫ সালের শেষ দিকে বইটি প্রকাশের পর ইরাক যুদ্ধ নিয়ে ইঙ্গ-মার্কিন প্রশাসনের ষড়যন্ত্র আর আন্তর্জাতিক আইন ভঙ্গের অনেক অজানা অধ্যায় বিশ্ববাসীর সামনে পষ্ট করে দেন ফিলিপ স্যান্ডস। যথারীতি বইটি

BanglaBook.org

প্রকাশের পর বুশ ব্লেয়ারের 'ক্লাসিফায়েড' বৈঠক নিয়ে কোনো মন্তব্য করতে রাজি হয়নি ডাউনিং স্ট্রিট কিংবা হোয়াইট হাউস।

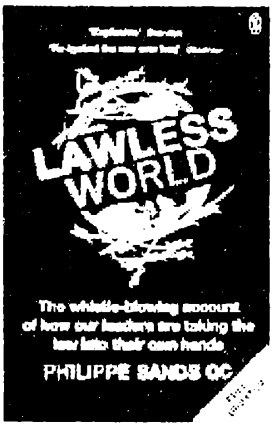

মানবাধিকার আইনজীবী ফিলিপ স্যান্ডস ও তার আলোচিত বই Lawless World

১৬ মার্চ ২০০৩ সালে ইরাকে থাকা জাতিসংঘের অস্ত্র পরিদর্শকদের তাদের কাজ অসমাপ্ত রেখেই বাগদাদ থেকে ফিরে আসতে একরকম বাধ্য করেছিল বুশ প্রশাসন। অথচ ইরাকের হাতে গণবিধ্বংসী অস্ত্র আছে যুক্তরাষ্ট্রের এমন চাপের মুখেই নিরাপত্তা পরিষদের মাধ্যমে তাদের বাগদাদে পাঠানো হয়েছিল। জাতিসংঘের অস্ত্র পরিদর্শক দলকে সাধ্যমতো সহযোগিতাও করছিল ইরাক সরকার। জাতিসংঘের দাবি মেনে ইরাকের অস্ত্র সক্ষমতা বিষয়ে ১২ হাজার পৃষ্ঠার একটি রিপোর্টও হস্তান্তর করেছিলেন সাদ্দাম হোসেন। কিন্তু জাতিসংঘের অস্ত্র পরিদর্শকদের কাছ থেকে যুক্তরাষ্ট্র তাদের কাঙ্খিত রিপোর্ট পাবে না এমনটা টের পেয়েই কি অস্ত্র পরিদর্শকদের বাগদাদ ছাড়তে বাধ্য করা হলো?

ইরাকে জাতিসংঘের অস্ত্র পরিদর্শক হ্যান্স ব্লিক্স এবং গণবিধ্বংসী অস্ত্র খোঁজার অভিজ্ঞতা নিয়ে তাঁর বই

BanglaBook.org

ইরাকের অপ্রচলিত অস্ত্র অর্থাৎ ব্যাপক গণবিধ্বংসী অস্ত্র অনুসন্ধানের অভিজ্ঞতা নিয়ে একটি বই লিখেছিলেন জাতিসংঘ অস্ত্র পরিদর্শক দলের প্রধান হ্যান্স ব্লিক্স। 'ডিজআর্মিং ইরাক' নামের ওই বইয়ে সাবেক সুইডিস কূটনীতিক ব্লিক্স বলেছেন, কোনো তথ্য প্রমাণ না থাকা সত্ত্বেও প্রেসিডেন্ট বুশ অনেকটা গোঁড়াভাবেই বিশ্বাস করতেন সাদ্দামের হাতে অপ্রচলিত কোনো বিধ্বংসী অস্ত্র আছে। প্রেসিডেন্টের এই বিশ্বাসকে কখনই জোরালোভাবে ভাঙার চেষ্টা করেননি ডিক চেনি, রামসফেল্ড কিংবা কলিন পাওয়েলের মতো কর্মকর্তারা। এমনকি সত্যাসত্য যাচাইয়ের লক্ষ্যে আন্তরিকভাবে তারা প্রশাসনিক কোনো উদ্যোগও গ্রহণ করেননি। ব্লিক্স বলছেন, এ বিষয়ে ব্রিটিশ মার্কিন গোয়েন্দা তৎপরতাও ছিল যথেষ্ট দুর্বল। পর্দার আড়ালে গোয়েন্দাদের নীরব যুদ্ধের চাইতে বুশ ব্লেয়ারের প্রশাসন বরং গণমাধ্যমে ইরাক ইস্যুতে উস্কানি সংক্রান্ত কাভারেজ নিয়েই বেশি তৎপর ছিলেন। এই কূটনীতিক গভীরভাবে উপলব্ধি করেছেন তিনি এবং তার দল যখন 'ইরাকের সন্দেহজনক অস্ত্র ভাণ্ডার' নিয়ে আন্তরিক অনুসন্ধানের মধ্য দিয়ে বিশ্বকে একটি ফলাফল দেওয়ার চেষ্টা করছেন, তখন বুশ প্রশাসনের মনোভাব ছিল এরকম: 'ফলাফল আমরা জানি। আপনারা আমাদের এমন কিছু তথ্য দিন যা আমাদের ফলাফলকে সমর্থন করবে।'

এমন কিছু তথ্য বলতে বুশ প্রশাসন চাইছিল, জাতিসংঘ অস্ত্র পরিদর্শকরা বলুক যে, 'সাদ্দাম হোসেনের অস্ত্র ভাণ্ডারে স্থানান্তরযোগ্য বায়ো-ল্যাবোরেটরি, সেন্ট্রিফিউজের কাজে ব্যবহারযোগ্য অ্যালুমিনিয়াম পাইপ এবং হলুদ ইউরেনিয়াম কেইক পাওয়া গেছে।' মোদ্দাকথা হলো বুশ প্রশাসন জাতিসংঘ অস্ত্র পরিদর্শকদের কাছ থেকে তাদের মর্জি মাফিক ফলাফল চাইছিলেন। কিন্তু জাঁদরেল কূটনীতিক হ্যান্স ব্লিক্স বুশ প্রশাসনের সেই ফাঁদে পা দেননি। কারণ এমনিতেই আন্তর্জাতিক ন্যায়নীতি মানতে যুক্তরাষ্ট্রকে বাধ্য করতে না পারার নৈতিক দায় বর্তেছিল জাতিসংঘের ঘাড়ে। মার্কিন বিরোধী জোরালো কোনো পদক্ষেপ নিতে ব্যর্থ হলেও ৭ মার্চ ২০০৩ সালে হ্যান্স ব্লিক্স এবং আন্তর্জাতিক আণবিক শক্তি কমিশনের প্রধান এল বারাদি জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে দেওয়া অন্তবর্তী রিপোর্টে ইরাকের সহযোগিতামূলক মনোভাবের প্রশংসা করেছিলেন। বলা বাহুল্য অস্ত্র পরিদর্শকদের সেই বার্তা বুশ প্রশাসনের পছন্দ হয়নি। এমনকি হ্যান্স ব্লিক্স ও এল বারাদি'র পেছনে গোয়েন্দা লাগিয়ে তাদেরকে অদৃশ্য চাপের মুখে ফেলার চেষ্টা হয়েছে। ব্লিক্স উল্লেখ করেছেন, এটা ঠিক যে ৯০'র দশকে অপ্রচলিত অস্ত্রের একটি ভাণ্ডার গড়ে তুলেছিলেন সাদ্দাম হোসেন। আর সেটা তিনি করেছেন সম্ভবত শিয়া ও কুর্দীদের চাপে

BanglaBook.org

রাখতে। ৮০'র দশকে ইরাকের হালাবজা হত্যাকাণ্ডে রাসায়নিক অস্ত্রের প্রয়োগ ঘটিয়ে পাঁচ হাজার কুর্দী হত্যার দায় থেকেও মুক্ত নন সাদ্দাম হোসেন। কিন্তু ১৯৯১ সালেই সেইসব অস্ত্রের একটি বড় মজুত ধ্বংস করেছিলেন এই ইরাকি নেতা। ৯৫ সালে সাদ্দামের মেয়ে জামাই হোসেইন কামাল অপ্রচলিত অস্ত্রের মজুত ধ্বংসের সত্যতা স্বীকার করেছিলেন। ব্লিক্সের উপলব্ধি ছিল ইরাক ও সাদ্দাম হোসেনের জন্য দুর্ভাগ্য যে তাঁরা বিশ্বকে প্রশ্নহীনভাবে এটা বোঝাতে ব্যর্থ হয়েছেন যে, তাদের হাতে অপ্রচলিত তথা গণবিধ্বংসী অস্ত্রের কোনো ভাণ্ডার নেই। বিপরীত দিকে পশ্চিমা গণমাধ্যমকে ব্যবহার করে বরং উল্টো ফায়দাটাই তুলে নিয়েছিল বুশ ব্লেয়ার প্রশাসন।

মার্কিন কংগ্রেসের ডেমোক্র্যাট সদস্যদের আপত্তি, জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ এমনকি নিরাপত্তা পরিষদের অসমর্থন, মানবাধিকার কর্মীসহ বিশ্বজুড়ে যুদ্ধবিরোধী লাখো মানুষের বিক্ষোভ আর ইরাকের কোটি মানুষের উদ্বেগ উৎকণ্ঠা সবকিছু উপেক্ষা করে, ২০০৩ সালের ১৯ মার্চ জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে 'ইরাকের বিরুদ্ধে সামরিক পদক্ষেপ' ঘোষণা করলেন প্রেসিডেন্ট বুশ। লক্ষ্য করুন 'ওয়ার' বা যুদ্ধ নয় 'মিলিটারি অ্যাকশান'। সরকারি কাগজপত্রে কোথাও কোথাও 'ইনভেশান বা আক্রমণ' কথাটিও উল্লেখ করা হয়েছে। শব্দগুলোর মধ্যেই এক ধরনের মোড়লিপনা এবং অভিভাবক সুলভ চাতুরতা রয়েছে। যা এসেছে 'নিও কনজারভেটিভ থিংক ট্যাংকদের' 'আমেরিকান লিডারশিপ' অর্জনের সুদূর প্রসারি পরিকল্পনা থেকে। ইরাক যুদ্ধের দুটি পর্যায়ের প্রথমটি ছিল কথিত ইনভেশান বা আক্রমণের মধ্য দিয়ে 'মানবতাবিরোধী এবং যুক্তরাষ্ট্রের জন্য হুমকি' সাদ্দাম হোসেনকে উৎখাত করা।

বাগদাদের ৫০ লাখ মানুষের জন্যে পরদিন ২০ মার্চের সূর্যোদয়টা ছিল আতঙ্ক আর উৎকণ্ঠার। আগের দিন বুশের যুদ্ধের ক্ষণ ঘোষণার পর থেকেই অজানা আশঙ্কায় একেকটা মুহূর্ত পার করছিল নগরবাসি। এই বুঝি হামলা শুরু হলো। এই বুঝি বোমা হামলার সতর্ক সাইরেন বেজে উঠল। সেদিন দিনভর টেলিভিশনে সাদ্দাম হোসেনের হাসিমুখ। রাজপথে বালির বস্তা ফেলে বাঙ্কার করা হচ্ছে। মেশিনগান বসানো হচ্ছে। কোথাও কোথাও ট্যাঙ্ক নেমেছে। সাঁজোয়া বহর দাপিয়ে বেড়াচ্ছে বাগদাদের ফেরদৌস স্কয়ার। সেনাদের উদ্দীপ্ত করতে হাসিমুখে বাগদাদের বিভিন্ন সেনাঘাঁটি পরিদর্শন করছেন সাদ্দাম। তবে সাদ্দামের হাসিমুখ নগরবাসিকে স্বস্তি দিতে পারছে না। পাড়া মহল্লা হাটবাজার আর রেস্তোরার টেলিভিশনে আল জাজিরা অ্যারাবিক চলছে। টিভি স্ক্রিনে নজর লাখো মানুষের। রাতেই কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে।

BanglaBook.org

কিন্তু কতটা ঘটবে সেটাই যেন আগাম জানতে চাইছে উদ্বিগ্ন মানুষ। সামনে অনিশ্চিত ভবিষ্যত। আতঙ্কিত মানুষ সাধ্যমতো খাবার মজুত করতে শুরু করেছে। একদিনেই বাজার থেকে উধাও হয়ে গেছে নিত্যপণ্য। পেট্রোল পাম্পে গাড়ির দীর্ঘ লাইন। অনেকে বাগদাদ ছেড়ে পরিবার পরিজন নিয়ে দূরের নিরাপদকে বেছে নিচ্ছেন। সন্ধ্যার পর বাগদাদ জুড়ে ভূতুড়ে নীরবতা। সন্ধ্যার আগেই ঘরে ফিরেছে মানুষ। শহরজুড়ে যেন অঘোষিত কারফিউ। রাতে জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে সাদ্দাম বললেন 'যুক্তরাষ্ট্রের এই হামলা ইরাক ও পুরো মানবতার জন্যেই লজ্জাজনক অপরাধ।'

২০ মার্চ মধ্যরাতে বাগদাদের অন্তত এক হাজারটি লক্ষ্যবস্তুতে হামলা চালায় যুক্তরাষ্ট্র

সেই লজ্জাজনক অপরাধটাই শুরু হলো মধ্যরাতে। কুয়েতসহ ইরাকের বিভিন্ন সীমান্তে অবস্থান নিয়েছে যৌথ বাহিনীর এক লাখ বিশ হাজারেরও বেশি সেনা–অত্যাধুনিক সাঁজোয়া আর বিভিন্ন প্রজন্মের ট্যাংক বহর। সবুজ সঙ্কেত পেলেই হাজারো ব্ল্যাকহক, অ্যাপাচি আর চিনুক হেলিকপ্টার নিয়ে ইরাক অভিমুখে অভিযান শুরু করবে সেনারা। তার আগে শুরু হবে এয়ার অ্যাটাক। স্থানীয় সময় রাত দেড়টার পর একসাথে বেজে উঠল বাগদাদের অনেকগুলো সতর্কতা সাইরেন। শুরু হলো 'অপারেশন ইরাক ফ্রিডম'। তবে স্বাধীনতা কিংবা মুক্তির সুবাতাস নয়, একের পর এক বোমা আর মিসাইল হামলায় কেঁপে উঠল বাগদাদ। দজলা নদীর (টাইগ্রিস) তীরে সাদ্দামের প্রাসাদ থেকে শুরু করে সরকারি ভবন, মন্ত্রণালয়, রিপাবলিকান গার্ডের সদরদপ্তর, বেছে বেছে গুরুত্বপূর্ণ সব স্থাপনায় হামলা চালানো হয়েছে। মাত্র কয়েক ঘণ্টার হামলায় গুড়িয়ে গেছে বাগদাদের হাজার হাজার ভবন। সাদ্দামও তার দুই ছেলে উদে-কুষে এবং উর্ধ্বতন সেনা কর্মকর্তাদের হত্যা করতে সাদ্দামের প্রাসাদসহ সম্ভাব্য সবগুলো লক্ষ্যবস্তু গুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। কোনো কোনো গণমাধ্যমে খবর ছড়িয়ে পড়েছে সাদ্দাম সম্ভবত আর বেঁচে নেই। তবে

BanglaBook.org

ইরাকের রাষ্ট্রিয় বেতারে শোনা গেল উদে'র গলা। তিনি বলছিলেন, 'হে আল্লাহ দখলদার শত্রুদের হাত থেকে আমাদের রক্ষা করো।' প্রায় একই সময়ে টেলিভিশনে জাতির মুখোমুখি প্রেসিডেন্ট বুশ: 'প্রিয় দেশবাসি সাদ্দাম হোসেনকে নিরস্ত্র করে দেশটির মানুষকে মুক্ত করতে এবং বিশ্বকে মৃত্যুসম হুমকি থেকে নিরাপদ রাখতে, এই মুহূর্তে আমরা সেনা অভিযানের প্রথম পর্যায়ে রয়েছি।'

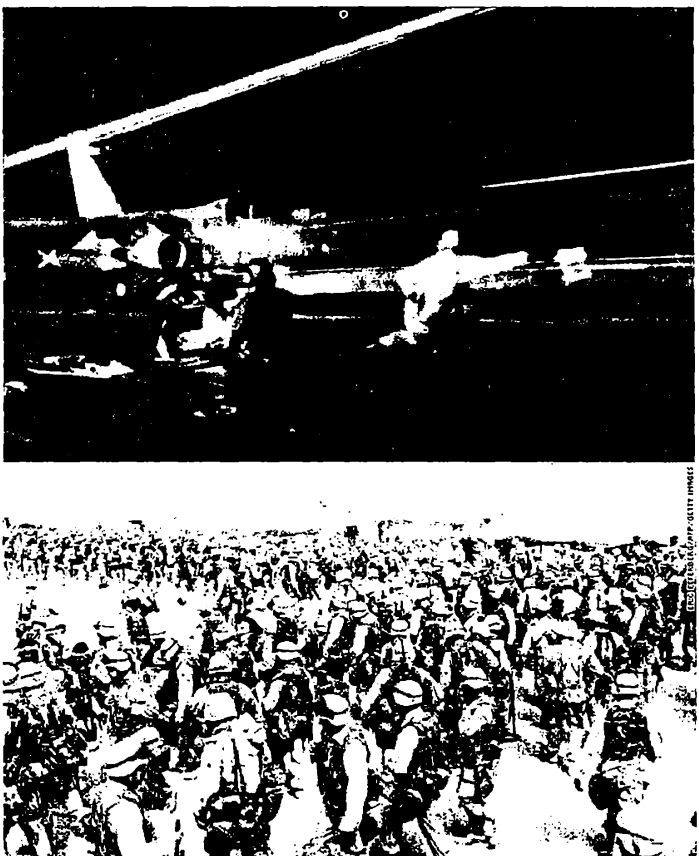

মার্কিন রণতরী ইউএসএস কিটি হক থেকে ছুটে যাচ্ছে বোমারুবিমান। কুয়েত সীমান্তে বহুজাতিক বাহিনীর অবস্থান

সেই মুহূর্তে উপসাগর আর লোহিত সাগরের বুকে রাতের অন্ধকার ভেদ করে যেন আগুনের ফুলকি ফুটছে। দুই সাগরে অবস্থান নেওয়া ব্রিটিশ রয়াল নেভি সাবমেরিন এবং দুই মার্কিন রণতরী ইউএসএস আব্রাহাম লিংকন ও ইউএসএস কিটি হক থেকে শত শত জঙ্গি বিমান বাগদাদের আকাশ কাঁপিয়ে

আবারো ফিরে আসছে রণতরীতে। সিবিএস নিউজের সাংবাদিক Cynthia Bowers ছিলেন মার্কিন রণতরী আব্রাহাম লিংকনে। সিনথিয়া বলছিলেন, সাগরের বুকে ভেসে থাকা আব্রাহাম লিংকন যেন সে রাতে পৃথিবীর ব্যস্ততম এক বিমান বন্দরের চেহারা পেয়েছে। ৫ শো থেকে ২ হাজার পাউন্ডের বোমা আর টমাহক ক্রুজ মিসাইল নিয়ে ছুটে যাচ্ছে শত শত এফ ফরটিন আর এফ এইটিন জঙ্গি বিমান। মিসাইল ক্যারিয়ারগুলো শূন্য করে একেকটি বিমান যখন ফিরে আসছে তখন উল্লাসে হাত তালিতে ফেটে পড়ছে গোটা রণতরী। সে যেন এক উৎসব মুখর পরিবেশ।

আর বাগদাদ? সিবিএস প্রতিনিধি সিনথিয়া যদি বাগদাদে থাকতেন তিনি কি বলতেন, সে রাতে বোমারু বিমানগুলোর ফেলে যাওয়া হাজার হাজার মিসাইল আর বোমা বিস্ফোরণের গগন বিদারি শব্দের আড়ালে চাপা পড়েছিল হাজারো নারী শিশুর আর্ত চিৎকার? মাশরুমের মতো সাদা কালো ধোঁয়ায় ঢাকা পড়েছিল বাগদাদ। ইউরেনিয়াম বোমা, সাদা ফসফরাস বোমা আর ক্লাস্টার বা গুচ্ছ বোমার আঘাতে বাগদাদের প্রজ্বলিত (আধুনিক সমরবিদ্যার ভাষায় এগুলোই প্রকৃত ব্যাপক গণবিধ্বংসী) এবং নিষিদ্ধ অস্ত্র। জেনেভা কনভেনশান অনুযায়ী বেসামরিক এলাকায় এসব অস্ত্রের ব্যবহার যুদ্ধাপরাধ) দিগন্তের দিকে আঙুল তুলে আর চোখের জল লুকিয়ে আল জাজিরা অ্যারাবিকের প্রতিনিধি বলছিলেন, 'বাগদাদ পুড়ছে, কি বলব-কিই বা আর বলার আছে'!

BanglaBook.org

বাগদাদের আকাশ ভোরের কালো ধোঁয়ায় ঢাকা ছিল

পেন্টাগন বাগদাদের সেই হামলার নাম দিয়েছিল Shock and awe . অর্থাৎ অতি দ্রুত আকস্মিক হামলার মধ্য দিয়ে শত্রু পক্ষকে দিকভ্রষ্ট ও

দ্বিধান্বিত করা। শব্দটি এসেছে Military doctrine বা সামরিক তত্ত্ব থেকে। রণাঙ্গনে অবতীর্ণ না হয়েও বিমান হামলা অথবা নিরাপদ দূরত্ব থেকে দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র হামলার মধ্যদিয়ে শত্রুপক্ষের অবকাঠামো এবং সবরকম যোগাযোগ ও উৎপাদন ব্যবস্থা গুড়িয়ে দিয়ে ইরাকের মানুষদের শারীরিক মানসিক আর সম্পূর্ণ মনোবল ভেঙে দেওয়াই ছিল এই হামলার উদ্দেশ্য।

হতাহত মানুষে ভরে উঠেছিল হাসপাতাল

একই উদ্দেশ্য ছিল নাৎসীদেরও। স্পেনে তখন রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধ। বাস্ক প্রদেশের বিদ্রোহীদের দমন করতে ১৯৩৭ সালের ২৬ এপ্রিল প্রদেশটির গোয়ের্নিকা শহরে বিমান হামলা চালায় জার্মানি ও ইতালির যৌথ বাহিনী। বৃষ্টির মতো বোমা ফেলে মাটির সাথে মিশিয়ে দেওয়া হয় পুরো গোয়ের্নিকা। হত্যা করা হয় অন্তত ১৭ শো মানুষকে। মৃত্যুর এই বিভীষিকায় সেদিন শোক করার মানুষটিও বেঁচে ছিল না গোয়ের্নিকায়। 'গোয়ের্নিকা' হত্যাযজ্ঞ দিয়ে পুরো স্পেনের কোটি মানুষের শারীরিক মানসিক আর মনের সমস্ত বল ভেঙ্গে দিয়েছিল নাৎসীরা। যেমনটা ইরাক ভেঙে দিয়েছে পুরো মধ্যপ্রাচ্যের মনোবল। গুড়িয়ে দিয়েছে কৃষ্টি সংস্কৃতি রাজনীতি আর সমস্ত স্বকীয়তা। ইতিহাসের পাতায় সযত্নে তোলা থাকা 'গোয়ের্নিকা' আজও মানবতার বিরুদ্ধে ব্যাপক বিধ্বংসী সমস্ত হামলা আর আগ্রাসনের সমার্থক হয়ে আছে। সেই হত্যাযজ্ঞ নিয়ে শিল্পী পিকাসো'র বিখ্যাত শিল্পকর্ম 'গোয়ের্নিকা' আজও পৃথিবীর তাবত গণহত্যার বিরুদ্ধে এক প্রতীকি প্রতিবাদ।

BanglaBook.org

১৯৩৭ সালে স্পেনের গোয়ের্নিকা আর ২০০৩ সালে ইরাকের বাগদাদ

১৯৩৭ আর ২০০৩ সালের মধ্যে পার্থক্য একটাই—প্রযুক্তি। নতুন শতকের জিপিএস সিস্টেম আর লেজার গাইডেড মিসাইলগুলো আরও বিধ্বংসী শক্তি নিয়ে বাগদাদের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য বস্তুতেই আঘাত হেনেছে। মাটির সাথে মিশে গেছে হাজার হাজার ভবন। হামলার প্রথম ধাক্কায় দিকভ্রষ্ট আর পক্ষাঘাতগ্রস্তের মতোই ছিল সাদ্দামের সেনাবাহিনী। বাগদাদের রাজপথ আর গুরুত্বপূর্ণ কিছু স্থাপনা ঘিরে বাঙ্কার গড়া ছাড়া সেনাদের যুদ্ধের তেমন কোনো প্রস্তুতি ছিল না। প্রতিরোধ গড়ার জন্য সেদিন কোনো শত্রু খুঁজে পায়নি তারা। মার্কিন নেতৃত্বাধীন যৌথ বাহিনীর জঙ্গি বিমানগুলো ছিল ইরাকি সেনাবাহিনীর নিশানার অনেক বাইরে। যুদ্ধের আগে ইরাকি বাহিনীর বিপুল সংখ্যক স্কাড মিসাইল থাকার কথা শোনা গেলেও সেগুলোর দেখা পাওয়া যায়নি। কুয়েত

BanglaBook.org

সীমান্তের কাছে উম্ম কসরের একটি সেনাঘাঁটিতে কিছু স্কাড মিসাইলের উপস্থিতি থাকলেও হামলার প্রথম ধাক্কাতেই সেগুলোর দখল নেয় ব্রিটিশ সেনারা। সব মিলে যুদ্ধের আগেই যেন হেরে বসেছিল ইরাকি বাহিনী। আর Shock and awe 'র নির্মম ধ্বংসলীলার মধ্য দিয়ে প্রেসিডেন্টে বুশ কট্টর আমেরিকান ভোটারদের এই বার্তাই দিলেন যে, নাইন-ইলাভেনের নির্মম ধ্বংসযজ্ঞের জবাব তিনি বহুমাত্রিক ধ্বংসের মধ্য দিয়েই ফেরত দিয়েছেন।

সে রাতেই সংবাদ সম্মেলনে দাঁড়িয়ে বাহবা নিতে ভোলেননি প্রতিরক্ষামন্ত্রী রামসফেল্ড। তিনি বলছিলেন, 'বেসামরিক লক্ষ্যবস্তু এড়িয়ে সুনির্দিষ্ট সামরিক ও দাপ্তরিক লক্ষ্যবস্তুতেই আঘাত হানা হয়েছে।' রামসফেল্ডের এই বক্তব্য আংশিক সত্য। প্রথমরাতের হামলার মূললক্ষ্য ছিল সাদ্দাম সরকার সামরিক কৌশলগত সকল লক্ষ্যবস্তু। কিন্তু পরবর্তী দিনগুলোতে আক্ষরিক অর্থেই নতুন শতাব্দির 'গোয়ের্নিকা'র জ্বলন্ত উদাহারণ হয়ে উঠেছিল পুরো ইরাক। রামসফেল্ড যখন জোর গলায় দাবি করছেন তাদের অত্যাধুনিক জঙ্গি বিমানের লেজার গাইডেড বোমাগুলো বেসামরিক এলাকা এড়িয়ে 'সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যবস্তুতেই হামলা চালাচ্ছে' তখন ২২ মার্চ থেকে ২৮ মার্চ পর্যন্ত চালানো মার্কিন হামলার খতিয়ান বলছে, বাগাদাদের কাঁচা বাজার, শপিংমল, বেসামরিক বাড়িঘর, হাসপাতাল, মসজিদ, মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়, টেলিফোন এক্সচেঞ্জ, চলন্তবাস, এমনকি ফসলের মাঠ লক্ষ্য করে অন্তত সাতশ টমাহক মিসাইল এবং বিভিন্ন প্রজন্মের আটশ বোমা হামলা চালানো হয়েছে। চারদিনের উপর্যুপরি সেই হামলায় মারা গেছে ৪৫০ জন বেসামরিক ইরাকি।

BanglaBook.org

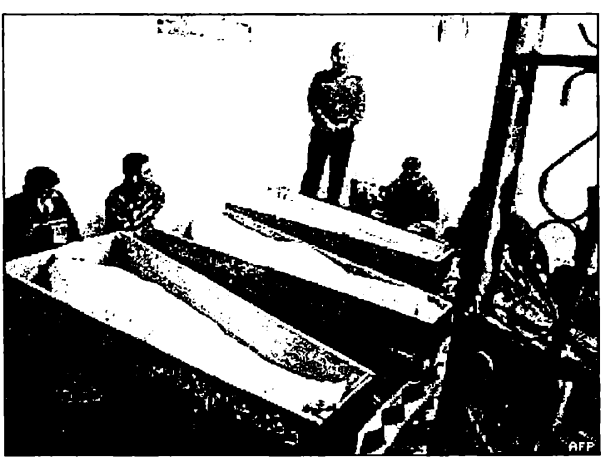

বাগদাদের আল শুলা এলাকায় নিহত একই পরিবারের তিন শিশুর কফিন

২৯ মার্চ শনিবার বাগদাদের আল শুলা এলাকার আল নাসের মার্কেটে বোমা হামলায় মারা গেছে অন্তত ৫০ জন। সেদিন বিবিসির সাংবাদিক রাগে ওমর বাগদাদে থেকে সরাসরি বলছিলেন, 'রাজধানীর উপকণ্ঠে শিয়া অধ্যুষিত এই দরিদ্র এলাকার বাজারে মার্কিন ক্রুজ মিসাইলের হামলা হয়েছে।' ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী স্থানীয় টিভি সাংবাদিক সালাম জাকি বলছিলেন, তিনি কেনাকাটার জন্য বাজারে ঢোকার সময়ই দেখছিলেন মাথার ওপর একটি মার্কিন জেট বিমান ওড়াওড়ি করছে। এর কয়েক মিনিটের মধ্যেই আকাশ কাঁপিয়ে বিস্ফোরণ এবং পুরো বাজারটি যেন মাটির সাথে মিশে গেছে। সন্ধ্যা ছয়টার এই হামলার কিছুক্ষণ পরই শুলা এলাকায় প্রবেশ করে মার্কিন সেনাবাহিনীর ৫২ কর্পস ব্রিগেড। তখনো আহতদের আর্ত চিৎকারে ভারি হয়েছিল আল নূর হাসপাতালের পরিবেশ। কারো দুই হাতই উড়ে গেছে, কারো পা নেই। কারো শরীরের অর্ধেক ঝলসে গেছে। হাসপাতালের একজন ডাক্তার বলছিলেন, হতাহতদের বেশিরভাগই ছিন্নভিন্ন পোড়া আর ঝলসানো দেহ নিয়ে হাসপাতালে এসেছে। মর্গের ট্রে খুলে ছয়টি শিশু আর তিনজন নারীর ছিন্নভিন্ন শরীর সাংবাদিকদের দেখাচ্ছিলেন ওই ডাক্তার।

BanglaBook.org

আল জানাবিয়ার খামার বাড়ি

সেদিনই বাগদাদের দক্ষিণাঞ্চলে ইসমাইলিয়া এলাকার আল জানাবিয়ায় ঘটে আরও একটি হৃদয় বিদারক হামলার ঘটনা। একটি খামার বাড়িতে মার্কিন বিমানের অত্যাধুনিক লেজার গাইডেড মিসাইলের হামলায় মারা যায় ১১ শিশু ও সাত নারীসহ ২০ জন বেসামরিক মানুষ। ফ্রান্সভিত্তিক বার্তাসংস্থা এএফফি প্রতিনিধির এই খবরে বলা হয়েছে, 'রক্তে ভেসে যাওয়া স্কুলের বই,

ছোট্ট শিশুর রক্তাক্ত মৃতদেহের পাশেই পড়েছিল গবাদি পশুগুলোর ছিন্নভিন্ন দেহ। পাশাপাশি তিনটি ভবনের দুটি মাটির সাথে মিশে গেছে। অন্যটি ধ্বংসপ্রায়। প্রত্যক্ষদর্শীরা বলছিলেন, শনিবার রাতে তিনটি বাড়ির ঘুমন্ত মানুষদের ওপর মার্কিন বিমান থেকে পর পর দুটি মিসাইল হামলা চালানো হয়। ১১ শিশুর সবার শরীর পুড়ে কয়লা হয়ে গেছে। একই পরিণতি চারটি গরু বেশ কটি ভেড়া দুটি কুকুর আর একপাল হাঁসমুরগিও'। (হতাহতদের শরীর ঝলসে যাওয়া, কিংবা পুড়ে কালো হয়ে যাওয়া নিষিদ্ধ ফসফরাস বোমা ব্যবহারের ইঙ্গিত দেয়। ভিয়েনা কনভেনশন অনুযায়ী বেসামরিক মানুষের ওপর এই বোমার ব্যবহার যুদ্ধাপরাধ)।

আল জাফরিয়া'র নিহত শিশুর মুখোমুখি নির্বাক মা

তিনটি বাড়ির বেঁচে থাকা একমাত্র মানুষটি বিস্মিত আতঙ্কিত বাকরুদ্ধ। নিহতদের দিকে আঙুল তুলে তিনি বলছিলেন, ওদের মৃত্যুই আমাকে বাঁচিয়ে দিয়েছে। কিন্তু এই বেঁচে থাকা তো আমি চাইনি।'

একই দিন বাগদাদের আল জাফরিয়া এলাকার আরও ছটি বেসামরিক বাড়ি ঘরে হামলা চালিয়ে ৬ জন শিশুকে হত্যা করে মার্কিন বাহিনী। ভেঙে পড়া বাড়ির ইটকাঠের জঞ্জালের সাথে যেন মিলেমিশে একাকার হয়েছিল ছোট্ট শিশুদের দেহ।

একদিন পর ৩০ মার্চ সকালে নাজাফের কাছে একটি গাড়ি বহরে হামলা চালায় মেরিন সেনারা। সেনাদের নির্দেশ মেনেই একটি সেতুর চেক পোস্টের কিছুটা দূরে থেমেছিল কয়েকটি ভ্যান আর একটি ল্যান্ডরোভার। মার্কিন বিমান

BanglaBook.org

হামলা থেকে প্রাণ বাঁচাতে দূরের কোথাও পাড়ি জমিয়েছে একটি পরিবার। এই তাণ্ডবের মধ্যেও যথাসাধ্য ভালো কাপড় চোপড় পরে সেজে গুজে একটি ভাড়া করা ল্যান্ডরোভারে চেপেছে একই পরিবারের ১২ জন মানুষ। এমন নয় যে নারী শিশু বোঝাই গাড়ির যাত্রীদের বোঝা যাচ্ছিল না বা সন্দেহজনক কিছু মনে হচ্ছিল। একটি হামভি সেনাযান থেকে সেই গাড়িতে উপর্যপুরি গুলি চালাল সেনারা। ঘটনাস্থলেই মারা গেল ১১ জন। যাদের আটজনই শিশু। নয় মাসের অন্তঃসত্ত্বা গৃহবধু লামিয়া হাসপাতালে বিলাপ করতে করতে টাইমসের সাংবাদিককে বলছিলেন, 'দেখুন আমার ফুলের মতো নিষ্পাপ দুই মেয়েকে দেখুন। ওদের মাথা যেন ঘাড় থেকে ছিঁড়ে বেরিয়ে আসছে।' চেকপয়েন্টের একজন কর্পোরাল বলছিলেন, অধঃস্তন সেনারা কমান্ড না মেনে কোনো সতর্কতামূলক ফাঁকা গুলি ছাড়াই গাড়িতে গুলি করে বসেছে। তবে এতগুলো মানুষের মৃত্যুতেও কোনো অনুতাপ নেই কর্পোরাল রায়ান ডুপারের। একটু আগেই এই চেকপয়েন্টে কোনো এক ছদ্মবেশী বেসামরিক লোকের মর্টার হামলায় এক মেরিন সেনা আহত হয়েছে। সেই ঘটনার রেশ টেনে কর্পোরাল রায়ান টাইমসকে বলছিলেন, 'ইরাকিরা অপদার্থ। আমরা হলাম ওদের ক্যামোথেরাপি। আমি রীতিমত এই দেশটাকে ঘৃণা করতে শুরু করেছি। একবার ওই সিভিলিয়ানকে পেয়ে নেই। আমি ওকে গুলি করে মারব। 'US Marines Turn Fire on Civilians at the Bridge of Death' The Times.March 2003'

টাইমসের সাংবাদিককে বলছিলেন, 'দেখুন আমার ফুলের মতো নিষ্পাপ দুই মেয়েকে দেখুন'

বাগদাদের সরকারি ভবন আর রামসফেল্ডের ভাষায় সাদ্দামের 'সুনির্দিষ্ট সব লক্ষ্যবস্তু' যখন বিলীন তখনও দিনে দিনে লম্বা হতে থাকল 'ঘৃণিত' ইরাকি 'সিভিলিয়ান'দের মৃত্যুর তালিকা। যতদিন গড়াল ততই আরও রক্তস্নাত হলো ইরাক।

ক্লাস্টার বোমায় দুই ভাগ হয়ে যাওয়া ছোট্ট শিশুটির মুখে তখনও ঝুলে ছিল দুধের নিপল। রক্তাক্ত আরেক শিশু

এপ্রিলের প্রথম দিনেই মার্কিন বোমা কেড়ে নিল অন্তত ৮২ জন বেসামরিক মানুষের প্রাণ। দ্বিতীয় দিন ৪৪ জন। তৃতীয় দিন বাগদাদে বিমান হামলা কেড়ে নিল আরও ২৭ জনের প্রাণ। একই দিন হিল্লা শহরের প্রত্নতাত্ত্বিক এলাকা ব্যাবিলনে ব্রিটিশ মার্কিন সেনাদের যৌথ হামলা থেকে ছোঁড়া নিষিদ্ধ ক্লাস্টার বা গুচ্ছবোমা (বেসামরিক এলাকায় এই বোমার ব্যবহার যুদ্ধাপরাধ। এতে ছোট ছোট অসংখ্য ক্যানিস্টার থাকে। যা দীর্ঘদিন পর্যন্ত অবিস্ফোরিত থেকে মাইনের মতো বিধ্বংসী হয়ে ওঠে) বিস্ফোরণে মারা যায় অন্তত ৬০ জন। একসাথে নিজের পরিবারের ১৫ জনকে হারিয়েছেন হামিদা আবেদ।

BanglaBook.org

মার্কিন ক্লাস্টার বোমায় গুড়িয়ে গেছে তাদের বাড়িটা। বোমার আঘাতে বাড়ির ছোট্ট শিশুর তুলতুলে নরম দেহটা দুই ভাগ হয়ে গেছে। আহত শিশুদের কারো হাত নেই কারো পা নেই। বোমার আঘাতে উড়ে গেছে ২১ বছরের খালিদের একটি পা। তার বাবা হামিদ বলছিলেন, 'চারদিক থেকে যেন উত্তপ্ত লোহার টুকরো এসে মানুষের ওপর পড়ছিল। বিশ্বাস করুন সাধারণ মানুষ ছাড়া সেখানে আর কেউ ছিল না। কোনো ইরাকি সেনা থাকারতো প্রশ্নই আসে না। তারপরও আমাদের বাড়িঘরে হামলা হলো। আপনার দেশের মানুষদের দেখতে বলুন এখানে কী হচ্ছে। বুশ ব্লেয়ার দেখুন কিভাবে আমাদের নিরপরাধ মানুষদের রক্ত ঝরছে।' এই ঘটনার একটি ২১ মিনিটের ভিডিও ধারণ করেছেন সাংবাদিকরা। কোনো সুস্থ মানুষের পক্ষে সেই ভিডিও দেখা সম্ভব নয়। বলছিলেন ইন্ডিপেন্ডেন্টের সাংবাদিক রবার্ট ফিস্ক। Robert Fisk and Justin Huggler. The Independent, April 2003. ২১ মার্চ থেকে ৪ এপ্রিল পর্যন্ত মাত্র ১৪ দিনে ইরাক জুড়ে এক হাজার দুশো বায়ান্ন জন বেসামরিক মানুষকে হত্যা করেছিল ব্রিটিশ-মার্কিন যৌথবাহিনী।

BanglaBook.org

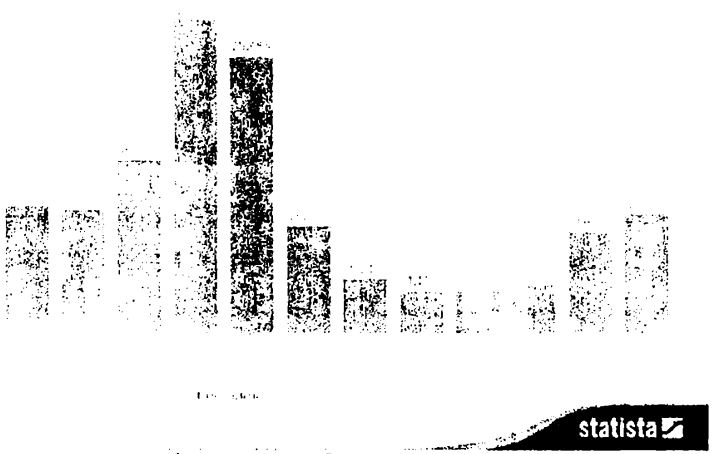

২০০৩-২০১৪ পর্যন্ত ইরাক যুদ্ধে নিহত মানুষের পরিসংখ্যান।
সূত্রঃ ইরাক বডি কাউন্ট

ইরাক যুদ্ধে হতাহত মানুষদের প্রকৃত সংখ্যাটা হয়তো কখনও জানা যাবে না। ব্রিটিশভিত্তিক সংস্থা ইরাক বডি কাউন্টের পরিসংখ্যান আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত। তবে এটিও যথেষ্ট নয়। কারণ নিহত ইরাকিদের প্রাপ্ত মরদেহের সংখ্যা অনুসরণ করে এই পরিসংখ্যান করা হয়েছে। কিন্তু মার্কিন

দখলদারিত্বের এক দশকে ইরাক জুড়ে এমন অসংখ্য হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে যাতে হতাহত হাজার হাজার মানুষের কোনো হদিস মেলেনি। ২০০৫-০৬ সালে ইরাকের সুন্নি অধ্যুষিত শহর ফালুজায় মার্কিন বাহিনীর চালানো গণহত্যা, সাদ্দামের শহর তিকরিত অভিযান কিংবা মোসুল নাজাফ কারবালায় দখলদার বিরোধী লড়াইয়ে কত মানুষকে হত্যা করা হয়েছে তার প্রকৃত সংখ্যা হয়তো কখনই জানা যাবে না। তেমনি জানা যাবে না ইরাকের মার্কিন মদতপুষ্ট শিয়া সরকারের গুপ্তঘাতক বাহিনীর হাতে কত সুন্নি কিংবা সুন্নি গেরিলাদের হাতে কত শিয়া-কুর্দীর মৃত্যু হয়েছে তার প্রকৃত সংখ্যাও।

বৃটিশ মেডিকেল জার্নাল ল্যানসেট-এর এক পরিসংখ্যানে বলা হয়েছে, ২০০৬ সালের অক্টোবর পর্যন্ত ইরাক যুদ্ধে নিহতের সংখ্যা ছিল ৬ লাখ ৫৫ হাজার। বৃটিশ আমেরিকা এবং ইরাকের ডাক্তারদের একটি দল পুরো ইরাকের সমস্ত হাসপাতালের নথি, বিভিন্ন ঘটনায় স্থানীয় মানুষের সাক্ষাৎকার এবং বিভিন্ন শহরের কয়েক হাজার বাসিন্দার সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে এই রিপোর্ট প্রণয়ন করেছে। ল্যানসেট বলছে, ২০০৪ সালের পর থেকে ইরাক জুড়ে রোজ অন্তত পাঁচশটি সন্ত্রাসী হামলার ঘটনা ঘটেছে। ২০০৫-০৬ জুড়ে বেশিরভাগ মানুষের মৃত্যু হয়েছে এসব সন্ত্রাসী ঘটনায়।

যথারীতি ল্যানসেটের এই রিপোর্ট প্রত্যাখ্যান করেছিল বুশ-ব্লেয়ার প্রশাসন। ২০০৫-এর ডিসেম্বরে বুশ আরও একটি জলজ্যান্ত মিথ্যার স্বাক্ষর রেখে বলেছিলেন ইরাক যুদ্ধে এ পর্যন্ত ত্রিশ হাজার বেসামরিক মানুষের মৃত্যু হয়েছে। বেসামরিক মানুষের মৃত্যু থেকে শুরু করে রণাঙ্গনের লড়াইয়ের খুঁটিনাটি নিয়ে বরাবরই গণমাধ্যমকে মিথ্যা তথ্য দিয়ে ভুল পথে পরিচালিত করেছে বৃটিশ-মার্কিন সেনা কর্তৃপক্ষ। টার্গেট করে ইরাকের বেসামরিক বাড়িঘরে হামলা চালিয়ে বলা হত অনিচ্ছাকৃত হামলা। রাস্তার দুরন্ত শিশুদের হত্যা করে বলা হয়েছে, 'ওরা সাদ্দাম বাহিনীর চর হিসেবে কাজ করেছে। ওদের কাছে বোমা পাওয়া গেছে।' সাধারণ মানুষের বাড়িতে গ্রেনেড গুলি বোমা ছুঁড়ে বলা হত বাড়ির ভেতর থেকে আগেহামলা হয়েছে। ব্রিটিশ মার্কিন সেনাদের সুনির্দিষ্ট এমন আরও কিছু মিথ্যার উদাহরণ দেওয়া যাক।

২১ মার্চ: মার্কিন সেনা কমান্ড দাবি করেছে উম্ম কসরে থাকা ইরাকি বাহিনীর ৫১ ডিভিসনের কমান্ডার আত্মসমর্পণ করেছেন। প্রকৃত সত্য: এই দাবির পরদিন আল জাজিরা টিভি তার সরাসরি সাক্ষাৎকার নিয়েছে।

২৩ মার্চ: ব্রিটিশ সেনামুখপাত্র দাবি করেছে তারা কুয়েত সীমান্তবর্তী ইরাকি শহরের দখল নিয়েছেন। প্রকৃত সত্য হলো ২৬ মার্চ পর্যন্ত ব্রিটিশ সেনারা উম্ম কসরের দখল নিতে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছিল।

BanglaBook.org

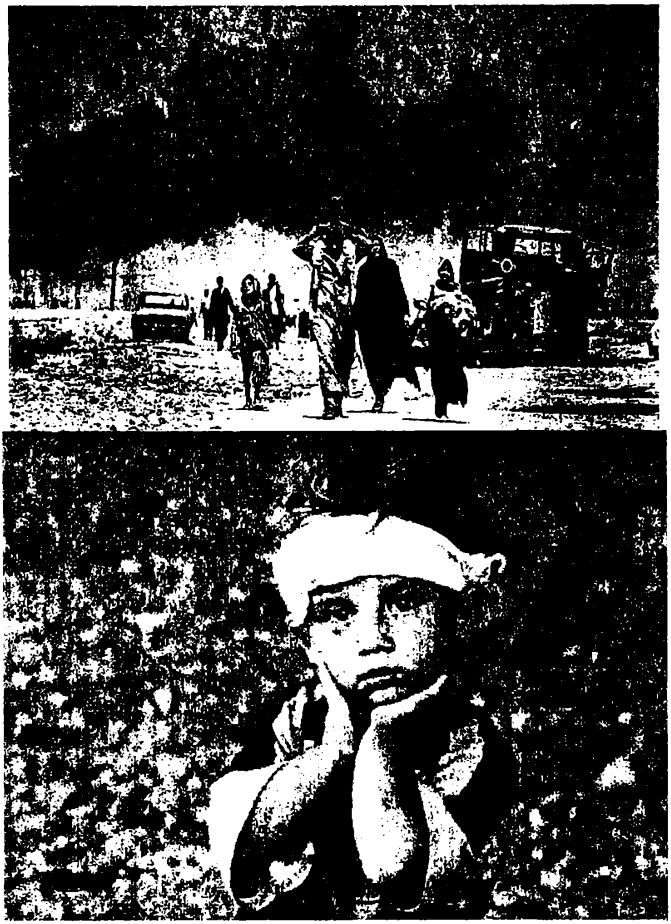

আজও লাখো মানুষের মৃত্যু আর এক অনিশ্চিত ভবিষ্যতের নাম ইরাক

২৫ মার্চ: ব্রিটিশ সেনামুখপাত্রের দাবি বসরার শিয়া মুসলিমরা দখলদার বিরোধী লড়াই শুরু করেছে। সেনাদের ওপর হামলা চালাচ্ছে। প্রকৃত সত্য এমন কোনো ঘটনাই বসরায় ঘটেনি।

২৬ মার্চ: বসরার উদ্দেশ্যে ১২০টি ব্রিটিশ ট্যাংক রওনা হয়েছে। প্রকৃত সত্য: ট্যাঙ্কগুলো বসরা থেকে ফিরে এসেছে।

২৮ মার্চ: বুশের সাথে এক সংবাদ সম্মেলনে ব্লেয়ার দাবি করেছেন দুই বৃটিশ সেনাকে ইরাকিরা অপহরণের পর হত্যা করেছে। প্রকৃত সত্য: ওই দুই সেনা যুদ্ধক্ষেত্রে মারা গেছে।

BanglaBook.org

২৯ মার্চ: সাদ্দামের একজন জেনারেলকে আটক করেছে ব্রিটিশ সেনারা। প্রকৃত সত্য: জেনারেল নন। সদ্য কমিশন পাওয়া এক তরুণ অফিসার।

২৯ মার্চ: মার্কিন সেনাকমান্ড দাবি করেছে বাগদাদের আল শুলা মার্কেটে বিমান বিধ্বংসী ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়ে ৬২ জন বেসামরিক নাগরিককে হত্যা করেছে ইরাকি বাহিনী। প্রকৃত সত্য: রবার্ট ফিস্কের ছবিসহ রিপোর্টে বলা হয়েছে মার্কিন মিসাইল হামলায় ওই ঘটনা ঘটেছে। ঘটনাস্থলে পাওয়া মিসাইলের ভাঙা অংশে লেখা ছিল Texas by Raytheon.

২০০৩-এর ৯ এপ্রিল পতন হয় বাগদাদের। সাদ্দামের প্রাসাদের দখল নেয় মার্কিন সেনারা

২০০৩ সালের ৯ এপ্রিল পতন হলো বাগদাদের। সাদ্দাম হোসেনের অত্যাচারে অতিষ্ঠ ইরাকিদের হাতে নয় বরং মার্কিন শেঁকলে নামানো হলো হিরক রাজা সাদ্দামের বিশাল আকৃতির ভাস্কর্য। দজলা নদীর তীরে সাদ্দামের প্রাসাদ আর

তার রাজ সিংহাসনের দখল নিলেন মার্কিন জেনারেল। কিন্তু যে ব্যাপক গণবিধ্বংসী অস্ত্র যা কিনা যুক্তরাষ্ট্র তো বটেই গোটা বিশ্ব শান্তির জনে হুমকি, কোথায় গেল সাদ্দামের সেই মারণাস্ত্রের বিপুল মজুত? না ইরাক দখলের পরও অপ্রচলিত কোনো অস্ত্রভাণ্ডারের মজুত খুঁজে পায়নি মার্কিন সেনারা। অথচ কথিত এই অস্ত্রের নাম করে একের পর এক ষড়যন্ত্র আর প্রতারণার জাল বুনে গেছে বুশ প্রশাসন। জানাবো এমনি আরও একটি নিকৃষ্টতম ষড়যন্ত্রের কথা। ইতিহাসে যা হাবরুশ চিঠি কেলেঙ্কারি নামে পরিচিত।

১৪ ডিসেম্বর ২০০৩। একটি 'এক্সক্লুসিভ' খবর প্রকাশ করেছে বৃটিশ পত্রিকা সানডে টেলিগ্রাফ। খবরের শিরোনাম 'Terrorist behind September 11 strike was trained by Saddam.' অর্থাৎ নাইন-ইলাভেনে জড়িত সন্ত্রাসীদের প্রশিক্ষণ দিয়েছেন সাদ্দাম। খবরটি ছাপা হওয়ার দিনটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এর আগেরদিন অর্থাৎ ১৩ ডিসেম্বর নিজ শহর তিকরিতের একটি খামার বাড়ির গোপন সুড়ঙ্গ থেকে আটক হয়েছেন সাদ্দাম হোসেন। এমন এক সময় এই খবর প্রকাশ হলো যখন দশম মাসে পা দিয়েছে ইরাক আগ্রাসন। ততদিনে ইরাকে নিহত বেসামরিক মানুষের সংখ্যা দশ হাজার ছাড়িয়ে গেছে। অথচ যুদ্ধ শুরুর দশম মাসেও ইরাকে কোনো ব্যাপক বিধ্বংসী অস্ত্রের হদিস দিতে পারছে না যুক্তরাষ্ট্র। ঠিক এই সময় বৃটিশ গোয়েন্দা সংস্থা এমআই সিক্সের বরাতে পাওয়া, সানডে টেলিগ্রাফের খবরটি লুফে নিয়েছে ইউরোপ আমেরিকার গণমাধ্যম। এমন একটা খবর ইরাকের দখলদারিত্বকে রাতারাতি সঠিক এবং মার্কিন জনগনের চোখে রীতিমত 'যৌক্তিক পদক্ষেপ'এ পরিণত করে। বিপরীত দিকে 'এক্সক্লুসিভ' এই তথ্যের জোয়ারে ঢাকা পড়ে যায় ইরাকের অন্যায় যুদ্ধ আর সেই যুদ্ধে নিরপরাধ হাজারো নারী শিশু হত্যার নীতি নৈতিকতা। খবরটির শিরোনাম পড়ে যে কারো মনে হতে পারে, গ্রেফতার হওয়া সাদ্দাম হয়তো মার্কিন সেনাদের কাছে এই তথ্য স্বীকার করেছেন। কিন্তু না। এই খবরের মূল শেকড় আরও গভীরে।

ফিরে যাবো যুদ্ধের আগে ২০০৩ সালের জানুয়ারিতে। স্টেট অব ইউনিয়নে দেওয়া ভাষণে একটি আতঙ্ক সৃষ্টিকারী খবর দিলেন প্রেসিডেন্টে বুশ: ' ব্রিটিশ সরকার জানতে পেরেছে সাদ্দাম হোসেন পারমাণবিক অস্ত্র তৈরির জন্য আফ্রিকার একটি দেশ থেকে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ইউরেনিয়াম ও উচ্চশক্তির অ্যালুমিনিয়াম টিউব কেনার চেষ্টা করছে। আমরা এও জেনেছি তাদের হাতে স্থানান্তরযোগ্য রাসায়নিক অস্ত্রের ল্যাবোরেটরিও রয়েছে।' প্রেসিডেন্টের দেওয়া এই তথ্য সত্যি হলে এটি অবশ্যই যুক্তরাষ্ট্র ও তার সবচে কাছের মিত্র ইসরাইলের জন্য এক মহা উদ্বেগের খবর। বলাবাহুল্য যুদ্ধের

BanglaBook.org

আগে প্রেসিডেন্টে বুশের দেওয়া এই খবর এবং যুদ্ধের পর ১৪ ডিসেম্বর সানডে টেলিগ্রাফের দেওয়া খবরটির সূত্র আসলে এক। একটি চিঠি। ইরাকি গোয়েন্দা প্রধান জেনারেল তাহির জলিল হাববুশ আল তিকরিতির লেখা একটি চিঠি উদ্ধার করেছে বৃটিশ গোয়েন্দা সংস্থা এমআই সিক্স। চিঠিটি কবে কোথা থেকে উদ্ধার করা হয়েছে সেই দিনতারিখ জানা না গেলেও, হাতে লেখা ওই চিঠির তারিখটি ছিল ১ জুলাই ২০০১। লেখা হয়েছে ইরাকি প্রেসিডেন্টে সাদ্দাম হোসেনকে। চিঠিটি এ রকম: 'মাননীয় প্রেসিডেন্ট, আল্লাহ আপনার হেফাজত করুন। মিসরের মোহাম্মদ আতা (নাইন-ইলাভেনের হামলাকারী) এসেছেন। তার সঙ্গে আবু আমেরও (কারো ছদ্ম নাম) রয়েছেন। তাঁরা আল-দৌরায় আবু নিদালের বাড়িতে রয়েছেন। আমরা তাদের দেখভাল করছি। আমরা তার জন্য (আতা) তিনদিনের একটি কর্মসূচি ঠিক করেছি। একটি টিম তাকে সার্বক্ষণিক সাহায্য করবে। সার্বিক বিষয়ে তাকে খুবই উৎসাহী মনে হলো। তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এই টিমই লক্ষ্যবস্তুতে কাঙ্খিত হামলাটা চালাবে।' এই চিঠির আরও একটি অংশ, যা ঠিক প্রেসিডেন্ট বুশের ভাষণের সাথে মিলে যায়। সেটি হলো ইরাকি গোয়েন্দা প্রধান হাববুশ সাদ্দামকে জানাচ্ছেন, 'নাইজার থেকে ইউরেনিয়ামের একটি চালান আসছে। এ ছাড়া উচ্চশক্তির অ্যালুমিনিয়াম টিউবও জোগাড় হচ্ছে।' মনে আছে নিশ্চয়ই প্রেসিডেন্ট বুশ কংগ্রেসের সাক্ষ্যেও বলেছিলেন, সাদ্দাম নাইন-ইলাভেনে জড়িত এবং তার কাছে গণবিধ্বংসী অস্ত্র আছে।

নিজের জন্ম শহর তিকরিতে আটক হওয়ার আগে সাদ্দাম হোসেন

ইরাকি গোয়েন্দা প্রধানের এই চিঠি আর মোহাম্মদ আতার ইরাক সফর নিয়ে প্রথম সন্দেহটা উস্কে দিয়েছিল মার্কিন ম্যাগাজিন নিউজউইক। একই মাসে অর্থাৎ ডিসেম্বরে এফবিআইএ'র তথ্যসূত্রের বরাত দিয়ে নিউজউইক বলছে, ইরাকে নয়। ২০০১ সালের জুলাই মাসে মোহাম্মদ আতার অবস্থান ছিল যুক্তরাষ্ট্রে। ২৭ জুন ২০০১ থেকে ১৯ জুলাই ২০০১ পর্যন্ত সময়কালে মোহাম্মদ আতা যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডা, বোস্টন, নিউ ইয়র্ক, নিউজার্সি এবং লাসভেগাসে ঘোরাফেরা করেছেন। ইন্টারনেট ব্যবহার করেছেন, এটিএম বুথ ব্যবহার করেছেন, ফোনকল করেছেন। যার সবই এফবিআই-এর রেকর্ডে আছে। মাত্র ৭ দিনের জন্যে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে গিয়েছিলেন। সেটাও ইরাক নয় স্পেন। ফিরে এসেছেন ১৯ জুলাই বোস্টনে। Newsweek, December 2001.

নিজের জন্ম শহর তিকরিতের একটি খামার বাড়ি থেকে আটক হন সাদ্দাম হোসেন

তাহলে ইরাকি গোয়েন্দা প্রধান কেন তার ১ জুলাইয়ে লেখা চিঠিতে বলেছেন মোহাম্মদ আতা এসেছেন। কোনটা সত্যি? সত্যিটা প্রকাশ করেছিলেন পুলিজ্জার পুরস্কার পাওয়া মার্কিন সাংবাদিক রন সাসকিন্ড। কেবল সত্যি প্রকাশ নয়। রীতিমত কেঁচো খুঁড়তে সাপ বের করেছেন এই সত্যানুসন্ধানী সাংবাদিক।

হাববুশ চিঠি কেলেঙ্কারি'র আদ্যোপান্ত নিয়ে একটি বই লিখেছেন রন সাসকিন্ড। ২০০৮ সালে প্রকাশিত সাড়া জাগানো এই বইয়ের নাম, 'The Way of the World: A Story of Truth and Hope in an Age of Extremism.' চারশো পৃষ্ঠার এই বইয়ে সাসকিন্ড প্রমাণ করেছেন হাববুশের কথিত চিঠির পুরোটাই ছিল বুশ প্রশাসনের আরও একটি জালিয়াতি। মিথ্যা বানোয়াট গল্প এবং শতাব্দির নিকৃষ্টতম গল্প। ব্রিটিশ গোয়েন্দা সংস্থা এমআই

BanglaBook.org

সিক্স নয় এই গল্পের আসল রচয়িতা সিআইএ। বইয়ে সাসকিন্ড বলেছেন সাদ্দাম হোসেনের অন্যতম বিশ্বাসঘাতকদের একজন ছিলেন হাববুশ। যখনও নাইন-ইলাভেন ঘটেনি কিংবা ইরাক যুদ্ধ শুরু হয়নি তখন থেকেই সিআই-এর সাথে ইরাকি গোয়েন্দা প্রধান হাববুশের সম্পর্ক ছিল। তার মাধ্যমেই ইরাক যুদ্ধের অনেক আগে থেকেই বুশ প্রশাসন নিশ্চিত ছিল সাদ্দামের হাতে কোনো অচলিত বা পারমাণবিক অস্ত্রের মজুত নেই। সাদ্দামের প্রশাসনে রীতিমত সিইআইএ'র হয়ে কাজ করছিল হাববুশ। তাকে দিয়েই চিঠিটি প্রস্তুত করিয়ে নেয় সিআইএ। এবং চিঠিটি এমআই সিক্সকে হস্তান্তর করেন হাববুশ। 'অপারেশন ইরাক ফ্রিডম' নামের আগ্রাসন শুরুর পর সাদ্দাম হোসেনের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের মাথার দাম নির্ধারণ করে ধরিয়ে দেওয়ার পুরস্কার ঘোষণা করেছিল বুশ প্রশাসন। হাববুশের মাথার দাম ধরা হয়েছিল ১০ লাখ মার্কিন ডলার। মজার ব্যাপার হলো ইরাক দখলের পর সাদ্দামের কর্মকর্তারা একে একে সবাই ধরা পড়েছেন। তাদের প্রায় সবার মৃত্যুদণ্ডও কার্যকর করা হয়েছে। কিন্তু হাববুশ ধরা পড়লেন না। কারণ তাকে জর্ডানে পুনর্বাসিত করা হয়েছে। সাসকিন্ড তার বইয়ে বলেছেন চুপ থাকার পুরস্কার হিসেবে হাববুশকে ৫০ লাখ মার্কিন ডলার দিয়ে জর্ডানে আবাস গড়ার পাকাপাকি ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছে। তবে সীমিত চলাচলের মধ্যে তাকে একরকম বন্দি জীবন যাপন করতে হচ্ছে। আর স্টেট ডিপার্টমেন্টের ওয়েবসাইটে আজও ঝুলছে হাববুশকে ধরিয়ে দেওয়ার বিনিময়ে এক মিলিয়ন মার্কিন ডলারের পুরস্কার ঘোষণার নোটিশটি।

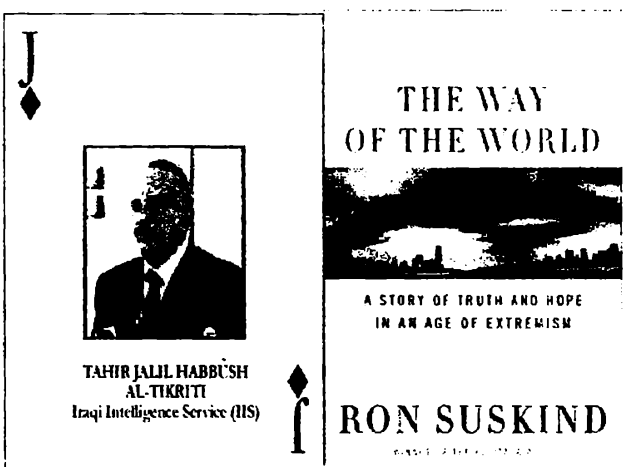

ইরাকি গোয়েন্দা প্রধান হাববুশ এবং সাংবাদিক রন সাসকিন্ডের সাড়া জাগানো সেই বই

যথারীতি হাববুশ চিঠি কেলেঙ্কারির সকল দায় অস্বীকার করেছিল সিআইএ। আর পুলিজ্জার পাওয়া সাংবদিক রন সাসকিন্ডের বইটিকে নর্দমার সাংবাদিকতা বলে ধিক্কার দিয়েছে হোয়াইট হাউস। তারও কিছুদিন পর ইরাকে গণবিধ্বংসী অস্ত্র খুঁজে না পাবার দায় স্বীকার করে পল উলফউইটজ বলেছিলেন, 'ওটা ছিল আমলতান্ত্রিক ভুল'। প্রকৃত সত্য হলো ইচ্ছাকৃত ভুল এবং প্রতারণা। ইরাক যুদ্ধ নিয়ে এমন অজুত নিযুত ইচ্ছাকৃত ভুল আর প্রতারণার জন্ম দিয়েছে বুশ সরকার। কেবল যুক্তরাষ্ট্র নয় পুরো বিশ্বের সামনে বুশ ও তার সহযোগিরা যত রকমের মিথ্যা প্রতারণা আর ছলনার আশ্রয় নিয়েছেন, তা নিয়ে রীতিমত হাজার পৃষ্ঠার একটি প্রামাণ্য ইতিহাস রচনা করা যায়। কিন্তু কোনো দেশের ক্ষমতাশালী কোনো রাজনৈতিক নেতৃত্বের এমন অন্যায়ের বিরুদ্ধে কি কোনো আন্তর্জাতিক আইনে কোনো প্রতিকার নেই? দুর্বল জাতি রাষ্ট্রকে রক্ষা করার কোনো রক্ষাকবজ নেই?

এ প্রসঙ্গে ১৯৪৫ সালে ন্যুরেমবার্গ ট্রায়ালের একটি বিখ্যাত উদ্ধৃতির কথা স্মরণ করব। ওই ট্রাইব্যুনালের চিফ প্রসিকিউটর ছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিমকোর্টের বিচারপতি রবার্ট এইচ জ্যাকসন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য গঠিত এই ট্রাইব্যুনালের প্রথম দিনের বিচার কার্যের শুরুতেই শান্তির বিরুদ্ধে অপরাধের স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এই বিচারক বলেছিলেন, 'Crimes Against Peace as planning, preparation, initiation or waging of a war of aggression, or a war in violation of international treaties, agreements or assurances, or participation in a common plan or conspiracy for the accomplishment of any of the foregoing.'

অন্যায় যুদ্ধ বা আগ্রাসনের স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এই বিচারক বলেছিলেন:

'No political, military, economic or other considerations shall serve as an excuse or justification for a war of aggression. If certain acts in violation of treaties are crimes, they are crimes whether the United States does them or whether Germany does them, and we are not prepared to lay down a rule of criminal conduct against others which we would be unwilling to have invoked against us.'

৪৫ সালে ট্রাইব্যুনালের বিচার কাজের শুরুতেই বিচারপতি জ্যাকসনের এই ব্যাখ্যার সাথে সহমত পোষণ করেছিল ট্রাইব্যুনাল। পরের বছর ১৯৪৬

BanglaBook.org

সালে একটি মামলার রায়ে জ্যাকসনের এই ব্যাখ্যাটি পর্যবেক্ষণ হিসেবে জুড়ে দিয়ে আদালত বলেছিল, 'War is essentially an evil things...to initiate a war of aggression, there for is not only a international crime, it is a supreme international crime, differing only for other war crime is that it contains within itself the accumulated evil of the whole.'

বিচারপতি জ্যাকসনের সেই ব্যাখ্যা আজও আন্তর্জাতিক আইন ও বিচারিক কার্যক্রমের একটি মাইলফলক ধারা হয়ে আছে। সেই ধারা অনুযায়ী বুশ-ব্লেয়ার ও তাদের হোয়াইট হাউস এবং ডাউনিং স্ট্রিটের সহযোগিরা কি পূর্ব পরিকল্পনা ও ষড়যন্ত্রের আশ্রয় নিয়ে একটি জাতিগোষ্ঠির বিরুদ্ধে অন্যায় যুদ্ধ চাপিয়ে দেওয়ার মধ্য দিয়ে আগ্রাসন চালানোর দায় এড়াতে পারেন? শান্তির বিপক্ষে অবস্থান নেওয়ার দায় অস্বীকার করতে পারেন? ন্যুরেমবার্গ ট্রায়ালের ৭০ বছর পর জাস্টিস রবার্ট জ্যাকসনের সেই ব্যাখ্যাটি ইরাকের বেলায় আজও এক মর্মান্তিক সত্য হয়ে আছে। অথচ জার্মান যুদ্ধাপরাধীদের কঠোর বিচারকে ঘিরে এই বিচারপতির স্বপ্ন ছিল, ন্যুরেমবার্গ ট্রায়াল বিশ্বশান্তির লক্ষ্যে একটি মাইলফলক প্রভাবক হিসেবে কাজ করবে। তার বিশ্বাস ছিল এই ট্রায়াল নীতি নৈতিকতাহীন আগ্রাসন তথা অন্যায় যুদ্ধের বিরুদ্ধে এবং মানবতার স্বপক্ষে একটা রক্ষাকবজ হিসেবে বিশ্বে জারি থাকবে। জাস্টিস রবার্ট জ্যাকসন বেঁচে থাকলে দেখতে পেতেন, তারই দেশের রাষ্ট্রনায়করা কেবল একক পরাশক্তি অর্জনের নেশায়, নিত্য নতুন অজুহাতে বিশ্বের দেশে দেশে জনপদ থেকে জনপদে শান্তির বিরুদ্ধে ক্রমাগত যুদ্ধ আর সংঘাতকে উস্কে দিয়ে চলেছে।

যেমন 'গণবিধ্বংসী অস্ত্র না থাকলে কি হয়েছে, ইরাক যুদ্ধ যৌক্তিক ছিল'। ইরাকের অন্যায় যুদ্ধের স্বপক্ষে এমনটাই ছিল বুশ প্রশাসনের শেষ কথা। উলফউইটজ বলেছিলেন, 'The invasion of Iraq was a way to redraw the Middle East to reduce the terrorist threat to the United States'. অর্থাৎ মধ্যপ্রাচ্য ও যুক্তরাষ্ট্রকে সন্ত্রাসী হুমকি থেকে মুক্ত রাখতে এই যুদ্ধের দরকার ছিল। অথচ উলফউইজের এই বক্তব্যের আরও আগে যুক্তরাষ্ট্রের নিজস্ব তদন্ত রিপোর্টই বলেছে, ইরাক যুদ্ধ মধ্যপ্রাচ্যকে নিরাপদ তো করেইনি উল্টো মধ্যপ্রাচ্যসহ গোটা বিশ্বের জন্যই বহুমাত্রিক হুমকি তৈরি করেছে। যুক্তরাষ্ট্রের ১৬টি অভ্যন্তরীণ গোয়েন্দা সংস্থার ২০০৬ সালের এক সমন্বিত রিপোর্ট বলছে, 'The Iraq conflict has become the 'cause celebre' for jihadists, breeding a deep resentment of

BanglaBook.org

U.S. involvement in the Muslim world and cultivating supporters for the global jihadist movement.' রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে 'নতুন সাংগঠনিক কাঠামোর মধ্যদিয়ে ইরাকের জিহাদি ও তাদের নেতারা নুতন মাত্রার সন্ত্রাসবাদের জন্ম দিচ্ছে'। ২০০৬ সালে মার্কিন গোয়েন্দা রিপোর্টের সেই 'নতুন মাত্রার সন্ত্রাসবাদ' পরবর্তী দু-তিন বছরের মাথায় বিশ্বব্যাপী এক নতুন আতঙ্ক নিয়ে হাজির হয়। যার নাম আইএস।

ন্যুরেমবার্গ ট্রায়াল ও জাস্টিস রবার্ট এইচ জ্যাকসন

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, একসময় আফগানিস্তানে যেমন জঙ্গিবাদ বলে কোনো শব্দের সাথে মানুষের পরিচিতি ছিল না একইভাবে ইরাক তথা

মধ্যপ্রাচ্যেও সন্ত্রাসবাদের সাংগঠনিক কোনো কার্যক্রম ছিল না (ফিলিস্তিনের হামাস এবং লেবাননের হেজবুল্লাহ যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরাইলে চোখে সন্ত্রাসী হলেও বাকি দুনিয়ার কাছে তা নয়)। একটি অন্যায় যুদ্ধের জন্ম দিয়ে আফগানিস্তানের মতো ইরাককেও সন্ত্রাসী উৎপাদনের কারখানায় পরিণত করা হয়েছে। শিয়া সুন্নি আর কুর্দীদের মধ্যে সংঘাত উস্কে দিয়ে নরকতুল্য পরিস্থিতির সৃষ্টি করা হয়েছে। ইরাককে ভেঙে তিন টুকরো করার সকল আয়োজন সম্পন্ন করা হয়েছে। এক ইরাককে কেন্দ্র করে গোটা মধ্যপ্রাচ্য আজ যেন সংঘাতপ্রাচ্য। যার এক এবং অদ্বিতীয় দায় যুক্তরাষ্ট্রের। যুক্তরাষ্ট্রের হাত ধরে এই ভূখণ্ডে যে গোয়ের্নিকা'র জন্ম তা এখন কড়ায় গণ্ডায় ফেরত দিচ্ছে আইএস নামের নৃশংস বর্বর সন্ত্রাসীরা। ইরাকে যুক্তরাষ্ট্রের পাপ থেকেই জন্ম আইএস নামের এই দানবের।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

আরব
বসন্ত আসেনি এসেছে আইএস

যে দেশটিকে চড়া দামে শুধতে হচ্ছে আরব বসন্তের ণ সেটি সিরিয়া। সিরিয়ার রক্তাক্ত রণাঙ্গণ এখন মধ্যপ্রাচ্য তথা বিশ্ব রাজনীতির অন্যতম ক্রীড়নক। এটি সম্ভবত বিশ্ব ইতিহাসের একমাত্র রণাঙ্গণ—যেখানে যোদ্ধাদের কারো একক কোনো লক্ষ্য নেই। আঞ্চলিক বৈশ্বিক আর উগ্রপন্থার রাজনীতির জটিল সমীকরণের গোলক ধাঁধায় ঘুরপাক খাচ্ছে এই রণাঙ্গণের লক্ষ্য উদ্দেশ্য।

এই শিশুদের চোখ যেন সিরিয়ার অনিশ্চিত ভবিষ্যতের মানচিত্র, প্রিয় স্বদেশ ছেড়ে শরণার্থী শিবিরের পথে অনিশ্চিত যাত্রা

আরব বসন্তের অভিঘাত
ইরাক লিবিয়া গাদ্দাফির পতন
সিরিয়ার যুদ্ধ
সিরিয়ার রণাঙ্গনে শত্রু মিত্র
সিরিয়ার আলকায়দা'র প্রতি মার্কিন সমর্থন
সিরিয়ায় মৃত্যুর মিছিল

তিউনিশিয়ার ২৭ বছরের দরিদ্র যুবক তারেক-আল-তায়েব মোহাম্মদ বোআজিজি। বাবা লিবিয়ায় নির্মাণ শ্রমিকের কাজ করতে গিয়ে মারা গেছেন। বাবার অকাল মৃত্যুর পর ছয় ভাইবোনকে নিয়ে যেন সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছিলেন বোআজিজি। সময়টা ২০১০। বিশ্বজুড়ে চলা আর্থিক মন্দার অভিঘাতে অসংখ্য দেশের মতো বিপর্যস্ত তিউনিশিয়াও। রেকর্ড ভেঙে ত্রিশ ছুঁয়েছে বেকারত্বের হার। বাজারে জিনিসপত্রের অগ্নিমূল্য। বাড়ির জিনিসপত্র বেঁচে ছোট বোনটিকে কলেজে ভর্তি করিয়েছেন বোআজিজি। এত টানাটানির মধ্যেও সারাদিন মুটে-মজুরের কাজ করে রাতের কলেজে পড়াশুনা করে ডিগ্রিটা শেষ করেছেন। কিন্তু চাকরি মিলছে না। সেনাবাহিনী পুলিশ সরকারি অফিসের ছোট কাজ, বেসরকারি কারখানার শ্রমিক, এমন কোনো দপ্তর নেই যেখানে সিভি ফেলেননি বোআজিজি। শেষতক চাকরি নয়। ধারকর্য করে কিছু টাকা জোগাড় করে রাজধানী তিউনিস'র থিয়েটার হলের সামনের ফুটপাতে একটি ফলের দোকান দিয়েছিলেন এই যুবক। তার এক বন্ধু বলছিলেন, সামান্য আয়ের ওই দোকান থেকেও দরিদ্র প্রতিবেশীদের বিনামূল্যে ফল দিতেন বোআজিজি। ১৭ ডিসেম্বর বিকেল বেলা। ফুটপাতের অবৈধ বিক্রেতাদের উচ্ছেদ করতে গিয়ে বোআজিজি'র দোকানটি ভেঙে গুড়িয়ে দেয় নগর কর্তৃপক্ষ। পুলিশের হাতে নাজেহাল হতে হয় তাকে। প্রতিবাদে নিজের গায়ে পেট্রোল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেন এই দরিদ্র যুবক। তিউনিস-এর রাজপথে বোআজিজি যখন জ্বলন্ত টর্চ হয়ে জ্বলছেন, এর কিছুক্ষণ আগেই নতুন মেয়াদের জন্যে ক্ষমতায় বসতে পার্লামেন্টে আস্থা ভোটের মুখোমুখি প্রেসিডেন্ট বেন আলী। বোআজিজি'র জ্বলন্ত দেহের আগুন ছড়ালো পুরো তিউনিশিয়ায়। তীব্র গণআন্দোলনের মুখে ২২ বছরের ক্ষমতা ছেড়ে আত্মীয় পরিজনসহ দেশ ছেড়ে পালালেন বেন আলী। কিন্তু অবাক বিস্ময়ে পুরো দুনিয়া দেখল উত্তর আফ্রিকার দেশ তিউনিশিয়ার আগুন ছড়িয়ে পড়েছে পুরো আরব বিশ্ব তথা মধ্যপ্রাচ্যে। পশ্চিমা বিশ্ব অভিনব এই অগ্নি স্ফুলিঙ্গের নাম দিয়েছে আরব বসন্ত।

২০১১ সাল। নাইন-ইলাভেনে সন্ত্রাসি হামলার দশক পূর্তিতে যুক্তরাষ্ট্রে যখন বরাবরের মতো সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে নিত্য নতুন লড়াইয়ের অঙ্গিকার করছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট, মধ্যপ্রাচ্যে তখন গণতন্ত্রের গণজোয়ার। তিউনিশিয়ার দাবানল থেকে ছড়িয়ে পড়া আগুনে পুড়ছে, আলজেরিয়া, জর্ডান, ওমান, কুয়েত, মিসর, ইয়েমেন, লিবিয়া, বাহরাইন আর সিরিয়া। রক্ষণশীল সমাজের কালো পর্দার আগল ভেঙে গণতন্ত্রের দাবিতে রাতদিন রাজপথে নারীরাও। ইতিহাসে প্রথমবারের মতো নেতৃত্বহীন আন্দোলনে বিস্ময়করভাবে ফুঁসে উঠেছে আরব বিশ্বের কোটি মানুষ।

BanglaBook.org

তিউনিশিয়ার বোআজিজির শরীরের আগুন দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে আরব-আফ্রিকায়

১৪ জানুয়ারি তিউনিশিয়ার নির্বাসিত স্বৈরশাসক বেন আলী যখন সৌদি আরবে নিরাপদ আশ্রয় পেলেন ততদিনে উত্তাল কায়রো। ২৫ তারিখেই কায়রোর তাহরির স্কয়ারের দখল নিল জনতা। তাহরির স্কয়ারের সেই বিক্ষোভে সংহতি জানাল ইয়েমেনের মানুষ। ৩ ফেব্রুয়ারি ইয়েমেনের রাজধানী সানায় জড়ো হলো বিশ হাজার মানুষ। লিবিয়ার বেনগাজিতে বিক্ষোভ ছড়ালো ১৫ ফেব্রুয়ারি। ১৫ মার্চ বাহরাইন। ১৬ মার্চ সিরিয়ার দামেস্ক।

যে আরব বিশ্বের পরিচিতি ছিল অশিক্ষিত পশ্চাপদ আর অসচেতন। সেই দেশগুলোর তরুণ প্রজন্ম দেখাল কী করে ফেইসবুক টুইটার এসএমএস আর ই-মেইলকেও গণজোয়ারের সঙ্গি করা যায়। বছর ঘুরতে না ঘুরতেই মিসরের হোসনি মোবারক আর লিবিয়ার চার দশকের স্বৈরশাসক মুয়াম্মার গাদ্দাফিকে বরণ করতে হলো মর্মান্তিক পরিণতি।

BanglaBook.org

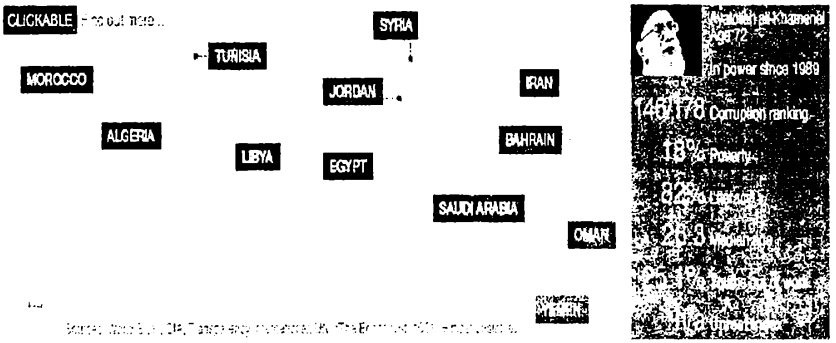

আরব বসন্তের দেশগুলো

কিন্তু যে স্বপ্ন আর গণতন্ত্রের সোনার হরিণের মায়ায় রাজনৈতিক নেতৃত্বহীন তারুণ্যের এই গণজোয়ার তার বিনিময়ে কোনো বসন্ত আসেনি। বোআজিজির মতো হাজারো যুবকের আত্মাহুতির বিনিময়ে স্বস্তির বদলে এসেছে নৈরাজ্য। আর অন্ধকারের পর্দা ভেদ করে এসেছে বিভৎস বর্বর আইএস। কেবল ২০১২ সালের জুন পর্যন্ত আরব বসন্তের এক বছরে সিরিয়া ইয়েমেন মিসর আর লেবাননে প্রাণ গেছে অন্তত ৫০ হাজার মানুষের। যাদের অধিকাংশই তরুণ।

BanglaBook.org

কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণী থেকে গৃহবধুরাও মোবারক পতনের আন্দোলনে কায়রোর রাজপথে নেমেছিলেন

হতাশার প্রথম সূচনা মিসরকে ঘিরে। মাত্র কয়েকমাসের আন্দোলনে তিন দশকের স্বৈরশাসক হোসনি মোবারকের পতন ঘটানোর পর মিসরের কোটি মানুষ দেখল তাদের বসন্তের ফল গেছে কট্টর ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিকদল মুসলিম ব্রাদারহুডের ঘরে। যাদের কাছে গণতন্ত্র নয় বরং ধর্মরাষ্ট্র গড়াই মূলকথা। অথচ মোবারক পতনের আন্দোলনে যোগ দেওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া আধুনিকমনস্ক উদারপন্থী কোটি তরুণ তরুণী শরিয়াআইন-নির্ভর ধর্মরাষ্ট্র গড়তে এই

আন্দোলনে শামিল হয়নি। সাম্প্রদায়িক বিভেদ নয় বরং অসাম্প্রদায়ীক চেতনার আলোকে অর্থনৈতিক মুক্তির স্বপ্নই ছিল ওই আন্দোলনের মূলমন্ত্র। সেই মিসরে আজ শরীয়া আইন ফিরে না এলেও ফিরে এসেছে ইতিহাস। হোসনি মোবারকের জায়গায় এসেছেন আবদেল ফাত্তাহ আল সিসি। মোবারকের মতোই দীর্ঘমেয়াদি সামরিক গণতন্ত্র যার একমাত্র লক্ষ্য।

আরব বসন্ত নামের এই মরুঝড়ে আরবের আকাশ ফিঁকে হলেও যুক্তরাষ্ট্রের জন্যে খুলে দিয়েছে সম্ভাবনার হাজারটা দুয়ার। ইরাক যুদ্ধকে আশ্রয় করে মধ্যপ্রাচ্যের রাজনীতির খোলনলচে পাল্টে দেওয়ার স্বপ্ন ছিল যুক্তরাষ্ট্রের। আরেকটু খোলাসা করে যদি বলি, রুশ সাম্রাজ্যের পতনের পরও আরব তথা মধ্যপ্রাচ্যের যেসব দাম্ভিক স্বৈরাচার এখনও প্রাণপনে মস্কোর ধ্বজা ধরে আছেন তাদের শিক্ষা দেওয়া এবং মধ্যপ্রাচ্যে রয়ে যাওয়া রাশিয়ার অবশিষ্ট লেজুড়টুকুও ছিন্ন করা ছিল এই যুদ্ধের অন্যতম একটি কারণ।

২০১০-১১ সময় কালটা যদি ফিরে দেখি; যুদ্ধের বহুমুখী অভিঘাতে ইরাকের অবস্থা হয়েছে ত্রিশঙ্কু। চরম পর্যায়ে পৌঁছে গেছে শিয়া-সুন্নি সংঘাত। প্রতিদিন দেশের কোথাও না কোথাও ডজন ডজন শিয়া না হয় সুন্নি মরছে। আজ শিয়া শহর কারবালায় আত্মঘাতী হামলা, তো কাল সুন্নি শহর ফালুজায় সিরিজ বোমা হামলা। শিয়াপন্থী সরকার চাইছে সুন্নিদের বংশ নির্বংশ হোক আর সুন্নিরা পণ করেছে ইরাকের মাটি থেকে শিয়া শব্দটিকেও কবর দিতে। শিয়া-সুন্নি দ্বন্দ্বের মাঝখানে খনিজ সমৃদ্ধ কুর্দীরা চাইছে সুযোগ বুঝে নিজেদের আজন্ম লালিত স্বপ্ন; স্বাধীন কুর্দী ভূখণ্ড গড়ার কাজটি পাকা করে ফেলতে। বুশের 'অপারেশন ইরাক ফ্রিডম'কে কেন্দ্র করে গোষ্ঠিগত সংঘাতের সূত্র মেনে ইরাক তখন তিন টুকরো হবার জোগাড়। প্রায় এক দশকের দখলদারিত্বের পর যুক্তরাষ্ট্র যখন দেখল যে যথেষ্ট হয়েছে আর যুদ্ধবাজির দরকার নেই। কারণ বাদবাকি যুদ্ধটা অর্থাৎ ভবিষ্যতের নিরন্তর লড়াইটা চালিয়ে যাবার জন্য এবার ইরাকের শিয়া সুন্নি আর কুর্দীরাই যথেষ্ট, তারাই ভাই-ভাইয়ে রক্ত ঝরাতে সক্ষম, তখন ইরাকের কথিত 'গণতন্ত্র আর মুক্তির' অভিযান শেষ করেছে যুক্তরাষ্ট্র। রাশিয়ার প্রভাব থেকে ইরাকের মুক্তি তো এলো; কিন্তু আরব তথা মধ্যপ্রাচ্যের বাদবাকি যে দেশগুলোতে এখনও ক্ষীণ শব্দে রাশিয়ার বানানো জঙ্গি বিমান ওড়ে, কামান ফোটে মার্কিন এম-সিক্সটিন রাইফেলের বদলে কালাশনিকভ শোভা পায় সেই সিরিয়া-লিবিয়া আর ইরানের কী হবে?

লিবিয়ার বেলায় যুক্তরাষ্ট্রের ভ্রুকুঞ্চিত এই প্রশ্নের জবাবটি সহজ করে দিল আরব বসন্ত। গাদ্দাফি বিরোধী গণজোয়ারের সুযোগে রাতারাতি লিবিয়ার বিদ্রোহী ফ্রন্টের হাতে পৌঁছে গেল টনকে টন অস্ত্র। বহুধাবিভক্ত লিবিয়-সমাজ;

BanglaBook.org

যে দেশে কিনা প্রায় দেড়শটি উপজাতি একে অপরকে শত্রুজ্ঞান করে। কোনো এক মন্ত্রবলে তাদের সবাই গাদ্দাফি বিরোধী লড়াইয়ে এক হয়ে গেল। ন্যাটোর বিমান থেকে তাদের জন্য আকাশ থেকে হুরপরী নেমে আসার মতোই নেমে এলো ইউরোপ আমেরিকার নিত্য নতুন সমরাস্ত্র।

ন্যাটোর অস্ত্রে লিবিয়ার গাদ্দাফি বিরোধী লড়াই এবং গাদ্দাফিকে হত্যার কয়েক মুহূর্ত আগের ছবি

সেই অস্ত্রের জোরে ইরাকি নেতা সাদ্দাম হোসেনের মতোই মর্মান্তিক পরিণতি বরণ করতে হলো লিবিয়ার চার দশকের একনায়ক মুয়াম্মার গাদ্দাফিকে। তিনিও সাদ্দাম হোসেনের মতো লিবিয়ার প্রত্যন্ত এলাকার একটি গর্তে লুকিয়েছিলেন। আটকের কয়েক মিনিটের মধ্যে তার মাথায় পিস্তল ঠেকিয়ে গুলি করে হত্যা করে বিদ্রোহীরা। যে কিনা হরহামেশা প্রকাশ্যে মার্কিন

নেতাদের গর্দান নেওয়ার হুমকি দিতেন সেই লৌহমানব গাদ্দাফির পরাজয় কি তবে আরব বসন্তের ফল? না। এটা স্পষ্ট যে গাদ্দাফি বিরোধীরা যদি যুক্তরাষ্ট্র ও ন্যাটোর প্রকাশ্য মদত না পেত তাহলে লিবিয়ার ফলাফলটা অন্যরকম হতে পারত। যে কারণে গাদ্দাফির এমন করুণ পরিণতি, ঠিক একই কারণে আজও ক্ষমতার মসনদে বাহরাইন-ইয়েমেন-আর জর্ডানের স্বৈরশাসকরা। প্রশ্ন ওঠে আরব বসন্ত নামের তারুণ্যের এই গণজোয়ারও কি তবে পরিকল্পিত ছিল?

এই প্রশ্নের জবাব পাওয়া যাবে লিবিয়ার আজকের পরিস্থিতির দিকে তাকালে। অবধারিতভাবে লিবিয়াকেও আজ ক্রমশ ইরাকের পরিণতি বরণ করে নিতে হচ্ছে। গাদ্দাফিকে পতনের জন্য বিনা-পয়সায় যুক্তরাষ্ট্র আর ন্যাটোর দেওয়া টনকে টন অস্ত্র এখন লিবিয়ার বিবদমান কয়েকশ গ্রুপের যুবকদের হাতে। নব্বুই'র দশকে আফ্রিকার কঙ্গো রুয়ান্ডা আর লাইবেরিয়ার পরিস্থিতি যেন ফিরে এসেছে লিবিয়ায়। এক সময় আফ্রিকার যুদ্ধবাজ জেনারেল রাজনৈতিক নেতা আর আমলাদের মতো লিবিয়ার ক্ষমতাধররাও এখন ব্যক্তিগত স্বশস্ত্র বাহিনী পুষছেন। বিপক্ষ গ্রুপের সাথে স্বার্থের দ্বন্দ্বে রক্তরক্তি করাই এদের কাজ। লিবিয়ায় এখন এমন গ্রুপের সংখ্যা শতাধিক। স্বয়ং দেশের প্রধানমন্ত্রীকেও অস্ত্রের মুখে তুলে নিয়েছিল এমনি একটি গ্রুপ। এদের অন্তত একডজন গ্রুপ এরই মধ্যে নিজেদের আল কায়দা তথা আইএস'র মতো উগ্রপন্থায় বিশ্বাসী বলে ঘোষণা দিয়েছে। ২০১৩ সালে লিবিয়ার মার্কিন দূতাবাসে এমনি একটি গ্রুপের তাণ্ডবে প্রাণ হারান স্বয়ং মার্কিন রাষ্ট্রদূত। অবস্থা এমন যে দু বেলা দুমুঠো খাবার বা কর্মসংস্থান জোগাড়ের চাইতেও লিবিয়ায় এখন একটা অস্ত্র জোগাড় করে ফেলা সহজ। এই পরিস্থিতিতে একটি দেশের সার্বিক সামাজিক শৃংখলা কোথায় গিয়ে দাঁড়ায় সেটা সহজেই অনুমেয়। ২০১৪ সালের অক্টোবরে প্রকাশিত হিউম্যান রাইটস ওয়াচের এক রিপোর্টে বলা হয়েছে, আইনের শাসনের পরিবর্তে লিবিয়া যেন ক্রমশ: অস্ত্রের শাসনের দেশে পরিণত হয়েছে। যেখানে অস্ত্রধারীরা কথায় কথায় অস্ত্রের ভাষা প্রয়োগ করছে। বেসামরিক এলাকায় পর্যন্ত ভারী অস্ত্রের ব্যবহার ঘটছে। যা কিনা স্পষ্টতই যুদ্ধাপরাধ। লিবিয়ার বর্তমান অবস্থাকে ২০১১ সাল পূর্ববর্তী যে কোনো সময়ের তুলনায় জঘন্য বলে মন্তব্য করেছে হিউম্যান রাইটস ওয়াচ। গাদ্দাফি পতনের পর থেকে এ পর্যন্ত লিবিয়ার ২ লাখ ৮০ হাজার মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছে। কোনোরকম রাজনৈতিক এবং প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা না থাকায় নৈরাজ্যজনক এই পরিস্থিতিতে এখন ওয়াশিংটনের কাছেই ধর্ণা দিতে হচ্ছে লিবিয়ার নতুন সরকারকে। ফলে মার্কিন বলয়ই হয়ে উঠেছে দেশটির অনিবার্য ভবিতব্য। আর এটাই ছিল যুক্তরাষ্ট্রের লক্ষ্য।

BanglaBook.org

লিবিয়ায় অস্ত্রের এমন ব্যবহার এখন রোজকার ঘটনা। এমনকি বিমানবিধ্বংসী ভারি অস্ত্রও সেখানে সহজলভ্য

কুয়েত ওমান বাহরাইন আর ইয়েমেনের মতো যুক্তরাষ্ট্রের সাম্রাজ্যবিরোধী যুদ্ধের সহযোগী বন্ধু রাষ্ট্রগুলোতেও আছড়ে পড়েছিল আরব বসন্তের ঢেউ। হাজারো আন্দোলনকারীকে হত্যার মধ্য দিয়ে কঠোর হাতে সেই আন্দোলন দমন করেছে এই দেশগুলোর দীর্ঘদিনের স্বৈরশাসকরা। ইয়েমেনে স্নাইপার রাইফেল দিয়ে বেছে বেছে আন্দোলনকারীদের হত্যা করা হয়েছে। বাহরাইনে শান্তিপূর্ণ মিছিলে গুলি চালিয়ে, সামরিক যান তুলে দিয়ে হত্যা করা হয়েছে শতাধিক মানুষকে। গণতন্ত্রকামী বিক্ষোভ দমন করতে বাহরাইনের মাটিতে হাজির হয়েছে সাড়ে চার হাজার সৌদি সেনা। এই সেনাদের ইচ্ছেমাফিক গুলি

BanglaBook.org

চালাবার ক্ষমতা দিয়েই মাঠে নামিয়েছিল দেশটির রাজতান্ত্রিক শাসক। বাহরাইনে আন্দোলনে জড়িত কত মানুষ যে গুপ্ত হত্যার শিকার হয়েছে তার কোনো হিসাব নেই। এসব হত্যাকাণ্ড নিয়ে কখনও কোনো প্রশ্ন তোলেনি যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিমা বিশ্ব। অথচ প্রায় একই সময় সিরিয়ায় চলা বাশার বিরোধী বিক্ষোভ নিয়ে পশ্চিমা বিশ্ব ও তাদের গণমাধ্যমের মাথা ব্যথার অন্ত ছিল না। এর কারণ একটাই। বাহরাইন হলো সৌদি আরবের মতোই যুক্তরাষ্ট্র তথা ইউরোপের পরীক্ষিত বন্ধু। সেই বাহরাইনে এখন ২ কোটি ৩০ লাখ ডলার খরচ করে একটি স্থায়ী সেনাঘাঁটি গড়তে চলেছে বৃটেন। উদ্দেশ্য আইএস জঙ্গিদের হাত থেকে মধ্যপ্রাচ্যকে রক্ষা করা। বাহরাইনের রাজতান্ত্রিক শাসকগোষ্ঠিও এতে সন্তুষ্ট। কারণ যুক্তরাষ্ট্র আর পশ্চিমা বন্ধুরাই তাদের ক্ষমতার মসনদ রক্ষা করবে। একই ধারাবাহিকতায় আল কায়দা দমনের নামে মার্কিন ড্রোনের জন্যে অবারিত হয়েছে ইয়েমেনের আকাশ।

রইল বাকি এক, বাশার আল আসাদ। যে দেশটিকে চড়া দামে শুধতে হচ্ছে আরব বসন্তের ঋণ সেটি সিরিয়া। লিবিয়ার মতো সিরিয়াতেও রাতারাতি ক্ষমতার পালাবদল ঘটতে পারত। গাদ্দাফির পরিণতি বরণ করতে পারতেন বাশার আল আসাদ। কিন্তু সিরিয়ার পরিস্থিতি তো লেবাননের মতো অত সরল আর একমুখী নয়। বরং মধ্যপ্রাচ্যের হাজারো চরিত্রের হাজার রকম স্বার্থগত দ্বন্দ্ব আর তাদের ইন্ধনকে কেন্দ্র করে বহুমুখী সংঘাতের এক রক্তাক্ত মঞ্চ হয়ে উঠেছে সিরিয়ার রণাঙ্গন।

সিরিয়ার চার বছরের গৃহযুদ্ধ কেড়ে নিয়েছে অন্তত ২০ হাজার শিশুর প্রাণ

এটি সম্ভবত বিশ্ব ইতিহাসের একমাত্র রণাঙ্গন যেখানে কেউ একক কোনো লক্ষ্য নিয়ে লড়ছে না। সমর বিশারদরা বলে থাকেন লড়াইয়ের লক্ষ্যের ওপরই নির্ভর করে যুদ্ধের ধরণ। কিন্তু সিরিয়ার 'বহু মাথা বিশিষ্ট' এই যুদ্ধ দানবের লক্ষ্যটাও বহুমুখী। আঞ্চলিক বৈশ্বিক আর উগ্রপন্থার রাজনীতির জটিল

সমীকরণের গোলক ধাঁধায় ঘুরপাক খাচ্ছে এই রণাঙ্গনের লক্ষ্য উদ্দেশ্য। প্রতিমুহূর্তে বদলাচ্ছে এই যুদ্ধের গতিমুখ। তাই বাশার বিরোধীদের উত্তাল গণজাগরণকে কেন্দ্র করে সিরিয়ার এই রণাঙ্গণকে বিশাল এক রঙ্গমঞ্চ হিসেবে হাজির করেছে যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিমা বিশ্ব। সিরিয়ার রক্তাক্ত রণাঙ্গণ হয়ে উঠেছে মধ্যপ্রাচ্য তথা বিশ্ব রাজনীতির অন্যতম ক্রীড়নক।

গোটা দুনিয়ার আল কায়দা'র সন্ত্রাসীরা যুক্তরাষ্ট্র তথা পশ্চিমা বিশ্বের এক নম্বর শত্রু এটা সবার জানা। কিন্তু সিরিয়ার আল কায়দা যে যুক্তরাষ্ট্রের বন্ধু এটি অনেকেরই জানা নেই। আসাদকে ক্ষমতা থেকে সরাতে মরিয়া যুক্তরাষ্ট্র আর ন্যাটো যখন সেই আল কায়দার হাতে দেদার অস্ত্র তুলে দিল তখন থেকেই পাল্টে গেল এই যুদ্ধের গতিপ্রকৃতি। এর মধ্য দিয়ে প্রকারান্তরে দুনিয়ার তাবত ধর্মীয় উগ্রপন্থীদের কাছে এই বার্তাই পৌঁছানো হলো যে; ধর্মরক্ষার রণাঙ্গন এখন সিরিয়া। ফ্রি সিরিয়ান আর্মি যখন পশ্চিমা দুনিয়ার দেদার মদত পাচ্ছিল তখন এই যুদ্ধের গতিমুখ যেখানে ছিল, এখন রাতারাতি ভিন্ন চেহারা নিয়ে হাজির হয়েছে লড়াইয়ের স্বরূপ। একইভাবে সৌদি আরব, কাতার, কুয়েত, জর্ডান, তুরস্ক, ইসরাইল, ইরান, যুক্তরাষ্ট্র এবং পশ্চিমা দুনিয়ার ভিন্ন ভিন্ন স্বার্থের দানবীয় এক ক্রীড়নকে পরিণত হয়েছে সিরিয়া। যেখানে সৌদি আরবের কাজ হলো গোপনে আইএস-এর মতো সুন্নি উগ্রপন্থীদের মদত দিয়ে শিয়াদের ঘায়েল করা। ইরান ও ইরাকের কাজ হলো শিয়াদের মদত দিয়ে সুন্নিদের ঘায়েল করা। তুরস্কের কাজ হলো কুর্দীরা যাতে কোনোভাবেই অর্থ অস্ত্র আর সক্ষমতায় শক্তিশালী হয়ে না ওঠে সেই লক্ষ্যে বিপক্ষ শক্তি হিসেবে সুন্নি জঙ্গিদের হাতে রাখা। আর এই লক্ষ্য পূরণে প্রকাশ্যে ন্যাটোর শক্তি বাড়ানোর কথা বললেও তলে তলে আইএস জঙ্গিদের মদত দিতেও পিছপা হচ্ছে না তুরস্ক। ইসরাইলের লক্ষ্য হলো শিয়া সুন্নি দ্বন্দ্বকে উস্কে দিয়ে এই অঞ্চলকে দীর্ঘমেয়াদে অস্থিতিশীল করে তোলা। কারণ এই অঞ্চলের মুসলিমরা ভাইয়ে ভাইয়ে রক্ত ঝরালে, প্রতিনিয়ত দ্বন্দ্ব সংঘাতে ব্যস্ত থাকলে ফিলিস্তিনে প্রশ্নহীন আগ্রাসন জারি রাখাটা সহজ হয়। গাজার মানুষদের ভূমিতে অবৈধ বসতি গড়ে স্বপ্নের ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের সম্ভাব্য মানচিত্রটাকে বেমালুম গায়েব করে দেওয়াও সম্ভব হয়। এ কারণেই কি সাম্প্রতিক সময়ে গাজায়, পশ্চিমতীরে অবৈধ বসতি নির্মাণের হিড়িক পড়েছে? এই সুযোগেই কি ৫০ দিনের আগ্রাসনে গাজার প্রায় তিনহাজার মানুষকে হত্যা করা হয়েছে?

আসা যাক যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থ প্রসঙ্গে। সিরিয়ার লড়াইয়ে যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিমা বিশ্বের লক্ষ্য হলো শিয়া সুন্নি বা কুর্দী যখন যাকে দরকার তাকে মদত দিয়ে

BanglaBook.org

এই অঞ্চলকে দীর্ঘমেয়াদে অস্থিতিশীল করে তোলা। তাহলে সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধের একটি দীর্ঘমেয়াদি রণাঙ্গন খাড়া থাকে, টেকে যুদ্ধ বাণিজ্য। তেমনি গোটা অঞ্চলে অন্য যে কোনো সময়ের তুলনায় সরাসরি মার্কিন প্রভাবটা আরও বেগবান করে তোলা যায়। যুক্তরাষ্ট্রের 'নিও কনজারভেটিভ থিংক ট্যাংক'দের ১৯৯৮ সালের প্রস্তাবনার কথাটি স্মরণ করুন। নতুন শতকে মধ্যপ্রাচ্যের রাজনীতির খোলনলচে পাল্টে দেবার স্বপ্ন দেখেছিলেন ডিকচেনি উলফউটজ আর রামসফেল্ডরা। নতুন শতকের এক দশকের মাথায় কেবল ইরাক যুদ্ধ দিয়েই মধ্যপ্রাচ্যকে নিজেদের করে নিতে চলেছে যুক্তরাষ্ট্র। সেই সঙ্গে সফল হতে চলেছে এই অঞ্চলে একক মার্কিন প্রভাব বিস্তারের স্বপ্ন।

বলছিলাম সিরিয়ার কথা। ত্রিমুখী-চতুর্মুখী লড়াইয়ের অভিঘাতে এই মুহূর্তে বিশ্ব ইতিহাসের সবচেয়ে নৈরাজ্যময় ভূখণ্ডে পরিণত হয়েছে সিরিয়া। এই রণাঙ্গনের চরিত্র এমনই কিম্ভূতকিমাকার যে এখানে কে কার পক্ষে লড়ছে, কে কার শত্রু বা মিত্র এমনকি এই রণাঙ্গনের যোদ্ধারাও সেটা গুলিয়ে ফেলেন। একটা উদাহারণ দেওয়া যাক। ঘটনাটি ২০১৩ সালের মাঝামাঝি সময়ের। আল কায়দা সমর্থিত জঙ্গিদল আল নুসরা ফ্রন্টের একজন কমান্ডার ধরা পড়েছেন আইএস জঙ্গিদের হাতে। সুন্নি জঙ্গিদের হাতে নুসরা ফ্রন্টের ওই কমান্ডার ভেবেছিলেন, যাদের হাতে আটক হয়েছেন তারা সম্ভবত শিয়া অনুসারী কোনো গ্রুপ। প্রাণ বাঁচাতে ওই কমান্ডার শিয়ারীতি অনুসরণ করে প্রার্থনা করতে শুরু করলেন। আর শুধু এ কারণেই আইএস জঙ্গিদের হাতে তার প্রাণ গেল। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে আইএস আর নুসরা ফ্রন্টের মধ্যে রক্তারক্তি বেধে যায়। সিরিয়ায় বিবদমান গ্রুপগুলো যারা কিনা সবাই মুসলিম কিন্তু প্রতিনিয়ত একে অন্যের রক্ত ঝরাচ্ছে, তাদের পরিচয় ও শত্রুমিত্রের খতিয়ান তুলে ধরার মধ্যদিয়ে এই রণাঙ্গনের প্রকৃতি কিছুটা হলেও বোঝা সম্ভব।

BanglaBook.org

নিষিদ্ধ রাসায়নিক অস্ত্র ব্যবহার করে বেসামরিক মানুষ হত্যা ও ব্যাপক মানবাধিকার লংঘনের অভিযোগ রয়েছে সিরিয়ার সরকারি বাহিনীর বিরুদ্ধে

সিরিয়ান আর্মড ফোর্স: এটি সিরিয়ার সরকারি বাহিনী। সৈন্য সংখ্যা অন্তত আড়াই লাখ। প্রেসিডেন্ট বাশার আল আসাদের শত্রুরাই এই বাহিনীর শত্রু। এছাড়াও রয়েছে আরও দুটি বাহিনী—জেনারেল সিকিউরিটি ডিরেক্টরেট এবং ন্যাশনাল ডিফেন্স ফোর্স। সৈন্য সংখ্যা যথাক্রমে আট হাজার এবং আশি হাজার। এছাড়া বাথ ব্রিগেড ও সাবিহা মিলিশিয়া নামে সিরিয়ার ক্ষমতাসীন দলের অনুগতদের নিয়ে রয়েছে আরও একটি বাহিনী। সিরিয়ার অস্ত্রের মূল যোগানদাতা রাশিয়া। গৃহযুদ্ধ শুরুর পরও রাশিয়ার কাছ থেকে বিভিন্ন প্রজন্মের ক্ষেপণাস্ত্র কিনেছেন বাশার আল আসাদ। রয়েছে শক্তিশালী বিমান বাহিনী। বিদ্রোহী নিয়ন্ত্রিত এলাকায় বিমান হামলার মাধ্যমে প্রায়ই রণাঙ্গনে সুবিধা আদায় করে নিচ্ছে সরকারি সেনারা।

BanglaBook.org

সিরিয়ার রণাঙ্গনে যোগ দিয়েছে অন্তত সাত হাজার হেজবুল্লাহ গেরিলা

হেজবুল্লাহ গেরিলা: লেবাননভিত্তিক শিয়া মুসলিমদের এই দলটিও জড়িয়েছে সিরিয়ার রণাঙ্গনে। বাশার আল আসাদের পক্ষে লড়াই করা ছাড়াও ইরাক-সিরিয়ায় আইএস জঙ্গিদের মতো সুন্নি জঙ্গিদের চালানো শিয়া গণহত্যার প্রতিশোধ নিতে সিরিয়ার রণাঙ্গনে লড়ছে হেজবুল্লাহ'র ৭ হাজার যোদ্ধা। আইএস ও আলকায়দা জঙ্গিরাই তাদের প্রধান শত্রু। হেজবুল্লাহ গেরিলাদের অন্যতম মদতদাতা ইরান। লেবাননভিত্তিক এই দলটির সিরিয়ার যুদ্ধে জড়ানোর পেছনেও ইরানের আর্থিক ও সামরিক মদত রয়েছে। প্রশিক্ষিত হেজবুল্লাহ গেরিলাদের হাতে বিমান ধ্বংসী স্টিংগার মিসাইল থেকে শুরু করে ড্রোন পর্যন্ত রয়েছে। ২০১৩ সালে ইসরাইলের আকাশে ঢুকে পড়া হেজবুল্লাহ গেরিলাদের একটি ড্রোন ভূপাতিত করেছিল তেলআবিব। তবে সুন্নি গেরিলাদের মতো হেজবুল্লাহ গেরিলারা কট্টর ও নৃশংস নয়। অকারনে বেসামরিক মানুষ বা অমুসলিম হত্যায় বিশ্বাসী নয় লেবাননের হাসান নসরুল্লাহ নেতৃত্বাধীন এই গেরিলা দলের সদস্যরা।

আল আব্বাস ব্রিগেড: ইরাকভিত্তিক শিয়া অনুসারী এই দলটি হেজবুল্লাহ ও সিরিয়ার সরকারি বাহিনীর সাথে জোটবদ্ধ হয়ে আইএস-এর মতো সুন্নি জঙ্গিদের বিরুদ্ধে লড়ছে। আট থেকে দশ হাজার যোদ্ধা রয়েছে আল আব্বাস ব্রিগেডের।

রেভ্যুলেশনারি গার্ডস কর্পস ইরান: শুরু থেকে অস্বীকার করে এলেও ২০১২ সালে ইরানি কর্তৃপক্ষ স্বীকার করেছে যে সিরিয়ার গৃহযুদ্ধে যোগ দিয়েছে রেভ্যুলেশনারি গার্ডসের অন্তত এক হাজার সদস্য। পরিচয় গোপন রাখতে ইরানের বিশেষ বাহিনীর সদস্যরা হেজবুল্লাহ গেরিলার পরিচয়ে বাশার

BanglaBook.org

বিরোধী ফ্রি সিরিয়ান আর্মির সুন্নি জঙ্গিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে। এখনও ইরানের অজ্ঞাত সংখ্যক শিয়া যোদ্ধা সিরিয়ায় লড়ছে। প্রেসিডেন্ট বাশার আল আসাদের বন্ধুরাষ্ট্র ইরানের উদ্দেশ্য সুন্নি জঙ্গিদের নির্মূল করা।

ফ্রি সিরিয়ান আর্মির যোদ্ধা

ফ্রি সিরিয়ান আর্মি: আগস্ট ২০১১ সালে আসাদ বিরোধী আন্দোলনের প্রথম সুযোগেই গঠিত হয় ফ্রি সিরিয়ান আর্মি। কর্নেল রিয়াদ আল আসাদের নেতৃত্বে বাশার আল আসাদ অনুগত সেনাবাহিনীর কয়েকজন দলছুট সেনা কর্মকর্তার হাত ধরে তুরস্কে গঠিত হয় এই বাহিনী। তবে অল্প কিছুদিনের মধ্যেই ইউরোপ, যুক্তরাষ্ট্র ও আরব দেশগুলোর আর্থিক সামরিক সমর্থনের মধ্যদিয়ে বাশার বিরোধী লড়াইয়ের কেন্দ্রে থাকা বাহিনীতে পরিণত হয় ফ্রি সিরিয়ান আর্মি। বিভিন্ন মত-পথ আর দল উপদলে বিভক্ত হাজারো যোদ্ধার ব্যানার হয়ে উঠে এই বাহিনী। ফলে কার্যত রণাঙ্গনে ফ্রি সিরিয়ান আর্মি'র যোদ্ধাদের ওপর দলটির নেতাদের কোনো নিয়ন্ত্রন ছিল না। সেই নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আরব বিশ্ব বিশেষ করে সৌদি আরবের মধ্যস্থতায় ২০১২ সালে একটি সুপ্রিম মিলিটারি কাউন্সিল গঠন করে ফ্রি সিরিয়ান আর্মি। যার চিফ অব স্টাফ করা হয় জেনারেল মোহাম্মদ ইদরিসকে। উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম; রণাঙ্গনকে এই চারটি অঞ্চলে ভাগ করে চারজন কমান্ডারের অধীনে যুদ্ধ পরিচালনা শুরু করে দলটি। সংকটের শুরুটাও এখান থেকেই। কারণ তখন ফ্রি সিরিয়ান আর্মির পরিবর্তে দলটির পরিচিতি গড়ে ওঠে সুপ্রিম মিলিটারি কাউন্সিল বা এসএমসি নামে। আন্তর্জাতিক যোগাযোগ রক্ষা করা সৌদি মার্কিন অস্ত্রের চালান বুঝে নেওয়া এবং গণমাধ্যমের সাথে কথা বলা থেকে শুরু করে আঞ্চলিক কমান্ডগুলোর নিয়ন্ত্রণ সব কাজেই নেতা হিসেবে পরিচিত হচ্ছিলেন জেনারেল ইদ্রিস। ফলে কেন্দ্রীয় কমান্ডে দানা বাধে অসন্তোষ। যার ফলস্বরূপ নানা দল উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়ে ফ্রি সিরিয়ান

BanglaBook.org

আর্মি। এক সময় বিদেশি অর্থ আর অস্ত্র বন্ধ হলে কার্যত নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে ফ্রি সিরিয়ান আর্মির তৎপরতা। বর্তমানে দলটির যোদ্ধারা ফ্রি সিরিয়ান আর্মির ব্যানার ব্যবহার করে স্বতন্ত্রভাবে লড়ছে। বাশার আল আসাদমুক্ত গণতান্ত্রিক সিরিয়া গড়তে লড়ছে ফ্রি সিরিয়ান আর্মির চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ হাজার যোদ্ধা।

ইসলামিক ফ্রন্ট সিরিয়া: সালাফিপন্থী কট্টর সুন্নি জঙ্গিদের অন্যতম একটি মোর্চা ইসলামিক ফ্রন্ট সিরিয়া। নভেম্বর ২০১৩ সালে কট্টরপন্থী সাতটি ইসলামি দল মিলে তৈরি হয় এই জোট। জোটের বাকি সদস্য দলগুলো হলো, হরকাত আহরার আল শামস-ইসলামিয়া, জয়েশ আল ইসলাম, শুকোর আল শামস, লিওয়া আল তাওহীদ, লিওয়া আল হাক, আনসার আল শামস এবং কুর্দীস ইসলামিক ফ্রন্ট। সিরিয়ায় এখন পর্যন্ত বাশার বিরোধী সবচেয়ে বড় ইসলামি ফ্রন্ট এটি। কেবল ইরাক সিরিয়া নয়, মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশের উগ্র সালাফিপন্থী দলগুলো ইসলামি ফ্রন্টের ব্যানারে জোট বেঁধেছে। বিভিন্ন রণাঙ্গনে ভাগ হয়ে লড়ছিল এই ফ্রন্টের অন্তত পঁয়তাল্লিশ হাজার যোদ্ধা। মজার ব্যাপার হলো ২০১৩ সালের শেষ দিকে সিরিয়ার উগ্রপন্থী দলগুলোর প্রতি যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিমা বিশ্বের অর্থ অস্ত্রের মদতে ভাটা পড়লে এই জঙ্গি জোটে ভাঙ্গণ শুরু হয়।

শুরা কাউন্সিলের মাধ্যমে পরিচালিত হয় এই ফ্রন্ট। শুরা কাউন্সিলের প্রধান হলেন আহমেদ আল শাইখ। এদের সাথে আইএস জঙ্গি কিংবা আল কায়দা সমর্থিত আল নুসরা ফ্রন্টের মৌলিক কোনো পার্থক্য নেই। কারণ এই ফ্রন্টেরও লক্ষ্য বাশার আল আসাদকে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে সিরিয়ায় একটি শরিয়াভিত্তিক ইসলামি রাষ্ট্র কায়েম করা। আইএস-এর মতো এরাও সিরিয়ার 'জিহাদে' বিদেশি জিহাদিদের আমন্ত্রণ জানিয়েছে।

আহফাদ আল রাসুল ব্রিগেড: সুন্নিভিত্তিক জঙ্গি গ্রুপ আহফাদ আল রাসুল। বাশার আল আসাদের বিরুদ্ধে লড়লেও গ্রুপটি আইএস জঙ্গিদের বিরোধী। তবে আইএস জঙ্গিরা যখন আইএসআইএল নামে ইরাকের শিয়া সরকার বিরোধী তৎপরতা চালাচ্ছিল তখন তাদের সাথে জোট বেঁধেছিল এই দল। কিন্তু ইরাক ও সিরিয়ার সুন্নি উপজাতিদের ওপর আইএস জঙ্গিদের ব্যাপক হত্যাযজ্ঞ ও দমন পীড়নের পর দলটি সিরিয়ার মাটিতে আইএস-এর শত্রু হয়ে দাঁড়ায়। সিরিয়ার রণাঙ্গনে বাশার আল আসাদ এবং আইএস-এর বিরুদ্ধে লড়ছে এই দলের সাত থেকে নয় হাজার যোদ্ধা। কাতার সরকার এই গ্রুপটিকে অর্থ জোগান দেওয়ার মধ্যদিয়ে মদত দিচ্ছে বলে অভিযোগ রয়েছে। গ্রুপটির নেতা জিয়াদ হজ্জ ওবায়েদ।

BanglaBook.org

কেবল সিরিয় সেনা নয় শিয়া মুসলিম হত্যায়ও পিছিয়ে নেই ইসলামি ফ্রন্টের জঙ্গিরা। দুই শিয়া মুসলিমের মৃত্যু পরোয়ানা পড়ে শোনাচ্ছেন একজন

মার্টায়ার্স অব সিরিয়া ব্রিগেড: সিরিয়ার ইদলিবভিত্তিক কট্টরপন্থী সুন্নি গ্রুপ এটি। ইরাকে দলটি মার্টায়ার্স অব জাবাল আল জাওইয়া ব্রিগেড নামে পরিচিত। ২০১১ সালের শেষ দিকে দলটির তৎপরতা শুরু হয়। পরে ২০১২ সালে মার্টায়ার্স অব সিরিয়া ব্রিগেড নামে গ্রুপটির সিরিয়ায় যুদ্ধ শুরু করে বর্তমানে সিরিয়ার উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে লড়ছে। এই দলের প্রায় সাত হাজার যোদ্ধা। সিরিয়ায় ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাই এদের মূল লক্ষ্য।

হরকাত আল শাম আল ইসলামিয়া: এটিও ইদলিবভিত্তিক একটি সালাফিপন্থী কট্টর সুন্নি জঙ্গি দল। ২০১১ সালের শেষ দিকে গঠিত এই দলটি সিরিয়ার গৃহযুদ্ধের প্রথম দিকে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। ২০১২ সালের ডিসেম্বরে লিওয়া আল হক আর আহরার আল শামস-এর মতো সমমনা দশটি জঙ্গিগোষ্ঠিকে নিয়ে একটি জোট গঠন করে দলটি। সাবেক ইরাকি জঙ্গি নেতা হাসান আবোদের নেতৃত্বে ২০১৩ সালের শেষ দিকে সিরিয়ার সরকারি

BanglaBook.org

বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছিল এই জঙ্গি দল। তারাই প্রথম সিরিয়ার সরকারি বাহিনীর বিরুদ্ধে ইম্প্রোভাইস এক্সপ্লোসিভ ডিভাইস ব্যবহার করে। দলটির প্রযুক্তি জ্ঞানে অভিজ্ঞ একটি টেকনিকেল ডিভিশন রয়েছে। যারা একই সঙ্গে শত্রুপক্ষের বিরুদ্ধে সাইবার যুদ্ধও পরিচালনা করছে। এই দলের যোদ্ধা সংখ্যা অন্তত ২০ হাজার।

আলেপ্পোর খান আল আসাল এলাকায় বেসামরিক মানুষদের জড়ো করে হত্যার কয়েক মুহূর্ত আগের ছবি

জয়েশ আল ইসলাম: ২০১৩ সালে সিরিয়া ও ইরাকভিত্তিক অন্তত ৫০টি ছোটবড় সুন্নি জঙ্গি দলের সমন্বয়ে গড়ে ওঠে জয়েশ আল ইসলাম বা ইসলামের সেনাবাহিনী নামের এই জোট। তবে এখন এই জোটের দলগুলো বিভিন্ন উপদলে বিভক্ত হয়ে সিরিয়ায় লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। অভিযোগ রয়েছে জয়েশ আল ইসলাম গড়ে ওঠার পেছনে সৌদি আরবের প্রত্যক্ষ মদত রয়েছে। বলা হয়ে থাকে আল কায়দার বিকল্প হিসেবেই এই জঙ্গিদের বিশাল একটি জোটকে মাঠে নামানো হয়েছিল। এখনও এই জোটের অন্তত নয় হাজার যোদ্ধা সিরিয়ায় লড়ছে।

লিওয়া আল তৌহিদ: সিরিয়ার রণাঙ্গনে আলেপ্পোভিত্তিক এই জঙ্গি দলের অংশগ্রহণের শুরুটা ২০১২ সালে। যুদ্ধ শুরুর প্রথম ভাগেই আলেপ্পোর দখল নেয় লিওয়া আল তৌহিদ। উদারপন্থী এই মুসলিম গ্রুপটি সালাফিপন্থী সুন্নি বা আইএস জঙ্গিদের মতো ততটা কট্টর নয়। ছোট ছোট বিভিন্ন দল উপদল নিয়ে গঠিত লিওয়া আল তৌহিদ এখনও আলেপ্পোর রণাঙ্গনে সক্রিয়। নিজেদের দখল করা এলাকাকে তারা ইসলামি রাষ্ট্র ঘোষণা করেছে। সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা ও অধিকার রক্ষা এবং সরকার ব্যবস্থায় সাধারণ মানুষের মতামতকে প্রাধান্য দিয়ে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে দলটি। এক সময়

BanglaBook.org

আইএস বা নুসরা ফ্রন্টের মতো কট্টরপন্থীদের বিরুদ্ধে লড়ত এই দলটি। বর্তমানে তারা কেবল বাশার আল আসাদকে সমর্থন করা যোদ্ধাদের সাথেই লড়ছে। দলটির যোদ্ধা সংখ্যা অন্তত দশ হাজার।

অথেনটিসিটি এন্ড ডেভেলপমেন্ট ফ্রন্ট: সিরিয়ার আলেপ্পোভিত্তিক আরও একটি উদারপন্থী সুন্নি মুসলিম যোদ্ধাদের দল এটি। দলটি এর আগে ফ্রি সিরিয়ান আর্মি'র অন্তর্ভূক্ত ছিল। বর্তমানে এই দলের অন্তত ১৩ হাজার যোদ্ধা স্বতন্ত্রভাবে বাশাল আল আসাদ অনুগতদের বিরুদ্ধে লড়ছে। তবে দলটি আইএস জঙ্গিদের মতো ততটা কট্টর নয়।

নতুন জোট গঠনের ঘোষণা দিচ্ছেন আহমেদ ইসা আল শাইখ, রণাঙ্গনে সিরিয়ান ইসলামিক লিবারেশন ফ্রন্টের এক যোদ্ধা

সিরিয়ান ইসলামিক লিবারেশন ফ্রন্ট: বাশার আল বিরোধী বিশটি গ্রুপ নিয়ে ২০১২ সালে গড়ে ওঠে সিরিয়ান ইসলামিক লিবারেশন ফ্রন্ট বা এসআইএলএফ। তবে রণাঙ্গনে উগ্রপন্থীদের বাড়াবাড়ি এবং বেসামরিক মানুষকে হত্যার প্রশ্নে ভাঙন ধরে শক্তিশালী এই জোটে। ২০১৩ সালের

নভেম্বরে আহরার আল শাম, আনসার আল শাম আর কুর্দিস ইসলামিক ফ্রন্টের মতো সাতটি দল জোট ছেড়ে বেরিয়ে যায়। এবং নতুন একটি ইসলামি ফ্রন্টের ঘোষণা দেয়। শুকর আল শামস নামে জোটের আরেকটি সংগঠনের নেতা আহমেদ ইসা আল শাইখকে প্রধান বলে ঘোষণা করা হয়। এমন এক সময় সিরিয়ান ইসলামিক লিবারেশন ফ্রন্টে এই ভাঙন ধরে যখন বাশার আল আসাদ অনুগত বাহিনী আলেপ্পোর দ্বারপ্রান্তে চলে এসেছে। ভাঙনের আগে জোটের যোদ্ধা সংখ্যা ছিল ৪০ হাজার। তাদেরও লক্ষ্য, বাশার আল আসাদ মুক্ত সিরিয়ায় একটি ইসলামি রাষ্ট্র গড়ে তোলা।

আল নুসরা ফ্রন্ট: পুরো নাম দ্যা নুসরা ফ্রন্ট ফর দি পিপলস অব দ্যা লেভেন্ত। ২০১১ সালের মাঝমাঝি গড়ে ওঠে আল কায়দা সমর্থিত এই জঙ্গি দল। এর আগে ইরানভিত্তিক একটি আল কায়দা জঙ্গি গ্রুপ ও ইরাকের আইএস জঙ্গিদের সাথে জোট গড়ে ইরাকে মার্কিন ও শিয়া বিরোধী তৎপরতা চালাত দলটি। সিরিয়ার গৃহযুদ্ধ শুরুর পর দলটি ইরাক-সিরিয়ার সীমান্তবর্তী এলাকাগুলোতে লড়াই শুরু করে। ২০১২ সাল নাগাদ সিরিয়ার ১৪টি প্রদেশের মধ্যে ১১টিতেই ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে নুসরা ফ্রন্ট। ইদলিব, আলেপ্পো এবং দের আল জৌরের মতো শহরগুলোতে নুসরা ফ্রন্টের শক্তিশালী উপস্থিতি রয়েছে। বর্তমানে সিরিয়ার উত্তরাঞ্চলে রয়েছে নুসরা ফ্রন্টের জঙ্গিদের প্রভাব। নৃশংসতা আর বর্বরতার ক্ষেত্রে কট্টর সুন্নিপন্থী এই দলটির সাথে আইএস জঙ্গিদের বিশেষ কোনো পার্থক্য নেই। সিরিয়ার হাজারো বেসামরিক শিয়া ও খ্রিস্টান হত্যার জন্যে দায়ী নুসরা ফ্রন্ট। এমনকি নারী শিশুদেরও জবাই করে, ক্রুশবিদ্ধ করে নির্মমভাবে হত্যা করেছে কট্টরপন্থী এই দলটির জঙ্গিরা। সিরিয়ার প্রায় সবকটি বড় শহরে আত্মঘাতী হামলা চালিয়ে নিরপরাধ মানুষ হত্যার জন্যে নুসরা ফ্রন্টকে দায়ী করে থাকে বাশার সরকার। এসব হত্যা ও নির্যাতনের প্রমাণ দলটির ওয়েবসাইট। প্রায় প্রতিটি হত্যাকাণ্ডের ছবি স্বনামেই ইন্টারনেটে আপলোড করে থাকে নুসরা ফ্রন্ট। ২০১৩ সালে আইএস-এর সঙ্গে জোট গঠন করে নুসরা ফ্রন্ট। সে সময় আইএস জঙ্গিদের পরিচিত ছিল আইএসআইএল নামে। নুসরা ফ্রন্টের নেতা হলেন আবু মোহাম্মদ আল জুলানী। ইরাকের অসংখ্য বোমা হামলা চালিয়ে শত শত নিরিহ মানুষ হত্যার জন্য দায়ী জুলানি মার্কিন সেনাদের হাতে গ্রেফতারের পর ২০১১ সালে ইরাকি কারাগার থেকে মুক্তি পান। সে সময় আইএস নেতা বাগদাদিসহ হাজারো জঙ্গিকে রহস্যজনকভাবে মুক্তি দিয়েছিল যুক্তরাষ্ট্র। জুলানিও ছিলেন তাদের একজন। বলা হয় আল কায়দা নেতা আয়মান আল জাওয়াহিরির সাথে সরাসরি যোগাযোগ ছিল জুলানি'র। দলটির মোট যোদ্ধা সংখ্যা সম্পর্কে

BanglaBook.org

পরস্পরবিরোধী তথ্য পাওয়া যায়। মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএর দাবি নুসরা ফ্রন্টের অন্তত ৩০ হাজার সক্রিয় যোদ্ধা রয়েছে। আবার তুর্কী গোয়েন্দাদের ধারণা এই সংখ্যা প্রায় ৫০ হাজার।

বন্দি সিরিয় সেনাদের গণহত্যা এবং বেসামরিক শিয়া ও খ্রিস্টানদের ওপর গণহত্যার জন্য অভিযুক্ত আল নুসরা ফ্রন্ট

বাশার আল আসাদকে ক্ষমতাচ্যুত করা এবং সিরিয়ার রণাঙ্গনে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার অজুহাতে আল কায়দা জঙ্গি নুসরা ফ্রন্টকে অস্ত্র, অর্থ দিয়ে সাহায্য করেছিল যুক্তরাষ্ট্র নেতৃত্বাধীন পশ্চিমা জোট। নুসরা ফ্রন্টের মতো কট্টরপন্থী সুন্নি জঙ্গিদের অস্ত্র দিতে ২০১৩ সালের মে মাসে 'আল কায়দা'র ওপর আরোপিত অবরোধ তুলে নেয় ইউরোপিয় ইউনিয়ন। বৃটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী উইলিয়াম হেগ তখন বলেছিলেন, 'এর মধ্য দিয়ে আসাদ সরকারকে একটা সুস্পষ্ট বার্তা দিতে যাচ্ছে পশ্চিমা বিশ্ব'। একই মাসে এক গোপন সফরে সিরিয়া গিয়েছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের রিপাবলিকান সিনেটর জন ম্যাককেইন। সে সময় সিরিয়ার ইসলামি লিবারেশন ফ্রন্ট আর নুসরা ফ্রন্টের মতো কট্টর সুন্নি জঙ্গিদের সাথে বৈঠক করেছিলেন ম্যাককেইন। সিরিয়ার ইদলিবের ওই বৈঠকে আইএস এবং নুসরা ফ্রন্টের শীর্ষ জঙ্গি নেতারা উপস্থিত ছিলেন। এমনকি আইএস নেতা আবু বকর আর বাগদাদিও ইদলিবের ওই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বলে বিভিন্ন বার্তা সংস্থা ও সামাজিক যোগাযোগ ওয়েবসাইটে খবর রটেছিল।

আফগান রণাঙ্গনেও নিয়মিত হাজিরা দিতেন মার্কিন রাজনীতিক আর সিআইএ'র বড় বড় কর্তারা। সিরিয়ার রণাঙ্গনেও সেই একই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি দেখেছে বিশ্ব। ইউরোপিয় ইউনিয়নের পদক্ষেপ এবং ম্যাককেইনের এই বৈঠকের পর থেকে ঘুরতে শুরু করে সিরিয়া যুদ্ধের মোড়। বাশার আল

আসাদ 'পশ্চিমা বিশ্বের সুস্পষ্ট বার্তা' পেয়েছিলেন কিনা এই তথ্য জানা না গেলেও, ২০১৩ সালের শেষ দিকে ইরাক সিরিয়া জুড়ে শুরু হওয়া আইএস তথা সুন্নি জঙ্গিদের নরকতুল্য তাণ্ডবের কথা কারো অজানা নেই।

ABU BAKAR AL BAGHDADI MET JOHN MCCAIN IN IDLIB SYRIA MAY 27TH 2013. AT THAT TIME AL BAGHDADI WAS A MODERATE MUSLIM. AL BAGHDADI GET SOPHISTICATED WEAPONS, MONEY, AND TRAINING FROM CIA IN JORDAN

সিরিয়ার ইদলিবে আইএস এবং নুসরা ফ্রন্টের জঙ্গিদের সাথে মার্কিন সিনেটর ম্যাককেইনের বৈঠক

জয়েশ আল মুহাজেরিন ওয়া আল আনসার: যার বাংলা হলো অভিবাসী সেনা ও সাহায্যকারী। ২০১৩ সালে গঠিত এই দলের অধিকাংশ সদস্যই বিদেশি। ককেশিয় ও বলকান অঞ্চলের মুসলিম নাগরিকদের ব্যাপক অংশগ্রহণ রয়েছে এই দলে। চেচেন বিদ্রোহী নেতা ওমর আল শিশানি এই দলের নেতা। সিরিয়ার আলেপ্পো প্রদেশের হামা ও লাতকিয়া প্রদেশে দলটির কার্যক্রম। সিরিয়ায় ইসলামি রাষ্ট্র কায়েমের স্বপ্ন দেখা এই দলটির সাথেও আইএস জঙ্গিদের বিশেষ কোনো পার্থক্য নেই।

BanglaBook.org

কুর্দিস ইসলামিক ফ্রন্ট: সালাফিপন্থী উগ্র কুর্দী মুসলিম বিদ্রোহী দল এটি। সম্প্রতি হরকাত আহরার আল শামস এবং আইএস-এর সাথে জোট বেঁধেছে কুর্দীদের এই দলটি। আইএস জঙ্গিদের মতোই কট্টর ও নৃশংসতায় বিশ্বাসী এই দলের সদস্যরা। তবে তাদের লক্ষ্য হলো ইরাক ও সিরিয়ার কুর্দী ভূখণ্ডে স্বাধীন কুর্দীল্যান্ড গঠন করে ইসলামি রাষ্ট্র গড়ে তোলা।

পপুলার প্রটেকশান ইউনিট: কুর্দি রাজনৈতিক দল ডেমোক্রেটিক ইউনিটি পার্টির সামরিক শাখা হলো পপুলার প্রটেকশান ইউনিট। স্বাধীন কুর্দী আন্দোলনে কুর্দিস্তান ওয়ার্কাস পার্টির দীর্ঘদিনের সঙ্গি ডেমোক্রেটিক ইউনিটি। সিরিয়ার উত্তর পূর্বাঞ্চলে স্বাধীন কুর্দিস্তান গড়ার লক্ষ্যে গত কয়েক দশক ধরে আন্দোলন করছে দলটি। কিন্তু কট্টরপন্থী জঙ্গিদের হাতে ইরাক ও সিরিয়ার কুর্দীদের গণহারে হত্যা ও নির্যাতনের প্রতিশোধ নিতে ইরাকের কুর্দী সামরিক বাহিনী পেশমের্গার সাথে হাত মেলায় কুর্দিদের বিভিন্ন দল। সুন্নি জঙ্গিদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিতে বিভিন্ন রণাঙ্গনে আসাদ অনুগত সেনাদের সাথে একসঙ্গে লড়ছে কুর্দীরা। তাদের মোট সেনা সংখ্যা দশ থেকে পনের হাজার।

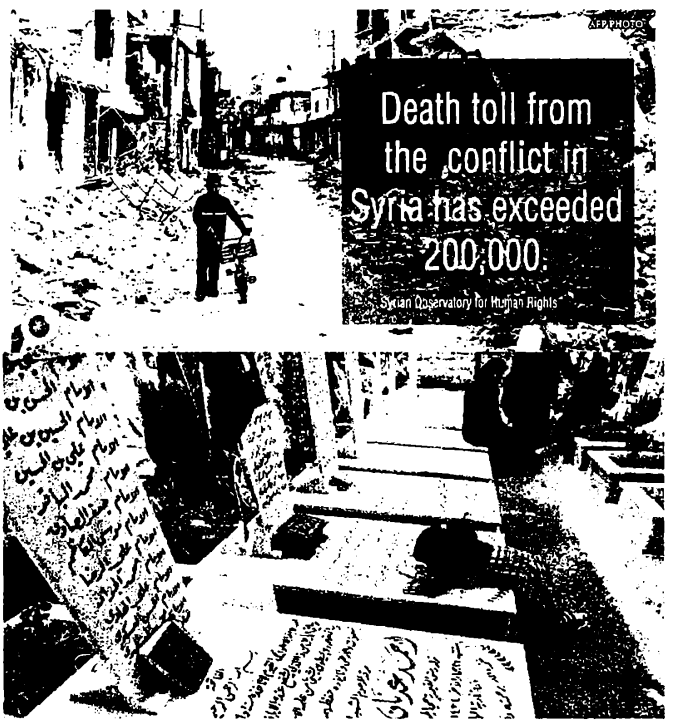

শিশুদের জন্যে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর দেশের তালিকায় সিরিয়ার অবস্থান এখন এক নম্বর

এই দীর্ঘ তালিকার বাইরেও সিরিয়ায় আরও কয়েক ডজন স্বশস্ত্র গ্রুপ প্রতি মুহূর্তে কারো না কারো রক্ত ঝরিয়ে চলেছে। বলে রাখা ভালো, যাহা নুসরা ফ্রন্ট তাহাই আইএস কিংবা যাহা সিরিয়ান ইসলামিক লিবারেশন ফ্রন্ট তাহাই আইএস। অর্থাৎ নানা নামে, নানা পতাকায় বিভক্ত সিরিয়ার সুন্নি কট্টরপন্থী জঙ্গিদের চূড়ান্ত গন্তব্য হলো আইএস। তার প্রমাণ পাওয়া গেল সেপ্টেম্বরে সিরিয়ার জঙ্গিদের ওপর মার্কিন নেতৃত্বাধীন যৌথ বাহিনীর হামলা শুরুর পর। মার্কিন জোটের হামলার পর ঘুঁচে যায় নুসরা ফ্রন্ট ও আইএস জঙ্গিদের দূরত্ব। এক ছাতার তলায় এসে জড়ো হয় সিরিয় রণাঙ্গনের প্রায় সবকটা কট্টর সুন্নি জঙ্গি গোষ্ঠি। এই মুহূর্তে বৃহত্তর সেই জঙ্গি ছাতাটির নামই আইএস।

সিরিয়ার জঙ্গিদের সাহায্য করা বা না করা প্রশ্নে মাত্র এক বছর আগের আর এক বছর পরের মার্কিন নীতি অনেকের কাছেই হাসির খোরাক জুগিয়েছে। এ যেন নিজের থুতু নিজেই চাটা। সিরিয়ার গৃহযুদ্ধ শুরুর পর প্রথমে গোপনে পরে প্রকাশ্যে এবং রীতিমত দম্ভভরে এই জঙ্গিদের মদত দিয়ে আবার তাদের বিরুদ্ধেই নতুন মোড়কে সেই একই সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধ শুরু করেছে যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্ররা। শুরু থেকেই যুক্তরাষ্ট্রের ওই পদক্ষেপকে আত্মঘাতী বলে আসছিল সিরিয়া, ইরান ও রাশিয়া। শেষ পর্যন্ত 'সেই তো নথ খসালি তবে কেন লোক হাসালি'র মতোই একটা হেজে গোবরে পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে পশ্চিমা বিশ্ব। কিন্তু যারা বলে থাকেন এটা যুক্তরাষ্ট্রের 'ভুল নীতি'র ফল তাদের খতিয়ে দেখা উচিত যে জেনে শুনেই যুগে যুগে এমন 'ভুল নীতির'ই পুজো করে আসছে যুক্তরাষ্ট্র। আর এটাই সম্ভবত মার্কিন প্রভাব বলয় গড়বার আসল নীতি। তবে এই মুহূর্তে সম্ভবত মধ্যপ্রাচ্যের সবচেয়ে সুখি মানুষ হলেন বাশার আল আসাদ। যে জঙ্গিরা তার স্বৈরাচারী মসনদের জন্যে আতঙ্কের কারণ হয়েছিল, তাদের বিরুদ্ধে এখন আর আসাদ অনুগত সেনাদের বৃথা রক্তক্ষয় আর শক্তিক্ষয়ের খুব দরকার হচ্ছে না। যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে এই জঙ্গিদের বিরুদ্ধে লড়ছে মোট ৬২টি দেশ। একের পর এক বিমান হামলায় গুড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে ইরাক আর সিরিয়ার জঙ্গি আস্তানা। মাত্র দুই মাসে ইরাক ও সিরিয়ার কয়েক হাজার জঙ্গি অবস্থানের ওপর বিমান হামলা চালিয়েছে যৌথ বাহিনী। যদিও কেবল বিমান হামলা দিয়ে এই জঙ্গিদের নির্মূলের মার্কিন পরিকল্পনা কতটা কাজে আসবে তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

বাশার আল আসাদের মসনদ টিকে থাকার প্রশ্নে এই জঙ্গিরা এখন আর খুব বড় হুমকি না হলেও, বিমান হামলা শুরুর পর ইরাক সিরিয়ার সাধারণ মানুষের জীবনে আগের চাইতে আরও বহুগুণে হুমকি বেড়েছে। পরিস্থিতি এমন যে, যেসব এলাকা বাশার আল আসাদ অনুগত সরকারি সেনাদের

BanglaBook.org

নিয়ন্ত্রণের বাইরে, সেসব এলাকায় নানা নামে নানা ব্যানারে ধারাবাহিক হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে যাচ্ছে জঙ্গিরা। আবার নিরাপদ নেই আসাদ নিয়ন্ত্রিত এলাকার সুন্নি মুসলিমরাও। তাদের শত্রু আর বিশ্বাসঘাতক হিসেবেই বিবেচনা করে সরকারি সেনারা। হামা হোমস আর দামেস্কের উপশহরের মতো বিভিন্ন শহরে আসাদ অনুগত সেনা কিংবা সরকারি গুপ্তঘাতক সাবিহা মিলিশিয়া'র হাতে কত মানুষের যে মৃত্যু হয়েছে তার সঠিক কোনো হিসাব নেই। ২১ আগস্ট ২০১৩ সালে দামেস্কের বিদ্রোহী নিয়ন্ত্রিত পৌটা এলাকায় রাসায়নিক অস্ত্রের হামলায় একদিনেই অন্তত ৪ শো শিশুসহ ১৪ শো মানুষকে হত্যা'র অভিযোগ রয়েছে সরকারি বাহিনী'র বিরুদ্ধে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে মার্কিন হামলার কবলে পড়তে যাচ্ছিল সিরিয়া। তবে জাতিসংঘের অধীনে রাসায়নিক অস্ত্রের মজুত ধ্বংসের মধ্য দিয়ে হামলা এড়িয়েছেন বাশার আল আসাদ।

ইরাক ও সিরিয়ার আইএস জঙ্গি অবস্থানের ওপর মার্কিন নেতৃত্বাধীন যৌথ বাহিনীর বিমান হামলা

একইভাবে শিয়া খ্রিস্টান কিংবা কুর্দীদের নৃশংসভাবে হত্যা করে যুদ্ধাপরাধের নিত্যনতুন নজির সৃষ্টি করে চলেছে কট্টরপন্থী সুন্নি জঙ্গিরা। এসব হত্যাকাণ্ডের বদলা নিতে রক্ত ঝরাচ্ছে শিয়া গেরিলারাও। জাতিসংঘের হিসাব মতে ২০১১ থেকে ২০১৪ পর্যন্ত চার বছরের গৃহযুদ্ধে সিরিয়ায় দুই লাখেরও বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে। আর সিরিয়ান অবজারভেটরি ফর হিউম্যান রাইটসের হিসেবে এই সংখ্যা প্রায় তিন লাখ। ২০১৪ সাল জুড়ে সিরিয়ায় নিহতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৭৬ হাজার। যাদের বেশিরভাগই বেসামরিক মানুষ। নভেম্বর ২০১৩ পযন্ত সিরিয়ার নানা বাহিনীর হাতে নিহত শিশুর সংখ্যা ছিল সাড়ে ১১ হাজার। আর নিহত নারীর সংখ্যা প্রায় ৭ হাজার।

BanglaBook.org

না সরকারি বাহিনী না উগ্র ধর্মীয় জঙ্গি গোষ্ঠি কারো কাছেই নিরাপদ নয় সিরিয়ার নারী শিশুরা। এমন ধারার বহুমুখী আর নৈরাজ্যজনক পাল্টাপাল্টি হত্যাকাণ্ডের নজির সম্ভবত বিশ্ব ইতিহাসে বিরল। যে কারণে ২০১৪ সালের সবচেয়ে অনিরাপদ দেশের তালিকার এক নম্বরে উঠে এসেছে সিরিয়ার নাম।

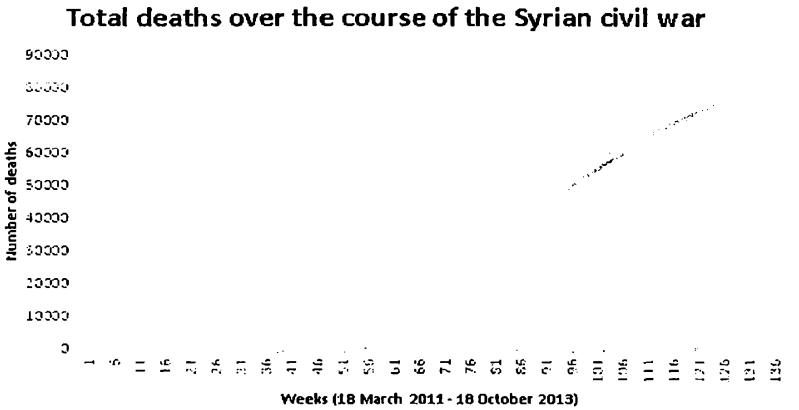

কেবল আরব বসন্ত আর সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট বাশার আল আসাদের ক্ষমতা আঁকড়ে থাকাই কি সিরিয়ার আজকের পরিণতির জন্যে দায়ী? নাকি আরব বসন্ত নামের চকচকে লোভাতুর এক মাকাল-ফলকে আশ্রয় করে আফগানিস্তানের মতোই এই ভূখণ্ডকে নতুন শতকের জঙ্গিবাদের নতুন বীজতলায় পরিণত করা হলো? কিভাবে বিশ্বের হাজারো তরুণ অবলিলায় সিরিয়ার রণাঙ্গনে পৌঁছে গেল? কারা এই মুসলিম যুবকদের অর্থ অস্ত্র আর প্রশিক্ষণের মদত দিয়ে মুসলিমদের বিরুদ্ধেই নিরন্তর একট যুদ্ধ চালিয়ে যাবার অভিনব পন্থা আবিষ্কার করল?

বিশ্লেষকরা বলে থাকেন ইরাক যুদ্ধ ছিল মধ্যপ্রাচ্যে যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাব বিস্তারের প্রথম পদক্ষেপ। আর সিরিয়ার রণাঙ্গনে আইএস তথা জঙ্গিবাদের চাষবাস ও তাদের পুনর্বাসনের মধ্য দিয়ে দীর্ঘমেয়াদে যুদ্ধ পরিস্থিতি জিঁইয়ে রাখাটা হলো এই দ্বিতীয় পদক্ষেপ। অতীতের মতো এখানেও যুক্তরাষ্ট্রের পাশে তার ঐতিহাসিক মুসলিম বন্ধু সৌদি আরব। দুই ভাই হাবিল-কাবিলের মতো ইরাক সিরিয়ার শিয়া সুন্নিদের ভ্রাতৃঘাতী সংঘাতের পেছনে এই দেশটির অবদানই সবচেয়ে বেশি। আর সেই অবদানের ফলাফল থেকেই সৃষ্টি বহুমাথা বিশিষ্ট দানব আইএস জঙ্গিদের।

BanglaBook.org

আইএস ও একজন বাগদাদি
অন্তরালে যুক্তরাষ্ট্র সৌদি আরব ইসরাইল

সুন্নি ছাড়া আর সবাইকে 'কাফের' গণ্য করার এক অদ্ভুত স্বঘোষিত তরিকা নিয়ে আবির্ভাব আইএস জঙ্গিদের। ইরাক সিরিয়ার শিয়া কুর্দী খ্রীস্টান আর ইয়াজিদিদের নির্বংশ করার দায়িত্ব নিয়েই যেন মাঠে নামানো হয়েছে এই জঙ্গিদের। কোথা থেকে এলো নতুন যুগের এই জঙ্গিদের বিধ্বংসী এমন পরিকল্পনা?

মধ্যপ্রাচ্যে শিয়া সুন্নি দাঙ্গা সৃষ্টির মার্কিন নীতি
ইরাকের সুন্নি জঙ্গিদের মদত
ইরাকে জঙ্গি সৃষ্টির মার্কিন কারাগার
বাগদাদির উত্থান ও বিজয়
আইএস ও নুসরা ফ্রন্টের জঙ্গিদের যুক্তরাষ্ট্র সৌদি আরব ও ইসরাইলের প্রশিক্ষণ

ব্রিটেনের ডেইলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট পত্রিকার সাংবাদিক-কলামিস্ট প্যাট্রিক কুকবার্ন। ২০১৪ সালের নভেম্বরে রয়াল ইউনাইটেড সার্ভিসের এক অনুষ্ঠানে বৃটিশ গোয়েন্দা সংস্থা এমআই সিক্সের সাবেক প্রধান স্যার রিচার্ড ডিয়ারলাভের সাথে তার কথা হচ্ছিল। ১৯৯৯ থেকে ২০০৪ সাল পর্যন্ত এমআই সিক্সের প্রধান ছিলেন তিনি। নাইন-ইলাভেন থেকে ইরাক যুদ্ধ পর্যন্ত সময়ের অনেক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলীর নীরব সাক্ষী এই কর্মকর্তা। তাদের আলাপের বিষয় ইরাক-সিরিয়া এবং আইএস জঙ্গি উত্থান। সাংবাদিক প্যাট্রিক কুকবার্নকে অকাট্য একটি সত্যের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন সাবেক এই গোয়েন্দা কর্মকর্তা। নাইন-ইলাভেন ট্রাজেডির কয়েকদিন আগের ঘটনা। প্রিন্স সুলতান বিন বানদার আল ফয়সাল তখন ওয়াশিংটনে সৌদি রাষ্ট্রদূত। ব্রিটিশ গোয়েন্দা প্রধান ডিয়ারলাভকে প্রিন্স বানদার বলছিলেন, 'মধ্যপ্রাচ্যে সেই দিন আর খুব বেশি দূরে নেই। যেদিন সবাই আল্লাহর কাছে হাত তুলে বলবে—হায় আল্লাহ! শিয়াদের রক্ষা করো। বিশ্বেও কোটি কোটি সুন্নিই তাদের জন্য যথেষ্ট'। নাইন-ইলাভেন পরবর্তী এক দশকের মাথায় প্রিন্স সুলতান বিন বানদারের এই ভবিষ্যৎ বাণী ইরাক-সিরিয়ার লাখো শিয়া জনগোষ্ঠির জীবনে মর্মান্তিক এক বাস্তবতা নিয়ে হাজির হয়েছে। শিয়া মুসলিমদের ওপর আইএস তথা সালাফিপন্থী উগ্র সুন্নি জঙ্গিদের নজিরবিহীন নৃশংস বর্বরতা দেখে তাবত দুনিয়া যেন বলছে 'হায় প্রভু শিয়াদের রক্ষা করো'।

আফগান রণাঙ্গনের ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় বিন লাদেনের আল কায়দা মোল্লা ওমরের তালেবান আর হাকিমুল্লাহ মেহসুদের তেহরিক ই তালেবান, এই তিন দুষ্টচক্রের জন্মদাতা যথাক্রমে যুক্তরাষ্ট্র, সৌদি আরব এবং পাকিস্তান। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিটা নতুন। বিন লাদেনের আল কায়দা বা মোল্লা ওমরের তালেবান কখনও টার্গেট করে কোনো মুসলিমকে হত্যা করেনি। সে কাবুলের কোনো শিয়াই হোক কিংবা আফগানিস্তানের কোনো উপজাতি মুসলিমই হোক। দখলদার পশ্চিমা বাহিনী ও তাদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট লক্ষ্যবস্তুই ছিল আল কায়দার লড়াইয়ের টার্গেট। এই প্রসঙ্গে স্বয়ং বিন লাদেনের একটি উক্তিও স্মরণ করা যায়। লাদেন একাধিক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, সাধারণ মানুষ বিশেষ করে অসহায় নারী শিশু সে যেই ধর্মেরই হোক, তাদের হত্যায় তিনি বিশ্বাসী নন। শিয়া-কুর্দী-তুর্কম্যান কিংবা আলাওয়াইত এরা সবাই মুসলিম। ইসলামের মূল স্তম্ভগুলোকে তারা অস্বীকার করেন না। আজ পর্যন্ত মুসলিম বিশ্বের কোনো ফতোয়া তাদেরকে অমুসলিম বলেও ঘোষণা করেনি। কিন্তু আইএস-এর মতো ইরাক সিরিয়ার সুন্নি জঙ্গিদের যুদ্ধটা যেন এই মুসলিমদের বিরুদ্ধেই। আরেকটু নির্দিষ্ট করে বললে সুন্নি ছাড়া আর সবাইকে 'কাফের'

BanglaBook.org

গণ্য করার এক অদ্ভুত স্বঘোষিত তরিকা নিয়ে আবির্ভাব এই জঙ্গিদের। মুসলিমদের এসব শাখা-প্রশাখাকে নির্বংশ (এথনিক ক্লিনজিং) করার দায়িত্ব নিয়েই যেন মাঠে নামানো হয়েছে এই জঙ্গিদের। কিন্তু কোথা থেকে এলো নতুন যুগের এই জঙ্গিদের মুসলিমঘাতী এমন বিধ্বংসী পরিকল্পনা? বলছিলাম সৌদি কর্মকর্তা প্রিন্স বানদারের ভবিষ্যদ্বাণীর কথা। তার ওই উক্তি এবং পরবর্তী ঘটনা প্রবাহ যে নিতান্ত কাকতালীয় ছিল না তার প্রমাণ মেলে হোয়াইট হাউসের কিছু পদক্ষেপের দিকে তাকালে। যুক্তরাষ্ট্র সৌদি আরব আর ইসরাইলের সম্মিলিত এমনি এক পদক্ষেপ হলো, The Redirection.

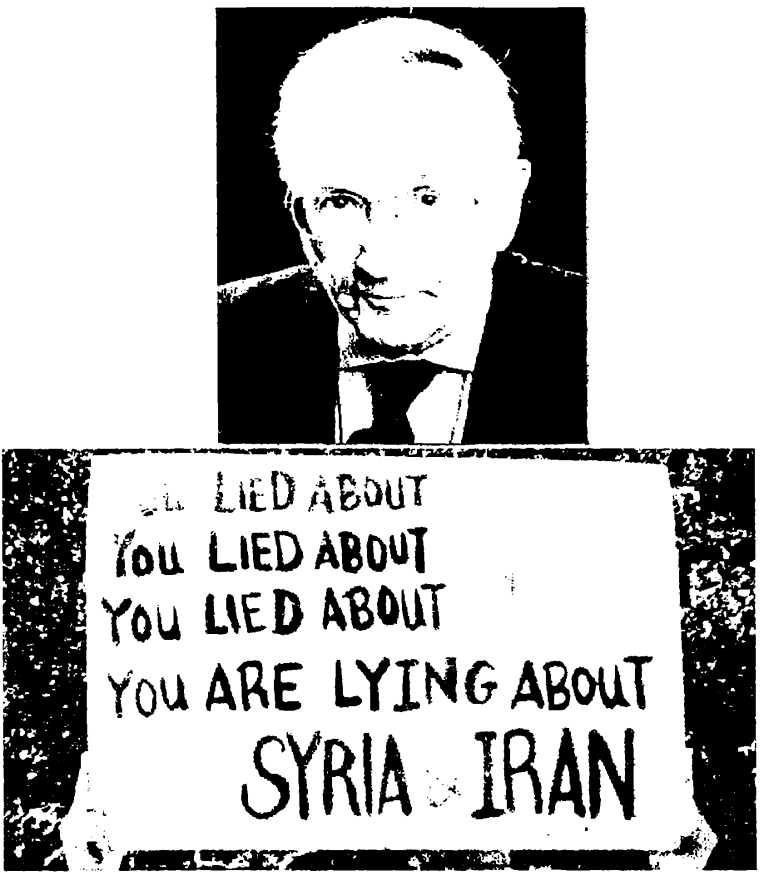

সেইম্যুর হার্শ এবং সিরিয়া যুদ্ধের প্রতিবাদ প্ল্যাকার্ডে অকাট্য সত্য

আগেও বলেছি মার্কিন নিও কনজারভেটিভ থিংক ট্যাংকদের পরিকল্পনা ছিল ইরাক যুদ্ধের মধ্যদিয়ে মধ্যপ্রাচ্যের রাজনীতির খোলনলচে পাল্টে দেওয়া।

কিন্তু ইরাকের মাটিতে একটি যুদ্ধ বাঁধিয়ে এবং কেবল রুশপন্থী একজন সাদ্দাম হোসেনকে উৎখাত করেই সেটা সম্ভব ছিল না। সে জন্য দরকার পুরো মধ্যপ্রাচ্যে, যুক্তরাষ্ট্রের, সৌদি আরব এবং ইসরাইলের একক আধিপত্য ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা। সে লক্ষ্য হাসিলের জন্যেই গ্রহণ করা হয়েছিল The Redirection বা গতিভ্রষ্ট করার নীতি। মধ্যপ্রাচ্য নিয়ে ত্রি-দেশিয় এই ষড়যন্ত্রের কথা ফাঁস করেছিলেন, পুলিজ্জার পুরস্কার পাওয়া মার্কিন সাংবাদিক সেইম্যুর হার্শ। এক অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে তিনি বলেছেন, যখন আরব বসন্ত আসেনি, ইরাক-সিরিয়ার কোটি শিয়া সুন্নি মুসলিম যখন ভাইয়ে ভাইয়ে গলাগলি করে পাঁচ বেলা মসজিদে নামাজ আদায় করছে, তখন ইরাক রণাঙ্গনের পাপ থেকে আরও বহুমুখী পাপের জন্ম দেওয়ার মতো এই বিধ্বংসী ষড়যন্ত্রের জাল বোনা হয়েছে।

ইরাক, সিরিয়াসহ পুরো মধ্যপ্রাচ্যে সুন্নিপন্থী আল কায়দা জঙ্গিদের মদত দিয়ে রক্তক্ষয়ী সংঘাত আর গৃহযুদ্ধ পরিস্থিতি সৃষ্টির পরিকল্পনা চূড়ান্ত হয়েছে। মার্কিন ম্যাগাজিন দ্য নিউ ইয়র্কার-এর মার্চ ২০০৭ সালের এক প্রতিবেদনে (The Redirection: Is the Administration's new policy benefitting our enemies in the war on terrorism?) হার্শ বলেছেন এই নীতির আওতায়, এক ঢিলে দুই পাখি অর্থাৎ শিয়া-সুন্নি সংঘাত সৃষ্টির মধ্যদিয়ে ইরান ও সিরিয়ার ক্ষমতার রদবদল ঘটাতে চেয়েছিল এই তিন দেশ। এ জন্য তাদের প্রথম টার্গেট ছিল লেবানন ভিত্তিক গেরিলা গ্রুপ হেজবুল্লাহ। কারণ এই অঞ্চলে ইরান তথা শিয়াদের অন্যতম ভরসার জায়গা হলো শক্তিশালী এই গেরিলা গ্রুপটি। ইরানের প্রত্যক্ষ সমারিক সহায়তায় গ্রুপটি তেল আবিবের মাটিতে হামলা চালানোর মতো মিসাইল তৈরি করেছে। নিজস্ব ড্রোন ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে। রয়েছে অন্তত তিন হাজার সদস্যের প্রশিক্ষিত সামরিক বাহিনী। জরুরি প্রয়োজনে মাঠে নামার মতো মজুত আছে আরও কয়েক হাজার যোদ্ধার অনিয়মিত বাহিনী। প্রকাশ্য কোনো সামরিক অভিযান নয়। বরং কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার মতো সুন্নি জঙ্গিদের উস্কে দিয়ে শিয়া শক্তিকে গুঁড়িয়ে দেওয়াই ছিল এই নীতির অন্যতম কৌশল। সুন্নি উগ্রপন্থীদের মধ্যে সামরিক অভিলাস সৃষ্টির মাধ্যমে আল কায়দা জঙ্গিদের লড়াইয়ের একটি নতুন ক্ষেত্র প্রস্তুত করা, আর সেটা করা হলে ইরান সিরিয়া তথা মধ্যপ্রাচ্যের রুশ ব্লকের হুমকি থেকে যেমন ইসরাইলকে রক্ষা করা যাবে, তেমনি সৌদি আরবের স্বার্থও রক্ষা হবে। জঙ্গিবাদের ধুয়া তুলে চাপের মুখে রাখা যাবে ফিলিস্তিনের হামাস গেরিলাদেরও। আর নিঃসন্দেহে মধ্যপ্রাচ্যে দুই মিত্রের স্বার্থই যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থ।

BanglaBook.org

লেবাননভিত্তিক হেজবুল্লাহ গেরিলা ও তাদের আত্মঘাতী স্কোয়াড

বিধ্বংসী এমন একটা নীতি গ্রহণের অন্তর্নিহিত আরেকটি কারণ ছিল। যুক্তরাষ্ট্র অবাক হয়ে লক্ষ্য করেছে ইরাক যুদ্ধ ইরানকে মোটেই চাপে ফেলেনি। বরং ইরানের কৌশলগত ক্ষমতায়ন বেড়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের কৌশল ছিল সাদ্দামের শাসনামলে দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে ইরাকের নিষ্পেষিত শিয়াদের ক্ষমতায়নের মধ্য দিয়ে শিয়া-সুন্নি ক্ষমতা বলয়ের একটি ভারসাম্য রক্ষা করা। সে কারণে মধ্যপ্রাচ্যের আর সব দেশে সুন্নি জঙ্গিদের মদত দেওয়া হলেও, ইরাকের বেলায় গুটি হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছিল শিয়াদের। আর সেটাই কিনা ইরানের জন্যে সাপেবর হয়েছে। তাই তেহরানের ঘাড়ের কাছে মার্কিন সেনা উপস্থিতিতেও ইসরাইলের জন্যে নিরাপত্তা ঝুঁকি কমেনি। মার্কিন সৌদি রক্তচক্ষু উপেক্ষা করেই ইরাকের নূরী আল মালিকী সরকারের সাথে ইরানের গোপন সম্পর্ক জোরদার হয়েছে। ইরাক যুদ্ধ পরবর্তী সুন্নি জঙ্গি উত্থান ইরান-ইরাকের শিয়া নেতাদের আরও কাছাকাছি এনেছে। প্রেসিডেন্টে আহমাদিনেজাদ

BanglaBook.org

ক্রমাগত ইসরাইলকে হুমকি দিয়ে চলেছেন। পরমাণু প্রযুক্তির অধিকার নিয়ে হম্বিতম্বি করছেন। এসবই ছিল যুক্তরাষ্ট্রের ধারণার অতীত।

২০০৭ সালের জানুয়ারিতে প্রেসিডেন্ট বুশের একটি বক্তব্য থেকে ইরান সিরিয়া বিরোধী মার্কিন ষড়যন্ত্রের আঁচ পাওয়া যায়। যুদ্ধ শুরুর আগে বুশ প্রশাসন ইরাকের বিরুদ্ধে যেসব ভাষা ও তথ্য যুদ্ধ চালাত ইরান সিরিয়ার বিরুদ্ধেও বুশকে ঠিক একই অস্ত্র প্রয়োগ করতে দেখা গেল। লক্ষ্য করুন, 'These two regimes Iran and Syria are allowing terrorists and insurgents to use their territory to move in and out of Iraq, Iran is providing material support for attacks on American troops. We will disrupt the attacks on our forces. We'll interrupt the flow of support from Iran and Syria. And we will seek out and destroy the networks providing advanced weaponry and training to our enemies in Iraq.'

অর্থাৎ বুশের ভাষায় ইরানই ইরাকে অস্থিরতা সৃষ্টি করছে, মার্কিন সেনাদের ওপর হামলায় অর্থ অস্ত্র আর প্রশিক্ষণ দিয়ে মদত দিচ্ছে। অথচ ইতিহাস বলছে বুশের এই অভিযোগ আরও অনেক কিছুর মতোই সর্বৈব মিথ্যা। কারণ ইরাকে অস্থিরতা সৃষ্টির পেছনে ইরান তথা শিয়াদের ইন্ধন থাকলেও সেটি ছিল সৌদি আরব আর যুক্তরাষ্ট্রের লেলিয়ে দেওয়া সুন্নি জঙ্গিদের হাত থেকে শিয়াদের রক্ষা করবার তাগিদে। ২০০৫-০৬ সাল থেকে ইরাক জুড়ে শিয়া সুন্নি সংঘাত শুরুর পেছনে ইরান নয় বরং তার চাইতেও যে বড় কোনো শক্তির অর্থ অস্ত্রের ইন্ধন ছিল তার প্রমাণই হলো ত্রি-দেশিয় এই ষড়যন্ত্র নীতি। একই বছরের জানুয়ারিতে মার্কিন সিনেটের পররাষ্ট্রনীতি বিষয়ক কমিটির শুনানিতে আগ্রাসি ওই নীতি সম্পর্কে খোলামেলাভাবেই ইরান সিরিয়া আর হেজবুল্লাহকে destabilize করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছিলেন কন্ডোলিজ্জা রাইস। শুনানিতে দেওয়া রাইসের বক্তব্য উল্লেখ করে সাংবাদিক সেইম্যুর হার্শ বলছেন: 'a new strategic alignment in the Middle East,' separating 'reformers' and 'extremists'; she pointed to the Sunni states as centers of moderation, and said that Iran, Syria, and Hezbollah were 'on the other side of that divide.' Iran and Syria, she said, 'have made their choice and their choice is to destabilize.'

মার্কিন কংগ্রেসের শুনানীর মধ্যদিয়ে গৃহিত যে কোনো নীতি 'প্রকাশ্য' এবং 'আইনসিদ্ধ'। কিন্তু কথিত এইসব প্রকাশ্য নীতির এমন সব অপ্রকাশ্য আর গোপন পদক্ষেপ থাকে যা কখনই মার্কিন জনগণের কাছে খোলাসা করা

হয় না। এমনকি সেসব প্রসঙ্গ কংগ্রেসের সামনেও হাজির করা হয় না। যেমন আফগান মুজাহিদদের সাহায্য করার মার্কিন নীতিটা ছিল প্রকাশ্য। কিন্তু ওই নীতির আওতায় আফগান শিশুদের জন্য জঙ্গিবাদি শিক্ষাক্রম প্রণয়নের পদক্ষেপটা ছিল অপ্রকাশ্য। তেমনি The Redirection-এর আওতায় ইরাক সিরিয়ায় সুন্নি জঙ্গি আমদানি, সৌদি আরবের মাধ্যমে নানারকম দাতব্য সংস্থার সাইন বোর্ডের আড়ালে জঙ্গিদের বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার অর্থায়ন, ইসরাইলের মাধ্যমে জঙ্গিদের কারো কারো প্রশিক্ষণের মতো বহুমুখী গোপন তৎপরতার কথা খুব কমই প্রকাশ পেয়েছে।

নাইন-ইলাভেন থেকে আইএস, সকল ষড়যন্ত্রের পেছনেই দুই বন্ধু ডিক চেনি আর প্রিন্স বানদারের রহস্যজনক উপস্থিতি

বুশ প্রশাসনের অনেক ষড়যন্ত্রের মতোই মধ্যপ্রাচ্যের মানচিত্র পাল্টে দেওয়ার আর অশান্তি সৃষ্টি করবার এই নীল নকশার অন্যতম দুই রূপকার হলেন ভাইস

প্রেসিডেন্ট ডিক চেনি এবং সৌদি আরবের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা প্রিন্স বানদার বিন সুলতান (ওয়াশিংটনের সাবেক সৌদি রাষ্ট্রদূত। সমালোচকরা যার নাম দিয়েছেন প্রিন্স অব টেররিস্ট)। প্রসঙ্গত, তারা দুজনই দীর্ঘদিনের বন্ধু। মধ্যপ্রাচ্যকে অস্থিতিশীল করবার এই ষড়যন্ত্রমূলক নীতি গ্রহণের আগে পরে দুই বন্ধুর মধ্যে কয়েক ডজন বৈঠক হয়েছে। সৌদি বাদশা আব্দুল্লাহর সাথেও বৈঠক করেছিলেন ডিক চেনি। ২০০৭ সালের এমনি এক বৈঠকে সৌদি বাদশা খোলাখুলিভাবেই চেনিকে জানিয়ে দিয়েছিলেন, ইরাকে সুন্নিদের মদত দেবে সৌদি আরব। বলে রাখা ভালো, যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে ইরাকের মার্কিন মদতপুষ্ট শিয়া নেতৃত্বাধীন সরকার আর তাদের একচ্ছত্র ক্ষমতায়নের ব্যাপারে বরাবরই নাখোশ ছিল সৌদি আরব।

যদিও সৌদি বাদশা'র এই স্পষ্ট ভাষণের আগেই অর্থাৎ ২০০৪ সাল থেকেই ইরাকে আল কায়দাপন্থী সুন্নি জঙ্গিদের মদত দিতে শুরু করে সৌদি আরব। উত্থান ঘটে আবু মুসাব আল জারকাউয়ির মতো নৃশংস জঙ্গি নেতাদের। ফলে অবধারিতভাবেই ইরাক রণাঙ্গণ আর দেশটির লাখো মানুষ দুই বন্ধুরাষ্ট্র সৌদি আরব আর যুক্তরাষ্ট্রের নির্মম এক পাশার ময়দান হয়ে উঠে। যে ময়দানে সুন্নিদের বিরুদ্ধে শিয়াদের লেলিয়ে দেয় যুক্তরাষ্ট্র। আর শিয়াদের বিরুদ্ধে সুন্নি সন্ত্রাসীদের লেলিয়ে দেয় সৌদি আরব। ঠিক যেমনটা করা হয়েছিল আফগান রণাঙ্গনে। যুক্তরাষ্ট্রের সন্ত্রাসবিরোধী লড়াইয়ের কাঁচামাল হিসেবে আল কায়দা ও তালেবান জঙ্গিদের সৃষ্টি করেছিল সৌদি আরব এবং পাকিস্তান। আর দুই বন্ধু রাষ্ট্রের সৃষ্টি করা সেই ছায়া শত্রুর বিরুদ্ধেই বছরের পর বছর লড়ে গেছে যুক্তরাষ্ট্র।

সৌদি আরব হলো সেই দেশ যারা বরাবর নিজ দেশের ওয়াহাবিপন্থী জঙ্গিদের বিদেশের মাটিতে ছেড়ে দিয়ে কথিত জিহাদ আর জঙ্গিবাদকে টিকিয়ে রেখেছে এবং বিশ্বব্যাপী ধর্মীয় উগ্রপন্থার বিস্তার ঘটিয়েছে। আবার সেই জঙ্গিরাই যখন সৌদি আরবের বাদশাহদের স্বৈরাচারী শাসন ব্যবস্থার জন্যে হুমকি হয়ে উঠেছে, তখন তাদের নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ সৌদি জমিনে কোনো জিহাদ চলবে না। জিহাদ হতে হবে সৌদি-মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থার নীলনকশা মতে। বিন লাদেনের ইতিহাস যদি স্মরণ করি যে লাদেনকে গড়েছিল সৌদি আরব, সেই লাদেন যখন সৌদি রাজতন্ত্রের জন্যেই হুমকি হয়ে উঠল তখন তাকে আবর্জনার মতো ছুঁড়ে ফেলা হয়েছে। এটি সৌদি আরবের অভ্যন্তরীণ নীতিরই অংশ। সৌদি বাদশাহরা বংশ পরম্পরায় নিজেদের রাজত্ব আর বাদশাহী অটুট রাখতে সুন্নি জিহাদিদের মদত দেওয়াটাকেই অন্যতম এক হাতিয়ার বলে মনে করেন। তাই মধ্যপ্রাচ্যের অন্য

BanglaBook.org

জাতি রাষ্ট্রেও যাতে গণতন্ত্রের পথ উন্মোচিত হতে না পারে সেই খবরদারিটাও তারা নিশ্চিত করে। সৌদি রাজতন্ত্রের ভয় হলো, আরব বিশ্বের অন্য দেশগুলোতে গণতন্ত্রের পথ উন্মুক্ত হলে সৌদি আরবেও রাজতন্ত্রের দিন শেষ হয়ে যাবে।

রিপাবলিকান বুশ থেকে ডেমোক্র্যাট ওবামা: সৌদি আরবের সাথে যুগ যুগের অটুট বন্ধন

উইকিলিকসের ফাঁস করা এক নথিতে দেখা গেছে, ২০০৯ সালের ডিসেম্বরে সাবেক মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিলারি ক্লিনটন তার এক বার্তায় বলছেন, 'সৌদি আরব এখনও আল কায়দার জন্যে গুরুতর এক সহযোগিতার ক্ষেত্র

হয়ে আছে। একইভাবে তালেবান আর পাকিস্তানের লস্কর ই তৈয়বার মতো সংগঠনকেও তারা মদত দিয়ে যাচ্ছে। সৌদি আরব যদি এই সংগঠনগুলোর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নেয় তাহলে এটা যেমন তার নিজ দেশের জন্যে হুমকি, তেমনি বিশ্বের জন্যেও'। মার্কিন সিনেটে হাজির করা তথ্য বলছে, জঙ্গিবাদ বিস্তারের পেছনে গত চার দশকে বিভিন্ন দাতব্য প্রতিষ্ঠানের নামে অন্তত দশ বিলিয়ন মার্কিন ডলার খরচ করেছে সৌদি আরব। এই বিপুল অঙ্কের বেশিরভাগটাই আল কায়দার মতো কট্টরপন্থীদের পেছনে খরচ করা হয়েছে।

ইরাক রণাঙ্গন হয়ে ওঠে যুক্তরাষ্ট্র ও সৌদি আরবের পাশার ময়দান

এ প্রসঙ্গে এক সৌদি কূটনীতিকের মূল্যবান একটি উক্তি তুলে ধরেছেন সেইম্যুর হার্শ। আল কায়দা সৃষ্টির দায় স্বীকার করে ওই সৌদি কূটনীতিক সেইম্যুর হার্শকে বলছিলেন: 'আমরা এদের সৃষ্টি করেছি, কিভাবে এদের নিয়ন্ত্রণ করতে হয় সেটাও আমরা জানি। আমরা চাই সালাফিপন্থীরা (উগ্রপন্থী সুন্নি জঙ্গিরা) এবার তাদের বোমাগুলো হেজবুল্লাহ গেরিলা, মুক্তাদা আল সাদর (ইরাকের প্রভাবশালী শিয়া নেতা) আর ইরান-সিরিয়ার দিকে ছুঁড়ে মারুক।' ওই সৌদি কূটনীতিক বলছিলেন, মধ্যপ্রাচ্যে ছত্রভঙ্গ করে দিতে যুক্তরাষ্ট্র সৌদি আরব আর ইসরাইলের এই ষড়যন্ত্রকে মোট চারটি ধাপে বাস্তবায়নের দিকে এগিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত ছিল। যার অন্যতম একটি হলো সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট বাশার আল আসাদকে দুর্বল করতে শিয়া বিরোধীদের অর্থের যোগান দেবে সৌদি আরব। যুক্তি হলো এমনটা করা হলে চাপের মুখে নতি স্বীকার করতে বাধ্য হবেন বাশার আল আসাদ। বলে রাখা ভালো তখনও কিন্তু সিরিয়ার গৃহযুদ্ধের ন্যুনতম কোনো আলামতও কোথাও নেই।

BanglaBook.org

জারকাবি

জারকাবির দলের হাতে অপহৃত এক শিয়া মুসলিম

ফিরে তাকাই ইরাক রণাঙ্গনের দিকে। ইরাকে যে অন্যায় যুদ্ধ শুরু করেছিল যুক্তরাষ্ট্র; রিলে রেসের মতো সেই যুদ্ধের মারণকাঠি চলে গিয়েছিল সুন্নি জঙ্গিদের হাতে। অথবা বলা যৌক্তিক যে ভ্রাতৃঘাতী সেই মারণকাঠি সুন্নি জঙ্গিদের হাতে তুলে দিয়েছিল যুক্তরাষ্ট্র ও সৌদি আরব। যুদ্ধের তৃতীয় বছর থেকে ইরাক রণাঙ্গনে ইঙ্গ-মার্কিন সেনারা যতটা না খবরের শিরোনাম, তার চাইতে বেশি সুন্নি জঙ্গি নেতারা। যেন ইরাক রণাঙ্গনে মার্কিন সেনারা পুনর্গঠন আর গণতন্ত্র গড়ার কাজ ছাড়া আর কিছুই করছে না। যা কিছু হচ্ছে তার সব দায় জঙ্গিদের। ইরাক জুড়ে একের পর এক জঙ্গি হামলায় প্রাণ গেছে হাজারো শিয়া মুসলিমের। ক্রমশ ভাতৃঘাতী দাঙ্গায় রুপ নিচ্ছিল ইরাক পরিস্থিতি। সুন্নি জঙ্গিদের সেসব হামলার মোড়কটা ছিল—'দখলদার মদতপুষ্ট ইরাকের শিয়া

BanglaBook.org

সরকারের বিরুদ্ধে'। কিন্তু ঘটনা পরম্পরা বলে দেয় ইরাকের ওই নরকতুল্য পরিস্থিতির পেছনে নেহাত উগ্রপন্থী কিছু সুন্নি জঙ্গির কাকতালীয় কোনো অবদান ছিল না। বরং অর্থ অস্ত্র আর প্রশিক্ষণ দিয়ে সুন্নি জঙ্গিদের বিষধর সাপের মতো ইরাকের জমিনে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। আর ওই সাপ বেছে বেছে কেবল শিয়া খ্রিস্টান আর কুর্দীদের গণহারে মেরে নির্বংশ করেছে। যা দিনে দিনে ক্ষুব্ধ করে তোলে সংখ্যাগরিষ্ঠ শিয়া জনগোষ্ঠিকে। প্রাণ বাঁচাতে তারাও অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছে। দেশটিতে এমনি নারকীয় পরিস্থিতির জন্ম দিয়ে তবেই ইরাক রণাঙ্গণ ছাড়ে মার্কিন বাহিনী। ততদিনে ইরাক নামের দেশটার পরিণতি হয়েছে ফেলে দেওয়া আমের আঁটির মতো। দেশজুড়ে বিশৃংখলা। শিয়া সুন্নি আর কুর্দী এই তিনখণ্ডে বিভক্ত হতে বসেছে ইরাক। সেনাবাহিনীও এই তিন ধারায় বিভক্ত। বিমান বাহিনী বলে আর কিচ্ছুটি অবশিষ্ট নেই। তেলের হিস্যায় জনগণের ন্যায্য অধিকার নেই। মার্কিন দয়ার ওপর নির্ভরশীল অর্থনীতি। গণতান্ত্রিক কোনো প্রতিষ্ঠান আর টিকে নেই। সামান্য যাদুঘরের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন; তাও চলে গেছে ইউরোপ আমেরিকার চোরাকারবারিদের হাতে।

ইরাকের এমন পরিণতিই কি তবে চেয়েছিল যুক্তরাষ্ট্র? The Redirection নামের মার্কিন ষড়যন্ত্র বলছে—ভুল বা ব্যর্থতা নয় বরং ওই নৈরাজ্য ছিল পূর্ব পরিকল্পিত এবং ইরাকের ওই পরিস্থিতি ছিল সৌদি মার্কিন ও ইসরাইলি ষড়যন্ত্রের প্রথম পরিচ্ছেদ। আর এই প্রথম পরিচ্ছেদের নায়ক বা খলনায়ক হলেন জর্ডান বংশোদ্ভুত সুন্নি জঙ্গি নেতা আবু মুসাব আল জারকাউয়ি অথবা জারকাবি। সিআইএ'র ফাইলে যার নাম lone wolf বা নিঃসঙ্গ নেকড়ে। তবে ইরাকের হাজারো শিয়া মুসলিমের রক্তে হাত রাঙানো জারকাবি নামের এই নেকড়েটি মোটেই নিঃসঙ্গ ছিলেন না। বরং তিনি ছিলেন সুতো বাঁধা এক পুতুল। এটি সন্দেহ করা মোটেও অমূলক নয়প যে, তার অদৃশ্য সুতোটা ছিল সৌদি আরবের হাতে। কিন্তু কে এই জারকাবি? ২০০০ সালে নিজ দেশ জর্ডানে চুরি আর ধর্ষণের দায়ে সাজা ভোগ করেন জারকাবি। করামুক্ত হবার পর তিনি পুরোদস্তুর উগ্রপন্থায় বিশ্বাসী এক অন্য মানুষ। নাইন-ইলাভেন ট্রাজেডির পর আফগানিস্তানে মার্কিন বিরোধী লড়াইয়ে যোগ দিয়ে বিন লাদেন ও আয়মান আল জাওয়াহিরির সাথে তার ঘনিষ্ট সম্পর্ক গড়ে ওঠে। জিহাদের স্বপ্ন দেখা জারকাবি'র কাছে তখন লাদেন আর জাওয়াহিরি এক মহান নেতা। যাদের 'পবিত্র ছোঁয়া' পেতে তার আফগানিস্তান যাত্রা। কিন্তু কোনো এক অজ্ঞাত মন্ত্রবলে দুই নেতার 'পবিত্র ছোঁয়া' অগ্রাহ্য করে আফগান জিহাদের রণভূমি ছেড়ে ইরাকে পাড়ি জমান জারকাবি। লাদেন আর

BanglaBook.org

জাওয়াহিরির মতো দুই নেতার সংস্পর্শ উপেক্ষা করে জারকাবির ইরাকে ছুটে যাওয়াটা অনেকের মনেই সন্দেহের উদ্রেক করে। প্রশ্ন ওঠে কার ইন্ধনে, কিভাবে জারকাবি ইরাকে পাড়ি জমালেন? লাদেন-জাওয়াহিরির চাইতেও বড় কোনো নেতা কি তাকে ইরাকে ডেকে নিল? ঠিক কখন তিনি ইরাকে এলেন এ ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট দিনক্ষণ জানা না গেলেও ২০০৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে বিন লাদেন ও জাওয়াহিরিকে লেখা জারকাবির একটি চিঠি প্রকাশিত হয় গণমাধ্যমে। ওই চিঠিতে জারকাবি লিখেছেন, তিনি ইরাকের শিয়া জনগোষ্ঠির ওপর হামলা চালাতে চান। তার লক্ষ্য ইরাকে গৃহযুদ্ধ পরিস্থিতি তৈরি করা। এ ব্যাপারে আল কায়দা যদি তার সাথে দ্বিমত পোষণ করে তাহলে আল কায়দার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতেও প্রস্তুত জারকাবি।

২০০৪ সালের মার্চ থেকে ইরাকের শিয়া জনগোষ্ঠির ওপর হামলা শুরু করে সুন্নি জঙ্গি জারকাবি

২০০৪ সালের ২ মার্চ ইরাকে আশুরার মিছিলে বোমা হামলার মধ্যদিয়ে শিয়াদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন জারকাবি। ইরাকে শিয়া নিধণের সেটাই ছিল শুরু। লক্ষ্য করুন পাঠক, কীভাবে শিয়া-সুন্নি দাঙ্গা বাঁধানোর সৌদি নীতির সাথে জারকাবির নীতি উদ্দেশ্যের মিলন ঘটেছে। ২০০৪ সাল থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত প্রায় প্রতিদিন ইরাকের কোথাও না কোথাও বোমা হামলা, আত্মঘাতী হামলা, শিয়া মসজিদে হামলা, খুন, অপহরণ আর গুপ্ত হত্যার মতো হাজারো নারকীয় ধ্বংসযজ্ঞের জন্ম দিয়েছেন জারকাবি ও তার দল। একদিকে শিয়া মুসলিমদের ওপর হত্যাযজ্ঞ অন্যদিকে বিদেশিদের অপহরণের বিনিময়ে মুক্তিপণ আদায়, নয়তো অপহৃতদের খুন করে সেই খুনের ছবি অনলাইনে পোস্ট করে ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি করাই ছিল জারকাবি ও তার দলের কাজ।

দলটির এমন নৃশংস তৎপরতার অবধারিত ফল দাঁড়ায় শিয়া-সুন্নি সংঘাত। মার্কিন মদতপুষ্ট শিয়া সরকারের সেনাবাহিনী ও পুলিশসহ বিভিন্ন আইন শৃংখলা রক্ষাকারি বাহিনীর মধ্যে তৈরি হয় বিশৃংখলা। তাদের দমন নিপীড়ন আর অবিশ্বাসের টার্গেটে পরিণত হন সুন্নিরা। জারকাবির শিয়া নিধনের এই তরিকা নিয়ে মুসলিম বিশ্বে তখন নিন্দার ঝড়। ২০০৫ সালের জুনে আল কায়দা ইন মেসোপটেমিয়া'র (পরে আল কায়দা ইন ইরাক) এসব কর্মকাণ্ডের তীব্র সমালোচনা করে জারকাবিকে একটি চিঠি লিখেছিলেন আল কায়দা নেতা আয়মান আল জাওয়াহিরি। তিনি লিখেছেন, জারকাবি কি কখনও এসব হত্যাযজ্ঞের মধ্য দিয়ে ইরাক তথা বিশ্বের শিয়া মুসলিমদের নিশ্চিহ্ন করতে পারবেন? একজন মুসলিম হয়ে নিরপরাধ সাধারণ মুসলমানের রক্ত ঝরিয়ে জারকাবি কখনই তার অভিষ্ঠ লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবেন না। বিশ্বের কোটি কোটি মুসলিমের কাছে এসব কর্মকাণ্ড ঘৃণার জন্ম দেবে বলে সতর্কতা উচ্চারণ করেছিলেন জাওয়াহিরি। জাওয়াহিরির এই চিঠির প্রতি সমর্থন ছিল বিন লাদেনেরও। কারণ আর কেউ না জানুক লাদেন ঠিকই জেনেছেন, সৌদি নীল নকশারই বাস্তবায়ন করছেন জারকাবি। এর পরই জারকাবির সাথে সকল সম্পর্ক অস্বীকার করেছিল আল কায়দা। তবে লাদেন-জাওয়াহিরির ওই সতর্কতায় কোনো কাজ হয়নি। উল্টো নিজের জঙ্গি দলকে অর্থে অস্ত্রে আরও শক্তিশালী করে তুলছিলেন জারকাবি। ফেব্রুয়ারি ২০০৬ সালে মৃত্যুর কয়েকমাস আগে উত্তর বাগদাদের সামারায় ইমাম আল আসকারি'র পবিত্র মাজার গুড়িয়ে দেন জারকাবি। শিয়া জনগোষ্ঠির কাছে অত্যন্ত পবিত্র এই মাজার ধ্বংসের মধ্য দিয়ে লক্ষ্যে পৌঁছে যান এই জঙ্গি নেতা। শিয়া সুন্নি দাঙ্গা বাঁধানো ছিল তার উদ্দেশ্য। ওই মাজার ধ্বংসের পর আক্ষরিক অর্থেই ইরাক জুড়ে ছড়িয়ে পড়ল রক্তক্ষয়ী দাঙ্গা।

BanglaBook.org

আবু মুসাব আল জারকাবির মৃতদেহের ছবি নিয়ে মার্কিন সেনাদের সংবাদ সম্মেলন

নিষ্ঠাবান ভৃত্যের মতোই সফলভাবে নিজের দায়িত্ব সম্পন্ন করেছিলেন জারকাবি। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত ইরাক রণাঙ্গনে যেখানে তখনও লাখো মার্কিন সেনার উপস্থিতি, হাজার রকমের গোয়েন্দা নজরদারি, সবকিছু ভেদ করে কিভাবে একের পর এক ওমন ধ্বংসলীলা চালিয়ে যাচ্ছিলেন জারকাবি? কোথা থেকে আসছিল তার অর্থ আর বিপুল পরিমাণ অস্ত্র? এই প্রশ্নের সরাসরি কোনো জবাব না মিললেও প্রিন্স বানদারের উক্তিটি আরও একবার স্মরণ করা যেতে পারে। বানদারের ভাষায় 'শিয়াদের রক্ষা করো প্রভু' এমন পরিস্থিতির শুরুটা হয়েছিল জারকাবির হাত ধরেই। অর্থাৎ যুক্তরাষ্ট্র সৌদি আরব আর ইসরাইলের নীল নকশার প্রথম পরিচ্ছেদের শুরুটা ছিল নাৎসি কায়দায় জারকাবির শিয়া নিধনের নতুন তরিকার জঙ্গিবাদ দিয়ে। ৭ জুন ২০০৬ সালে ইরাকে মার্কিন জঙ্গি বিমানের লেজার গাইডেড মিসাইলের হামলায় প্রাণ হারান জারকাবি। অর্থাৎ জারকাবির দায়িত্ব শেষ। এবার শিয়া-সুন্নি সংঘাতের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ। আর এই পরিচ্ছেদে দৃশ্যপটে উঠে এলেন জারকাবির চাইতেও নৃশংস আর ভয়ঙ্কর আরেক জঙ্গি নেতা আবু বকর আল বাগদাদি। জারকাবির অসমাপ্ত রিলে রেসের মারণকাঠি এবার সেই বাগদাদির হাতে।

BanglaBook.org

খিলাফত ঘোষণার পর বাগদাদির সব শেষ ছবি

খুব কমই তিনি জনসমক্ষে আসেন। সচরাচর তাকে দেখা যায় না। তার চারপাশ ঘিরে থাকে কালো পোষাকধারী সশস্ত্র জঙ্গি দল। তিনি নিজেও কালো পোষাকে ঢেকে রাখেন আপাদমস্তক । তাই তাকে আলাদা করে চেনা যায় না। আট দশজন শীর্ষ জঙ্গি নেতা ছাড়া কেউ তার দেখা পান না। মাঝে মাঝে হঠাৎ নাটকীয় কায়দায় কোনো মসজিদে জুমার নামাজ আদায় করতে আসেন তিনি। তাও সেটি আগে থেকে কেউ জানতে পারেন না। সবশেষ তাকে জনসমক্ষে দেখা গেছে ২০১৪ সালের জুলাইয়ে। সিরিয়ায় আইএস-এর কথিত খিলাফত রাষ্ট্রের রাজধানী রাক্কার একটি মসজিদে জুমার নামাজে খুতবার পর ইমামতি করেছিলেন। এর আধাঘন্টা আগেই পুরো মসজিদ ঘিরে ফেলে সশস্ত্র জঙ্গিরা। নামাজ পড়তে আসা নারীদের আলাদা কক্ষে সরিয়ে নেওয়া হয়। তিনি মসজিদে হাজির হবার পর অচল হয়ে যায় সবার মোবাইল ফোনের নেটওয়ার্ক। রাক্কার ২৯ বছর বয়স্ক বাসিন্দা আলী, নিউজ উইককে দেওয়া

BanglaBook.org

সাক্ষাৎকারে বলছিলেন মসজিদে তার উপস্থিতিটা যেন গা ছমছমে এক আতঙ্কের জন্ম দিয়েছিল। চারদিকে পিন পতন নীরবতা। খুতবায় ভাবলেশহীন চেহারা—তিনি বলছিলেন তার পরের লক্ষ্য সৌদি আরব। এ সময় তিনি 'আল্লাহু আকবর' বলে স্লোগান দিয়ে ওঠেন। উপস্থিত সবাইকে তার সাথে গলা মেলানোর নির্দেশ দেওয়া হয়। পুরো মসজিদ তখন 'আল্লাহু আকবর' ধ্বনিতে গমগম করছিল। মসজিদে উপস্থিত আলীর মতো মুসল্লিদের কাছে সেই ধ্বনি আতঙ্কের জন্ম দিয়েছিল। কারণ শিয়া মুসলিমসহ আইএস-এর ভাষায় কাফেরদের জবাই করে হত্যার সময়ও একই ধ্বনিতে চারপাশ প্রকম্পিত করে তোলে আইএস-এর জল্লাদরা। তিনি মসজিদ ছাড়ার আধঘণ্টা পর্যন্ত মুসল্লিদের কাউকে বেরুবার অনুমতি দেয়নি জঙ্গিরা। বলছি সদা সতর্ক আইএস নেতা আবু বকর আল বাগদাদির কথা।

গ্রিক পুরাণের বহুমাথা বিশিষ্ট দানবের মতো তারও অসংখ্য মাথা, অসংখ্য নাম। কখনও তিনি ইব্রাহিম আওয়াদ, কখনও ইব্রাহিম আলী আল বদরী কখনও আবু বকর আল বাগদাদি কখনও ডক্টর ইবরাহীম, আবার কখনও আবু দুইয়া। এতগুলো নামের আড়ালের মানুষটি এই মুহূর্তে বিশ্বের সবচেয়ে ভয়ঙ্কর এক জঙ্গিদলের নৃশংস এক নেতা। যার নির্দেশে প্রতি মুহূর্তে ইরাক অথবা সিরিয়ায় তুচ্ছ সব কারণে গর্দান যাচ্ছে কোনো-না-কোনো মানুষের। যুক্তরাষ্ট্রের কাছে যার মাথার দাম দশ কোটি ডলার। তিনি আইএস জঙ্গিদের কথিত খিলাফত রাষ্ট্রের আত্মস্বীকৃত খলিফা আবু বকর আল বাগদাদি। বিশ্বের শান্তিকামী কোটি মানুষের কাছে তিনি নাৎসি নেতা হিটলারের চাইতেও ঘৃণিত এক নাম। আর ইসলামি উগ্রপন্থায় বিশ্বাসীদের কাছে 'বাগদাদি' ক্যারিশম্যাটিক এবং ঈর্ষণীয় এক নেতৃত্বের নাম।

BanglaBook.org

বাগদাদের ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইসলামিক স্টাডিজে শরিয়া আইনে ডক্টরের ডিগ্রিধারী এই মানুষটি কেবল মধ্যপ্রাচ্যকে নয় ইসলামকেও চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলে দিয়েছেন। কারণ তিনি বা তার অস্ত্রধারী জিহাদিরা দুনিয়ার সামনে ইসলামের যে ভয়ঙ্কর রূপ খাড়া করেছেন, তার লোকেরা যে ইসলামের প্রচার করছেন সেই ইসলামের সাথে এমনকি ধর্মপ্রাণ মুসলিমরাও পরিচিত নন। তিনি এবং তার জিহাদিরা প্রতিটি কথার আগে পরে মাঝখানে 'আল্লাহ দয়ালু আল্লাহ ক্ষমাশীল' বলতে বলতে মুখে ফেনা তুলছেন. অথচ তাদের কর্মকাণ্ডে 'দয়া আর ক্ষমা'র লেশমাত্র খুঁজে পাওয়া যায় না। কিভাবে উত্থান এই নৃশংস দয়ামায়াহীন বাগদাদি'র?

Wanted
Information leading to the location of
Abu Du'a
Up to $10 Million Reward

Place of Birth : Samarra, Iraq
Date of Birth : 1971
Sex : Male
Hair : Black
Eyes : Brown
Complexion : Olive
Aliases : Dr. Ibrahim 'Awwad Ibrahim 'Ali al-Badri al-Samarrai', Ibrahim 'Awad Ibrahim al-Badri al Samarrai, Abu Duaa', Dr. Ibrahim, Abu Bakr al-Baghdadi

বাগাদাদির মাথার দাম এখন ১০ লাখ মার্কিন ডলার

২০০৩ সালের আগের বাগদাদি কোনোদিন অস্ত্র হাতে নিয়েছিলেন বলে কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। 'বরাবরই লাজুক নিভৃতচারী, ভদ্র আর পড়ুয়া এক বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপক ছিলেন তিনি। ১৮ বছর বয়স থেকে থাকতেন বাগদাদের দরিদ্র এলাকা তবচি'র জামে মসজিদ লাগোয়া এক কামরার একটি ঘরে। খুব মিষ্টি কণ্ঠ। তার আজানের ধ্বনিতে অন্তর যেন জুড়িয়ে যেত। শখ বলতে ছিল শুধু ফুটবল। পাড়ার লীগ ম্যাচে তবচি মসজিদের হয়ে খেলতেন। পরিচিত ছিলেন আবু দুইয়া নামে। দুইয়া ছিলেন আমাদের মেসি। দুর্দান্ত 'স্ট্রাইকার'। টেলিগ্রাফ পত্রিকাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বলছিলেন—এক সময়ের খেলার সাথী আবু আলী। সেই বাগদাদি এখনও স্ট্রাইকার। তবে ফুটবলের নয়। জঙ্গিদল আইএস-এর অপ্রতিদ্বন্দ্বী এবং একমাত্র স্ট্রাইকার তিনি। ইতিহাসের নির্মম সত্য হলো, পাড়ার সেই গোবেচারা ভদ্র স্ট্রাইকার আবু দুইয়া'র কল্যাণে তবচি'র দরিদ্র পল্লীতে আজ

BanglaBook.org

যুদ্ধাবস্থা, বলছিলেন আবু আলী। এখানে শিয়া সুন্নি দুই গোত্রেরই হাজারো দরিদ্র মানুষের বসবাস। আবু দুইয়া এক সময় এই পাড়ার বাসিন্দা ছিলেন কেবল এ কারণে শিয়া গেরিলাদের ক্ষোভ আর প্রতিশোধের আগুনে পুড়ছে তবচির সুন্নিরা। পুরো এলাকাকে রাজধানী বাগদাদ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে শিয়া'রা। ভয়ে বাড়ির বারান্দায় পর্যন্ত দাঁড়াবার সাহস পাচ্ছেন না সুন্নিরা। এই পরিস্থিতির জন্যে এখন খেলার সাথী আবু আলীও ঘৃণা করেন আবু দুইয়াকে।

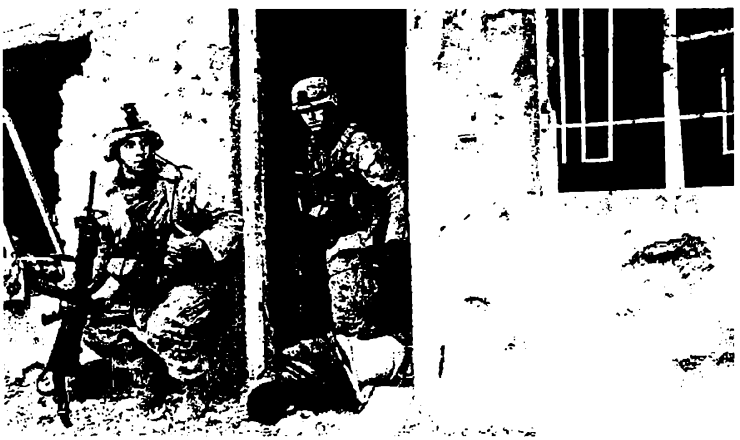

২০০৩ সালে ইরাক যুদ্ধ শুরুর সময়টাতেও বাগদাদি ছিলেন পুরোদস্তুর একজন সংসারি মানুষ। স্ত্রী আর একমাত্র সন্তান নিয়ে কাটছিল তার দিন। টেলিগ্রাফকে আবু আলী বলছিলেন ইরাক যুদ্ধ শুরুর পর স্বভাবতই সুন্নিরা সবচেয়ে বেশি নির্যাতনের শিকার হয়েছিল। দখলদার মার্কিন সেনাদের প্রতিরোধ করতে জোট বাঁধছিল হাজারো সুন্নি। এক হয়েছিল তবচি'র সুন্নিরাও। ইসলামিক পার্টি নামের একটি দলে যোগ দেওয়ার আমন্ত্রণ জানানো হয় বাগদাদিকে। কিন্তু প্রত্যাখ্যান করেন বাগদাদি। আর এ কারণে তাকে তবচি'র ওই মসজিদ ছাড়তে হয়। হারাতে হয় একমাত্র বাসস্থানটাও।

প্রায় একই সময় ইসলামিক আর্মি ইন ইরাক নামের একটি মিলিশিয়া গ্রুপ গড়ে তোলেন বাগদাদির বিশ্ববিদ্যালয়ের সহপাঠি আহমাদ আল দাবাশ। সুন্নি জঙ্গিদের অনেকেই তখন এই দলে যোগ দিচ্ছিল। আল কায়দার সমর্থনও পেয়েছিল ইসলামিক আর্মি অব ইরাক। টেলিগ্রাফকে দাবাশ বলছিলেন ইসলামিক আর্মিতেও ছিলেন না বাগদাদি। কিন্তু সুন্নিদের ওপর মার্কিন সেনাদের দমন নিপীড়ন আর শিয়া সরকারের একচ্ছত্র আধিপত্য বাগদাদিকে মানসিক পীড়া দিচ্ছিল।

BanglaBook.org

ইরাকের সুন্নি শহর ফালুজায় ব্যাপক গণহত্যা চালিয়েছিল মার্কিন সেনারা

২০০৪ সালে মার্কিন সেনাদের ফালুজা অভিযানের আগে জানে। এক সময় 'জামায়াত জয়েশ আহলে আল সুন্নাহ ওয়াল ই জামা' (JJASJ) নামের একটি সুন্নি উগ্রপন্থী দলে যোগ দেন বাগদাদি। সেই দলের হয়ে একই বছর ফালুজায় মার্কিন বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন তিনি। সেখানেই তার যুদ্ধের হাতেখড়ি। ফালুজার সুন্নি মুসলিমদের ওপর ব্যাপক হারে গণহত্যা চালিয়েছিল মার্কিন ও ইরাকি সেনারা। ফালুজার সেই অন্যায় যুদ্ধই প্রথমবারের মতো ইরাকের সুন্নি উগ্রপন্থীদের এক ছাতার নিচে নিয়ে আসে। সেখানেই জারকাবির সাথে বাগদাদির পরিচয়। ফালুজা যুদ্ধের পর ইরাকের বিভিন্ন শহরে ঘাটটি সিরিজ হামলা চালিয়ে অন্তত দেড়শো মানুষ হত্যার অভিযোগ উঠে তার বিরুদ্ধে। বোমা হামলা চালিয়ে প্রাচীন একটি শিয়া মসজিদ উড়িয়ে দেওয়ারও হোতা তিনি। একের পর এক এসব ঘটনার মধ্য দিয়ে বাগদাদি তখন মার্কিন ও ইরাকি বাহিনীর কাছে মোস্ট ওয়ান্টেড এক জঙ্গি নেতা। তবে ভাগ্য বরাবরই সুপ্রসন্ন ছিল বাগদাদির। তিনি ইরাকের শিয়া সরকারের সেনাদের হাতে ধরা পড়েননি। ২০০৫ সালে ফালুজায় (মতান্তরে নিজ শহর সামারা) মার্কিন বাহিনীর হাতে ধরা পড়েন বাগদাদী। ইরাকি বাহিনীর হাতে পড়লে হাজারো সুন্নি জঙ্গির মতো তাকেও হয়তো গুপ্ত হত্যার শিকার হতে হত। আটক হবার পর ইরাকের উম্ম কসরে মার্কিন সেনা নিয়ন্ত্রিত বন্দি শিবির ক্যাম্প বুকায় বন্দি করা বাগদাদিকে।

বিশাল একটি মাঠের চারপাশে ইলেকট্রোফায়েড কাঁটাতারের বেড়া। আর ভেতরে ছোট ছোট টিনশেড ক্যাম্পে বন্দিদের থাকার ব্যবস্থা। ক্যাম্প বুকার এমন ২৪টি ক্যাম্পে তখন হলুদ লাল ও সবুজ পোষাক পরা বিভিন্ন শ্রেণির ২৪

হাজার ইরাকি বন্দি। যাদের অর্ধেকেরও বেশি বিভিন্ন জঙ্গি সংগঠনের সুন্নি জঙ্গি। এই বন্দি শিবির যেন ইরাকের হাজারো সুন্নি জঙ্গিদের অন্যতম এক আশ্রয়স্থল হয়ে উঠে। সদ্য ক্ষমতা হারানো সাদ্দাম সরকারের সেনা কর্মকর্তা থেকে শুরু করে যাদেরই শত্রু বলে গণ্য হয়েছে, তাদেরকেই সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধের কয়েদি হিসেবে ক্যাম্প বুকায় আটক করা হয়েছে। সেখানেই বাগদাদিকে খুব কাছ থেকে দেখার সুযোগ পান তরুণ সুন্নি জিহাদি আবু আহমেদ। বৃটিশ দৈনিক গার্ডিয়ানকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে আবু আহমেদ বলেছেন, বাগদাদ বা ইরাকের অন্য কারাগারে কোনো বন্দির সাথে কথা বলা দূরে থাক পরস্পরের সাথে দেখা হবার সুযোগটাও ছিল না।

BanglaBook.org

উম্ম কসরের বন্দি শিবির ক্যাম্প বুকায় আটক ছিলেন বাগদাদিসহ ২৪ হাজার জঙ্গি

কিন্তু এই কারাগার যেন তাদের নতুন জীবন দিয়েছে। এখানে সব সময় বন্দিরা বাইরে ঘোরাফেরার সুযোগ পেত কথা বলার সুযোগ পেত। এখানেই আইএস নেতা আবু বকর আল বাগাদাদির সাথে আবু ওমরের সখ্যতা। অসংখ্য দিন বাগদাদিকে কাছ থেকে দেখেছেন ভবিষ্যত কর্মপন্থা নিয়ে কথা বলেছেন। তারপরও মানুষটিকে ঠিক বুঝে উঠতে পারেননি ওমর। তার ভাষায় বাগদাদি শুনতেন বেশি বলতেন কম। তাকে ঠিক বোঝা যেত না। তার মধ্যে কোথায় যেন একটা আড়াল ছিল। একটা বন্ধ দরজা ছিল। মনে হত তিনি কিছু একটা লুকুচ্ছেন। তাই আর সব বন্দির কাছে তাঁকে অনেক দূরের মানুষই মনে হত। কিন্তু এটাও ঠিক যে তার উপস্থিতি সব সময় বিশেষভাবে সবার নজর কাড়ত। তার মধ্যে নেতৃত্বের অন্তর্গত একটা শক্তি ছিল। জেলে জঙ্গিদের মধ্যে নিয়মিত বৈঠক হত। সেই বৈঠকেই সুন্নিদের একটি সশস্ত্র দল গড়ার কাজ শুরু করেন বাগাদাদি। যে দলের লক্ষ্য হবে শিয়াদের নিশ্চিহ্ন করে শরিয়াভিত্তিক একটি খিলাফত রাষ্ট্র গঠন করা। জেলে বসে সেই লক্ষ্যেই নিবিষ্ট মনে কাজ করে গেছেন বাগদাদি। বাছাই করেছেন দলের সদস্য। যাদের একজন ছিলেন আবু ওমর। দলের সবার ফোন নাম্বার জামার ভেতর বিশেষ কায়দায় লুকিয়ে রাখতেন ওমর। আর এভাবেই যুক্তরাষ্ট্রের সেনা কর্মকর্তাদের নাকের ডগায় মার্কিন কারাগার ক্যাম্প বুকা হয়ে উঠে আইএস জঙ্গি উত্থানের অন্যতম এক সুতিকাগার। সাক্ষাৎকারে একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়ে আবু ওমর বলেছেন, সে সময় উগ্রপন্থার দায়ে যারাই গ্রেফতার হত এমনকি ইরাকি বাহিনীর হাতে গ্রেফতার হলেও তাদের প্রায় ছিনিয়ে এনে এই বন্দি শিবিরে পুরে রাখত মার্কিন সেনারা।

ক্যাম্প বুকা সম্পর্কে বোম ফাটানো তথ্য দিয়েছিলেন এক আল কায়দা সদস্য। ২০০৯ সালে মুক্তি পাবার পর আল জাজিরাকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ওই আল কায়দা সদস্য বলেছেন: 'সেটা ছিল রীতিমত এক জঙ্গি স্কুল। বয়োজ্যেষ্ঠ জঙ্গি নেতারা সেখানে অল্প বয়ষ্ক তরুণদের ব্লাকবোর্ডে এঁকে এঁকে ক্লাশ নিতেন কি করে হাতে তৈরি বোমা বানাতে হয়, কিভাবে বুকে বিস্ফোরক বেঁধে নিজেকে উড়িয়ে দিতে হয়, কিভাবে রাস্তার পাশে বোমা পেতে রাখতে হয়। বুকার আরেক জঙ্গি নেতা আদেল জসিম মোহাম্মদ, আরব নিউজকে বলেছেন, ওই কারাগারে মাত্র এক সপ্তহের কারাবাসের মধ্যেই তিনি ২৫ থেকে ৩৫ জন জঙ্গি সদস্য সংগ্রহ করে আরও দ্বিগুণ শক্তি নিয়ে উগ্রপন্থায় ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। সাক্ষাৎকারে আদেল বলেছেন, মার্কিন সেনা কর্মকর্তাদের চোখের সামনেই এসব ঘটত। তারা দেখেও না দেখার ভান করতেন। ২০০৬ থেকে ২০০৭ সাল পর্যন্ত ক্যাম্প বুকায় দায়িত্ব পালন করা

BanglaBook.org

মার্কিন এয়ারফোর্সের সেনা কর্মকর্তা James Skylar Gerrond এক সাক্ষাৎকারে স্বীকার করেছেন, 'সব জেনে শুনেই বুকাকে জঙ্গি উত্থানের এক প্রেসার কুকারে পরিণত করা হয়েছিল'।

২০০৯ সালে ক্যাম্প বুকা বন্ধ ঘোষণার পর হাতে গোনা কয়েকজন ছাড়া প্রায় সব বন্দিকেই মুক্তি দেয় মার্কিন সেনা কর্তৃপক্ষ। নথিতে উল্লেখ করা হয়, কোনো অপরাধের প্রমাণ না পাওয়ায় তাদের ছেড়ে দেওয়া হলো। অর্থাৎ ক্যাম্প বুকার অন্তত ৯৯ শতাংশ বন্দিরই কোনো অপরাধের প্রমাণ পায়নি যুক্তরাষ্ট্র। যাদের সংখ্যা অন্তত ২০ হাজার। এবং এদের শতকরা ৯০ জনই কোনো-না-কোনো সুন্নি জঙ্গি গোষ্ঠির সাথে যুক্ত ছিল। ছাড়া পান বাগদাদিও। এর কিছুদিন পরই মুক্ত হন বাগাদাদির ব্যক্তিগত সহকারি হয়ে ওঠা আবু ওমর। অথচ তখনও জারকাবির সৃষ্টি করা শিয়া-সুন্নি সংঘাতের বহুমুখী অভিঘাত মোকাবেলা করছে ইরাক। ইরাকি সরকারের প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও কেন, কার নির্দেশে পুরো একটি কারাগার উজাড় করে ইরাকের জমিনে ছেড়ে দেওয়া হলো? ইরাকের পরবর্তী ঘটনা প্রবাহের ভেতরই লুকিয়ে ছিল এই প্রশ্নের উত্তর।

মুক্তির পর জেল থেকে নিয়ে আসা ফোন নাম্বারের সূত্র ধরে বাগদাদির হয়ে সবার সাথে যোগাযোগ শুরুর কাজটি করেছিলেন আবু ওমর। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই শেষ হয় দল গোছানোর কাজ। এ যেন জঙ্গিদের ক্যাম্প বুকা অ্যালামনাই এসোসিয়েশান। যোগ দেন বুকায় থাকা সাদ্দাম হোসেনের সেনাবাহিনী'র প্রত্যাখ্যাত বেশ কজন সেনা কর্মকর্তা। যাদের একজন সাবেক ইরাকি জেনারেল ইজ্জত ইব্রাহীম আল দৌরি। যিনি ছিলেন সাদ্দামের বাথপার্টি

BanglaBook.org

শীর্ষ নেতা। বাথিষ্টদের সাথে জঙ্গিদের আদর্শিক কোনো মিল না থাকলেও কেবল নুরী আল মালিকীর শিয়া আধিপত্য ভেঙে দেওয়াই ছিল তাদের টার্গেট। বাগদাদির উপস্থিতিতে জঙ্গি নেতাদের গোপন বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়, শিয়া সরকারের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক যুদ্ধ ঘোষণার। ঠিক হয় দিন তারিখও। কিন্তু বিপুল সংখ্যক জঙ্গির জেল থেকে মুক্তির বিষয়টি নজরে ছিল মালিকী সরকারের। সতর্ক হয়ে যায় নিরাপত্তা বাহিনী। বন্ধ করে দেওয়া হয় সিরিয়াসহ সকল সীমান্ত চৌকি। বাগদাদসহ শিয়া শহরগুলোতে নেওয়া হয় নজীরবিহীন নিরাপত্তা। সুযোগ খুঁজতে থাকে জঙ্গিরাও। ২০০৯ সালের ১৯ আগস্ট হামলার দিন ঠিক করে জঙ্গিরা। সেদিন সকালে পানিবাহি তিনটি ট্রাকে বোঝাই করা হয় শক্তিশালী বিস্ফোরক। একটি অবস্থান নেয় বাগদাদের অর্থ মন্ত্রণালয়ের সামনে। আরেকটি একশো মিটার দূরে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সামনে এবং তৃতীয়টি একটি পুলিশ কনভয়ের কাছে। কয়েক মিনিটের ব্যবধানে পরপর বিস্ফোরিত হয় ট্রাকগুলো। বিস্ফোরণের ধাক্কায় বাগদাদের পিচঢালা রাস্তা যেন আকাশে উড়ছিল। ধ্বসে পড়েছিল আশপাশের দোকানপাট, বাড়িঘর। নিহতের সংখ্যা দাঁড়ায় একশো। জারকাবির মৃত্যুর পর সেটাই ছিল ইরাকে সবচেয়ে বড় ধরনের হামলা। আর ওই হামলার মধ্যদিয়ে ইরাকে নতুন মাত্রার তাণ্ডব শুরু করেন বাগাদাদি।

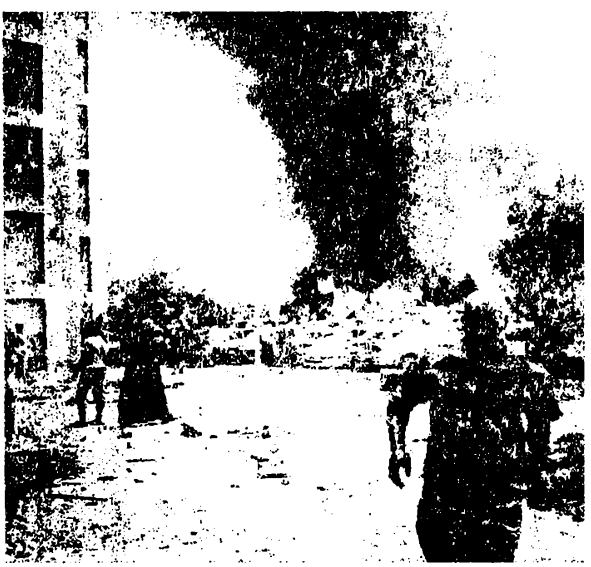

বাগদাদের অর্থ ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সামনে ট্রাক বোমা হামলার অন্তরালে ছিলেন বাগদাদি

জেলে বসেই আবু মুসাব আল জারকাবির মৃত্যু সংবাদ পেয়েছিলেন বাগদাদি। ফালুজা যুদ্ধে জারকাবির আল কায়দা ইন ইরাকের সাথে বাগদাদির সখ্যতা ছিল। জারকাবির মৃত্যুর পর দলটির নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন আবু ওমর আল বাগদাদি। ২০১০ সালে মার্কিন বিমান হামলায় আবু ওমরের মৃত্যু হলে দলের হাল ধরেন বর্তমান আইএস নেতা। যদিও আরব বার্তা সংস্থা আল মনিটর মনে করছে আবু ওমর আল বাগদাদি এবং আবু বকর আল বাগদাদি আসলে একই মানুষ। ইরাকের শিয়া সরকারের চোখে ধুলো দিতেই এই কৌশল অবলম্বন করেন তিনি। প্রশ্ন ওঠে বাগাদাদি তাহলে কবে জেলে গেলেন আর কবেই বা ছাড়া পেলেন। আল মনিটর এর মতো অনেক গণমাধ্যমের দাবি জারকাবির মৃত্যুর আগেই বাগদাদি মুক্তি পান। এবং আল কায়দা ইন ইরাকের ছায়া নেতৃত্বের দায়িত্ব পালন করেন। তবে ক্যাম্প বুকার নথিপত্রের ভিত্তিতে যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্টের তথ্য বলছে, বাগদাদি'র কারাভোগের সময়কাল ২০০৫ থেকে ২০০৯। তাই এই তথ্যটিকেই দালিলিক হিসেবে ধরে নিতে হচ্ছে।

BanglaBook.org

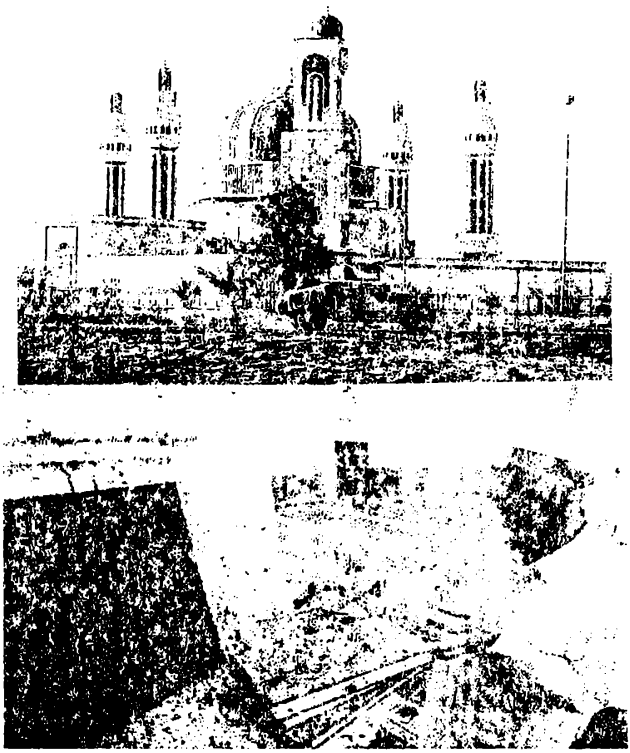

সুন্নি মসজিদ উম্ম আল কুরা'য় আত্মঘাতী হামলার হোতা ছিলেন বাগদাদি

বলছিলাম ২০১০ সালের মে মাসে আল কায়দা ইন ইরাকের নেতা নির্বাচিত হন বাগদাদি। দলটির নাম তখন ইসলামিক স্টেট অব ইরাক অর্থাৎ আইএসআই। টেলিগ্রাফ পত্রিকাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ইরাকের নিরাপত্তা বিশ্লেষক হিশাম আল হাশমী বলছেন: 'এটা এখনও বিশাল এক রহস্য যে কেন তারা বাগদাদিকে নেতা হিসেবে নির্বাচন করল। কারণ দলটিতে তখনও বাগদাদির চেয়ে অনেক পুরনো এবং অনেক পরীক্ষিত নেতা ছিল। তাদের তুলনায় বাগদাদী পুরোদস্তুর নবীণ। উত্তর ইরাকের নিনেভে দলটির শুরা কাউন্সিলের নির্বাচনে এগারো সদস্যের মধ্যে নয়জনই বাগদাদির পক্ষে ভোট দিয়েছেন। যারা অনেকে বাগদাদিকে ঠিকমতো চেনেনও না।' ইরাকি এই বিশ্লেষকের মতো আরও অনেকেই বাগদাদির হঠাৎ নেতা হয়ে উঠবার পেছনে রহস্যের ইঙ্গিত পেয়েছেন। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে জারকাবির জঙ্গি দলটির রিমোট কন্ট্রোল ছিল সৌদি আরবের হাতে। বাগদাদির নেতা হয়ে ওঠার পেছনেও কি তবে সৌদি ইচ্ছারই বাস্তবায়ন ঘটেছে?

জারকাবির আল কায়দা ইন ইরাকের পর এবার শুরু হলো ইসলামিক স্টেট অব ইরাকের তাণ্ডব। সেই একই কায়দায় শিয়া মুসলিম হত্যা, বিদেশিদের অপহরণ এবং কাফের আখ্যা দিয়ে খুন, প্রায় প্রতিদিন ইরাকের কোনো-না-কোনো এলাকায় বোমা হামলা; এই ছিল আইএসআই'র রোজকার কর্মকাণ্ড। মার্চ ২০১১ থেকে একই বছরের আগস্ট পর্যন্ত ইরাক জুড়ে ২৩টি সন্ত্রাসী হামলার নেতৃত্ব দেন বাগদাদি। এরমধ্যে সবচেয়ে গুরুতর হামলার ঘটনাটি ঘটে ২৮ আগস্ট। সেদিন পশ্চিম বাগদাদের আল আদেল এলাকার উম্ম আল কুরা মসজিদে আত্মঘাতী হামলা চালিয়ে সুন্নি নেতা এবং সংসদ সদস্য খালেদ আল ফাদাওয়িকে হত্যা করা হয়। ৯১ সালে প্রথম উপসাগরীয় যুদ্ধে বিজয়ের স্মারক হিসেবে এই মসজিদ গড়েছিলেন সাদ্দাম হোসেন। মসজিদটিতে সাদ্দামের রক্তে লেখা একটি কোরান শরীফও রক্ষিত ছিল। যুদ্ধ শুরুর পর সুন্নি জঙ্গিদের আশ্রয় এবং বৈঠকের কেন্দ্র হয়ে উঠে এই মসজিদ। পরে এটি দখলে যায় শিয়া মিলিশিয়াদের। আর তারই প্রতিশোধ হিসেবে বাগদাদির হামলার টার্গেটে পরিণত হয় উম্ম আল কুরা মসজিদ। ২০১১ সালের মে মাসে আল কায়দা নেতা বিন লাদেনের মৃত্যু সংবাদ প্রচার হলে নিন্দা জানিয়ে হামলার হুমকি দিয়েছিলেন বাগদাদি। ওই হুমকির তিনদিন পর পাঁচ মে হিল্লা শহরে বোমা হামলা চালিয়ে চব্বিশ জন পুলিশ হত্যার দায় স্বীকার করেছিলেন বাগদাদি। একই বছরের আগস্টে মোসুলে আত্মঘাতী হামলায় সত্তর জন, ডিসেম্বরে বাগদাদ জুড়ে সিরিজ বোমা হামলায় তেষট্টি জন এবং বছরব্যাপী ইরাক জুড়ে মোট একশোটি জঙ্গি হামলায় এক হাজারেরও বেশি মানুষের মৃত্যুর জন্যে বাগদাদিকে দায়ী করেছিল ইরাকি সরকার।

BanglaBook.org

এমন রক্তক্ষয়ী পরিস্থিতিতে ২০১১ সালের ডিসেম্বরে আনুষ্ঠানিকভাবে ইরাক থেকে সকল সেনা প্রত্যাহার করে নেয় যুক্তরাষ্ট্র। এ সময় মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা বলেছিলেন, 'We're leaving behind a sovereign, stable and self-reliant Iraq' অর্থাৎ সার্বভৌম স্থিতিশীল এবং আত্মনির্ভরশীল এক ইরাককে রেখে যাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র। ওবামার এই বক্তব্য সম্ভবত শতাব্দির সেরা কৌতুক হিসেবে গিনেস রেকর্ড বুকে ঠাঁই পেতে পারে।

আইএস জঙ্গিদের হাতে মৃত্যুর প্রতিক্ষায় রাক্কার তিন শিয়া মুসলিম

আরেক কুর্দী মুসলিমকে ক্রুশ বিদ্ধ করে হত্যা

২০১২ সালে আরব বসন্তের ধারাবাহিকতায় সিরিয়ায় গৃহযুদ্ধ শুরু হলে নতুন রণাঙ্গন খোলার দারুণ এক মওকা এসে যায় বাগদাদির সামনে। বাশার আল আসাদ বিরোধী সশস্ত্র সংগ্রামের প্রথম সুযোগেই ইসলামিক স্টেট অব ইরাকের একদল জঙ্গিকে সিরিয়ায় পাঠিয়ে দেন বাগদাদি। পরের বছর ২০১৩ সালের এপ্রিলে এক বিবৃতিতে আইএসআই'এর কর্মকাণ্ডকে সিরিয়া পর্যন্ত

বিস্তৃত করার ঘোষণা দিয়ে দলের নাম ইসলামিক স্টেট অব ইরাক এন্ড লেভেন্ট অথবা ইসলামিক স্টেট অব ইরাক এন্ড সিরিয়া বলে ঘোষণা করেন। এ সময় সিরিয়ার আলকায়দা পন্থী সুন্নি জঙ্গি দল জাহাবাত আল নুসরা'র (আল নুসরা ফ্রন্ট নামেও পরিচিত) সাথে জোট বাঁধেন বাগদাদি। মাত্র এক মাসের মাথায় দুই গ্রুপের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব শুরু হয়ে যায়। নুসরা ফ্রন্ট চাইছিল বাগদাদি তার দলবল নিয়ে নুসরা ফ্রন্টের নামেই অন্তর্ভুক্ত হবেন। আর বাগদাদি চাইছিলেন আইএসআইএল'এর স্বীকৃতি। এই বিবাদ আল কায়দা নেতা আয়মান আল জাওয়াহিরি পর্যন্ত গড়িয়েছিল। এক চিঠিতে বাগদাদিকে নুসরা ফ্রন্টের ব্যানারেই লড়াই করার অনুরোধ করেছিলেন জাওয়াহিরি। বাগদাদি এই প্রস্তাব কেবল প্রত্যাখানই করেননি বরং নুসরা ফ্রন্টের ৮০ শতাংশেরও বেশি বিদেশি জিহাদিকে উল্টো আইএসআইএল-এর দলে ভেড়ান। এবং নুসরা ফ্রন্টের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার ঘোষণা দেন। ঘটনা পরম্পরায় নিজেদের মধ্যেই খুনোখুনিতে লিপ্ত হয় দুই দল।

আইএস জঙ্গিদের গণহত্যার চিত্র

২০১৩ সালের শেষভাগে বেসামরিক নাগরিকসহ নুসরা ফ্রন্টের অন্তত সাতশ যোদ্ধাকে হত্যা করে সিরিয়ার আর রাক্কা শহরের দখল নেয় আইএসআইএল। রাতারাতি সেখানে ইসলামি শরিয়া আইন চালুর ঘোষণা দিয়ে অমুসলিমদের অস্ত্রের মুখে মুসলিম বানানো হয়। যারা এতে রাজি হননি তাদের হত্যা করা হয়। অসংখ্য শিয়া ও কুর্দী মুসলিমকে কাফের আখ্যা দিয়ে জনসমক্ষে জবাই করে, গুলি করে কিংবা গ্রেনেড বিদ্ধ করে হত্যা করে আইএস জঙ্গিরা। যৌনদাসি হিসেবে তুলে নেওয়া হয় শিয়া কুর্দী আর খ্রিষ্টান নারীদের। এমন নারকীয় পরিস্থিতিতে রাক্কা ছেড়ে উদ্বাস্তু হতে হয় হাজারো মানুষকে।

BanglaBook.org

হত্যার পরও আরেক হতভগ্যের লাশের ওপর বর্বর নির্যাতন

একই সময়ে ইরাকের বিভিন্ন শহরেও নতুন মাত্রার ত্রাস শুরু করে আইএসআইএল। ২০১৩ সালের পুরোটা বছর জুড়ে প্রায় প্রতিদিন ইরাকের কোনো-না-কোনো শহরে হামলা চালিয়েছে আইএস জঙ্গিরা। ২৩ জুলাই বাগদাদের আবু গারিবসহ দুটি কারাগারে হামলা চালিয়ে ২৯ জন নিরাপত্তাকর্মীকে হত্যার পর শত শত বন্দিকে মুক্ত করার দায় স্বীকার করেছিলেন বাগদাদি। পরে এদের সবাই আইএস জঙ্গি দলে পুনর্বাসিত হয়েছিল। এই হামলার প্রায় এক বছর আগে থেকে Breaking the Walls বা দেওয়াল ভাঙার প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছিলেন বাগদাদি। আবু গারিব কারাগারের দেওয়াল ভেঙে ইরাকের নুরী আল মালিকী সরকারকে তিনি বুঝিয়ে দিলেন তার হাত এমনকি ইরাক নামের রাষ্ট্রটির চাইতেও অনেক বেশি লম্বা।

একে একে আইএস জঙ্গিদের সিরিয়ার পূর্বাঞ্চলীয় বিভিন্ন এলাকার দখল নেওয়া এবং ইরাকের দিকে অগ্রসর হওয়ার ঘটনা ছিল তখন গণমাধ্যমের রোজকার শিরোনাম। নতুন বছর ২০১৪ সালের শুরুটা হয় আইএস-এর বিজয় গাঁথা দিয়ে। জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহেই পর পর ইরাকের সুন্নি শহর ফালুজা এবং রামাদি'র দখল নেয় আইএস জঙ্গিরা। বরাবরের মতো এই শহর দুটিতেও সুন্নি ছাড়া বাকি সব ধর্মের মানুষের ওপর নৃশংস হত্যা আর নির্যাতন চালিয়ে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে জঙ্গিরা। জুনে ইরাকের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর মোসুল এবং সুন্নি শহর তিকরিতের দখল নেয় আইএস। মোসুল দখলের প্রথম দিনেই শহরের সমস্ত মাজার আর শিয়া মসজিদগুলো ট্যাঙ্কের গোলায় উড়িয়ে দেয় জঙ্গিরা।

BanglaBook.org

মোসুল দখলের প্রথমদিনেই ১৭ শো সেনা ও কারাগারে থাকা ৬৭০ জন শিয়া কুর্দী এবং খ্রিস্টান বন্দিকে হত্যা করে জঙ্গিরা

দক্ষিণ কিরকুকের একটি গ্রামে শিয়া নারী শিশু ও বেসামরিক মানুষের ওপর চালানো হয় বর্বর হত্যাযজ্ঞ। যাকে গণহত্যা বললেও কম বলা হবে। একটি এয়ারবেইজ দখলে নিয়ে এয়ারফোর্সের কয়েকশ তরুণ ক্যাডেটকে লাইনে দাঁড় করিয়ে বিমান বিধ্বংসী মেশিন গানের ভারি বুলেট দিয়ে গুলি করে মাংসের কিমায় পরিণত করা হয়। মোসুলে একদিনেই আত্মসমর্পণের পরও অন্তত ১৭শ ইরাকি সেনাকে গুলি ও জবাই করে হত্যা করে জঙ্গিরা। ভাগ্যক্রমে বেঁচে যাওয়া এক সেনাসদস্য বর্বর সেই হত্যাকাণ্ড আর নির্মম নির্যাতনের বর্ণনা দিয়েছেন। মোসুলের কেন্দ্রীয় কারাগারের দখল নিয়ে অন্তত ৬৭০ জন শিয়া কুর্দী আর খ্রিষ্টান বন্দিকে বিনা কারণে হত্যা করা হয়। গুঁড়িয়ে দেওয়া হয় শিয়া অধ্যুষিত শহর তাল আফারের ৪ হাজার বাড়িঘর। পুরুষদের বেছে বেছে হত্যার পর নারীদের এমনকি দশ বারো বছরের কিশোরীদেরর তুলে নেয় জঙ্গিরা। এই শহরগুলোর কত শত শিয়া মুসলিম আইএস জঙ্গিদের

BanglaBook.org

হাতে প্রাণ দিয়েছে, কত শত নারীকে জোর করে যৌনদাসি বানানো হয়েছে, বুকের দুধ পান করা কত শিশুকে তাদের মায়েদের কাছ থেকে আলাদা করা হয়েছে; এখনও সেইসব হত্যা আর নির্যাতনের সঠিক কোনো পরিসংখ্যান জানা যায়নি। কারণ শহরগুলো এখনও আইএস জঙ্গিদের দখলে।

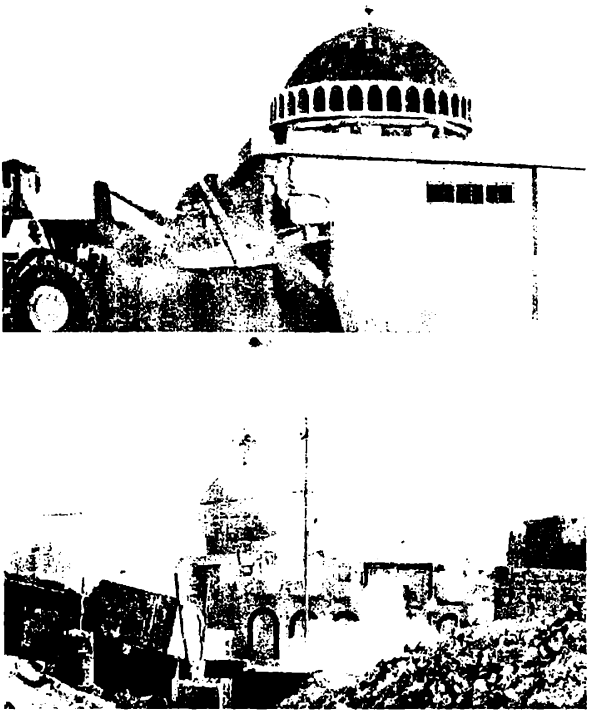

মোসুলের হাজার বছরের পুরনো মসজিদ সুফি সাধকদের মাজার, মাটির সাথে মিশিয়ে দিয়েছে বর্বর আইএস জঙ্গিরা

কেবল ইরাকি সেনা বা ভিন্ন মতাবলম্বীদের ওপর গণহত্যাই নয়—মোসুলের হাজার বছরের পুরনো মসজিদ, সুফী সাধকদের মাজার সবকিছুই মাটির সাথে মিশিয়ে দিয়েছে আইএস জঙ্গিরা। শত শত বছর ধরে যে সুফী সাধকদের ভক্তিভরে শ্রদ্ধা জানিয়ে আসছিল ইরাকের কোটি কোটি মুসলিম, হাজার বছরের ইতিহাসে যে মাজারের ওপর এমনকি ইসলামের শত্রুরাও হাত দেওয়ার সাহস পায়নি, সেই মসজিদ আর মাজারগুলো গুড়িয়ে দিয়েছে ইসলামের এই নব্য রক্ষাকর্তারা। মোসুলের নিনেভসহ বিভিন্ন এলাকায় নবী হযরত ইউনুস (আ:) এর মাজারসহ অন্তত চারজন সুফী সাধকের মাজার গুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। বিস্ফোরক দিয়ে উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে শত বছরের পুরনো অন্তত ৬টি মসজিদ।

BanglaBook.org

কেবল পবিত্রস্থান হিসেবেই নয়। ইরাকের শিয়া মুসলিমদের ইতিহাস ঐতিহ্য আর শহরের পরিচয়ের স্মারক হিসেবেও যুগ যুগের সাক্ষী ছিল প্রত্নতাত্ত্বিক এই স্থাপনাগুলো। ইতিহাসে সম্ভবত এই প্রথম নিজেদের মুসলিম বলে দাবি করা একটি গোষ্ঠি আল্লাহর ঘর মসজিদকে পর্যন্ত শিয়া-সুন্নি বিভেদে বিভক্ত করল। আর এটাই চেয়েছিল যুক্তরাষ্ট্র সৌদি আরব এবং ইসরাইল।

সীমান্ত তুলে দিয়ে ইরাক-সিরিয়ার দখল করা অংশে (ম্যাপের মাঝখানে কালো অংশ) খিলাফত ঘোষণা করে আইএস

উপোষ রেখে হত্যা করা হয় শত শত ইয়াজিদি শিশুকে

ওমাবা ঘোষিত 'সার্বভৌম ও আত্মনির্ভরশীল' ইরাকি শহরগুলোর শিয়া সেনারা সেদিন প্রতিরোধের চেষ্টা দূরে থাক বরং প্রাণ নিয়ে পালিয়েছে। আর যারা পালাবার সুযোগ পায়নি তারা ধরা পড়েছে। এমন শত শত সেনার হত্যাযজ্ঞের ছবি আইএস-এর বর্বরতা আর নৃশংসতার জ্বলন্তপ্রতীক হয়ে

আছে, থাকবে আরও বহুযুগ পর্যন্ত। শহরগুলোর ব্যাংক অস্ত্রাগার লুট আর তেল শোধনাগার দখলের মধ্যদিয়ে আইএস জঙ্গিদের কাছে হিরক খনি হয়ে উঠেছে ইরাকের রণাঙ্গন। যুক্তরাষ্ট্রের অত্যাধুনিক হামভী সেনাযান, এম সিক্সটিন ফর্টিন বা ফিফটিন রাইফেল, ট্যাংক বিধ্বংসী গোলা কিংবা বিমান বিধ্বংসী ক্ষেপণাস্ত্র সবই এখন এই জঙ্গিদের দখলে।

ইরাক-সিরিয়ার শহরগুলোতে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার পর ২৯ জুন দখল করা ভূখণ্ডে খিলাফত ঘোষণার মধ্যদিয়ে আরও একবার জঙ্গিদলটির নাম পরিবর্তন করেন বাগাদাদি। এবার নাম দেওয়া হয় শুধু ইসলামিক স্টেট বা আইএস। তুলে দেওয়া হয় ইরাক সিরিয়ার সীমান্ত। পরদিন আইএসএস জঙ্গিদের হত্যাকাণ্ড ও অস্ত্রের মুখে ধর্মান্তরিত করার খবরে উদ্বেগ প্রকাশ করে জাতিসংঘের তরফ থেকে জানানো হয়, আইএস-এর তাণ্ডব চালানো শহরগুলো থেকে অন্তত ১২ লাখ মানুষকে ঘরছাড়া করা হয়েছে। পুরো জুন-জুলাই ইরাক-সিরিয়ার নতুন নতুন শহর দখলের মধ্যদিয়ে একরকম প্রতিরোধহীন ত্রাস সৃষ্টি করেছিল জঙ্গিরা। কেবল ইরাকের কুর্দিস্তান দখল করতে গিয়ে প্রবল বাধার মুখে পড়তে হয় তাদের। তারপরও সিনজার পার্বত্যাঞ্চলের বিস্তীর্ণ এলাকা দখলে নিয়ে ইয়াজিদি সম্প্রদায়ের হাজারো নারী পুরুষ ও শিশুদের ওপর নজিরবিহীন নির্যাতন চালানো হয়েছে।

BanglaBook.org

পশুর মতো গলায় শিকল পরিয়ে দাস হিসেবে বিক্রি করা হয় ইয়াজিদি নারীদের

আইএস-এর হাতে ইরাকের এমন মর্মান্তিক পরাজয়ের দায় বর্তেছিল ইরাকের নূরী আল মালিকী সরকারের ওপর। যদিও সিরিয়ার পশ্চিমাঞ্চল দখলের পর আইএস জঙ্গিদের অগ্রসর হবার খবরটা কারোই অজানা ছিল না। ২০১৩

সালের শেষভাগ থেকে ১৪ সালের মাঝামাঝি পর্যন্ত আইএস-এর তাণ্ডবের প্রশ্নে নির্বিকার দেখা গেছে যুক্তরাষ্ট্রকে। বার বার যুক্তরাষ্ট্রের কাছে সাহায্য চেয়েছে ইরাক। মালিকী সরকার বার বার এসব ঘটনার জন্য সৌদি ইন্ধনকে দায়ী করেছেন। সৌদি আরবকে থামাতে ওবামা প্রশাসনের কাছে ধর্ণা দিয়েছেন। কিন্তু 'সার্বভৌম' ইরাকের 'অভ্যন্তরীণ' বিষয়ে নাক গলাতে চায়নি হোয়াইট হাউস। সাহায্য বলতে ১৯ জুন ইরাকে ৩শ সামরিক উপদেষ্টা পাঠায় যুক্তরাষ্ট্র। সেপ্টেম্বরে পাঠানো হয় সাড়ে তিনশো সেনা। তবে সেটা বাগদাদের মার্কিন দূতাবাস রক্ষার জন্য। সম্ভবত নাইন-ইলাভেন ঘনিয়ে আসার অপেক্ষায় ছিল ওবামা প্রশাসন। ইরাক জুড়ে আইএস-এর বর্বরতার আটমাস পর ৮ আগস্ট প্রথমবারের মতো জঙ্গি অবস্থানের ওপর বিমান হামলা চালায় যুক্তরাষ্ট্র। আগস্ট-সেপ্টেম্বরে একে একে মার্কিন ও বৃটিশ সাংবাদিকসহ চারজনকে জবাই করে হত্যার পর সেই ভিডিও প্রচার করে জঙ্গিরা। মূলত নিজেদের নাগরিক হত্যার পরই আইএস বিরোধী যুদ্ধ ঘোষণা করে যুক্তরাষ্ট্র-ব্রিটেন। ২৩ সেপ্টেম্বর আইআস-এর কথিত খিলাফত রাষ্ট্রের রাজধানী রাক্কায় প্রথমবারের মতো বিমান হামলা চালায় যুক্তরাষ্ট্র। সে মাসেই যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে গঠিত হয় আইএস বিরোধী বহুজাতিক জোট। কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, ইউরোপ আর মধ্যপ্রাচ্যের মোট ৬২টি দেশ অংশ নেয় আইএস বিরোধী এই জোটে। অক্টোবর থেকে জোটগতভাবে আইএস-এর বিরুদ্ধে চলছে বহুজাতিক জোটের বিমান হামলা। যদিও এই হামলার কার্যকারিতা আর রণকৌশল আইএসকে কতটা কাবু করবে তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র ও সৌদি আরব সত্যিকার অর্থে আইএসকে যথাসম্ভব অল্প সময়ের মধ্যে গুড়িয়ে দিতে চায়; নাকি ভয়ঙ্কর এই জঙ্গিদের নৃশংসতা আরও অনির্দিষ্ট সময় ধরে টিকিয়ে রেখে এই অঞ্চলে দীর্ঘমেয়াদে একটা যুদ্ধ পরিস্থিতি জারি রাখতে চায়, তা নিয়েও যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে।

আমেরিকা ইউরোপ এমনকি সৌদি আরবের মতো দেশেরও বর্তমান সামরিক সক্ষমতা প্রশ্নাতীত। রণাঙ্গনের জেনারেলরা নন বরং এ যুগের রণ কৌশলের প্রণেতা হলো স্যাটেলাইট প্রযুক্তি। পেন্টাগনে বসেই বিশ্বের প্রত্যন্ত যে কোনো এলাকার ওপর নজরদারি চালানোই শুধু নয়, স্যাটেলাইট গাইডেড মিসাইল হামলা চালিয়ে নিখুঁতভাবে লক্ষ্যবস্তুকে পঞ্চাশ হাত মাটির তলায় গেঁড়ে ফেলতে পারে যুক্তরাষ্ট্র। সেখানে বিশ্বের ক্ষমতাধর ৬২টি দেশ মিলে গত প্রায় এক বছরেও আইএস জঙ্গিদের কোনঠাসা করতে পারছে না এটি হাস্যকর অকল্পনীয়। যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক সিনেট প্রার্থী মার্ক ডানোফ বলছেন, '৬২টি দেশের দরকার নেই। যুক্তরাষ্ট্র একাই ২৪ ঘণ্টার নোটিসে আইএস'এর কথিত

BanglaBook.org

খিলাফত রাষ্ট্রকে মরুভূমি'র ধূলিকণায় পরিণত করতে পারে।' যুক্তরাষ্ট্রের ভাষায় এই 'জঘন্য খুনে জঙ্গিদের তাহলে কেন এখনও নিশ্চিহ্ন করা যাচ্ছে না? মার্ক ডানোফের মতে যুক্তরাষ্ট্র সৌদি আরব ও ইসরাইলের সম্মিলিত ষড়যন্ত্রের ফল হিসেবে সৃষ্টি হওয়া আইএস জঙ্গিদের নিয়ে এখনও অনেক খেলার বাকি। রক্তাক্ত এই মঞ্চের পর্দা নামবে তখনই, যখন এই তিন দেশের বহুমুখী স্বার্থ উদ্ধার হবে। আইএস জঙ্গিদের বেতন ভোগী ভাড়াটে খুনি উল্লেখ করে এই মার্কিন রাজনীতিক প্রশ্ন ছুঁড়েছেন, কারা এই খুনিদের অর্থ অস্ত্র আর সাহযোগিতা দিয়ে সিরিয়ার রণাঙ্গনে ছেড়ে দিল এবং এক সময় তারা ইরাকের প্রায় অর্ধেকটা দখল করে নিল, সেটা আজ তদন্তের দাবি রাখে। মার্ক ডানোফের এই অভিযোগ যে অমূলক নয় তার প্রমাণ 'The Redirection.' এবারে নজর দিতে চাই ইসরাইলসহ ত্রি দেশিয় ষড়যন্ত্রের আরও কিছু অজানা অধ্যায়ের দিকে।

তুর্কী সিরিয়ার সীমান্তবর্তী শহর কোবানির আইএস জঙ্গিদের ওপর বহুজাতিক জোটের বিমান হামলা

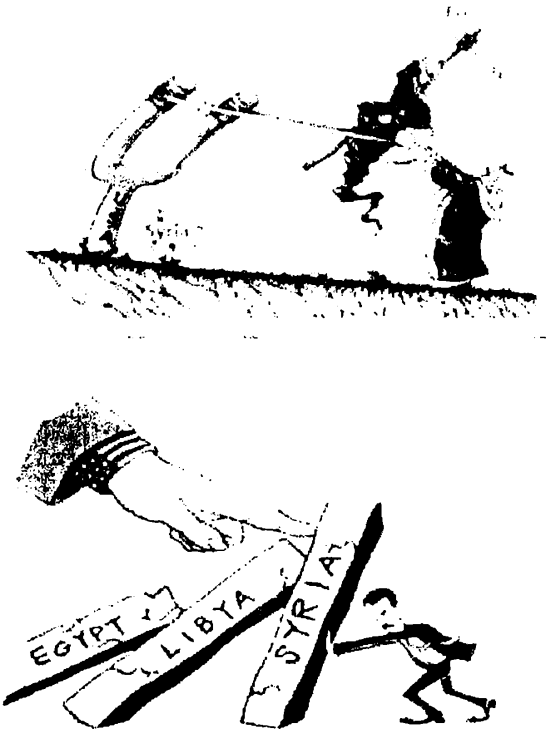

যুক্তরাষ্ট্রের আইএস বিরোধী জোটে নেই মধ্যপ্রাচ্যের পরমাণু শক্তিধর রাষ্ট্র ইসরাইল। এ ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্র ও সৌদি আরবের যুক্তি হলো, ইসরাইল এতে অংশ নিলে আইএস বিরোধী যুদ্ধ নিয়ে মুসলিম বিশ্বে প্রশ্ন উঠবে। গ্রহণযোগ্যতা হারাবে জঙ্গিবিরোধী এই লড়াই। বরং জোটে অংশ না নিয়ে ভৌগোলিক রাজনৈতিক অবস্থান থেকেই আইএস বিরোধী ভূমিকা রাখবে ইসরাইল। অর্থাৎ ইসরাইলের ভূমিকা হবে অপ্রকাশ্য। সিরিয়ার গৃহযুদ্ধের শুরু থেকে ঠিক সেই ভূমিকাটাই রেখে চলেছে ইসরাইল। তবে সেটা আইএস তথা সুন্নি জঙ্গিদের বিপক্ষে নয় বরং পক্ষে। প্রেসিডেন্টে ওবামা বলেছিলেন বিশ্বের কোনো মাটিতে আইএস জঙ্গিদের জন্য কোনো স্বর্গ রচনার সুযোগ দেবে না যুক্তরাষ্ট্র ও তার জোট। কিন্তু অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি ওবামা যে মুহূর্তে এই হুঁশিয়ারী দিচ্ছেন তখনও আইএস জঙ্গিদের সামরিক বেসামরিক সকল রকম মদতই দিচ্ছিলো যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে কাছের বন্ধু ইসরাইল। এখনও জঙ্গিদের

BanglaBook.org

জন্য খোলা রয়েছে ইসরাইলের গোপন দ্বার। আফগানিস্তানে যুক্তরাষ্ট্রের সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধ নিয়ে মার্কিন সাংবাদিক কারলোত্তা গলের 'The wrong enemy' বইটির কথা আরও একবার মনে করিয়ে দিচ্ছি। ওই বইয়ে কারলোত্তা প্রমাণ দিয়েছেন কিভাবে পাকিস্তান তালেবান জঙ্গিদের সৃষ্টি করে বানের জলের মতো আফগান রণাঙ্গনের দিকে ঠেলে পাঠাত আর পাকিস্তানের তৈরি করা সেই জঙ্গিদের বিরুদ্ধেই লড়ত যুক্তরাষ্ট্র। ইরাক-সিরিয়ায় যুক্তরাষ্ট্রের আইএস তথা জঙ্গিবিরোধী লড়াইয়ে ঠিক সেই ভূমিকাটাই পালন করছে ইসরাইল।

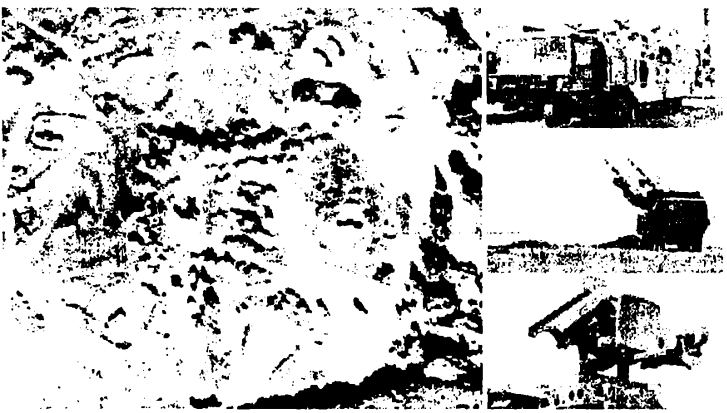

দামেস্কের আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় ইসরাইলি বিমান হামলা

২০১৩ সালের ডিসেম্বরে জঙ্গিরা যখন রাক্কার পর একে একে সিরিয়ার অন্যান্য এলাকার দিকে এগিয়ে চলেছে, তখন জঙ্গিদের পক্ষে যেন অগ্রবর্তী বাহিনীর ভূমিকাই পালন করেছিল ইসরাইল। ৭ ডিসেম্বর দামেস্কের অন্তত সাতটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্যবস্তুতে বিমান হামলা চালায় তেল আবিব। বিজ্ঞান গবেষণাগার, সিরিয়ার আকাশ প্রতিরক্ষার মিসাইল ডিপো, এয়ার ডিফেন্স সাইট, রাডার আর ইলেকট্রনিক মনিটরিং স্টেশন লক্ষ্য করে চালানো হয় এসব হামলা। জঙ্গি বিরোধী লড়াইয়ের জন্য রাশিয়ার কাছ থেকে নতুন প্রজন্মের যে মিসাইলের সম্ভার গড়ে তুলেছিলেন বাশার আল আসাদ, তার প্রায় সবটাই ধ্বংস করে দেয় ইসরাইল। এত গেল সিরিয়ার মাটিতে হামলার মধ্যদিয়ে জঙ্গিদের কৌশলগত সুবিধা দেওয়ার প্রসঙ্গ। এবার আসা যাক জঙ্গিদের প্রতি ইসরাইলের সামরিক সাহায্য প্রসঙ্গে।

ইসরাইল এবং সিরিয়াকে আলাদা করেছে যে ভূখণ্ড, সেটি গোলান মালভূমি। ৭০-এর দশকে বাশার আল আসাদের বাবা হাফিজ আল আসাদের

BanglaBook.org

সময়ে গোলানের দখল নিয়ে দুই দেশের মধ্যে একটি ক্ষণস্থায়ী যুদ্ধ হয়েছিল। ওই যুদ্ধের পর সেখানে একটি আন্তর্জাতিক সীমারেখা বা সহজ করে বললে ভারত পাকিস্তানের দুই কাশ্মিরের মতো একটি নিয়ন্ত্রণ রেখা গড়ে দিয়েছিল জাতিসংঘ। এই নিয়ন্ত্রণ রেখার নো ম্যানস ল্যান্ডে নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করে আসছে জাতিসংঘের সেনারা। ইসরাইল যখন দামেস্কের সামরিক লক্ষ্যবস্তুতে বিমান হামলা চালাল, ঠিক একই সময় জাতিসংঘ সংস্থা UN Disengagement Force (UNDOF) সিকিউরিটি কাউন্সিলের কাছে পেশ করা এক গোপন প্রতিবেদনে বলেছে, আইএস জঙ্গিসহ সিরিয়ায় লড়াই করা সুন্নি জঙ্গিদের সাথে ইসরাইলি সেনাদের রহস্যময় আচরণ লক্ষ্য করা গেছে। সীমান্তের ceasefire line এলাকাকে জঙ্গিদের জন্যে স্বর্গরাজ্যে পরিণত করা হয়েছে। এবং রহস্যময় এসব কর্মকাণ্ডের ওপর জাতিসংঘের UNDOF-এর বাহিনীকে কোনো নজরদারি চালাতে দেওয়া হচ্ছে না। এমনকি ইসরাইলি সেনারা জাতিসংঘ বাহিনীকে ওই এলাকা ত্যাগ করতেও বাধ্য করেছে। রিপোর্টে বলা হয়েছে গোলান মালভূমির সিরিয়া অংশে বাশার আল আসাদ যখনই জঙ্গি বিরোধী কোনো অভিযান চালিয়েছেন। তখনই সেই জঙ্গিদের গোলানের ইসরাইল অংশে আশ্রয় প্রশ্রয় দেওয়া হয়েছে। এমনকি জঙ্গিদের হয়ে সিরিয় সেনাদের লক্ষ্য করে মর্টার আর ট্যাঙ্কের গোলা ছুঁড়েছে ইসরাইল। আর গণম্যাধ্যমে দাবি করা হয়েছে, আসাদ অনুগত সেনাদের হামলার মুখে আত্মরক্ষার জন্যেই ওইসব হামলা করেছে ইসরাইল। রিপোর্টে UNDOF প্রধান বলেছেন, এ সব কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে ইসরাইল কেবল নিয়ন্ত্রণ রেখাই লঙ্ঘন করেনি বরং গোলানে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের অস্ত্র বিরতি চুক্তিও লংঘন করেছে।

BanglaBook.org

গোলানে জাতিসংঘ শান্তি রক্ষীদের প্রহরা

ইসরাইল এবং সিরিয়াকে আলাদা করেছে যে ভূখণ্ড, সেটি গোলান মালভূমি। ৭০-এর দশকে বাশার আল আসাদের বাবা হাফিজ আল আসাদের সময়ে গোলানের দখল নিয়ে দুই দেশের মধ্যে একটি ক্ষণস্থায়ী যুদ্ধ হয়েছিল। ওই যুদ্ধের পর সেখানে একটি আন্তর্জাতিক সীমারেখা বা সহজ করে বললে ভারত পাকিস্তানের দুই কাশ্মিরের মতো একটি নিয়ন্ত্রণ রেখা গড়ে দিয়েছিল জাতিসংঘ। এই নিয়ন্ত্রণ রেখার নো ম্যানস ল্যান্ডে নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করে আসছে জাতিসংঘের সেনারা।

সিরিয়ার আহত জঙ্গির শয্যাপাশে ইসরাইলি প্রধানমন্ত্রী

ইসরাইল যখন দামেস্কের সামরিক লক্ষ্যবস্তুতে বিমান হামলা চালাল, ঠিক একই সময় জাতিসংঘ সংস্থা UN Disengagement Force (UNDOF) সিকিউরিটি কাউন্সিলের কাছে পেশ করা এক গোপন প্রতিবেদনে বলেছে, আইএস জঙ্গিসহ সিরিয়ায় লড়াই করা সুন্নি জঙ্গিদের সাথে ইসরাইলি সেনাদের রহস্যময় আচরণ লক্ষ্য করা গেছে। সীমান্তের ceasefire line এলাকাকে জঙ্গিদের জন্যে স্বর্গরাজ্যে পরিণত করা হয়েছে এবং রহস্যময় এসব কর্মকাণ্ডের ওপর জাতিসংঘের UNDOF-এর বাহিনীকে কোনো নজরদারি চালাতে দেওয়া হচ্ছে না। এমনকি ইসরাইলি সেনারা জাতিসংঘ বাহিনীকে ওই এলাকা ত্যাগ করতেও বাধ্য করেছে। রিপোর্টে বলা হয়েছে গোলান মালভূমির সিরিয়া অংশে বাশার আল আসাদ যখনই জঙ্গি বিরোধী কোনো অভিযান চালিয়েছেন। তখনই সেই জঙ্গিদের গোলানের ইসরাইল অংশে আশ্রয় প্রশ্রয় দেওয়া হয়েছে। এমনকি জঙ্গিদের হয়ে সিরিয় সেনাদের লক্ষ্য করে মর্টার আর ট্যাঙ্কের গোলা ছুঁড়েছে ইসরাইল। আর গণম্যাধ্যমে দাবি করা হয়েছে, আসাদ

BanglaBook.org

অনুগত সেনাদের হামলার মুখে আত্মরক্ষার জন্যেই ওইসব হামলা করেছে ইসরাইল। রিপোর্টে UNDOF প্রধান বলেছেন, এ সব কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে ইসরাইল কেবল নিয়ন্ত্রণ রেখাই লঙ্ঘন করেনি বরং গোলানে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের অস্ত্র বিরতি চুক্তিও লংঘন করেছে।

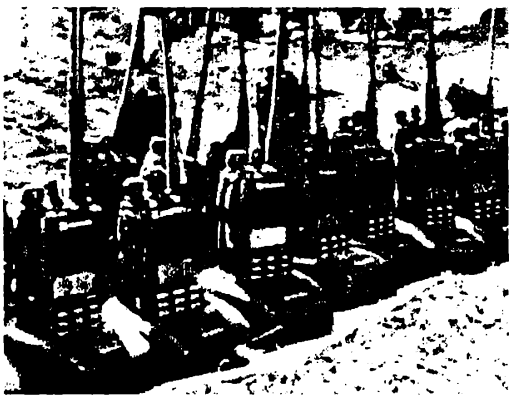

জঙ্গিদের জন্যে ইসরাইলের বেতারযন্ত্র

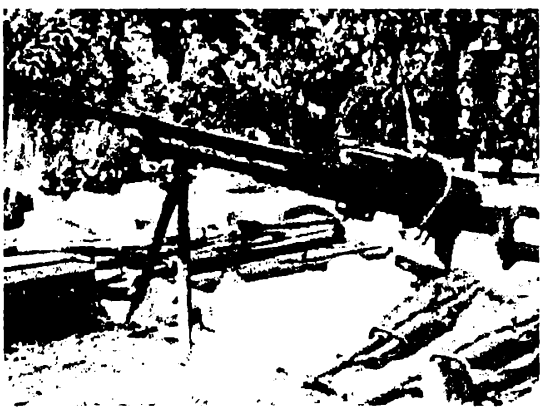

জঙ্গিদের জন্যে ইসরাইলের স্নাইপার রাইফেল

গোলান সীমান্তের ইসরাইল অংশে জঙ্গিদের স্বর্গরাজ্য গড়ে ওঠার কথা বলেছেন UNDOF প্রধান। বস্তুত তাই। রণাঙ্গনে আহত জঙ্গিদের জন্য ওই এলাকায় রীতিমত হাসপাতাল গড়ে তুলেছে ইসরাইল। ২০১৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে আর্মি ফিল্ড হসপিটাল নামের এমনি এক হাসপাতাল পরিদর্শন করেছিলেন ইসরাইলি প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু। সীমান্তের সেনা চৌকিতে দায়িত্ব পালন করা সেনাদের জরুরি চিকিৎসা সেবা দেওয়ার ওই হাসপাতালে এক

বছরে অন্তত এক হাজার জঙ্গিকে চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে। ওই হাসপাতালে চিকিৎসা সুবিধা পাওয়া এমনি এক জঙ্গি নেতা শরিফ আস সাফোরি। গত ২২ জুলাই গোলানের সিরিয় অংশে আটক হন ইসরাইল ফেরত এই জঙ্গি। আটকের পর শরিফ স্বীকার করেছেন গত দুই বছরে তিনি মোট পাঁচবার সীমান্তপথে ইসরাইল সফর করেছেন। প্রথমবার ইসরাইল সীমান্তে যাবার পর উর্ধ্বতন এক সেনাকর্মকর্তা ও তার দুই সহকারি তাকে সীমান্তের কাঁটাতারের বেড়া অতিক্রমে সাহায্য করেন। পরে তাকে ইসরাইলি সিমকার্ডযুক্ত একটি সেল ফোন দেওয়া হয়। এই ফোনের মাধ্যমে আরও কয়েকজন ইসরাইলি সেনা কর্মকর্তার সাথে নিয়মিত যোগাযোগ করেছেন শরিফ। যোগ দিয়েছেন একাধিক বৈঠকে। পাশাপাশি তিনি সীমান্তের আর্মি ফিল্ড হসপিটালে চিকিৎসা নিয়েছেন। এরপর ২০১৩ সাল থেকে ১৪ সালের মাঝামাঝি পর্যন্ত আরও চারবার ইসরাইল সফর করেন এই জঙ্গি নেতা। প্রতিটি সফরে তাকে অস্ত্র ও গোলাবারুদ দিয়ে সাহায্য করেছে ইসরাইল। প্রতিবারই ভারী রাইফেল, রকেট প্রপেল্ড গ্রেনেড বা আরপিজি, বিমান বিধ্বংসী স্টিংগার রকেট এবং বিভিন্ন অস্ত্রের হাজার হাজার রাউন্ড গুলি ইসরাইলি সীমান্ত থেকে রণাঙ্গনে নিয়ে গেছেন তিনি। জঙ্গি নেতা শরিফ আস সাফোরির স্বীকারোক্তির একটি ভিডিও ইউটিউবে পাওয়া যাচ্ছে। ভিডিওতে তার এই স্বীকারোক্তির ধরণ দেখে এমনটা মনে হয়নি যে নির্যাতন করে তার মুখ থেকে এসব কথা আদায় করা হয়েছে। শরিফের এই স্বীকারোক্তি যে মিথ্যে নয় তার আরও প্রমাণ রয়েছে।

আটক জঙ্গিনেতা শরিফ আস সাফোরী

ফেব্রুয়ারিতে ইরাকের নূরী আল মালিকী সরকারের এক সেনা কর্মকর্তা অভিযোগ করে বলেছেন, ইরাক ও সিরিয়ায় তাণ্ডব চালানো আইএস জঙ্গিরা ইসরাইলি অস্ত্র ব্যবহার করছে। ইরাকি সেনাদের হাতে পরাজিত আইএস জঙ্গিদের ফেলে যাওয়া অস্ত্র ভাণ্ডারে ইসরাইলের তৈরি গোলা বারুদ পাওয়া

গেছে। জুনে একই দাবি করেন সিরিয়ার আরেক সেনা কর্মকর্তা। সে মাসে লেবানন সীমান্তের কাছে সিরিয়ার তারতোজ এলাকায় নুসরা ফ্রন্টের একটি ঘাঁটি দখলের পর একটি অস্ত্র গুদামের দখল নেয় বাশার অনুগত সেনারা। ইসরাইলের তৈরি বিভিন্ন প্রজন্মের রাইফেল, স্নাইপার রাইফেলসহ বিপুল পরিমাণ অস্ত্র ও গোলা বারুদে ঠাসা ছিল পুরোটা গুদাম। ২০১৩ সালের গোড়ার দিকে সিরিয়ার উত্তর পূর্বাঞ্চলের আল কাসির এলাকায় মেলে ইসরাইলের তৈরি মিসাইল। তারও আগে ২০১২ সালের ডিসেম্বরে অর্থাৎ বাশার বিরোধী লড়াইয়ের একদম শুরুতেই জর্ডান সীমান্ত এলাকার জঙ্গিদের কাছ থেকে উদ্ধার করা হয় ইসরাইলের তৈরি ট্যাংক বিধ্বংসী মিসাইল (LAV anti-tank missiles) বেতার যন্ত্র এবং গোলাবারুদ।

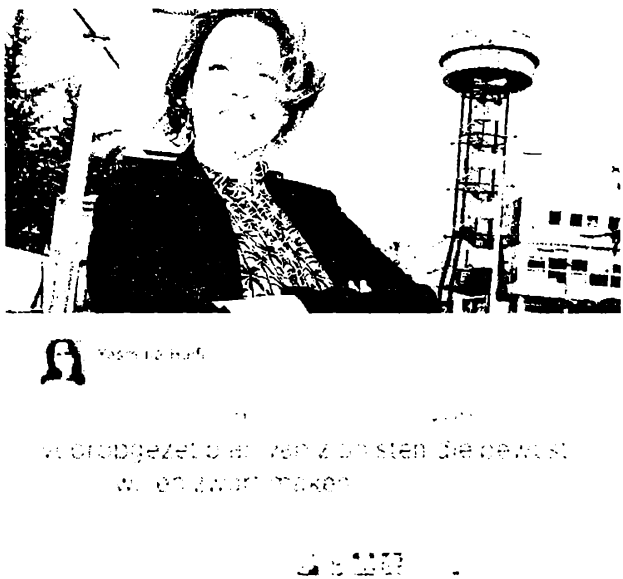

ইয়াসমিনা হাইফি ও ডাচ ভাষায় লেখায় তার টুইট

Jewish Telegraphic Agency (JTA)-এর একটি খবরের দিকে দৃষ্টি ফেরানো যাক। যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক এই বার্তাসংস্থা গত আগস্টে নেদারল্যান্ডসের বিচার মন্ত্রণালয়ের এক উর্ধ্বতন কর্মকর্তার উদ্ধৃতি দিয়ে একটি খবর ছেপেছে। খবরের শিরোনাম ISIS a Zionist conspiracy. ইয়াসমিনা হাইফি নামের ওই কর্মকর্তা বলেছেন: 'আইএস-এর সাথে ইসলামের কোনো সম্পর্ক নেই।

ইহুদি ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবেই এদের আবির্ভাব। আর এদের কাজ হলো ইসলাম ও মুসলিমদের ওপর কালিমা লেপন করা'। এমন এক সময় হাইফি এই মন্তব্য করলেন যখন নেদারল্যান্ডসে মুসলিম বিরোধী বিক্ষোভ তুঙ্গে উঠেছে। বিক্ষোভে অংশ নেওয়া মানুষদের ধারণাটা এমন যে মুসলিম মানেই আইএস আর মুসলিম মানেই উগ্র ধর্মান্ধ খুনি ধর্ষক।

পরে হাইফি বলেছেন বিশ্বজুড়ে মুসলিমদের সম্পর্কে এমন ধারণা গড়ে তুলতেই এই খুনি জঙ্গিদের সৃষ্টি করা হয়েছে, আর তাদের মদত দেওয়া হচ্ছে। তবে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ইসরাইল বিরোধী এই মন্তব্য করে তোপের মুখে পড়েছিলেন হাইফি। উর্ধ্বতন সরকারি কর্মকর্তা হিসেবে তার ওই মন্তব্যকে ঘিরে মাঠ গরম করতে চেয়েছিল বিরোধীরা। ফলে স্ট্যাটাসটি প্রত্যাহার করতে বাধ্য হন তিনি।

হাইফি'র মতো নাবিল নাঈমও বিশ্বাস করেন আল কায়দার মতো আইএসও সিআইএ'র অন্যতম এক সৃষ্টি। দানব সৃষ্টির এই পর্বে সিআইএ'র সাথে যোগ দিয়েছে ইসরাইলের গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদ আর সৌদি আরব। নাবিল নাঈম মিসরের রাজনৈতিক দল ডেমোক্রেটিক জিহাদ পার্টির প্রতিষ্ঠাতা। স্বশস্ত্র সংগ্রামের মধ্যদিয়ে মিসরে উদারপন্থার ইসলামি শাসন কায়েমের আন্দোলন করতে গিয়ে সাবেক স্বৈরশাসক হোসনি মোবারকের সময় গ্রেফতার এবং দীর্ঘ কারাভোগের পর আরব বসন্তের দ্বার প্রান্তে মুক্তি পান নাঈম।

BanglaBook.org

নাবিল নাঈম

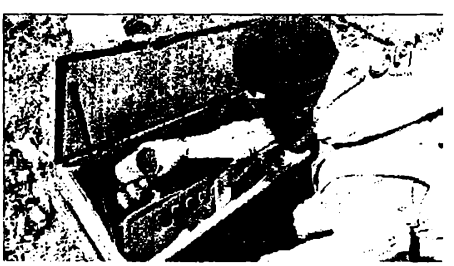

জঙ্গিদের জন্য পাঠানো মার্কিন গ্রেনেড

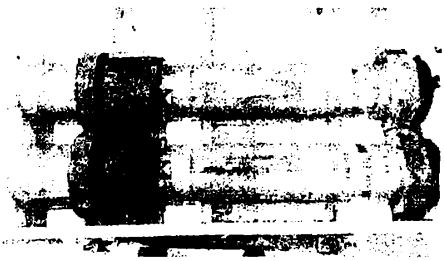

জঙ্গিদের জন্য সৌদি গোলা

জুলাই মাসে বৈরুতভিত্তিক প্যান অ্যারাবিক টিভি চ্যানেল al-Maydeen কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন: 'আফগান যুদ্ধের আল কায়দা থেকে শুরু করে এ যুগের আইএসও সিআইএ আর ইসরাইলি গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদের সৃষ্টি। প্রভুদের স্বার্থ রক্ষার কাজই করে চলেছে আইএস-এর জঙ্গিরা। আইএস এবং নুসরা ফ্রন্টের মতো জঙ্গিরা এখন পর্যন্ত যা যা করে চলেছে তার সবটাই যুক্তরাষ্ট্র, ইসরাইল ও সৌদি আরবের পক্ষে গেছে। যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরাইলের লক্ষ্য হলো এই অঞ্চলে অনির্দিষ্ট যুদ্ধাবস্থা টিকিয়ে রেখে মধ্যপ্রাচ্যকে টুকরো টুকরো করা। সোভিয়েত ইউনিয়ন ভাঙার মধ্যদিয়ে যেমন বলকানের প্রতিটি ক্ষুদ্র অঞ্চলকে একেকটা দুর্বল রাষ্ট্রে পরিণত করা হয়েছে, তেমনি মধ্যপ্রাচ্যের শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলোকে ভেঙে টুকরো টুকরো করার দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্য নিয়েই আইএস-এর মতো জঙ্গিদের মাঠে নামানো হয়েছে। আমার আশঙ্কা হলো ২০১৬ সাল নাগাদ আইএস ও তার প্রভু সিআইএ-মোসাদের লক্ষ্য পূরণের পালা শুরু হবে। উপসাগরীয় অঞ্চলের বাদশাহী মসদনগুলোতে ভাঙন শুরু হবে। যুগ যুগের পাপের ফলস্বরূপ এমনকি সৌদি আরবও এর থেকে পার পাবে না। গত জুনে বাগদাদি সৌদি আরবে জিহাদের ঘোষণা দিয়েছেন। আর আইএস-এ যোগ দেওয়া দেশটির শত শত জিহাদি এখন নিজ দেশে জিহাদ শুরুর জন্য উন্মুখ হয়ে আছে।' এ প্রসঙ্গে আইএস'র এক সৌদি জিহাদির টুইট বার্তার কথা উল্লেখ করেছেন নাবিল নাঈম: 'গত ৩০ জুন এক সৌদি জিহাদি তার টুইটারে বলেছেন, আল্লাহ চাহেত তারা সৌদি আরব দখলের পরই মক্কা ও কাবা ধ্বংস করবে। কারণ আইএস জঙ্গিদের বিশ্বাস প্রতিবছর মানুষ সেখানে কাবার পাথর ছুতেই ছুটে যায় আল্লাহকে ছুঁতে নয়।' কাবাঘর ধ্বংসের মতো এমন বিধ্বংসী ইচ্ছার কথা কোনোদিন কোনো মুসলমান তার কল্পনাতেও আনতে পারে? আইএস-এর এই লক্ষ্য পূরণ হলে হয়তো মধ্যপ্রাচ্যই হয়ে উঠবে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের মূল রণাঙ্গন। সিরিয়ার যুদ্ধে নুসরা ফ্রন্টের সাথে সিআইএ'র অদ্ভুত মেলবন্ধনের কথা উল্লেখ করেছেন নাঈম:

BanglaBook.org

'সিরিয়ার নুসরা ফ্রন্টের প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করেছিলেন আল কায়দা নেতা আয়মান আল জাওয়াহিরি। আমার বিশ্বাস নুসরা ফ্রন্টের নেতা মোহাম্মদ আল জাওলানি সিআইএ'র লোক। তিনি সিআই-এর জন্যই কাজ করছেন।'

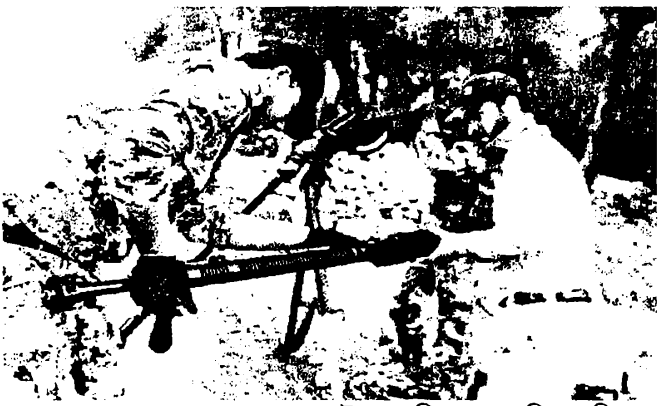

কাতারের দোহায় গোপন সেনা বেইজে জঙ্গিদের সামরিক প্রশিক্ষণ

জর্ডানের গোপন সেনা বেইজে জঙ্গিদের সামরিক প্রশিক্ষণ

নাবিল নাঈমের কথার সূত্র ধরে দেখা যাক কিভাবে যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্রদের মদত পেয়েছিল নুসরা ফ্রন্টের বিদেশি জিহাদিরা। যাদের সবাই এখন আইএস-এর সদস্য। আগেই বলেছি ফ্রি সিরিয়ান আর্মির কথিত উদারপন্থী যোদ্ধাদের অস্ত্র ও প্রশিক্ষণ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যুক্তরাষ্ট্র। কিন্তু বাস্তবতা হলো কোনো মর্ডারেট বিদ্রোহী নয় বরং ফ্রি সিরিয়ান আর্মির ব্যানারে মূলত নুসরা ফ্রন্টসহ কট্টরপন্থী আইএস জঙ্গিদের অস্ত্র অর্থ ও প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। সিরিয়ার গৃহযুদ্ধ শুরুর পর ২০১২ সালে কয়েক হাজার জঙ্গিকে প্রশিক্ষণ দিয়ে মাঠে নামানো হয়েছে। রয়টার্সের অনুসন্ধানী প্রতিবেদন বলছে,

কাতারের দোহায় সৌদি সীমান্তবর্তী আল আদউদ নামের একটি এলাকায় জঙ্গিদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। এর কাছেই মধ্যপ্রাচ্যে যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় এয়ার বেইজ। স্পর্শকাতর সামরিক এলাকা হওয়ায় কাতারের গোয়েন্দা সংস্থা-এর সার্বিক নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করে থাকে। সিরিয়া থেকে তুরস্ক হয়ে জঙ্গিদের একটি দলকে প্রথমে দোহায় নেওয়া হয়। পরে তাদের আল আদউদে পাঠানো হয়। সেখানে সামরিক বাহিনীর মতোই লড়াইয়ের সব রকম প্রশিক্ষণ পান জঙ্গিরা। কেবল প্রশিক্ষণই নয় সিরিয়ার জঙ্গিদের জন্য সৌদি আরব ও আরব দেশগুলোর দেওয়া অন্তত তিন বিলিয়ন ডলার অর্থ খরচ করেছিল কাতার। এই টাকা জঙ্গিদের বেতন আর অস্ত্র কেনা বাবদ খরচ হয়েছে। যুদ্ধ শুরুর পর থেকে দুই বছরে ৭০টি মিলিটারি কার্গো বোঝাই অস্ত্র ও গোলা বারুদ দিয়ে জঙ্গিদের সাহায্য করেছে কাতার। আরব দেশগুলোর এমন সাহায্য যত এসেছে নুসরা ফ্রন্ট আর আইএস জঙ্গিদের দাড়ি তত লম্বা হয়েছে, আর তারা আরও বেশি নৃশংস নির্মম দুর্ধর্ষ হয়েছে।

একইভাবে যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম মিত্রদেশ জর্ডানেও জঙ্গিদের গোপন সামরিক প্রশিক্ষণ হয়েছে। ২০১২ এবং ১৩ সালে দুই দফায় জর্ডানের দক্ষিণ ও পূর্বাঞ্চলীয় দুটি সেনা বেইজে কয়েক হাজার জঙ্গিকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এই জঙ্গিদের প্রায় সবাই এখন আইএস-এর সক্রিয় সদস্য। ২০১৩ সালের মার্চে জার্মান সাপ্তাহিক Der Spiegel এ বিষয়ে একটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদন প্রকাশ করে। প্রশিক্ষণে অংশ নেওয়া সদস্যদের বরাত দিয়ে পত্রিকাটি বলেছে সেই সময়ে অন্তত ১২শ সুন্নি সদস্য প্রচলিত অপ্রচলিত সব রকম গেরিলা যুদ্ধ, নগরকেন্দ্রিক গেরিলা লড়াই, বিস্ফোরকের ব্যবহার আর ট্যাংক বিধ্বংসী মিসাইলের প্রশিক্ষণ পেয়েছে। সামরিক পোষাক পরা মার্কিন প্রশিক্ষকরা যুক্তরাষ্ট্রের সেনাসদস্য নাকি কোনো বেসরকারি সিকিউরিটি এজেন্সি'র লোক সে সম্পর্কে জঙ্গিদের কোনো ধারণা ছিল না। তবে জঙ্গিরা তাদেরকে যুক্তরাষ্ট্রের বিশেষ কোনো বাহিনীর অভিজ্ঞ সদস্য বলেই মনে করেছে। একই মাসে অর্থাৎ ২০১৩ সালের মার্চে দ্যা টেলিগ্রাফও এ বিষয়ে একটি রিপোর্ট প্রকাশ করে। জর্ডানের নিরাপত্তা সূত্রের বরাত দিয়ে টেলিগ্রাফের এই রিপোর্টে বলা হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রের উদ্যোগে পরিচালিত এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে ব্রিটেন আর ফ্রান্সের প্রশিক্ষকরা অংশ নিয়েছে। মনে আছে নিশ্চয়ই একই সময় আল কায়দার ওপর নিষেধাজ্ঞা তুলে নিয়ে, বাশার আল আসাদকে একটি 'স্পষ্ট বার্তা' দিয়েছিলেন ইউরোপিয় ইউনিয়নের নেতারা। সেই 'স্পষ্ট বার্তা'র আড়ালে জর্ডানে নুসরা ফ্রন্টের সদস্যদের প্রশিক্ষণ ও সামরিক সহায়তা দিয়েছে ব্রিটেন। যা উঠে এসেছে গার্ডিয়ানের রিপোর্টে।

BanglaBook.org

তথ্যপ্রমাণে এটা স্পষ্ট যে আইএস জঙ্গিরা আসমান থেকে নাজিল হওয়া 'আল্লার সৈনিক' নয়, কিংবা ধর্মের বলে বলিয়ান হয়ে তারা এমন নৃশংস আর দুর্ধর্ষ হয়ে ওঠে নি। বরং ইরাক যুদ্ধের একটি পাপ থেকে আরও বহুমুখী পাপ আর ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তারের মধ্য দিয়ে নতুন যুগের এই নতুন জঙ্গিদের সৃষ্টি করা হয়েছে। অস্ত্র প্রশিক্ষণ আর বেতন দিয়ে ভাড়াটে বাহিনীর মতো তাদের পোষা হয়েছে। জঙ্গিদের ক্ষুদ্র সামর্থ্যকে দানবীয় করে তোলা হয়েছে, তাদের পাদ প্রদীপের আলোয় নিয়ে আসা হয়েছে। তাই এই খুনে জঙ্গিদের প্রতিটি হত্যাকাণ্ড আর সকল তাণ্ডবের দায় যুক্তরাষ্ট্র, সৌদি আরব ও ইসরাইল তথা ত্রী দেশিয় ষড়যন্ত্রের। সেই সঙ্গে এটাও সত্য যে কোনো জঙ্গি গোষ্ঠি বা বিদ্রোহী শক্তি সে যত শক্তিশালীই হোক না কেন, লড়াইয়ের ময়দানে তারা যতই বীরত্ব গাঁথা রচনা করুক না কেন, তারা কোনোদিনই কোনো রাষ্ট্র শক্তির চেয়ে বড় হয়ে উঠতে পারে না। যদি না তারা অন্য কোনো রাষ্ট্রীয় শক্তির মদত না পায়। যদি তাই হত তাহলে কলম্বিয়ার বামপন্থী ফার্ক গেরিলারা এতদিনে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে ফেলত, চেচেন বিদ্রোহীরা গড়ে তুলত স্বাধীন চেচনিয়া কিংবা গাজা ভূখণ্ডে রচিত হত স্বপ্নের স্বাধীন ফিলিস্তিন। অর্থাৎ আইএস জঙ্গিদের ইন্ধন দিয়েই তাদেরকে ইরাক নামের রাষ্ট্র শক্তির চাইতে আরও বহুগুণ শক্তিশালী করা হয়েছে। অথবা আইএস-এর অনিবার্য বিজয়ের লক্ষ্যেই ইরাক নামের রাষ্ট্রটির সমস্ত শক্তি আর সক্ষমতাকে নিংড়ে নেওয়া হয়েছে। মার্কিন বুদ্ধিজীবী ও বিশ্লেষক নোয়াম চমস্কি-র আশঙ্কা সাম্রাজ্যবাদি বিশ্ব শক্তিগুলোর আত্মঘাতী এসব ষড়যন্ত্র শেষপর্যন্ত গোটা মানব সভ্যতাকে হুমকির মুখে ঠেলে দিতে পারে। যে মেসোপটেমিয়ার হাত ধরে এই সভ্যতার অগ্রযাত্রা, সেটা পুরো মানব সভ্যতার জন্যই বিপর্যয়ের কারণ হতে পারে। ডেকে আনতে পারে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ সৃষ্টির মতো ভয়ঙ্কর পরিণতি। আর তেমনটা হলে সভ্যতার ধ্বংস অনিবার্য।

BanglaBook.org

ইসলামের নামে আইএস-এর নৃশংস বর্বরতা

ইসলাম নয় বরং ইসলামের নামে নৃশংস বর্বরতা আর ত্রাস সৃষ্টি করাই আইএস জঙ্গিদের একমাত্র হাতিয়ার। এই পরিচ্ছেদে নিতান্ত স্বল্প পরিসরে আইএস-এর কিছু কর্মকাণ্ডের বর্ণনা তুলে ধরা হলো। এটি পড়তে গিয়ে পাঠকের মনের পর্দায় যে দৃশ্যগুলো ভেসে উঠবে তা মানবিক বোধসম্পন্ন কোনো মানুষের পক্ষেই স্বস্তিকর নয়। বরং গা শিউরে ওঠা উৎকট অশ্লীল। কিন্তু বাস্তবতা হলো—এটাই আইএস। এই পরিচ্ছেদ ছাড়া গ্রন্থটি অসম্পূর্ণ থেকে যেত। তারপরও পাঠকের অস্বস্তির জন্য ক্ষমাপ্রার্থী

রাক্কার শরিয়া আদালতে এক হতভাগ্যের মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের মুহূর্ত

ইয়াজিদ নারীদের উপর যৌনসন্ত্রাস
শিয়া মুসলিম হত্যা
সুন্নি উপজাতি হত্যা
খ্রিস্টানদের হত্যা ও ধর্মান্তর
ইউনুস নবীর মাজার ধ্বংস
অন্ধকারের দুই শহর রাক্কা আর মোসুল
অনলাইনে আইএস-এর জিহাদ ও প্রপাগান্ডা

ইয়াজিদি নারীদের ওপর যৌনসন্ত্রাস

বার বার যেন ইতিহাসের ভুল বোঝাবুঝির (Historically misunderstood) দায় শোধ করে চলেছে ইরাকের ইয়াজিদি সম্প্রদায়ের প্রায় সাত লাখ মানুষ। ১৮ এবং ১৯ শতকে অটোমান সাম্রাজ্যের আমলে মোট বাহাত্তর বার এই জনগোষ্ঠির ওপর গণহত্যা চলেছে। লাখো ইয়াজিদিদের রক্তে লাল হয়েছে সিনজারের উষর প্রান্তর। তারও আগে চেঙ্গিস খান আর হালাকু খানের পারস্য বিজয়ের পথেও প্রাণ গেছে হাজারো ইয়াজিদির। ইরাক যুদ্ধ পরবর্তী সুন্নি জঙ্গিদের উত্থানকালেও টার্গেট সেই একই ইয়াজিদি। ২০০৭ সালে ইয়াজিদিদের কাফের ঘোষণা করেছিল আল কায়দা। সে সময় একের পর এক সুন্নি জঙ্গিদের হামলায় প্রাণ গেছে অন্তত এক হাজার ইয়াজিদির। ইতিহাসে যতবার ধর্মযুদ্ধ এসেছে ততবার ইয়াজিদি সম্প্রদায়ের অগুনতি মানুষের মর্মান্তিক মৃত্যু যেন এক অনিবার্য পরিণতি হয়ে দেখা দিয়েছে। কেন বারবার নৈরাজ্য আর বর্বরতার একই ইতিহাস ফিরে আসছে ইয়াজিদিদের জীবনে? নৃতাত্ত্বিকভাবে ইয়াজিদিরা সবাই কুর্দী। ভাষাও কুর্দী। অটোমান সাম্রাজ্যের সময় এই কুর্দীদের বড় একটা অংশ ইসলাম গ্রহণ করলেও ক্ষুদ্র একটি অংশ আজও নিজেদের স্বতন্ত্র জাতিসত্তা ধরে রেখেছে। বিশ্বের সবচেয়ে আদি ধর্ম জুরাথুস্ত্রবাদ ইংরেজিতে যা কিনা জোরোআসত্রিয়ানিজম সেই একেশ্বরবাদি ধর্মে বিশ্বাসী ইয়াজিদিরা। ইহুদি খ্রিস্টান আর মুসলিমদেরও হাজার বছর আগে একেশ্বরবাদের বীজ রোপিত হয়েছিল তাদের ধর্মে। ইয়াজিদিদের ধর্মবিশ্বাসকে যোধাইজম (Yazidism) নামেও অভিহিত করা হয়। যা কিনা সুফীবাদেরও আদিধারা। কোরানে যে সূর্য এবং অগ্নি উপাসকদের কথা বলা হয়েছে তাদেরই অপভ্রংশ হলো ইয়াজিদি।

ইতিহাস না জানা উগ্রপন্থীরা বরাবরই তাদেরকে এজিদের বংশধর বলে ভুল করে এসেছে। অথচ কারবালার ইতিহাসের ইয়াজিদ বিন মুয়াবিয়ার সাথে এই ইয়াজিদিদের লেশমাত্র সম্পর্ক নেই। ভুল বোঝাবুঝির জায়গাটি হলো 'শয়তান'। আল্লাহর নির্দেশ অমান্যকারি শয়তান নয়। বরং একই নামে ইয়াজিদিদের আরেকজন উপাস্য দেবতা আছেন। এই দেবতাকেও ইশ্বরের নির্দেশে স্বর্গ থেকে (Fallen angel Melek Tawwus) বহিষ্কার করা হয়েছিল। পরে আবারো তাঁকে স্বর্গে ফিরিয়ে নেন ঈশ্বর। ইয়াজিদিদের এই ধর্মবিশ্বাস যুগে যুগে উগ্রপন্থীদের কাছে 'শয়তান উপাসক'-এর আখ্যা পেয়েছে। আর ধর্মযুদ্ধের বলি হয়ে আসছে ইয়াজিদিরা।

BanglaBook.org

ব্যতিক্রম হয়নি এবারও। গত আগস্টে ইরাকের সিনজারের পার্বত্য এলাকা দখলে নিয়ে হাজারো ইয়াজিদি নারী পুরষকে হত্যা করেছে আইএস জঙ্গিরা। অল্প বয়স্ক কিশোর থেকে শুরু করে ৮০ বছরের বৃদ্ধ; সবাইকে লাইনে দাঁড় করিয়ে গুলি করে হত্যার আগে তাদের দিয়েই খোঁড়া হয় গণকবর। বৃদ্ধা নারীদের হত্যা করা হয় জ্যান্ত কবর দিয়ে। আর শিশুদের দিনের পর দিন উপোস রেখে তিলে তিলে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেওয়া হয়। নিহত শিশুদের মায়েদের দিয়েই ওদের কবর খুড়তে বাধ্য করে জঙ্গিরা। তুলে নেওয়া হয় অল্পবয়স্ক ইয়াজিদি নারীদের। আগস্ট থেকে নভেম্বর পর্যন্ত বলা চলে সিনজারের হাজারো ইয়াজিদির ভাগ্য সম্পর্কে একরকম অন্ধকারে ছিল বিশ্ব। বহুজাতিক বাহিনীর বিমান হামলার সাহায্য নিয়ে ইরাকি সরকার ওই পার্বত্য এলাকার দখল নিলে একে একে বেরিয়ে আসে জঙ্গিদের নজিরবিহীন বর্বরতার চিত্র। তাদের হাতে কত শত ইয়াজিদির প্রাণ গেছে সেই হিসেব জানা না গেলেও জঙ্গিদের হাতে ধর্ষণ আর নির্যাতনের শিকার হয়েছে হাজার হাজার ইয়াজিদি নারী। জাতিসংঘের হিসেবে সংখ্যাটা প্রায় আড়াই হাজার। আর ইয়াজিদি সম্প্রদায়ের হিসেবে নিখোঁজ তাদের চার হাজার ছয়শ কন্যা-জায়া-জননী। মাত্র শ' খানেক নারী নানাভাবে আইএস-এর খিলাফত নামের নরক থেকে বেঁচে ফিরে আসতে পেরেছে। ওদের ৪২ জনের সাক্ষাৎকার নিয়েছে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল। উঠে এসেছে ইসলামের নামে বর্বর নির্যাতনের লোমহর্ষক চিত্র।

জঙ্গিদের হাত থেকে উদ্ধারের পর এক ইয়াজিদি নারী।

স্ত্রী কন্যাসহ পরিবারের নয়জন নারীকে হারিয়েছেন এই পিতা

নিজের নামটা অন্তত গোপন রাখার অনুরোধ জানিয়েছেন ১৭ বছর বয়সি এক ইয়াজিদি তরুণী। ধরা যাক তার নাম মায়া। ৩ আগস্ট সিনজার দখলে নেওয়ার পর আইএস জঙ্গিদের হাতে নির্যাতনের শিকার কয়েক হাজার ইয়াজিদি নারী'র তিনিও একজন। ইংরেজিটা টুকটাক জানা ছিল। স্বপ্ন ছিল ইউরোপের কোনো দেশে পড়াশুনা করা। অপহরণের সময় তার সাথে থাকা মোবাইল ফোনটি কেড়ে নিয়েছিল জঙ্গিরা। পরে আবার সেটি ফেরত দিয়েছে। কারণ মায়া যাতে দুনিয়াকে আইএস-এর বর্বরতার কথা জানাতে পারে। ওদের ত্রাসের খবর যেন শিরোনাম হয়। আর মানুষ যাতে সেই খবর পড়ে শিউরে ওঠে। জঙ্গিদের কৌশল সফল হয়েছে। মায়ার মর্মান্তিক পরিণতি লাখো মানুষের চোখের জলের কারণ হয়েছে। ইরাকের কোনো এক শরনার্থী শিবিরে আশ্রয় নেওয়া মায়ার বাবা মা'র কাছ থেকে ফোন নাম্বারটি নিয়ে তার একটি সাক্ষাৎকার নেয় ইতালির এক সাংবাদিক।

মায়া বলছিলেন সেদিন তার গ্রাম থেকে কয়েকশো নারীকে অস্ত্রের মুখে তুলে নেয় জঙ্গিরা। মোসুলে আইএস-এর হেডকোয়ার্টারে বন্দি হন তারা। মায়াকে যেখানে রাখা হয়েছে সেখানে ছিলেন ১২ থেকে ৩০ বছর বয়সি চল্লিশ জন নারী। কয়েকটি কক্ষে ভাগ করে তাদের রাখা হয়েছে। বাইরে অস্ত্রধারী জঙ্গিদের প্রহরা। পালাবার পথ নেই। তারা আপনাদের সাথে কি আচরণ করছে? এই প্রশ্নের জবাবে দম নিয়ে মায়া বলছিলেন, 'আমি জানি না এই প্রশ্নের উত্তর কিভাবে দেব। কিভাবে বললে বোঝানো যাবে ঠিক কী ঘটেছে

BanglaBook.org

আমাদের ওপর।' একটু থেমে মায়া বলতে শুরু করলেন: 'এটা হলো জঙ্গিদের পতিতালয়। তবে পতিতারা দেহের বিনিময়ে টাকা পেলেও এখানে ব্যাপারটা তা নয়। বরং আমরা ওদের ভোগের সামগ্রি। এখানে বারো তেরো বছরের শিশু থেকে ত্রিশ বছরের নারীদেরও বন্দি রাখা হয়েছে। সারাদিন জঙ্গিরা আসছে যাচ্ছে। একেক সময় একেক দল। সারাদিন সারারাত বিশ ত্রিশ পঞ্চাশবার পর্যন্ত নির্যাতন চলছে। বেছে বেছে তারা আমাদের তুলে নেয়। এমনকি অল্পবয়সী শিশুদেরও রেহাই দেয় না। বাধা দিলে চলে অমানুষিক নির্যাতন। ওদের অত্যাচারে যখন কেউ আর্তচিৎকার করে তখন ওরা উচ্চশব্দে হাসে। ওদের হাসির আড়ালে আমাদের কান্না চাপা পড়ে। ওরা নিজেদের অজেয় সুপারম্যান মনে করে। ওরা ভাবে দুনিয়াটা কেবল ওদেরই। পশুর সাথেও মানুষ এমনটা করে না যা ওরা আমাদের সাথে করছে। এখানে প্রতিটা নারী একেকটা মৃত জীবন বয়ে চলছে। কারো মুখে কোনো কথা নেই। সবাই যন্ত্রের মতো প্রতিমুহূর্তে ওদের নির্দেশ পালন করে চলছে। আমি প্রতি মুহূর্তে নিজের মৃত্যু কামনা করছি। আমি রক্ষীকে বলেছিলাম তোমার পায়ে পড়ি আমাকে একটা গুলি করো। কিন্তু ওরা সেটা করে না। কারণ আমরা ওদের কাছে খুবই মূল্যবান। টাকাঅলা জঙ্গিরা এখান থেকে পছন্দ করে মেয়েদের কিনে নেয়। বাড়িতে নিয়েও সেই একই নির্যাতন। আত্মহত্যা করব সে উপায়ও নেই। মাঝে মাঝে মনে হয় আমি বুঝি ঘুমের মধ্যে দুঃস্বপ্ন দেখছি। ভোর হলেই বুঝি দুঃস্বপ্নটা শেষ হবে। কিন্তু শেষ হয় না...।' বলতে বলতে থেমে যান মায়া। তার সাথে আর যোগাযোগ হয় না ইতালির লা রিপাবলিকা পত্রিকার ওই সাংবাদিকের। জানা হয় না কি ঘটেছে মায়ার ভাগ্যে।

নারিনের দুনিয়াটা এখন এমনই ঝাঁপসা হয়ে গেছে

BanglaBook.org

ঘরের কোণে বন্দি নারিনের বান্ধবী

একই দিন অর্থাৎ ৩ আগস্ট জঙ্গিদের হাতে ধরা পড়ে ১৪ বছরের আরেক ইয়াজিদি কিশোরী নারিন। কুর্দী ফ্রিল্যান্স সাংবাদিক মোহাম্মদ আলী সালেহর নেওয়া নারিনের সাক্ষাৎকারটি প্রকাশ করেছে ওয়াশিংটন পোস্ট। 'গ্রামের আত্মীয় স্বজনরা বলছিল জঙ্গিরা আসছে, আমরা মেয়েরা সবাই যেন পালিয়ে যাই। আরও অনেকের সাথে আমিও ৫১ ডিগ্রি তাপমাত্রার মধ্যে মরুভূমির পথে পা বাড়াই। এক ঘণ্টা দৌড়ে পালাবার পর তৃষ্ণা মেটাতে আমরা একটা জায়গায় থামলাম। তখনই আবিষ্কার করলাম আমরা ধরা পড়ে গেছি। আমার মতো অল্প বয়স্ক নারীদের তারা আলাদা করে একটি ট্রাকে তুলে নিল। যখন ট্রাক ছাড়ল পেছনে তখন অনেকগুলো গুলির শব্দ। আমি দেখলাম আমার উনিশ বছরের একমাত্র ভাইটা লুটিয়ে পড়ছে। যে কিনা মাত্র কয়েকমাস আগে বিয়ে করেছে। তারা আমাদের সিরিয়া সীমান্তের কাছে ইরাকের পশ্চিম মোসুলের একটি স্কুলে বন্দি করেছে। সেখানে নেওয়ার পর আমাদের ইসলাম গ্রহণের নির্দেশ দেয়। রাজি না হওয়ায় আমাদের ওপর সীমাহীন নির্যাতন চালানো হয়। প্রায় প্রতিদিন চলত নির্যাতন। পরে তারা বিবাহিত ও অবিবাহিত নারীদের আলাদা করে নিল। সেদিনই আমাকে আর আমার বান্ধবীকে উপহার হিসেবে চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ বছর বয়সি দুই জঙ্গির হাতে তুলে দেওয়া হলো। আমাদের নিয়ে আসা হলো ফালুজায় ওই জঙ্গিদের বাড়িতে। প্রায় প্রতিদিন লোকটা আমাকে ধর্ষণের চেষ্টা করত। কিন্তু আমি বাধা দিতাম। এ কারণে আমাকে কিল, ঘুষি, লাথি, বেত দিয়ে পেটানো, উপোস করে রাখা প্রায় সব রকম নির্যাতনই চালানো হত। নরকতুল্য সেই

BanglaBook.org

নির্যাতন আর সহ্য হচ্ছিল না। আমরা দুই বান্ধবী আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত নিলাম। কিন্তু ষষ্ঠ দিনের মাথায় হঠাৎ একটা সুযোগ এলো। তারা নামাজ পড়তে মসজিদে গেল। আমরা বোরখা পরে পালালাম। কিন্তু সত্যি কি পালাতে পেরেছি? ওই আতঙ্ক আর দুঃস্বপ্ন আমাকে এখনও তাড়া করে বেড়ায়। আমি ঠিক করেছি এবার আমি দেশ ছেড়ে পালাব।'

ইসলাম গ্রহণের পরও মুক্তি মেলেনি ১৫ বছর বসয়ি এই তরুণীর

হাই স্কুলের শেষবর্ষের ছাত্রী ১৯ বছরের জনা। আগস্টের শেষ সপ্তাহে তার দুনিয়াটা যেন ধ্বসে পড়েছিল। সেদিন তাদের গ্রামে লুটপাট চালিয়ে বাড়ি ঘরে আগুন দিয়ে নারীপুরুষ সবাইকে তুলে নিয়েছিল জঙ্গিরা। জনার দুই ভাই আর বাবাসহ পুরুষদের আলাদা করে গুলি করে হত্যা করা হয়। এমনকি নয় দশবছর বয়সি শিশুদেরও রেহাই দেওয়া হয়নি। নারীদের নেওয়া হয় মোসুলের বন্দি শালায়। জনা'কে উপহার হিসেবে তুলে দেওয়া হয় সত্তর বছর বয়সী এক আইএস জঙ্গির হাতে। সেই লোকটি তাকে নিজ বাড়িতে নিয়ে মাথায় পিস্তল ঠেকিয়ে ইসলাম গ্রহণের নির্দেশ দেয়। কিন্তু তার মুখে থুথু ছিটিয়ে প্রতিবাদ করে জনা। কারণ ততক্ষণে সে জেনে গেছে আর যা-ই হোক, তাকে হত্যা করা হবে না। কিন্তু নেমে এসেছে ভয়াবহ নির্যাতন। সেই জনা এখন জাতিসংঘের একটি আশ্রয় শিবিরে। তার জীবনের এখন একটাই লক্ষ্য সত্তর বছর বয়সী ওই অমানুষটাকে গুলি করে হত্যা করা।

মোসুলে আইএস-র অন্ধকার থেকে মুক্তি পাওয়া ২০ বছর বয়সি আরেক ইয়াজিদি নারী লুনা। দশ বছর বয়সি কিশোরীসহ তাদের বিশজনকে একটি কক্ষে আটকে রেখেছিল জঙ্গিরা। 'একদিন তারা আমাদের কিছু নতুন পোষাক দিয়ে সেগুলো পরতে বলল। আমি দেখলাম সেগুলো খুবই ছোট নাচের পোষাক। কিন্তু জিলান ওই পোষাক পরতে রাজি হয়নি। ও খুবই সুন্দরী ছিল।

BanglaBook.org

বাথরুমে যাবার কথা বলে জিলান আত্মহত্যা করল। ওর হাতের কব্জি ছিড়ে গিয়েছিল।' লুনা বলছিলেন বোরখা গলায় পেঁচিয়ে আত্মহত্যা এখানে রোজকার ঘটনা। একসঙ্গে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিলেন ২৭ বছরের ওয়াফা আর তার বোন। কিন্তু দুই সঙ্গির বাধার মুখে পারেননি। ১৬ বছর বয়সি আরেক ইয়াজিদি তরুণীর দাদা বলছিলেন, 'ওই নরক থেকে সে ফিরেছে ঠিকই কিন্তু ও এখন জীবন্মৃত। ওর মুখের হাসি চলে গেছে। আমি ওকে চোখের আড়াল করি না। আমার ভয় ও যে কোন সময় আত্মহত্যা করবে।'

বিবিসিকে নিজের দূর্ভাগ্যের কথা বলছেন হান্নান

১৯ বছরের অ্যালবা'র গল্পটা আরও হৃদয় বিদারক। অ্যালবা তখন ছয় মাসের গর্ভবতী। সেটা তাকে দেখেও বোঝা যাচ্ছিল। অ্যালবা ভেবেছিল তিনি হয়তো রেহাই পাবেন। কিন্তু না, দিনের পর দিন তার ওপর নির্যাতন চলেছে। পেটের সন্তানটি নষ্ট হয়েছে। মরতে মরতে বেঁচে ফিরেছে অ্যালবা। ১৯ বছর বয়সি আরেক তরুণী হান্নান বিবিসিকে বলছিলেন, 'বড় একটা হলরুমে জড়ো করা হলো আমাদের। ওটা নাকি আইএস-এর সেক্স মার্কেট (নারীদের বিক্রির হাট)। আমি সেখানে দুশোর মতো বিভিন্ন বয়সি নারীকে দেখেছি। সেখানে দলে দলে জঙ্গিরা আসত। আকাশে ফাকা গুলি করে আমাদের ভয় দেখাত। আর যার যাকে খুশি তাকে তুলে নিত। পরে আমাদের আরেকটা ভবনে নেওয়া হলো। আমরা সাতজন একটা কক্ষে ছিলাম। সেখানে একটা প্লাস্টিকের জানালা ছিল। এক রাতে আমরা সেই জানালা ভাঙলাম। এবং একে একে বের হতে শুরু করলাম। আমি ছিলাম পঞ্চম জন। আমি যখন বের হচ্ছি তখনই দেখলাম একটা আলো এগিয়ে আসছে। আমি চোখ বন্ধ করে ঝাঁপ দিলাম এবং সর্বশক্তি দিয়ে দৌড়াতে শুরু করলাম। কিন্তু বাকি দুজনকে আর সাহায্য করতে পারলাম না। ওরা এখন কেমন আছে কে জানে।

BanglaBook.org

শিয়া কুর্দী খ্রিস্টান কিংবা ইয়াজিদি; ডাকাত দলের মতো লুটে নেওয়া এই নারীরা আইএস জঙ্গিদের কাছে মহামূল্যবান সম্পত্তি। ওদের যেমন ইচ্ছামতো ভোগ করা যায়, প্রয়োজন ফুরালে ইচ্ছামতো বিক্রি করে টাকা রোজগারও করা যায়। আবার আদায় করা যায় মুক্তিপণও। যেমন তিন হাজার ডলারের বিনিময়ে ক্ষমাকে সিরিয়ার রাক্কা থেকে মুক্ত করেছিল তার স্বজনরা। তাও সেটা সম্ভব হয়েছে তার একজন কাজিনের বিদেশি পাসপোর্ট থাকায়। জঙ্গি সেজে নিজের বোনকেই কিনতে হয়েছিল তাকে। যে জঙ্গির কাছে সে ছিল, তার ঘরে তখনও আরও পাঁচজন ইয়াজিদি নারী ও একটি স্ত্রী। তাদের দুজনকে সে বিয়ে করেছে। আর তাকে ব্যবহার করত গৃহকর্মী হিসেবে। একদিন এক জঙ্গি নেতা এসে লোকটিকে জানাল, খলিফা বাগদাদির নির্দেশ হলো একেক ঘরে একজনের বেশি ইয়াজিদি নারী রাখা যাবে না। কারণ সব জঙ্গির ভাগে একটা করে ইয়াজিদি দিতে হবে। হয়তো সে কারণেই মুক্তিপণের বিনিময়ে তার মুক্তি মিলেছে।

আইএস-এর দাবি ইয়াজিদিরা ইসলাম গ্রহণের মধ্য দিয়ে নিজেদের নিরাপদ করতে পারেন। কিন্তু ইসলাম গ্রহণ করেও রেহাই মেলেনি ১৫ বছর বয়সী আরেক তরুণীর। ইসলাম গ্রহণের সাথে সাথেই এক জঙ্গির সাথে তাকে জোর করে বিয়ে দেওয়া হয়েছে। স্বামী নামের ওই জঙ্গিটি তাকে রোজ নিয়ম করে তিনবেলা পেটাত আর যৌনসন্ত্রাস চালাত। রণাঙ্গনে সেই জঙ্গির মৃত্যু হলে আবারো জোর করে তার সাথে আরেক জঙ্গির বিয়ের আয়োজন চলছিল। যুক্তি হলো সে নীল নয়না সুন্দরী। তাই তাকে বিয়ে করতেই হবে। নয়তো যৌনজিহাদ নামের যথেচ্ছ পতিতাবৃত্তিতে নিজেকে উৎসর্গ করতে হবে। সুযোগ বুঝে পালিয়ে আসে ওই কিশোরী। কিন্তু সবাই তার মতো ভাগ্যবান নয়। পালানোর চেষ্টা করে যারা ধরা পড়ে তাদের ভাগ্যে জোটে আরও অমানুষিক নির্যাতন। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত সেই নির্যাতন থামে না। তবে নগণ্য হলেও ব্যতিক্রমী কিছু ঘটনার কথাও উল্লেখ করেছে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল। যেমন ১৩ বছর বয়সী এক কিশোরীকে নিজের জিম্মায় নিয়ে গোপনে তার বাবা মায়ের কাছে ফেরত দিয়েছে এক আইএস জঙ্গি। ইসলাম গ্রহণ করে বিয়ের পর বাবা মায়ের সাথে মিলিত হবার সুযোগ পেয়েছেন কয়েকজন ইয়াজিদি নারী। তবে এমন সংখ্যা হাতে গোণা।

আইএস জঙ্গিদের ইংরেজি ভাষার অনলাইন ম্যাগাজিন Dabiq-এ দাবি করা হয়েছে, ইয়াজিদি নারী শিশুদের ধর্ষণ, নির্যাতন আর দাস হিসেবে ব্যবহার কিংবা বিক্রি এই সবকিছুই বৈধ। যুক্তি হলো ইসলামের প্রথম যুগে এসবই বৈধ ছিল তাই এখনও বৈধ। শরিয়া মতে, যুদ্ধের পর আটক করা ইয়াজিদি

নারীদের যোদ্ধাদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়। যতক্ষণ না তারা ইসলাম গ্রহণ করছে ততক্ষণ পর্যন্ত তারা মুরতাদ কাফির। তাই তাদের সাথে যে কোন আচরণই বৈধ। মোহাম্মদ আল আদানি নামে এক আইএস জঙ্গি তাঁর এই লেখায়, যারা এখনও আইএস'র এমন আজগুবি তরিকায় বিশ্বাসী নন তাদের হুমকি দিয়ে বলা হয়েছে, 'আমরা রোম পর্যন্ত দখল করব আর তোমাদের নারীদের যৌনদাসি বানাব।

অথচ স্বল্পশিক্ষিত একজন সাধারণ মুসলিমও নির্দিধায় স্বীকার করবেন, আইএস-এর এসব কর্মকাণ্ড কেবল অবৈধই নয় বরং মহাপাপ। ইসলাম ধর্মের দোহাই দিয়ে কারো ওপর এমনকি একটি পশুর ওপরও নির্যাতনের কোনো সুযোগ নেই। এমনকি সে ইসলাম গ্রহণে রাজি না হলেও। ইসলামে সবার আগে নারী শিশু তথা সংখ্যালঘু ও অমুসলিমদের নিরাপত্তা এবং সম্মানের কথা বলা হয়েছে। হযরত মুহাম্মদ (সা:)-এর বিদায় হজেও এ বিষয়ে সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে। প্রসঙ্গত: ইসলামের প্রথম যুগের অনেক কিছুই স্বয়ং মহানবী তাঁর নবুয়াত প্রাপ্তির পরই বাতিল করেছেন। প্রশ্ন ওঠে তাহলে কি আইএস জঙ্গিরা নবীর নির্দেশ অর্থাৎ হাদিসকেও অগ্রাহ্য করছে? হাদিস অগ্রাহ্য করা আর আল্লাহর নবীকে অস্বীকার করারই শামিল। আর সেটা করা হলে কেউ কি নিজেদের মুসলিম বলে দাবি করার অধিকার রাখেন? (এ বিষয়ে বিস্তারিত পড়ুন আইএস এবং ইসলাম পরিচ্ছেদে)।

এত অত্যাচার আর এত নির্যাতনের পর শেষতক আইএস জঙ্গিদের বিরুদ্ধে অস্ত্রহাতে তুলে নিতে শুরু করেছে ইয়াজিদিরা। এমনকি নয়-দশ বছরের শিশুরাও স্কুল ছেড়ে এখন নিজের দেহের ওজনের চাইতে ভারী মেশিনগান কাঁধে তুলে নিয়েছে। এমনি এক শিশু বিবিসিকে বলেছে, মা বোনদের ইজ্জত বাঁচানোর চাইতে পড়াশুনাটা জরুরি নয়। নারীদের শরণার্থী শিবিরে রেখে লড়াইয়ের ময়দান খুঁজে ফিরছে লাখো ইয়াজিদি।

BanglaBook.org

শিয়া মুসলিমদের ওপর হত্যা নির্যাতন

১০ জুন ২০১৪। বিদ্যুত বেগে ইরাকের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর মোসুলের দখল নিয়েছে আইএস জঙ্গিরা। দ্বিধাবিভক্ত বিচ্ছিন্ন ইরাকি সেনাদের প্রায় সবাই মোসুল ছেড়ে পালিয়েছে। বাকিরা জঙ্গিদের হাতে ধরা পড়েছে। ওই সেনাদের ভাগ্যে কী ঘটেছে সেটা সবার জানা। মোসুল দখলের পর জঙ্গিদের পরবর্তী লক্ষ্য সুন্নি শহর তিকরিত। সাদ্দাম হোসেনের জন্মশহর তিকরিতের সুন্নী

জঙ্গিদের দমন করতে সেখানে একটি সেনাবেইজ গড়েছিল মার্কিন সেনারা। বেইজটির নাম Camp Speicher. এই ক্যাম্পে তখন মোট ৩ হাজার সেনা। প্রশিক্ষণ শেষ করে মাত্র দশদিন আগে এই ক্যাম্পে নবীন সেনা হিসেবে যোগ দিয়েছেন ২৩ বছর বয়সী ইরাকি শিয়া যুবক আলী হোসেন কাদিম। কিন্তু মোসুলের পরিণতি থেকে শিক্ষা নেয়নি ইরাকি সেনা কর্তৃপক্ষ। জঙ্গিরা যখন তিকরিত অভিমুখে তখনও ওই ক্যাম্পে রণকৌশল গড়বার মতো কোনো সেনা কর্মকর্তা নেই। বেইজে থাকা দিকভ্রান্ত সিদ্ধান্তহীন সেনারা পালাবার সিদ্ধান্ত নিলেন। ইউনিফর্ম ছেড়ে ঘরোয়া পোষাকে একযোগে ক্যাম্পের প্রধান ফটকের দিকে এগুতে শুরু করলেন সেনারা। কাদিমের পরণে একটি ট্রাকস্যুট আর পায়ে স্যান্ডেল। তখনও কাদিম ভাবছেন ১২০ মাইল দক্ষিণে বাগদাদ যাওয়াটা হয়তো কঠিন কিছু হবে না। তিকরিত বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে এসে থামল সেনাদল। দূরে আইএস জঙ্গিদের ৪০টি গাড়ির একটি সাঁজোয়া বহর। পালাবার কোনো পথ ছিল না। ছয়শোরও বেশি সেনাকে ট্রাকে তুলে নিল জঙ্গিরা। নিয়ে এলো সাদ্দামের প্রাসাদের সামনের খোলা মাঠে। সবাইকে পেছনে হাত বেঁধে মাঠের ওপর উপুড় করে শুইয়ে রাখা হলো। পরে জঙ্গিদের তোলা ছবিতে শত শত সেনার মধ্যে নিজেকেও আবিষ্কার করেছিলেন কাদিম।

BanglaBook.org

গোল-চিহ্নিত মানুষটিই কাদিম

পরবর্তী তিনদিনে ঘটে গেছে বিশ্বের সাম্প্রতিক ইতিহাসের সবচেয়ে নৃশংসতম গণহত্যা। একেক দিন একেক দলকে ট্রাকে করে তুলে নিত জঙ্গিরা। ওই সেনাদের কেউ আর ফিরে আসেনি। তৃতীয় দিনে এলো কাদিমের দলটির পালা। একটি খোলা প্রান্তরে লাইন ধরে উপুড় করে শুইয়ে রাখা হলো সবাইকে। কারো আর বুঝতে বাকি রইল না তারা সবাই জীবনের শেষপ্রান্তে

দাঁড়িয়ে। সেনাদের কেউ আল্লাহকে ডাকছেন। কেউ শিশুর মতো কাঁদছেন। কারো মুখ হতবিহ্বল ভাবলেষহীন। প্রথমজনকে গুলি করা হলো। গুলির বিভৎস্য শব্দের নিচে চাপা পড়ল মানুষের আর্তনাদ। তারপর দ্বিতীয় জন। তারপর তৃতীয়। এবার কাদিমের পালা। চিরদিনের জন্য চোখ বন্ধ করলেন কাদিম। দূর থেকে যেন দুবছরের মেয়েটার ডাক শুনলেন... বাবা...বাবা। কিন্তু না গুলি হলো না। প্রথম সেনার দেহটা দেখিয়ে জঙ্গিদের কেউ একজন বলল...ও এখনও মরেনি। হত্যাকারী প্রথমজনের কাছে ফিরে গেল। বলল, 'এই কাফিরদের কষ্ট পেয়ে মরতে দাও, এদের আরও কষ্ট পাওয়া উচিত'। সময়টা বড়জোর ত্রিশ কি চল্লিশ সেকেন্ড। কাদিম এই ফাঁকে তৃতীয় জনের মাথার উড়ে যাওয়া খুলি আর রক্ত মাংস নিজের মুখে আর মাথায় মেখে নিশ্বাস বন্ধ করে পড়ে রইলেন। পঞ্চম জনের ওপর গুলি চলল। বেঁচে গেলেন কাদিম। কাদিমের বর্ণনা মতে, কেবল তার দলেরই ছয়শরও বেশি সেনাকে হত্যা করেছে জঙ্গিরা। স্যাটেলাইট ছবিতে পাওয়া মৃতদেহ গুণে হিউম্যান রাইটস ওয়াচ বলছে, তিকরিতে তিনদিনে মোট সতেরো শো সেনাকে হত্যা করেছিল আইএস জঙ্গিরা। চারপাশে শত শত লাশ নিয়ে সেদিন টানা তিন ঘণ্টা সহকর্মীদের রক্তের স্রোতে শুয়েছিলেন কাদিম। নিউ ইয়র্ক টাইমসকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি বলছিলেন, মানুষের রক্ত মাংসের গা গুলিয়ে আসা গন্ধ আজও তার নাকে লাগে। তিন ঘণ্টা পর সেই মৃত্যু ময়দান ছেড়ে দৌড়াতে শুরু করেন কাদিম। কত ঘণ্টা দৌড়েছিলেন মনে নেই। শুধু মনে আছে ভয়ে আতঙ্কে টাইগ্রিস নদীতে ঝাঁপ দিয়ে জংলার আড়ালে লুকিয়ে ছিলেন অনেকক্ষণ। তারপর আবার দৌড়। টানা তিনদিন ঘাস লতাপাতা খেয়ে আর দৌড়ে দক্ষিণ ইরাকে নিজের বাড়িতে পৌছান কাদিম। তিনি হলেন সেই বিরলতম মানুষদের একজন যিনি নিজের চোখে আইএস-এর গণহত্যা দেখেছেন। যদিও তার আফসোস, আল্লাহ তাকে এমন দুর্ভাগ্যের ভাগি না করলেও পারতেন।

পাশের ছবিতে দুই সন্তানসহ কাদিমের এখনকার ছবি।

BanglaBook.org

মোসুল কারাগারের কয়েদীদের ট্রাকে তোলে হচ্ছে

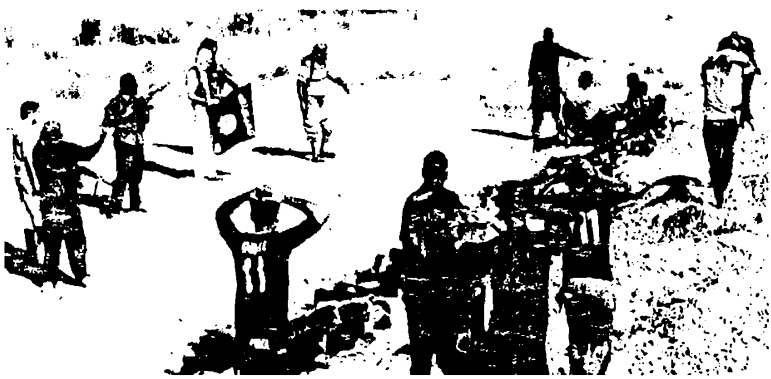

কয়েদীদের ট্রাক থেকে নামিয়ে হত্যার জন্যে ময়দানে নেওয়া হচ্ছে

জুনে মোসুল দখলের পর শহরের কেন্দ্রীয় কারাগারের নিয়ন্ত্রণ নেয় আইএস জঙ্গিরা। কারাগারের পনের'শ বন্দির মধ্যে সুন্নিদের এক লাইনে আর শিয়া ইয়াজিদি খ্রীস্টান ও কুর্দীদের আরেক লাইনে দাঁড় করানো হয়। জঙ্গিরা তখন হুমকি দিচ্ছিল সুন্নিদের লাইনে কোনো শিয়াকে পাওয়া গেলে তার হাত কেটে নেওয়া হবে। লাইনে দাঁড়ানো সবাইকে একে একে জেরা হলো। পরবর্তী ২৪ ঘন্টা তাদেরকে নামাজের সেজদা দেওয়ার ভঙ্গিতে লাইনে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে। কেউ একজন পানি চাইলে জবাব এলো, স্বর্গে পানি পাবি। পরদিন সবাইকে ট্রাকে তুলে পাশের মরুভূমিতে নেওয়া হলো। সিদ্ধান্ত হলো সবাইকে জবাই করে হত্যা করা হবে। কি করে শিয়া আর ইয়াজিদির মাথা ধড় থেকে আলাদা করতে হয় সেটি আরেক জঙ্গিকে শিখিয়ে দিচ্ছিল একজন। ছুরি হাতে জঙ্গিটি জবাব দিল, আমরা মাত্র কয়েকজন মিলে এতগুলো মানুষকে জবাই করতে

BanglaBook.org

সারাদিন লেগে যাবে, গুলি করাই ভালো। সেদিন ছয়শ ইরাকি শিয়া, কুর্দী, ইয়াজিদি আর খ্রিস্টানকে কয়েকটি গ্রুপে ভাগ করে হত্যা করেছিল জঙ্গিরা। সৌভাগ্যক্রমে বেঁচে যায় নয়জন। তাদেরই একজন হিউম্যান রাইটস ওয়াচকে বলছিলেন, 'আমার পাশের জনের মাথা লক্ষ্য করে গুলি চালানো হলো। আমি মুরুভূমির বালির ভেতর মুখ লুকিয়ে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করছি। আমার কানের কাছে বাতাস উড়িয়ে পরের গুলিটা লাগল পাশের হায়দারের মাথায়। তখনই খুনিটার গুলি শেষ হয়ে গিয়েছিল। সে গুলি আনতে গেল। আর আমার বন্ধু হায়দারের মাথা থেকে ফিনকি দিয়ে ছোটা রক্তে ভেসে গেল আমার মাথা আর মুখ। আমি মৃতের মতো পড়ে রইলাম। খুনিটা ফিরে এসে আমাকে মৃত ভাবল।'

আই এস-এর বর্বরতায় ক্ষুব্ধ সুন্নি উপজাতি গোষ্ঠি

জুন ২০১৪। ইরাকের দক্ষিণ কিরকুকের চারটি গ্রামে হামলা চালিয়ে অন্তত চল্লিশজন শিয়া মুসলিমকে হত্যা করে আইএস জঙ্গিরা। জাতিগতভাবে তারা ছিল কুর্দী বংশোদ্ভুত শিয়া মুসলিম। তাদের কাউকে জবাই করে কাউকে মাথায় পিস্তল ঠেকিয়ে হত্যার পর গণকবর দিয়েছিল জঙ্গিরা। এমনি একটি গণকবর থেকে দুটি কন্যাশিশুসহ ১৫ জনের লাশ উদ্ধার করেছে গ্রামবাসী। তাদের একটাই অপরাধ তারা তুর্কম্যান বংশোদ্ভুত শিয়া। আইএস-এর ফতোয়া মতে কাফের। কিরকুকের পুলিশ প্রধান জেনারেল আব্দেল রহিম ওয়াশিংটন পোস্টকে বলছিলেন, হত্যাযজ্ঞের পর গ্রামগুলো জ্বালিয়ে দিয়েছে জঙ্গিরা। এই ঘটনায় ক্ষোভে ফেটে পড়ছিল গ্রামের মানুষ। কিশোর থেকে বৃদ্ধ দলে দলে সবাই এখন আইএস বিরোধী যুদ্ধের প্রশিক্ষণ নিচ্ছে।

BanglaBook.org

সুন্নি উপজাতি গোষ্ঠির আইএস বিরোধী লড়াই

সুন্নি উপজাতিদের হত্যা

শিয়া, ইয়াজিদি, কুর্দী কিংবা খ্রিস্টানই শুধু নয়, ইরাকে সুন্নি মুসলিমদেরও রেহাই দেয়নি আইএস জঙ্গিরা। আইএস-এর বিরোধীতা করায় নভেম্বরে ইরাকের আল আনবার প্রদেশের একটি সুন্নি উপজাতি গ্রামে হামলা চালিয়ে কয়েকশো নারী পুরুষ ও শিশুকে হত্যা করে জঙ্গিরা। দিনটির কথা আজও ভুলতে পারেন না আবু আহমেদ। বিবিসিকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি বলছিলেন, আনবারের সুন্নিরা গোড়া থেকেই আইএস জঙ্গিদের বিরুদ্ধে ছিল। মরণপণ লড়ে যাচ্ছিল গ্রামবাসী। আবু নিজেও ছিলেন সেই লড়াইয়ে। সেদিন তাদের গুলি শেষ হয়ে যাওয়ায় তারা পালাতে বাধ্য হন। কিন্তু সাঁজোয়া জিপ-বোঝাই জঙ্গিরা তাদের ঘিরে ফেলে। তারপর কয়েকশো সুন্নি যোদ্ধাকে গ্রামের একপ্রান্তে নিয়ে ভারী মেশিনগানের গুলিতে হত্যা করা হয়। ভাগ্যক্রমে বেঁচে যান আবু। জঙ্গিরা গুলি করার সময় কৌশলে মাটিতে শুয়ে পড়েন আবু। তার বাহু ও পায়ে দুটি গুলি লাগে। মাটি কামড়ে চোখ বন্ধ করে ওই মৃত্যু উপত্যকায় পড়েছিলেন তিনি। জঙ্গিরা চলে যাবার পর ফিরে আসার সময় কয়েকশো মৃতদেহ দেখেছেন তিনি। গ্রামের ঘরগুলো জ্বালিয়ে দেয় জঙ্গিরা। হত্যা করা হয় কোলের শিশু এমনকি বৃদ্ধদেরও। দুধের শিশুদেরও রেহাই দেয়নি তারা। দুই মাস বয়সী একটি শিশুর রক্তাক্ত মৃতদেহ আমি নিজের হাতে তুলে এনেছি—বলছিলেন আবু আহমেদ। আইএস জঙ্গিদের এই গণহত্যায়

BanglaBook.org

অন্তত ৬৩০ জন গ্রামবাসী প্রাণ হারিয়েছে। এবার এই হত্যার প্রতিশোধ নিতে চান আবু। কিন্তু ইরাকের শিয়া সরকারের ওপরও তার বিশ্বাস নেই। সরকারের তরফ থেকে বলা হয়েছিল তোমরা লড়াই চালিয়ে যাও আমরা সাথে আছি। কিন্তু তারা আমাদের জন্য কিচ্ছু করে নি। আমরা টানা তেরো দিন নিজেদের সামর্থ্যে লড়াই চালিয়ে গেছি কিন্তু সরকারের কাছ থেকে কোনো সাহায্য পাইনি। আমরা তাদের বলেছি অস্ত্র না দাও অন্তত বিমান হামলা চালিয়ে আমাদের সাহায্য করো। তারা সেটাও করেনি, বলছিলেন ক্ষুব্ধ আবু আহমেদ।

ইরাকি নিরাপত্তা বিশ্লেষক ড. হিশাম আল হাশেমি বলছিলেন, যুদ্ধ করার চাইতে বরং বর্বরতাকেই বেছে নিয়েছে আইএস জঙ্গিরা। কারণ দীর্ঘমেয়াদি যুদ্ধের চাইতে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে মানুষকে আতঙ্কগ্রস্ত করেই লক্ষ্য হাসিল করতে চায় এই জঙ্গিরা। এই বিশ্লেষক বলছিলেন, সুন্নি হওয়া সত্ত্বেও আল-বু-নিম গোত্রের সুন্নিদের এতটুকু ছাড় দেয়নি জঙ্গিরা। এর মধ্যদিয়ে অন্যান্য সুন্নি উপজাতীকে তারা এই বার্তাই দিল যে, বশ্যতা শিকার করো- নয়তো চুপ থাক।

খ্রিস্টানদের হত্যা ও অস্ত্রের মুখে ধর্মান্তর

ইরাকের মোসুল। চারটি খ্রিষ্টান শিশুকে ধরে এনেছে আইএস জঙ্গিরা। চারজনেরই বয়স ১২ থেকে ১৪ বছর। পিছমোড়া করে হাত বাঁধা ওই শিশুদের চোখে মুখে ভয় বা আতঙ্ক নয় বরং কৌতূহল খেলা করছিল। হাঁটু মুড়ে ওদের মাটিতে বসানো হলো। কালো মুখোশে মুখ ঢাকা চার জঙ্গি পেছন থেকে ওদের গলায় ছুরি ধরে রেখেছে। প্রায় একই সময় চার জঙ্গি উচ্চস্বরে বলছে: 'বলো...লা ইলাহা ইল্লালাহু মোহাম্মদ রাসুলুল্লাহ্'। চার শিশু জবাব দিল, 'না আমরা প্রভু যিশুকে ভালোবাসি'। চারবার জঙ্গিরা একই নির্দেশ দিল। একই জবাব ফেরত দিল শিশুরাও। পরেরবার চার শিশুর গলায় ছুরি চালিয়ে ওদের মস্তক আলাদা করে ফেলল জঙ্গিরা। যে শিশুদের ওপর এখনও শরীয়তের কোনো বিধানই কার্যকর হয়নি, সেই শিশুদের এমন লোমহর্ষক হত্যাকাণ্ডের বর্ণনা দিতে দিতে নিজেকে আর ঠিক রাখতে পারলেন না রেভারেন্ড ক্যানন এন্ড্রু। চোখ মুছতে মুছতে ডেইলি মেইলকে তিনি বলছিলেন, 'কেউ সেদিন এই শিশুদের বাঁচাতে এগিয়ে আসেনি। কেউ বলেনি ওরা এখনও নেহাত শিশু, ওদের ওপর দুনিয়ার কোনো ধর্মই বলবত হতে পারে না।'

BanglaBook.org

জঙ্গিদের হাতে স্বজন হারানো খ্রিস্টান সম্প্রদায়

খ্রিস্টান বাড়িতে আইএস-এর লাল চিহ্ন

আরেক ভাগ্যহত পিতার কথা ডেইলি মেইলকে বলছিলেন এই রেভারেন্ড। এক খ্রিস্টান বাবা ও তার ছোট্ট শিশুটিকে ধরে এনেছে জঙ্গিরা। শিশুটির গলায় ছুরি ধরে জঙ্গিরা বলছিল 'হয় তুমি এই মুহূর্তে ইসলাম গ্রহণ করবে, নয়তো তোমার এই শিশুকে আমরা হত্যা করব। তুমিই বলো কোনটা বেছে নেবে।' জঙ্গিদের সাথে সাথে সেই পিতা আবৃত্তি করলেন 'লা ইলাহা ইল্লালাহু মোহাম্মদ রাসুলুল্লাহ'। এরপর আদরের সন্তানকে নিয়ে বাড়ি ফিরে কাঁদতে কাঁদতে রেভারেন্ডকে ফোনে বললেন 'আমি বিশ্বাসের পরীক্ষায় যীশুর কাছে হেরে গেলাম

ফাদার। যীশু কি আমাকে ক্ষমা করবেন না?' রেভারেন্ড জবাব দিলেন 'তিনি সর্বজ্ঞ, এখনও তাঁর ভালোবাসা আমাদের সাথেই আছে।' এরপর ইরাকের ভিটে মাটি ছেড়ে পরিজন নিয়ে অজানায় পাড়ি জমান ওই পিতা। যেমনটা পাড়ি জমিয়েছেন রেভারেন্ড ক্যানন এবং আরও প্রায় ১৩ লাখ খ্রিস্টান।

ইরাকের আরেক শহর ইরবিল জঙ্গিদের দখলে যাবার পর শহরের গীর্জাগুলো কাঠের পাল্লা দিয়ে চিরতরে আটকে দিয়েছিল জঙ্গিরা। শহরজুড়ে তখন অঘোষিত কারফিউ'র ভূতুড়ে পরিস্থিতি। সেই খবর জানা ছিল না আশি বছরের বিধবা ভিক্টোরিয়ার। রোজকার মতো সন্ধ্যার প্রার্থনায় যোগ দিতে গীর্জায় যাবার পথে তার পথ আগলে দাঁড়াল জঙ্গিরা। বলল 'তোমাকে ইসলাম গ্রহণ করতে হবে। আমাদের কোরআন তোমাকে এই নিশ্চয়তা দিচ্ছে যে তুমি স্বর্গবাসি হবে'। ভিক্টোরিয়া জবাব দিলেন, 'আর আমার বিশ্বাস হলো যদি তুমি দয়া ক্ষমা আর করুণার পথে থাকো তবে দুনিয়া আর পরকাল দুই ভুবনেই তোমার জন্য স্বর্গ রচিত হবে। তোমার বিশ্বাসের জন্য যদি তুমি আমাকে হত্যা করতে চাও, তাহলে আমি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত, এখানে এবং এখনই।' ভিক্টোরিয়ার এই জবাব শুনে তার নাতির বয়সী জঙ্গিটি কিছুক্ষণের জন্য মুখের কথা হারিয়ে ফেলল। তারপর চলে গেল।

তবে ভিক্টোরিয়ার মতো ইরাক সিরিয়ার এমন হাজারো খ্রিষ্টান নারী পুরুষকে রেহাই দেয়নি জঙ্গিরা। সিরিয়ার রাক্কায় মাত্র চৌদ্দ বছরের এক খ্রিস্টান শিশুকে ক্রুশবিদ্ধ করে হত্যা করে জঙ্গিরা। শিশুটির অপরাধ সে তার মোবাইল ফোনে আইএস-এর আরেকটি হত্যাযজ্ঞের ছবি তুলেছিল। জঙ্গিদের অস্ত্রের মুখেও ইসলাম গ্রহণে রাজি হয়নি সিরিয়ার খ্রিষ্টান অধ্যুষিত এলাকা বার্তেলার ৪৩ বছর বয়স্ক সালেম জর্জিস। পরিবার পরিজন নিয়ে তিনদিন অবরুদ্ধ থাকার পর শিশু সন্তানটির জন্য খাবার খুঁজতে রাস্তায় নেমেছিলেন সালেম। তাকে আটক করে ইসলাম গ্রহণের নির্দেশ দেয় জঙ্গিরা। রাজি হননি সালেম। গুলি বা জবাই করে নয়। সালেমকে পেটাতে পেটাতে তিল তিল করে হত্যা করেছিল জঙ্গিরা।

ইরাকের মোসুল কিংবা জঙ্গিদের দখলে যাওয়া সিরিয়ার রাক্কার মতো শহরগুলোতেও সেই একই তাণ্ডব, একই ত্রাস। নির্যাতন আর হত্যার প্রতিটি ঘটনাও প্রায় একই রকম নির্মম। মোসুলে কথিত খিলাফত কায়েমের পরই শহর জুড়ে মাইকিং করে লিফলেট বিলি করে বলা হয়েছে, শহরে থাকা সকল অমুসলিমকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে হবে। নয়তো তাদেরকে বিপুল অঙ্কের জিজিয়া কর দিতে হবে। টাকা দিয়ে সেই কর পরিশোধ করা যাবে না। দিতে হবে স্বর্ণ মুদ্রায়। নয়তো মৃত্যুকেই বেছে নিতে হবে। আর প্রাণ বাঁচাতে চাইলে

BanglaBook.org

সকল অমুসলিকে আইএস-এর কথিত খিলাফতের সীমানা ছাড়তে হবে। তবে যেতে হবে এক কাপড়ে। এমনকি পাসপোর্ট, টাকা পয়সা, খাবার দাবার কিছুই নেওয়া যাবে না। এই নির্দেশ যারা অমান্য করবে তাদের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। এই ঘোষণার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে অমুসলিমদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে, তারা কোনটা বেছে নেবেন। জঙ্গিদের এই ঘোষণা শুনে যারা তখনই বাড়ি ছেড়েছিলেন তারা বেঁচে গেছেন। আর যারা যাননি তাদের বাড়ি বাড়ি হানা দিয়ে যুবতী নারীদের তুলে নিয়েছিল জঙ্গিরা। যাবার সময় বাড়িগুলোতে এঁকে দেওয়া হয় লাল চিহ্ন। যাতে সহজেই খ্রিস্টান বাড়িগুলো চিহ্নিত করা যায়।

ইরাকে উত্তরাঞ্চলে অন্তত দুই হাজার বছর ধরে খ্রিস্টানদের বসবাস। এ অঞ্চলে ইসলামের বিজয়েরও ছয়শ বছর আগে থেকে খ্রিস্টানরা বসবাস করে আসছে। ইরাকে হাজার বছর ধরে মুসলিম আর খ্রিস্টানদের এই সহাবস্থান। ইতিহাসের নানা কালপর্বে শিয়া সুন্নিরা একে অপরের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরেছে ঠিকই কিন্তু খ্রিস্টানরা ছিল নিরাপদ। এই প্রথম ইরাকের সেই শান্তিপূর্ণ ধর্মীয় ঐতিহ্যের ওপরও কালি ছড়াল জঙ্গিরা। তাদের তাণ্ডবে ইরাক-সিরিয়ায় কত সংখ্যক খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীর প্রাণ গেছে, সেই হিসেব এখনও পাওয়া যায়নি। তবে আন্তর্জাতিক ক্যাথলিক প্রতিষ্ঠানের হিসেবে কেবল ইরাক থেকেই বাস্তুচ্যুত হয়েছে অন্তত ১৩ লাখ খ্রিস্টান। বাকি দুই লাখের অনেকের আশ্রয় মিলেছে কোনো না কোনো শরণার্থী শিবিরে এবং ইরাকের আইএস মুক্ত এলাকাগুলোর গীর্জায় অথবা কোন খ্রিস্টান দাতব্য সংস্থায়।

BanglaBook.org

অন্ধকারের দুই শহর রাক্কা ও মোসুল

ডিসেম্বর ২০১৪। সিরিয়ার রাক্কা শহরের প্রধান চত্বর। বাজিকরের খেলা দেখতে মানুষ যেমন গোল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, তেমনি শতাধিক মানুষের জটলা। দুনিয়ার আর কেউ না জানুক এখানকার মানুষদের কাছে রাক্কার প্রধান চত্বরে এমন জটলার একটাই মানে। আর তা হলো কোনো-না-কোনো হতভাগ্যের মৃত্যুদণ্ড। আজকের হতভাগ্যটির নাম পরিচয় জানা যায়নি। তবে তিনি মুসলিম। তার অপরাধটা গুরুতর; ব্লাসফেমী। তিনি বলেছেন 'ইসলাম একটা ভূয়া ধর্ম'। কবে কখন কোথায় কার কাছে বলেছেন, কে শুনেছেন, কে বাদি কে ফরিয়াদি—এসবের কোনো দরকার নেই। অভিযোগ এসেছে এটাই যথেষ্ট। হাত বেঁধে চোখ বেঁধে হাজির করা হলো অপরাধীকে। বিচারক কিছুক্ষণ কথা বললেন অপরাধীর সাথে। তারপর বললেন ঘটনা সত্য। সে

ইসলাম এবং আল্লাহকে অপমান করেছে। তার অপরাধ কাফেরের চাইতেও বেশি। আর এই অপরাধের একমাত্র শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। যদিও বিচারক তার এক পৃষ্ঠার রায়ে লিখেছেন অপরাধী তার কৃতকর্মের জন্য অনুতাপ প্রকাশ করে ক্ষমা প্রার্থনা করেছে। কিন্তু আইএস-এর আদালত ক্ষমা জানে না। বলাবাহুল্য রায় ঘোষণার আগেই বড় একটি ধামা হাতে প্রস্তুত জল্লাদ, আর গাছের গুড়ি। থর থর করে কাঁপছিল অপরাধী।

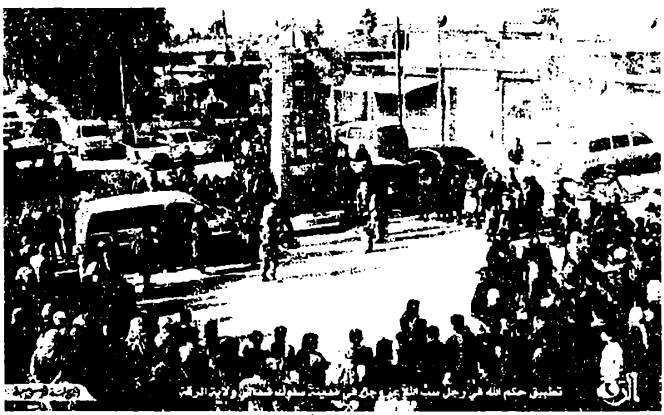

রাক্কার সড়ক দ্বীপে হতভ্যাগ্য সেই মানুষটির মৃত্যুদণ্ডের রায় ঘোষণা চলছে

মৃত্যুর মুহূর্তে বেশ কজন শিয়া মুসলিম

গাছের গুড়িটার ওপর মাথা রেখে নামাজের সেজদার ভঙ্গিতে তাকে দাঁড় করানো হলো। কিন্তু কাঁপতে কাঁপতে টাল সামলাতে না পেরে পড়ে গেল

লোকটা। আবারো তাকে একইভাবে দাঁড় করানো হলো। চারপাশে পিনপতন নিরবতা। মানুষের জটলার বেশিরভাগই শিশু-কিশোর আর যুবক। সদ্য আইএস দলে যোগ দেওয়া কালাশনিকভ হাতে মুখোশধারি পনেরটি শিশুও আছে এখানে। ওদের এখন ইন্টার্নশিপ চলছে। এরপর ওরা নিজেরাই এমন অপরাধীদের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করবে। তারপর পুরোদস্তুর জিহাদি'র মর্যাদা পাবে। তাদের কৌতূহলের সীমা নেই। অপরাধীর জন্যে ওদের কোনো অনুকম্পা নেই। কারণ ওদের বলা হয়েছে এটাই ইসলাম। বিদ্যুৎবেগে হাত চালাল মুখোশধারী জল্লাদ ; পলকে কয়েক হাত দূরে ছিটকে পড়ল একটি ছিন্ন মস্তক। লাশটা আজ দিনভর এই সড়কদ্বীপেই থাকবে। যারা এখনও একজন কাফেরের ভয়ঙ্কর পরিণতি দেখতে পায়নি তাদের দেখানো হবে। তারপর কাটা মাথাটি গেঁথে রাখা হবে শহরের একটি পার্কের লোহার গরাদে।

রাক্কার পৌর পার্ক এটি। একসময় সকাল সন্ধ্যা মানুষের পদচারণায় মুখর থাকত এই পার্ক। বাচ্চারা খেলা করত বড়রা জগিং আর রাতের বৌদের বৈকালিক আড্ডাস্থল ছিল এটি। কিন্তু এখন এই পার্ক জনশূন্য। পার্কের দেওয়ালের নিচে ওপরে সূঁচালো রডের ওপর নানান কায়দায় গেঁথে রাখা হয়েছে মানুষের রক্তাক্ত মস্তক। (ছবি প্রকাশযোগ্য নয়) তাই দৃশ্যগুলোর ছবি এড়িয়ে যাওয়া হলো) ফুটপাত ধরে হাঁটতে গেলে সেই মাথা পায়ের সাথে লেগে যায়। কখনও ছিটকে ফুটপাতে আছড়ে পড়ে। তাতে কি! কাফের নাস্তিক আর ইসলাম গ্রহণে অনিচ্ছুকদের কী পরিণতি হতে পারে রাক্কাবাসীকে সেটা দেখতেই হবে। তবে মানুষ হত্যার সবচেয়ে বড় আয়োজনটা হয় শুক্রবার জুমার নামাজের পর। সে যেন পশু জবাইয়ের হাট। চারজন পাঁচজন কখনও দশ জনেরও মৃত্যুদণ্ড অথবা হাত পা কেটে ফেলার উৎসব চলে সেখানে। যেমন কেউ একজন রাস্তায় চলতে গিয়ে হোঁচট খেয়ে পড়ল আর বলে উঠল 'ওহ গড ড্যাম ইট'। কোনো এক আইএস সদস্য কথাটা শুনে ফেলল। ব্যাস আর রক্ষা নেই। কারণ 'আল্লাহ'র অপমানের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। সেই দণ্ড কার্যকরের আগে শহরজুড়ে লিফলেট বিলি করে সবাইকে এমনকি শিশুদেরও হাজির থাকার নির্দেশ দেওয়া হবে। আর এভাবেই এই মৃত্যুর শহরে সকাল বিকাল মানুষের মৃত্যুর উৎসব দেখে চলেছেন রাক্কার আতঙ্কিত প্রায় দুই লাখ মানুষ। মূল বাসিন্দারা শহর ছেড়েছেন অনেক আগেই। এখন যারা এই শহরে আছেন তাদের যাবার কোনো জায়গা নেই। আইএস জঙ্গি আর তাদের কথিত খিলাফতের নব্য সমর্থক ছাড়া এই শহরে কেউ উচ্চস্বরে হাসে না, জোরে কথা বলে না গুণ গুণ করে গানও গায় না। প্রতিমুহূর্তে অজানা আতঙ্ক আর আশঙ্কা তাদের ঘিরে থাকে। রাক্কার পরিস্থিতিটা এভাবেই

BanglaBook.org

বর্ণনা করেছে জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক কমিশন। নির্যাতনের শিকার ইরাক সিরিয়ার ৪৮০ জন প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে প্রণীত এই রিপোর্টে বলা হয়েছে, সভ্যতা এবং মানবতার ওপর আইএস-এর ধ্বংসযজ্ঞ ধারণার চাইতেও বেশি নৃশংস আর অকল্পনীয়।

এই পরিস্থিতিতে রাক্কায় কেমন চলছে কথিত আইএস-এর খিলাফত? এর নাম যদি খিলাফত হয় তবে তা ভালোভাবেই চলছে। মানবাধিকার কমিশনকে বলছিলেন সাবেক এক রাক্কাবাসী। এখানে জিনিসপত্রের দাম আকাশ ছোঁয়া। মানুষের হাতে কাজ নেই টাকা নেই। স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ। পড়াশুনা বলতে কেবল আইএস পরিচালিত কিছু মাদ্রাসায় শিশুদের জঙ্গি হিসেবে গড়ে তোলার ট্রেনিং। খুব ছোটবেলা থেকেই এই শিশুদের মাথায় গেঁথে দেওয়া হয় জিহাদে শহীদ হওয়া মানে বেহেশত ও হুরপরীদের সান্নিধ্যে অনন্ত সুখ লাভ করা। একই লোভ দেখানো হয় শিশুদের বাবা মাকেও। সন্তান বেহেশতবাসি হওয়া মানে বাবা মায়েরও শান্তিময় পরকাল নিশ্চিত হওয়া। যেনে ইন্টারনেট ক্যামেরা রেডিও টেলিভিশন এসব নিষিদ্ধ করা গেলেও কেবল চিকিৎসা প্রযুক্তিকে নিষিদ্ধ করতে পারছে না জঙ্গিরা। কারণ ওদের প্রচুর ডাক্তার আর ওষুধপত্র দরকার। তাই চিকিৎসাশাস্ত্র তাদের প্রিয় বিষয়। আরেকটি প্রিয় বিষয় হলো, শহরের বিবাহযোগ্যা কন্যাদের আইএস জঙ্গিদের সাথে বিয়ে দেওয়া। বিয়ের সমস্ত খরচ দেওয়া এবং প্রয়োজনে কন্যার পিতাকে পণ দিয়ে হলেও বৈবাহিক সম্পর্কের মাধ্যমে ভবিষ্যতের জন্য আইএস-এর সামাজিক ভিতটা শক্ত করাই তাদের উদ্দেশ্য। আইএস দম্পতির সন্তান হলে তার জন্যেও মেলে বিশেষ ভাতা। সারা দুনিয়ার মুসলিম-অমুসলিম নারীদের যৌনজিহাদ বা যৌনদাসত্বে বাধ্য করা হলেও স্থানীয় নারীদের ওপর জঙ্গিরা সেই বাধ্যবাদকতা আরোপ করে না। কারণ তারা জানে তাহলে দীর্ঘমেয়াদে স্থানীয় মানুষের সমর্থন পাওয়া যাবে না।

আইএস-এর খিলাফতের আরেক শহর ইরাকের মোসুল। শহরটির বিজ্ঞাপনী বিলবোর্ডও এখন আইএস-এর দখলে। সেইসব বিলবোর্ডে শোভা পাচ্ছে শরিয়া আইনের নির্দেশাবলি এবং যৌনদাসিদের ব্যবহারের নিয়ম কানুন। বিলবোর্ড সাজানো হয়েছে প্রশ্ন এবং উত্তর দিয়ে। যেমন:

প্রশ্ন: আমি কি আমার দাসি'র দখল বুঝে পাবার সাথে সাথেই তার সাথে সহবাস করতে পারব?

উত্তর: সে যদি কুমারী হয় আর সে যদি আপনার দখলে থাকে তাহলে আপনি সেটা পারবেন। আর যদি তা না হয় তাহলে আপনাকে আগে নিশ্চিত হতে হবে যে গর্ভবতী নয়।

BanglaBook.org

যৌনদাসিদের ব্যবহার এবং নামাজ আদায়ের নিয়ম সম্পর্কে আইএস-এর বিলবোর্ড

প্রশ্ন: বয়সন্ধি পার হয়নি এমন কোনো দাসির সাথে কি সহবাস করা যাবে?

উত্তর: যাবে, যদি সে শারীরিকভাবে সক্ষম হয়। আর যদি না হয়, তাহলে বিষয়টি কারো জন্যেই সুখকর হবে না।

মোসুলের দোকানদার, সুন্নি মুসলিম ফাহাদ এনবিসি নিউজকে বলছিলেন নিরাপত্তার কথা যদি বলেন তাহলে বলতে হবে চুরি ডাকাতি ছিনতাইয়ের মতো অপরাধ এখন মোসুল থেকে হারিয়ে গেছে। কারণ লাখ টাকার মাল চুরির বিনিময়েও আপনি সারাজীবনের জন্য আপনার মূল্যবান একটা হাত হারাতে চাইবেন না। কঠোরভাবে আইন শৃংখলা রক্ষা করা হচ্ছে। সিগারেট সীসা হুকা মদ সব এখন নিষিদ্ধ। কারো কাছে এসব পাওয়া গেলে সাক্ষাৎ

BanglaBook.org

মৃত্যু। কিন্তু যদি বলেন আমরা ভালো আছি কিনা। তাহলে বলতে হবে আমরা ভালো নেই। কারণ ফোন ইন্টারনেট পানি বিদ্যুৎ পয়নিষ্কাষণের মতো কোনো সুবিধা এখানে নেই। এদিকে নজর দিয়ে নষ্ট করার মতো সময় ওদের নেই।

ইউনুস নবীর মাজার ধ্বংস

ইরাকের মোসুলে কথিত খিলাফত কায়েমের পর সেখানকার হাজার বছরের পুরনো ঐতিহ্যবাহী শিয়া মসজিদ ও সুফি সাধকদের মাজারগুলো বিস্ফোরক আর বুলডোজার দিয়ে গুড়িয়ে দেয় আইএস জঙ্গিরা। শুধু জুলাইতে প্রায় ৩০টির মতো মাজার ও ১৫টি মসজিদ ধ্বংস করেছে জঙ্গিরা। জুলাইয়ের কোনো এক শুক্রবার মুসল্লিরা যখন জুমার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন তখন অস্ত্রের মুখে মুসল্লিদের মসজিদ থেকে বের করে দিয়ে বিস্ফোরক পেতে রেখে সেগুলো উড়িয়ে দেওয়া হয়। একই দিন পূর্ব মোসুলের নিনেভ অঞ্চলে একটি পাহাড়ের ওপর হাজার বছর ধরে ভক্তদের ভালোবাসা আর যত্নে থাকা হযরত ইউনুস (আ:)-এর মাজারটিও গুড়িয়ে দেয় জঙ্গিরা। মাজারে উপস্থিত ভক্ত ও খাদেমদের অস্ত্রের মুখে বের করে দিয়ে প্রথমে মসজিদ পরে শাখল আর গাইতি দিয়ে ইউনুস নবী ও তাঁর সাহাবিদের কবরগুলো নিশ্চিহ্ন করে দেয় জঙ্গিরা।

BanglaBook.org

নিনেভের পাহাড় চূড়ায় ইউনুস নবীর মাজার কমপ্লেক্স

কেবল মুসলিম নয়। খ্রিস্টানদের কাছেও সমান পবিত্র ছিল এই মাজার। ইউনুস নবীর মসজিদ কমপ্লেক্সের পাশেই ছিল ১৮শ শতকের একটি

ঐতিহাসিক গীর্জা। শত শত বছর ধরে এটি ইরাকের মানুষের কাছে অসাম্প্রদায়িক চেতনার এক স্মারক হয়ে উঠেছিল। কিন্তু সবই গুড়িয়ে দিয়েছে জঙ্গিরা। মসজিদ কমপ্লেক্সটি শক্তিশালী হওয়ায় সেটি ভাঙা যায়নি। তবে সেই মাজারের অস্তিত্ব আজ আর নেই বলে বিভিন্ন গণমাধ্যমকে নিশ্চিত করেছে ইরাকি কর্তৃপক্ষ। একইভাবে গুড়িয়ে দেওয়া হয় মুসলিম ঐতিহ্যের নিদর্শন হজরত দাউদ (আ.)-এর মাজার, ইমাম ইয়াহিয়া ইবনে আল কাশেমের মাজার, সুফী সাধক আয়ান আল-দ্বীনের মাজার। মোসুলের ১১ টি গীর্জাও গুড়িয়ে দিয়েছে জঙ্গিরা। শহরের কেন্দ্রে থাকা মধ্যযুগীয় একজন কবি যিনি ছিলেন মোসুলের গর্ব ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অংশ তার ভাস্কর্যও গুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। কেবল মসজিদ মাজার গুড়িয়ে দেওয়াই নয়, সেখানকার দানবাক্সের লাখ লাখ টাকা এবং ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক সম্পদও লুটে নেয় জঙ্গিরা। মোসুল আর নিনেভ জুড়ে জঙ্গিদের চালানো এসব কর্মকাণ্ডের সমালোচনা করেছিলেন চারজন মানুষ। তাদের তিনজন সুন্নি নেতা খাত্তাব হাসান, রিয়াদ আল ওয়াদি এবং আব্দুল গফুর সালমান।

BanglaBook.org

ইউনুস নবী ও তাঁর সাহাবিদের কবর গুড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে

আর চতুর্থজন আইনজীবী ও মানবাধিকার কর্মী সামিরা সালেহ আল নাঈমি। কোরান হাদিসের ব্যাখ্যা তুলে ধরে তিন সুন্নি নেতা জঙ্গিদের বলেছিলেন 'তোমরা ইসলামের কোথায় পেলে যে খিলাফত প্রতিষ্ঠার নামে ধর্মীয় উপাসনালয় আর নবীদের মাজার ধ্বংস করা যাবে'? তারা ভেবেছিলেন তাদের আহবান না শুনলেও জঙ্গিরা অন্তত তাদের কোনো ক্ষতি করবে না। কারণ তারা সুন্নী নেতা। কিন্তু না, তাদের অস্ত্রের মুখে তুলে নিয়ে কথিত শরিয়া

আইনে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করে জঙ্গিরা। শেষ সুযোগ হিসেবে তাদের দুটি বিকল্প দিয়েছিল জঙ্গিরা। আইএস-এর প্রতি বশ্যতা স্বীকার অথবা জন্মভূমি ত্যাগ। তিন নেতা বলেছিলেন 'তোমাদের মতো পশুর কাছে বশ্যতা শিকার করার চাইতে মৃত্যুও অনেক সম্মানের'। মোসুলে জনসমক্ষে ওই তিন সুন্নি নেতাকে হত্যা করেছিল জঙ্গিরা। আইএস-এর বর্বরতা আর মসজিদ মাজার ধ্বংসের প্রতিবাদে নিজের ফেসবুক অ্যাকাউন্টে একটি স্ট্যাটাস দিয়েছিলেন আইনজীবী ও মানবাধিকার কর্মী সামিরা সালেহ আল নাঈমি। এরপরই নিখোঁজ হন সামিরা। তাকে অপহরণের পর মোসুলের বন্দিশালায় আটক করে তাঁর ওপর অকথ্য নির্যাতন চালায় জঙ্গিরা। সাতদিন পর মোসুল স্কয়ারে আইএস-এর কথিত শরিয়া আদালতে ধর্মত্যাগের অপরাধে মাত্র কয়েক মিনেটের বিচারে সামিরাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। কয়েকশো মানুষের সামনে প্রকাশ্যে গুলি করে হত্যা করা হয় এই মানবাধিকার কর্মীকে। এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে ছিল আন্তর্জাতিক বিশ্ব।

BanglaBook.org

সামিরা সালেহ ও আইএস-এর কথিত শরিয়া আদালত

অনলাইনে আইএস-এর জিহাদ ও প্রপাগান্ডা

নিজ দেশের আইএস অনুসারী জঙ্গিদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রের লড়াই প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে অস্ট্রেলিয় প্রধানমন্ত্রী টনি অ্যাবোট বলেছিলেন: 'একটি আই-ফোন আর একটি ছুরি দিয়ে খুব সহজেই বিশ্বশান্তি আর মানবতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা যায়, ত্রাসের সৃষ্টি করা যায়'। বাস্তবিক তাই। নতুন যুগের জঙ্গিবাদের অন্যতম

উপকরণ হলো স্মার্ট ফোন আর একটি সাধারণ ছুরি। সেই ছুরি যদি ভোতা হয় তবে সেটি আইএস জঙ্গিদের আরও বেশি পছন্দ। কারণ তাহলে কথিত কাফেরটির মৃত্যু হবে আরও যন্ত্রণাময়। হত্যা করাই শুধু নয় বিভৎস এসব কর্মকাণ্ডকে পুঁজি করে বিশ্বজুড়ে ত্রাস সৃষ্টি করতে প্রতিনিয়ত আইএস তার কৃতকর্মের ছবি ইন্টানেটে আপলোড করছে। কখনও ভিডিও কখনও স্টিল ছবি।

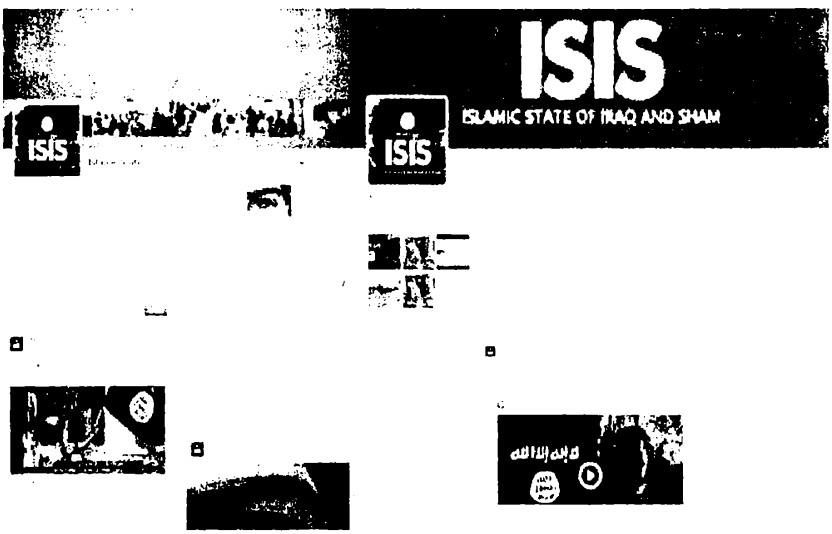

অনলাইনেও চলছে আইএস-এর সাইবার জিহাদ

সিরিয়ার রাক্কার একটি ঘটনার স্টিল ছবি ছড়িয়ে পড়েছে ইন্টারনেটে। ষোল থেকে সতের বছর বয়সি এক খ্রিস্টান তরুণীর গলায় ছুরি দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে ছিদ্র করছে জঙ্গিরা। সেই ছিদ্র দিয়ে গল গল করে বেরিয়ে আসছে রক্ত। নাৎসীদের মতো মানুষের যন্ত্রণাময় মৃত্যুর নিত্য নতুন পন্থা আবিষ্কার ও তার প্রয়োগ ঘটিয়ে সেটি দুনিয়া জুড়ে প্রচার করছে আইএস। জঙ্গিদের এমনি এক হত্যাকাণ্ডের ভিডিওতে দেখা গেছে, কোনো এক হতভাগ্যকে পিছমোড়া করে হাত বেঁধে তার গলায় ছুরি চালাতে চালাতে ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে হাস্যোজ্জল ভঙ্গিতে কোনো এক জঙ্গি বলছে 'ছুরি দিয়ে ওর স্বাভাবিক মৃত্যু হচ্ছে... হা হা হা'। আরেক ভিডিও মধ্যরাতে ইরাকের এক পুলিশ সদস্যের বাড়িতে হানা দিয়েছে আইএস জঙ্গিরা। আটকের পর তার হাত আর চোখ বেঁধে 'আল্লাহ হু আকবর' বলে গলায় ছুরি চালিয়ে দেওয়া হয়েছে। ইরাকের মোসুলে-সিরিয়ার রাক্কায় এমনি হাজারো মানুষকে কখনও দল বেঁধে জবাই বা গুলি করে হত্যা কখনও ক্রুশের ওপর পেরেক বিদ্ধ করে তিলে তিলে হত্যার

BanglaBook.org

ভিডিও অনলাইনে ছড়িয়ে দেওয়ার মধ্যদিয়ে সাইবার জগতের নিরন্তর এক লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে নতুন যুগের এই জঙ্গিরা। তাই ইরাক অথবা সিরিয়ার প্রত্যন্ত কোনো এলাকার একটি ঘটনা এখন কেবল ওই দেশ দুটির ক্ষুদ্র গণ্ডিতে আর সীমাবদ্ধ নেই। জঙ্গিদের সেই বর্বরতা আক্রান্ত করছে বিশ্বের কোটি মানুষকে। ক্ষুদ্র গণ্ডির কোনো একটি রণাঙ্গনের পক্ষ বা বিপক্ষ শক্তি হয়ে উঠছে বাদ বাকি দুনিয়ার মানুষ। আর এটাই এ যুগের জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে লড়াইকে আরও বেশি জটিল করে তুলেছে। কারণ সভ্য সমাজে বাস করা কোনো এক ধর্ম উম্মাদ একজন খ্রিস্টান হত্যার ভিডিওটি দেখে মনে পূলক অনুভব করছেন না, নিশ্চিত করে বলা সম্ভব নয়। কারণ মনের ঘরে নজরদারি চালাবার তো কোনো উপায় নেই। কিন্তু লড়াইটাকে এবার মানুষের মনের ঘর পর্যন্তই পৌছে দিয়েছে জঙ্গিরা। এই প্রসঙ্গে ব্রাসেলসের জঙ্গি সদস্য আকসা মাহমুদের কথাটি উল্লেখ করা যায়। নিজের টুইটার অ্যাকাউন্টে আকসা বলেছিলেন 'তুমি যদি ইরাক-সিরিয়ায় জিহাদের রণভূমিতে যোগ দিতে না পারো তাহলে তোমার বেডরুমকেই জিহাদের রণাঙ্গন বানিয়ে নাও।' বেডরুম বা নিজ দেশের এই জিহাদিরা আজ ইউরোপ আমেরিকার মাথা ব্যথার কারণ হয়ে উঠেছে।

তুরস্ক সীমান্তে কুর্দী যোদ্ধাদের হাতে আটক এক জঙ্গি বলেছেন, অনলাইনে বিভৎস এসব প্রচারণাকেও জিহাদের অংশ বলেই মনে করে আইএস। তাদের মতে আইএস সম্পর্কে দুনিয়া জুড়ে যে ত্রাসের সৃষ্টি হয়েছে তাতেই তারা নিজেদের সফল মনে করছে। এর মধ্যদিয়ে শত্রুরা ভয় পেয়ে দূরে থাকবে ফলে নিজেদের রক্তক্ষয় ছাড়াই যুদ্ধে জয় আসবে এবং খিলাফতের সীমানা বাড়াতে সক্ষম হবে আইএস। তেমনি জঙ্গিদের কথিত এসব বীরত্ব গাঁথার অনুরক্ত যুবকরা এক সময় আইএস-এ যোগ দেবে। দলটির বর্বর নির্যাতন আর হত্যাযজ্ঞের বর্ণনা দিয়ে এই আইএস জঙ্গি বলেছে, 'কাফেরদের প্রতি আইএস এমন আচরণ শরিয়তেরই বিধান। তাদের এভাবে হত্যা না করলে দুনিয়ায় ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হবে, না আর কাফেররাও ভয় পেয়ে সাবধান হবে না। তাই কাফেরদের কষ্ট দিয়ে হত্যা করাই হলো শরিয়া।' এই জঙ্গি বলছিলেন খলিফা বাগদাদির নির্দেশ হলো 'কাফিরদের প্রতি কোনো অনুকম্পা নয়। তাদের কষ্ট দিয়ে হত্যা করো'। সে কারণে ভোতা ছুরি দিয়ে হত্যা, কণ্ঠনালী ছিদ্র করে শরীরের সব রক্ত নিংড়ে নিয়ে হত্যা, ক্রুশ বিদ্ধ করে কিংবা জ্যান্ত কবর দিয়ে কাফেরদের হত্যা করা আইএস-এর বিধান।

আইএস জঙ্গিদের ইংরেজি ভাষার ওয়েব পোর্টাল 'দাকিব' এইসব বর্বর আর বিকৃত প্রচার প্রপাগন্ডার একটি অন্যতম উৎস। এই ওয়েব পোর্টালটিতে

BanglaBook.org

আইএস তার সমস্ত কর্মকাণ্ডের বৈধতা ব্যাখ্য করে প্রচারণা চালিয়ে আসছে। অমুসলিম সাধারণ মানুষ হত্যা, নিরস্ত্র সেনা বা পুলিশ সদস্যকে হত্যা, যৌনজিহাদের নামে যথেচ্ছ যৌনাচারের স্বীকৃতি এমনকি দাস হিসেবে নারীদের বিক্রির বৈধতাও দিচ্ছে এই ওয়েব পোর্টাল। বলাবাহুল্য কোরান হাদিসের উদ্ধৃতির মোড়কে তাদের সব কর্মকাণ্ডকেই বৈধ বলে প্রচার চালিয়ে আসছে জঙ্গিরা। যদিও আজ পর্যন্ত বিশ্বের একজন ইসলামিক স্কলারও বলেননি যে, আইএস-এর কর্মকাণ্ড ইসলাম স্বীকৃত। বরং দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ ইসলামি চিন্তাবিদরা উল্টোটাই বলে আসছেন।

প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞরা বলছেন আইএস-এর উত্থান শুরুর পর থেকে গত দুই বছরে ইন্টারনেটে যে পরিমাণ বিভৎস ছবির জোয়ার শুরু হয়েছে, এমন প্রবণতা এর আগে কখনই এত উৎকট হয়ে উঠেনি। আল কায়দা বা তালেবান জঙ্গিদের মধ্যেও এমন উগ্র বিকৃতি দেখা যায়নি। তবে এর একটা ভালো দিকও আছে। তা এই দৃষ্টিকোণ থেকে যে, ধর্মের নামে জিহাদের নামে জঙ্গিদের নজীরবিহীন এমন বর্বরতা সম্পর্কে মানুষ সচেতন হতে পারছে। তাদের এড়িয়ে চলার বা দূরে সরে থাকবার সুযোগ পাচ্ছে। অন্যদিকে ভয়ঙ্কর এই ছবিগুলোর ঝুঁকির দিকটা হলো, বিকৃত মানসিকতার এমন যথেচ্ছ প্রচার একটা সময় মানুষের গা সওয়া ব্যাপার হয়ে উঠতে পারে। লোপ পেতে পারে মানুষের স্বাভাবিক সংবেদনশীলতা।

BanglaBook.org

আইএস-এর বিদেশি যোদ্ধা ও জাতি রাষ্ট্রের সংকট

বিশ্বের ৮০ টি দেশের নানা ভাষার, নানা গোত্রের, নানা বর্ণের অন্তত ১৫ হাজার জঙ্গি এসে জড়ো হয়েছে ইরাক-সিরিয়ার এই নৈরাজ্যে। কেবল ইরাক সিরিয়া নয়, জাতি রাষ্ট্রের সংকটেরও কারণ হয়েছে এই জিহাদিরা। কারণ তাদের লক্ষ্য ইরাক-সিরিয়ার পর নিজ নিজ দেশেও খিলাফত প্রতিষ্ঠা। এই পরিচ্ছেদে আমরা বুঝতে চাইব বিভিন্ন দেশের এই যোদ্ধাদের মানসিক পারিবারিক সামাজিক আর রাজনৈতিক প্রেক্ষিত।

ব্রিটিশ তরুণদের অংশগ্রহণ
ফ্রান্স
বেলজিয়াম
অস্ট্রিয়া
কসোভো
চেচনিয়া
জর্জিয়া
অস্ট্রেলিয়া
তিউনিশিয়ার নারীদের যৌনজিহাদ
ব্রিটিশ বাংলাদেশি

বিশ্বের অন্যতম এক নৈরাজ্যপূর্ণ লড়াইয়ের ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে সিরিয়া। ইতিহাসের সূত্র বলে, চরম নৈরাজ্য থেকেই বিনির্মাণের উত্থান। ইরাক আর সিরিয়ার বিশাল একটি অংশ জুড়ে ঘটে চলা এই নৈরাজ্য ভূখণ্ডটিকে কোন বিনির্মাণের দিকে নিয়ে যাবে সেই বিচারের ভার সময়ের হাতে। তবে সিরিয়া আর ইরাকের এই পরিস্থিতিকে ইতিহাসের দায় বলেই আখ্যায়িত করছেন পণ্ডিতরা। এই দায় প্রথম বিশ্বযুদ্ধের। যখন মধ্যপ্রাচ্যের সীমারেখা আর দীর্ঘ কয়েক শতকের রক্তঘাম সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে গড়ে ওঠা রাষ্ট্র কাঠমোর আপন প্রাচীর গুড়িয়ে গড়ে উঠেছিল পশ্চিমা ভাব ধারার রাষ্ট্র ও সরকার ব্যবস্থা। যা গণমানুষের ইচ্ছা থেকে আসেনি। বরং চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিংবা এই দায় দজলা-ফোরাতের (টাইগ্রিস আর ইউফ্রেটিস নদী) তীর ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকা নাজাফ অথবা কারাবালা প্রাঙ্গণের। হাসান-হোসেনের শোকে শুকিয়ে গিয়েছিল যে স্রোতস্বীনি ফোরাতের নহর। হাসান-হোসেনের রক্তের উত্তরাধিকার হিসেবে আজও হৃদয়ে 'হায় হোসেন, হায় হোসেন' মাতম শোনেন শিয়া মুসলিমরা। শিয়াদের সেই বিলাপ যুগে যুগে সুন্নিদের ক্রোধের কারণ হয়েছে। কত শতবার হাসান–হোসেনের সাহাবিদের মাজার গুড়িয়ে দিয়েছে সুন্নিরা। আবার মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে শিয়াদের 'হৃদয়'। কিন্তু পাকাপাকি রফা কখনও হয়নি। আদি পিতা মাতা আদম-হাওয়ার দুই সন্তান হাবিল কাবিলের লড়াইয়ের ক্ষেত্রও তো এই ভূমি। সিরিয়ার দামেস্কের উপকণ্ঠের যে শহর থেকে রাসায়নিক বোমা হামলা চালিয়ে একরাতেই হত্যা করা হলো চারশো শিশুসহ চৌদ্দশো মানুষকে, নৃতাত্ত্বিকরা বলেন, সেটাই ছিল হাবিল-কাবিলের রণাঙ্গন। সেই অমিমাংসিত লড়াইটাই যেন ফিরে এসেছে সভ্যতার এই সুতিকাগারে। মার্কিন পণ্ডিত নোয়াম চমস্কি বলছেন 'এটা তো দশ হাজার বছর আগের সেই মেসোপটেমিয় সভ্যতার সূতিকাগার। যেখান থেকে শুরু হয়েছিল সভ্যতার যাত্রা। তবে কি ধ্বংসের জন্যে আবারো সেখানেই ফিরে যাচ্ছে সভ্যতা?' চমস্কির এই প্রশ্নের উত্তর দেবে সময়। তবে ধর্মের দায়, ইতিহাসের দায়, আঞ্চলিক রাজনীতির অমিমাংসিত নানা সমীকরণের দায়, সব আজ মিলেমিশে একাকার ইরাক-সিরিয়ার এই উষার মুরু প্রান্তরে।

ইতিহাসের নতুন কাল পর্বে আজ সেখানে রক্ত দিচ্ছে বিশ্বের ৮০টি দেশের ১৫ হাজারেরও বেশি যোদ্ধা। যাদের আমরা আইএস-এর 'বিদেশি যোদ্ধা' নামে নির্দিষ্ট করছি। লড়াইয়ের এই রণভূমে এখন হাজারো যোদ্ধার হাজারো দায়ের শোধ নেবার পালা। এদের একদল বাশার আল আসাদকে ক্ষমতা ও দুনিয়া থেকে বিদায় করে মাতৃভূমি রক্ষার দায় শুধছেন। আরেক দল

BanglaBook.org

বাশার মুক্ত সিরিয়ায় একটি ধর্মরাষ্ট্র করে গড়ে তোলার মধ্য দিয়ে ধর্মীয় দায় শুধছেন। আর দুই দলের লড়াইয়ের মাঝখানে নিজেদের দীর্ঘদিনের লালিত স্বপ্ন একটি স্বাধীন কুর্দী ভূমি গড়ার দায় মেটাচ্ছেন কুর্দী যোদ্ধারা। বহুমুখী এবং বহুধা বিভক্ত এই লড়াই সম্ভবত দুনিয়ার নিকট ইতিহাসের সবচেয়ে নৈরাজ্যজনক এক পরিস্থিতির জন্ম দিয়েছে।

আগেই বলেছি যারা বিশ্বাস করে একটি ইসলামি রাষ্ট্র গড়ে তোলার জন্যে সশস্ত্র সংগ্রামের নামই জিহাদ—সেই জিহাদিদের কাছে সিরিয়ার এই রণক্ষেত্র এখন নিজের মাতৃভূমি আত্মীয় পরিজন সবকিছুর চাইতে পবিত্র। তাদের কাছে এই ভূমি এখন আল্লাহর পবিত্র ভূমি। কিন্তু কারা এই জিহাদি? ইউরোপ আমেরিকান বংশোদ্ভুত একজন সিরিয় যদি এই লড়াইয়ে যোগ দেন, তিনিও কি বিদেশি যোদ্ধা? এর উত্তর দুটি। সহযোদ্ধাদের কাছে তিনি 'আল্লাহর ভূমি বা কথিত খিলফতরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পবিত্র যোদ্ধা' আর বাদবাকি দুনিয়ার কাছে তিনি বিদেশি যোদ্ধা কিংবা সন্ত্রাসী কিংবা মুজাহিদ কিংবা জিহাদি।

শোনা যায় ৮০'র দশকে বাংলাদেশের অন্তত ৫০ জন তরুণের একটি দল স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে পশ্চিম তীরে-গাজায় লড়াই করেছেন। ফিলিস্তিনিরা কখনও বলেনি যে তারা ধর্মরাষ্ট্র গড়বেন। তারপরও একটি স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্র গড়ার যে সংগ্রাম তা যুগে যুগে মানুষের শ্রদ্ধা ভালোবাসা আর আবেগে সিক্ত হয়েছে। আফগানিস্তানের রুশ বিরোধী মুজাহিদদের সাথেও লড়েছেন আমাদের দেশের অনেক তরুণ। তখনও তারা কথিত সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধের জঙ্গি হয়ে উঠেননি। ২০০১ সালের পর সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধের নামে যুক্তরাষ্ট্রের নয়া আধিপত্যবাদ 'শ্রদ্ধা-ভালোবাসার' সেই সব লড়াইকেও সন্ত্রাসের মোড়কে বাক্সবন্দি করেছে। আইএস-এর লড়াই দুনিয়াব্যাপী প্রশ্নহীন শ্রদ্ধা-ভালোবাসা পাচ্ছে কিনা সেটি প্রেক্ষিতের (perspective) প্রশ্ন। কিন্তু বলার অপেক্ষা রাখে না যে সিরিয়ার রনাঙ্গণ বিদেশি যোদ্ধাদের জন্য স্বর্গ হয়ে ওঠার অথবা 'জালেম মুক্ত' একটি ভূখণ্ড গড়বার এই উগ্র বাসনা তৈরির পেছনে যত রকম ভূমিকা বা উস্কানি দরকার তার প্রায় সবটাই করেছে যুক্তরাষ্ট্র নেতৃত্বাধীণ বিশ্বশক্তি।

আসাদের বিরুদ্ধে পশ্চিমা ও আরব দেশগুলোর ধারাবাহিক ভূমিকা জিহাদি মনোভাবাপন্ন তরুণদের সিরিয়ার এই যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে উৎসাহিত করেছে। আসাদকে উৎখাতের নাম করে তারা জড়িয়ে পড়েছেন ধর্মরাষ্ট্র গড়বার লড়াইয়ে। কিংবা বলা যায় 'কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার' যে চিরাচরিত মার্কিন কুটকৌশল, অর্থাৎ 'সন্ত্রাসী' দিয়ে বাশার আল আসাদকে উৎখাতের সেই চেষ্টা বুমেরাং হয়ে এবার তাবত পশ্চিমা দেশগুলোর মাথাব্যাথার কারণ

BanglaBook.org

হয়েছে। বিশ্বশক্তি চেয়েছে বলেই বাশার বিরোধী তরুণরা ঝাঁকে ঝাঁকে তুরস্ক হয়ে সিরিয়ায় প্রবেশ করতে পেরেছে। আসাদ সরকারকে ঘৃণার চোখে দেখা তুরস্কের এরদোগান সরকারও বিদেশি যোদ্ধাদের জন্যে সীমান্ত একরকম অবারিত করে দিয়েছিলেন। একদিকে সিরিয়ার সম্ভাব্য বিমান হামলা প্রতিরোধে সীমান্ত এলাকায় ন্যাটোর ডেস্ট্রয়ার ইন্টারসেপ্টর। অন্যদিকে বিদেশি যোদ্ধাদের প্রতি তুরস্কের নীরব সম্মতি সিরিয়ায় নারকীয় পরিস্থিতির জন্ম দিয়েছে। ঝাঁক বেধে আসা সেই বিদেশি যোদ্ধাদের কেউ ফ্রি সিরিয়ান আর্মির সাথে যোগ দেয়নি, যারা স্বৈরাচার আসাদ মুক্ত গণতান্ত্রিক সিরিয়া গড়তে চায়। এই যোদ্ধাদের বেশিরভাগই যোগ দিয়েছে আল কায়দা সমর্থিত আল নুসরাহ ফ্রন্টের সাথে। পরে আল নুসরাহ ফ্রন্টের সাথে মতবিরোধকে কেন্দ্র করে তারা যোগ দেয় আইএসআইএল-এর সাথে। যা এখন আইএস। এখন বিশ্বের ৮০টি দেশের নানা ভাষার নানা গোত্রের নানা বর্ণের আর নানা মনের মানুষ এসে মিলেছে ইরাক-সিরিয়ার এই নৈরাজ্যে। তাদের উদ্দেশ্য এক। ইসলামি খিলাফত প্রতিষ্ঠা। এই পরিচ্ছেদে আমরা বুঝতে চাইব বিভিন্ন দেশের এই যোদ্ধাদের মানসিক পারিবারিক সামাজিক এবং রাজনৈতিক প্রেক্ষিত।

'দয়া করে ফিরে এসো ইয়ুশরা। আমরা তোমাকে খুব মিস করছি। তোমার কোনো ভয় নেই। নিরাপদে ফিরে এসো সোনা।' ২০১৪-এর সেপ্টেম্বরের শেষ সপ্তায় লন্ডনের ব্রিস্টলে কান্না জড়িত কণ্ঠে দ্যা টেলিগ্রাফকে কথাগুলো বলছিলেন হুসেইন দম্পতি। তাদের আদরের মেয়ে ১৫ বছরের স্কুল ছাত্রী ইয়ুশরা হুসেইনের কোনো হদিস পাওয়া যাচ্ছে না। তদন্ত শেষে ব্রিস্টল পুলিশ যা শোনালো তাতে ইয়ুশরা'র বাবা মায়ের ভিরমি খাবার জোগাড়। তাদের বুদ্ধিমতি মেয়েটি, যে কিনা বড় হয়ে ডেন্টিস্ট হবার স্বপ্ন দেখছিল, সেই কিশোরী আইএস-এ যোগ দিতে বাড়ি ছেড়ে পালিয়েছে। এই খবরে বিস্মিত ইয়ুশরা'র বাবা মা। যে জঙ্গিবাদের হাত থেকে মুক্তি পেতে উন্নত জীবনের আশায় তারা সোমালিয়া ছেড়ে লন্ডনে এসে থিতু হলেন, সেই জঙ্গিবাদ এবার তাদের ব্রিস্টলের বেডরুমে এসে হানা দিল। একটি বারের জন্যেও হুসেইন দম্পতি টের পাননি তাদের মেয়ে কখন কিভাবে কার ইন্ধনে জঙ্গিদের এমন ভয়ঙ্কর জালে জড়িয়ে পড়ল। যে মেয়ে বরাবর ক্লাশে এ গ্রেড পেয়ে আসছে। চটপটে ও বুদ্ধিমতি সেই ইয়ুশরা কেন এমন নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে পা বাড়াল তার কোনো হিসেব কেউ মেলাতে পারছে না। তবে ব্রিস্টল পুলিশের তদন্ত বলছে, ইয়ুশরা একা নয়। লন্ডনের ১৭ বছর বয়সি আরেক তরুণের সাথে ইস্তাম্বুলের উদ্দেশ্যে তারা হিথ্রো ছেড়েছে। যাদের চূড়ান্ত গন্তব্য সিরিয়া।

BanglaBook.org

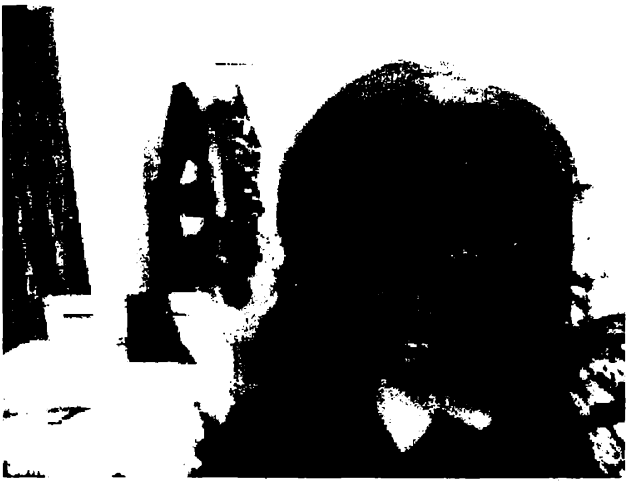

ব্রিস্টলের ১৫ বছরের কিশোরী ইয়ুশরা

সেই নব্বই দশক থেকে জঙ্গিবাদের সাথে লড়ছে সোমালিয়ার মানুষ। আল শাবাব জঙ্গিদের উত্থানের পর দেশটি এখনও বিশ্বের ব্যর্থ রাষ্ট্রের অন্যতম উদাহরণ। জঙ্গিদের দাপটে টিকতে না পেরে সোমালি সরকারকে পর্যন্ত প্রতিবেশী দেশে আশ্রয় নিতে হয়েছে। সরকারেরই যখন এই অবস্থা নাগরিকদের কথা তখন বলাই বাহুল্য। নব্বইয়ের দশক থেকে জঙ্গিদের অত্যাচারে অতিষ্ট সোমালিয়ার অধিকাংশ মানুষ মাতৃভূমি ছেড়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে পাড়ি জমিয়েছে। তাদেরই একটি বড় অংশ এখন বৃটেনের নাগরিক। নিতান্ত বেঁচে থাকার আশা নিয়ে যেসব সোমালি পরিবার লন্ডনে এসেছিল, তাদের পরবর্তী প্রজন্ম এখন উচ্চশিক্ষিত হয়ে বৃটিশ সমাজের মূলধারায় প্রতিষ্ঠিত হবার স্বপ্ন দেখছে। কিন্তু ইয়ুশরার মতো নাবালিকারা যাদের জীবন এখনও শুরুই হয়নি তাদের নিয়ে ভয়ানক শঙ্কায় পড়েছে লন্ডনের মুসলিম পরিবারগুলো। কেবল পরিবার নয় শঙ্কিত ব্রিটিশ সরকারও। কিংবা শুধু বৃটিশ সরকার নয় আতঙ্কে পুরো ইউরোপ।

ব্রিস্টলের স্কুল ছাত্রী ইয়ুশরা হুসেইন সম্ভবত সবশেষ ব্রিটিশ নাগরিক (অক্টোবর ২০১৪ পর্যন্ত) যিনি আইএস জঙ্গিদের ডাকে সাড়া দিয়ে ঘর ছাড়লেন। কেবল ইয়ুশরাই নয়, ম্যানচেষ্টারের ১৬ বছর বয়সি জমজ বোন জাহারা আর সাহারা, গ্লাসগোর বিশ বছর বয়সি আকসা মাহমুদ, যে কিনা ডাক্তার হতে চেয়েছিল। তাদের সবাই এখন আইএস-এর নারী ব্রিগেডের সদস্য। রাক্কার কথিত খিলাফত রাষ্ট্রে তাদের অবস্থান। সেখানকার শরিয়া আইন অনুযায়ী এই নাবালিকাদের প্রত্যেকেরই একটি করে জিহাদি স্বামী

BanglaBook.org

জুটেছে। আইএস জঙ্গিদের দলে এখন এমন ব্রিটিশ নারী জিহাদির সংখ্যা অন্তত ষাট। যাদের বেশিরভাগেরই বয়স ১৮ থেকে ২৪।

'From Coldplay to jihad' ২০ বছর বয়সি আকসা মাহমুদের আইএস-এর সাথে যোগ দেওয়ার এই খবর যত না ইউরোপে ঝড় তুলেছিল, তার চাইতেও বেশি আতঙ্ক ছড়িয়েছে, জিহাদের পক্ষে তার প্রতিদিনের টুইটার বার্তা। আইএস-এ যোগ দেওয়ার পর থেকে প্রায় প্রতিদিন টুইটারে ডায়রি লিখে আসছে আকসা। যা এরই মধ্যে বিশ্বব্যাপী আইএস-এর ডায়রি নামে পরিচিতি পেয়েছে। আকসার ডায়রি'র সেই আত্মকথনকে রীতিমত classic case of conversion to extremism বলে আখ্যায়িত করেছেন পশ্চিমা দুনিয়ার সমাজ তাত্ত্বিকরা।

আকসা মাহমুদ, বাবা মা ও একমাত্র বোনের সঙ্গে আকসা

স্কটল্যান্ডের পাকিস্তানি বংশোদ্ভুত একটি মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান আকসা মাহমুদ। আর দশজন অভিবাসি বৃটিশ তরুণীর মতোই পরিবারের বাইরে

ব্রিটিশ সংস্কৃতি আর ঘরে মুসলিম সংস্কৃতির মিশেলের সাথে ভালোই খাপ খাইয়ে নিয়েছিল আকসা। পছন্দ ছিল স্কটিশ ব্যান্ড কোল্ডপ্লে'র গান—হ্যারি পটারের বই-সিনেমা, সেই সঙ্গে ক্রিকেট। ক্রিকেট ভক্ত বাবা মুজাফ্ফর মাহমুদের সাথে ভারত-পাকিস্তানের খেলা নিয়ে বাজি ধরা কিংবা রাত জেগে খেলা দেখা। ঝোঁক ছিল পড়াশুনার প্রতিও। স্বপ্ন ছিল ফার্মেসিতে ক্যারিয়ার গড়ার। অর্থাৎ অস্বাভাবিক কোনো লক্ষণই তার মধ্যে ছিল না। সেই মেয়ে ২০১৩-এর নভেম্বরে উধাও হয়ে গেল। কয়েকদিন পর তুরস্ক থেকে ফোনে আকসা তার মাকে জানাল, কেয়ামতের দিন দেখা হবে। আর তার বদৌলতে তার বাবা মাও একদিন জান্নাতবাসি হবেন। কিছুদিন পর আকসা'র পরিবার জানতে পারেন তাদের মেয়ে সিরিয়ার আলেপ্পো হয়ে রাক্কায় পৌঁছেছে। বাবা মায়ের দেওয়া নাম পাল্টে উম্মে লেইত নাম ধারণ করেছে আকসা। জিহাদের পক্ষে প্রথম কাজ হিসেবে একজন সিরিয় জিহাদিকে বিয়ে করেছে। আইএস-এর কথিত খিলাফত রাষ্ট্রে আকসার কাজ হলো, জিহাদিদের জন্যে রান্না করা আর তাদের বাচ্চা কাচ্চাদের পাহারা দেওয়া।

জুন থেকে নিজের টুইটার একাউন্টে আইএস-এর ডায়রি পোস্ট করার মধ্যদিয়ে বিশ্বব্যাপী 'তরুণ জিহাদি' এবং 'উগ্র আইএস'-এর প্রতীক হয়ে উঠে আকসা। সিরিয়ার রাক্কা থেকে তার পোস্ট করা প্রথম টুইটটি ছিল 'যদি তুমি জিহাদের রণভূমিতে যোগ দিতে না পারো, তাহলে রণাঙ্গনকেই তোমার নিজের কাছে নিয়ে যাও'। অর্থাৎ 'তুমি যদি গ্লাসগোতে থাকো, তাহলে সেই গ্লাসগোকেই রণাঙ্গন বানাও'। এমন প্রায় প্রতিটি বার্তায় পশ্চিমা বিশ্ব এবং অমুসলিমদের ওপর হামলার পক্ষে নিজের তথা আইএস-এর যুক্তি তুলে ধরেছে আকসা। ২০১২ সালে যুক্তরাষ্ট্রের বোস্টন বোমা হামলা একই বছর লন্ডনের উলউইচের একটি সেনাক্যাম্পে দুই সেনাকে হত্যা, ২০০৯ সালে যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাসের ফোর্ট হুডের সেনা ছাউনিতে গুলি করে ১৩ জন মেরিন সেনাকে হত্যা; এই সবগুলো হত্যাকাণ্ডকে বীরের কাজ এবং প্রতিটি মুসলমানের এমন বীরত্ব দেখানো উচিত বলে সাফাই গেয়েছে আকসা।

স্বদেশি আইএস জঙ্গিদের ঠেকাতে প্রধানমন্ত্রী ডেভিড ক্যামেরন ব্রিটেনের সন্ত্রাসবিরোধী আইন সংশোধনের ঘোষণা দেবার পর তার সমালোচনা করেও বার্তা দিয়েছে আকসা:

'This is a war against Islam and it is know (sic) that either "you're with them or with us". So pick a side. My dear brothers and sisters who are stuck in the west and restrained due to the kufr (infidel) Governments know that indeed the

BanglaBook.org

help of Allah is always near, have Sabr (patience) and know that you will never be tested beyond your ability. And to those who are able and can still make your way, please ittaqillah (fear Allah) and don't delay anymore, hasten hasten hasten to our lands and live in Izzah (honour) before it is made difficult for you. Know that these trialing times and do not miss out on any of the ajr (rewards).'

১১ সেপ্টেম্বর অর্থাৎ যুক্তরাষ্ট্রে নাইন-ইলাভেনে হামলার বার্ষিকীর দিন আকসা শেষবারের মতো টুইট করেছে। এদিন সে লিখেছে, 'I will only come back to Britain to raise the black flag' এরপর থেকে তার টুইটার একাউন্টটি অকার্যকর রয়েছে। আকসার এসব বার্তার কথা জেনে বিস্মিত তার বাবা মা। ব্রিটেনের বিভিন্ন গণমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তার বাবা মুজাফফর মাহমুদ বলেছেন, তিনি এখনও ধারণা করতে পারছেন না তার মেয়ে কি করে অমন ভয়ঙ্কর পথে জড়িয়ে পড়ল। তাদের অনুমান অনলাইনের মাধ্যমেই আইএস জঙ্গিদের সাথে তার যোগাযোগ হয়েছে। এবং জঙ্গিরা ভালোভাবেই তাদের মেয়ের ব্রেইন ওয়াশ করেছে। যে কারণে কিছু সন্দেহ করার মতো সুযোগটাও তারা পাননি। কান্নাজড়িত কণ্ঠে আকসার বাবা বলেছেন, তারপরও তারা মেয়েকে ভালোবাসেন। এখনও তাকে ফিরিয়ে আনার কোনো উপায় থাকলে, তার পরিবার আকসাকে আবারো ফিরিয়ে নেবেন।

BanglaBook.org

সিরিয়ায় নিহত ব্রিটিশ বংশোদ্ভুত বাংলাদেশি ইফতেখার জামান

আকসা বা ইয়ুশরার মতো অল্পবয়স্ক না হলেও বাবা মাকে ফাঁকি দিয়েছিল ইফতেখার জামানও। পোর্টস্মাউথের বাংলাদেশি বংশোদ্ভুত এই ব্রিটিশ যুবক তুরস্কে ইসলামি স্টাডিজে পড়তে যাবার কথা বলে বাবা মায়ের সাথে প্রতারণা

করেছিলেন। ইফতেখার জামানের আদি নিবাস সিলেটের হবিগঞ্জে। একা নয় সাথে নিয়ে যান আরও পাঁচ বন্ধুকে। অনলাইনে আইএস-এর একজন এজেন্টের সাথে পরিচয় এবং পূর্ব লন্ডনের কোনো একটি মসজিদে কয়েক দফা বৈঠক শেষে ২০১৩ সালের জুন-জুলাইয়ে লন্ডন ছেড়ে তুরস্ক হয়ে সিরিয়ায় পৌঁছান ইফতেখার। সিরিয়া থেকে স্কাইপে বিবিসির জনপ্রিয় অনুষ্ঠান নিউজ নাইটকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে জিহাদের পক্ষে যুক্তি তুলে ধরে ইফতেখার বলেছিলেন, 'আমরা আল্লাহর আইন কায়েমে কাজ করছি। আর সেই জন্য মৃত্যুকেও ভয় করি না'। কিন্তু খুব বেশি দিন জিহাদের জন্য কাজ করার ভাগ্য হয়নি ইফতেখারের। একই বছরের ডিসেম্বরে সিরিয়ার সরকারি বাহিনীর সাথে লড়াইয়ে প্রাণ হারান ইফতেখার। এই ঘটনায় আরও ৭০ জন আইএস জঙ্গির সাথে দুই ব্রিটিশ বাংলাদেশি তরুণের মৃত্যু হয়। যাদের আরেকজন হামিদুর রহমান। যতদূর জানা যায় তিনিও পোর্টস্মাউথের বাসিন্দা।

তবে ব্যতিক্রম হলো, ইফতেখারের এই মৃত্যুকে আল্লাহর পথে শহীদ বলেই বিশ্বাস করেন তার স্বজনরা। এমনকি গণমাধ্যমে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ইফতেখারের দুই ভাই সরাসরিই বলেছেন, আইএস জঙ্গি দলে বড় ভাইয়ের অংশগ্রহণের ঘটনায় তারা মোটেই শঙ্কিত বা অনুতপ্ত নন। বরং তার জন্য গৌরববোধ করছেন। কারণ তিনি শহীদ হয়েছেন। আইএস জঙ্গিদের পক্ষে এমন 'অকপট' পরিবার এই মুহূর্তে অন্তত ব্রিটিশ প্রশাসনের কাছে কাম্য নয়। এ ধরনের পরিবারকে দেশের নিরাপত্তার জন্য হুমকি বলেই মনে করে ব্রিটিশ সরকার। বিবিসিকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ইফতেখারের সেই স্পষ্ট স্বীকারোক্তির পর থেকেই লন্ডন পুলিশের নজরে ছিল পরিবারটি। শেষ পর্যন্ত ২০১৪ সালের অক্টোবরে তথ্যগোপন ও সন্ত্রাসবিরোধী আইনে পোর্টস্মাউথের বাড়িতে অভিযান চালিয়ে ইফতেখারের ভাইবোনসহ ৬ জনকে গ্রেফতার করে পুলিশ।

ইফতেখারের মতো এমন অন্তত পাঁচশো ব্রিটিশ তরুণ আইএস জঙ্গি দলে নাম লিখিয়েছে। দলছুট বিভিন্ন জঙ্গিরা গণমাধ্যমে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বলেছে আইএস-এর প্রায় এক বছর বয়সি কথিত খেলাফত রাষ্ট্রে সবচেয়ে হিংস্র আর নির্মম হিসেবে এরই মধ্যে নাম কুড়িয়েছে এই ব্রিটিশ তরুণরা। তুচ্ছ কারণে সিরিয়ার সাধারণ মানুষকে হত্যা ও ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করা, বন্দি কুর্দী নারীদের ওপর নির্যাতন-যৌন সহিংসতা, অমুসলিম বিদেশিদের হত্যা, অস্ত্রের মুখে ধর্মান্তর বা তওবা করতে বাধ্য করা, কোনো কিছুতেই কম যান না এই ব্রিটিশ তরুণরা।

দৃশ্যটি কল্পনা করুণ। সিরিয়ার মরুময় কোনো এক প্রান্তরে হলুদ পোষাক পরা (আইএস-এর খিলাফত রাষ্ট্রে মৃত্যুদ-প্রাপ্ত কয়েদির পোষাক) মার্কিন

BanglaBook.org

সাংবাদিক জেমস ফলি কিংবা স্টিভেন সটলফ অথবা ব্রিটিশ ত্রাণকর্মী ডেভিড হাইনেস বা অ্যালান হেনিং। হাত পা বাঁধা। হাটু মুড়ে মৃত্যুর অপেক্ষায়। মুখোশধারী জঙ্গি গলায় ছুরি ধরে পাঠ করছে মৃত্যু পরোয়ানা। যাতে বলা হচ্ছে, 'তুমি কাফের। তোমার দেশ যুক্তরাষ্ট্র অথবা যুক্তরাজ্য কিংবা পশ্চিমা কোনো দেশ—কাফেরের রাষ্ট্র। তুমি, তোমরা মুসলমানের শত্রু, আল্লাহর শত্রু নবী মুহাম্মদ ও তার উম্মতের শত্রু। আর এটাই তোমার অপরাধ। এবং এই অপরাধের একমাত্র শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। যা এখনই কার্যকর করা হচ্ছে'।

মার্কিন সাংবাদিক জেমস ফলি, স্টিভেন সটলফ এবং ব্রিটিশ ত্রাণকর্মী ডেভিড হাইনেস ও অ্যালান হেনিং এর সম্ভাব্য হত্যাকারি জিহাদি জন

ব্যাস ছুরি চালিয়ে মুহূর্তেই ধড় থেকে মাথা আলাদা করে কাটা মাথাটি নিহতের বুকের ওপর রেখে দেওয়া হলো। বর্বর বিভৎস সেই ছবি প্রকাশের যোগ্য নয়। কোনো সুস্থ মানুষের পক্ষে অমন ছবি দেখাও সম্ভব নয়। তারপরও ধর্মের নামে, ইসলামের নামে ওমন বর্বরতার পক্ষেই অনলাইনে সাফাই গাইছে আইএস জঙ্গিরা। চূড়ান্ত মাদকাসক্ত কোনো ব্যক্তি যেমন মনোবিজ্ঞানী বা ডাক্তারদের কোনো যুক্তি শুনতে চায় না। নিজের স্বপক্ষে মনগড়া যুক্তি দাঁড় করায়। আইএস জঙ্গিদের আচরণটাও সেই রকম। জিহাদের জন্য এবং শিয়া-

কুর্দী আর অমুসলিমদের হত্যার পক্ষে বন্দি নারীদের যৌনদাসি হিসেবে ব্যবহারের পক্ষে, নারীদের ঘরের কোণে বন্দি করে রাখার পক্ষে তাঁরা নিজেদের তৈরি মনগড়া যুক্তি হাজির করছে। আর এ কাজটি করতে গিয়ে তারা কোরান হাদিসের মূল দর্শনকে পাশ কাটিয়ে খণ্ডিত ব্যাখ্যার আশ্রয় নিচ্ছে। ব্যাপারটা যেন এমন যে দুনিয়ার সকল আলেমই ভুল। কেবল তাঁরা এবং আর তাঁদের তৈরি ব্যাখ্যাই সঠিক।

যা বলছিলাম, আগস্ট ও সেপ্টেম্বর মাসে দুই মার্কিন সাংবাদিক জেমস ফলি ও স্টিভেন সটলফ এবং বৃটিশ ত্রাণকর্মী ডেভিড হাইনেস ও অ্যালান হেনিং-এর হত্যাকারি যে মুখোশধারি যুবক, তিনিও ব্রিটিশ নাগরিক। দীর্ঘ তদন্ত শেষে ব্রিটিশ গোয়েন্দা সংস্থা এমআই সিক্স এবং মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা এফবিআইএ বলছে তারা অনেকটাই নিশ্চিত হত্যাকারি ওই যুবকের নাম জন। বিশ্বব্যাপী যিনি এরই মধ্যে জিহাদি জন নামে পরিচিতি পেয়েছেন। অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি এই জন ছিলেন লন্ডনের একটি ব্যান্ড দলের শিল্পী। যিনি র‍্যাপার জন নামেও পরিচিত। অনলাইনে খুঁজলে র‍্যাপ সংগীতের 'ইয়ো ইয়ো' স্টাইলের অসংখ্য ছবি পাওয়া যায় জনের। ব্যান্ড দলটির অন্য সদস্যদের কাছে সে পরিচিত জর্জ এবং রিঙ্গো নামে। আইএস-এর সহযোদ্ধাদের কাছে তার পরিচিতি বিটলস নামে। কারণ নিজেকে বিখ্যাত ব্রিটিশ ব্যান্ডদল বিটলসের অন্যতম শিল্পী জন লেননের নামে পরিচয় দিতে পছন্দ করেন জন। ব্যান্ডদল বিটলস-এর মতো তারাও চার সদস্যের একটি দল। যারা কিনা ২০১৩ সালের কোনো এক সময় সিরিয়ায় পাড়ি জমায়।

তবে কালো মুখোশে মুখ ঢেকেও পরিচয় আড়াল করতে পারেননি জন। তার সঙ্গে যাওয়া তিন বন্ধুর লন্ডনের পরিবারগুলোর ওপর ফাঁদ পেতে নজরদারি চালিয়ে জনের আসল পরিচয় সম্পর্কে নিশ্চিত হন বৃটিশ গোয়েন্দারা। এছাড়া শিরশ্ছেদের আগে মুখোশের আড়ালে জনের মুখের যে অংশটুকু দেখা গেছে, সেই সূত্র ধরে তার চেহারার স্কেচ এঁকে তার পরিচয় সম্পর্কে নিশ্চিত হয়েছে মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা এফবিআই। কেবল তাই নয়। অনলাইনে আইএস জঙ্গিদের পোস্ট করা কয়েক হাজার ভিডিও, বিশ্লেষণ করে জিহাদি জনের চালানো আরও কয়েকটি হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারেও নিশ্চিত হয়েছে গোয়েন্দারা। যার একটিতে দেখা গেছে আসাদ অনুসারি আহত এক সেনাকে মাটিতে পড়ে থাকা অবস্থায় পিস্তল দিয়ে মাথায় গুলি করে হত্যা করছে জন। দুই মার্কিন সাংবাদিককে হত্যার দায়ে এরইমধ্যে জিহাদি জনের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী ওয়ারেন্ট জারি করেছে যুক্তরাষ্ট্র। তাকে ধরিয়ে দিতে পারলে এক কোটি মার্কিন ডলার পুরস্কার ঘোষণা করেছে এফিবিআই। আর যে কোনো মূল্যে তাকে আটক করে বিচারের মুখোমুখি করার ঘোষণা দিয়েছে ব্রিটেন।

BanglaBook.org

সিআইএর মুখপাত্র রায়ান ত্রাপানি গণমাধ্যমে দেওয়া বিবৃতিতে বলেছেন, ২০১৪ সালের মে থেকে আগস্ট পর্যন্ত সব উৎস থেকে পাওয়া তথ্য পর্যালোচনার পর সিআইএ ধারণা করছে, আইএস-এর মোট যোদ্ধার সংখ্যা অন্তত ত্রিশ হাজার। যাদের ১৫ হাজারেরও বেশি বিদেশি নাগরিক। এই বিদেশি যোদ্ধাদের মধ্যে ইউরোপের যোদ্ধারাই আইএস-এর লড়াইকে ক্রমশ: বেগবান করে তুলেছে। একের পর এক ইরাকি শহর দখলের মধ্য দিয়ে তারা আইএস-এর কথিত খিলাফত রাষ্ট্রের সীমানা বাড়িয়েছে। শোনা যায় আত্মস্বীকৃত খলিফা বাগদাদিও তার দলের ইউরোপের সদস্যদের বিশেষ খাতির করেন। ইউরোপের শিক্ষিত আর প্রযুক্তিনির্ভর তরুণ জিহাদিরা আইএস নামের নতুন শতকের জঙ্গি তৎপরতায় যুক্ত করেছে নতুন মাত্রা। যা জঙ্গি গোষ্ঠিকে নানাভাবে উদ্দীপ্ত করে চলেছে। সেই সঙ্গে বাদবাকি বিশ্ব ও বিশ্ব রাজনীতিতে তৈরি করেছে নতুন উদ্বেগ–নতুন মেরুকরুণ।

তবে আইএস এ যোগ দেওয়া স্বদেশি নাগরিকদের ব্যাপারে ব্রিটিশ সরকারের কঠোর আইন, (যে আইনে পাসপোর্ট বাজেয়াপ্ত বা নাগরিকত্ব বাতিল, সম্পদ জব্দ, দেশে ফিরে এলে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের মতো কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার বিধান রাখা হয়েছে) ইন্টারনেটসহ সামাজিক যোগাযোগ ওয়েবসাইট এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের ওপর গোয়েন্দা নজরদারি বাড়ানো এবং কমিউনিটিতে এক ঘরে হবার ভয়ে ব্রিটিশ নাগরিকদের আইএসপন্থী হবার প্রবণতা কিছুটা হলেও কমেছে। বিভিন্ন জরিপ অন্তত সেটাই প্রমাণ করে।

BanglaBook.org

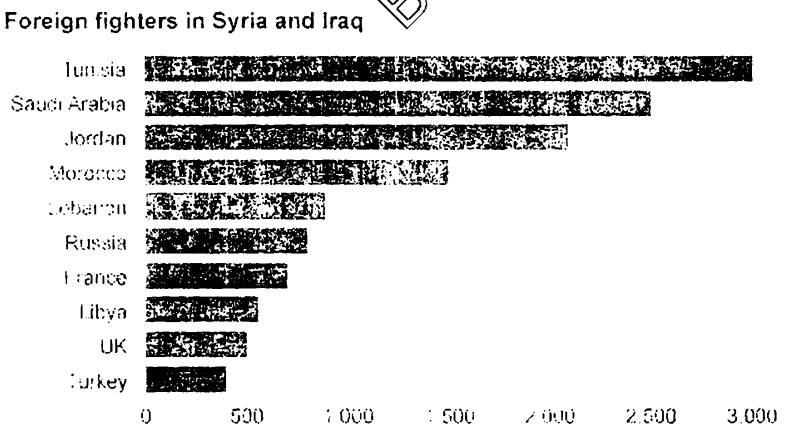

আইএস জঙ্গি দলে দেশভিত্তিক অংশগ্রহণ (সূত্র: বিবিসি/আগস্ট ২০১৪)

সেই সঙ্গে মুসলিম তরুণদের আইএস-এর পেতে রাখা ফাঁদ থেকে বাঁচাতে নানারকম উদ্যোগ নিয়েছেন মুসলিম কমিউনিটির নেতারা। তারই অংশ হিসেবে আগস্টে গণমাধ্যমে একটি ফতোয়া প্রকাশ করেছেন বৃটেনের একশো জন মুসলিম স্কলার। তারা বলেছেন, আইএস'র এসব জঙ্গি কার্যক্রম কোনোভাবেই আল্লাহ রাসূলের পথ নয় এবং এসব বর্বরতা ইসলামের দৃষ্টিতে চূড়ান্তভাবে হারাম। তাদের এই ফতোয়াটি আর্টিকেল আকারে প্রকাশ করে বৃটেনের দ্যা ডেইলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট। সচিত্র রিপোর্ট প্রকাশ করে বিবিসি ও স্কাই নিউজ।

ফ্রান্সের হাই স্কুলের ছাত্রী ১৭ বছরের শাহরা মেহেন্নি। দক্ষিণাঞ্চলীয় একটি শহরের বাসিন্দা। বাবা কামেল আলী মেহেন্নি আর মা স্যাভেরিন মেহেন্নি। পরিবারটি কিন্তু মুসলিম নয় ইহুদি। অক্টোবরে বিশ্ব গণমাধ্যমের শিরোনাম হয়ে উঠা খবরটি ছিল, 'জিউস গার্ল ইন আইএসআইএস।' সত্যি তাই। ইহুদি কিশোরী শাহরার জঙ্গি হয়ে ওঠার ঘটনা যেন গল্পকেও হার মানায়। ২০১৩ সালের গোড়া থেকেই মেয়ের কথাবার্তা চাল-চলনে কিছুটা পরিবর্তনের আভাস পান বাবা মা। স্কুলের পরও সে দীর্ঘসময় বাইরে কাটাত। ব্রিটেন থেকে ফ্রান্সে আসা কোনো এক মুসলিম নারীর সাথে বন্ধুত্ব হয়েছে। সেই নারীর সাথে দেখা করতে প্রায়ই ট্রেনে চেপে প্যারিস চলে যেত। সেই নারী তাকে বোরখা পরা শিখিয়েছে। বাড়িতেও মাঝে মাঝে বোরখা পরে চলার প্র্যাকটিস করত শাহরা। সেই সঙ্গে নিজের ঘরে কম্পিউটার নিয়ে রাতদিন পড়ে থাকত। পড়াশুনায় বরাবর ভালো ছাত্রী শাহরা পরীক্ষায় বাজে রেজাল্ট করার পর ঘটনা আঁচ করেন তার বাবা মা। মেয়েকে নানাভাবে বোঝানোর চেষ্টা করেন। এমনকি সোশাল ওয়েলফেয়ারের কাউন্সিলরের কাছেও নিয়ে গেছেন। কিন্তু না। কিছুতেই ভয়ঙ্কর ওই পথ মেয়েকে ফেরানো গেল না। ১০ মার্চ সকালে বান্ধবী নোরার বাসায় যাবার কথা বলে শেষবারের মতো বাড়ি ছাড়ল শাহরা। তার বাবার সন্দেহ হওয়ায় তিনি নিজে মেয়েকে ট্রেনে তুলে দিয়ে এলেন। বিকেলে মায়ের সাথে ফোনে কথা বলার সময়ও বলছিল নোরার বাসায় আছি। ততক্ষণে শাহরা মার্সেই বিমানবন্দরে। একা নয় বান্ধবী নোরাও তার সাথে পাড়ি জমিয়েছে।

আইএস-এর বিদেশি যোদ্ধাদের দেশভিত্তিক অংশগ্রহণ

আলজেরিয়া	৪০০ জন	(সরকারি হিসাব, মে ২০১৪)
অস্ট্রেলিয়া	২৫০ জন	(বেসরকারি হিসাব, এপ্রিল ২০১৪)
বেলজিয়াম	২৫০ জন	(সরকারি হিসাব, এপ্রিল ২০১৪)
কানাডা	৩০ জন	(বেসরকারি হিসাব, ফেব্রুয়ারি ২০১৪)

BanglaBook.org

ডেনমার্ক	১০০ জন	(বেসরকারি হিসাব, মে ২০১৪)
ফিনল্যান্ড	৩০ জন	(বেসরকারি হিসাব, মার্চ ২০১৪)
ফ্রান্স	৭শ-১ হাজার	(সরকারি হিসাব, এপ্রিল ২০১৪)
জার্মানি	২৭০ জন	(বেসরকারি হিসাব, মার্চ ২০১৪)
ইন্দোনেশিয়া	৬০-১০০ জন	(সরকারি হিসাব, এপ্রিল ২০১৪)
আয়ারল্যান্ড	২৫-৩০ জন	(মিনিস্ট্রি অব জাস্টিস, ফেব্রুয়ারি ২০১৪)
কসোভো	১শ-২০০ জন	(বেসরকারি হিসাব, মার্চ ২০১৪)
কিরগিস্তান ৫০+ জন		(নিরাপত্তা বিভাগ, মে ২০১৩)
মরক্কো	১৫০০ জন	(সরকারি হিসাব, এপ্রিল ২০১৪)
নেদারল্যান্ড	১২০ জন	(মিনিস্ট্রি অব জাস্টিস, ফেব্রুয়ারি ২০১৪)
নরওয়ে	৪০-৫০ জন	(বেসরকারি হিসাব, ফেব্রুয়ারি ২০১৪)
রুশ ফেডারেশান	৮শ-১০০০ জন	(বেসরকারি হিসাব, এপ্রিল ২০১৪)
সৌদি আরব	২৫শ-৩০০০	(সরকারি হিসাব, মে ২০১৪)
স্পেন	৫০ জন	(সরকারি হিসাব, এপ্রিল ২০১৪)
সুইডেন	৩০ জন	(বেসরকারি হিসাব, এপ্রিল ২০১৩)
সুইজারল্যান্ড	১০ জন	(গোয়েন্দা সংস্থা, মে ২০১৩)
তিউনিশিয়া	৩০০০ জন	(সরকারি হিসাব, এপ্রিল ২০১৪)
তুরস্ক	৪শ-৫০০ জন	(সরকারি হিসাব, এপ্রিল ২০১৪)
যুক্তরাজ্য	৪শ-৫০০ জন	(সরকারি হিসাব, মার্চ ২০১৪)
যুক্তরাষ্ট্র	৭০-১০০ জন	(এফবিআই, মে ২০১৪)

(সূত্রঃ গবেষণা প্রতিবেদন, FOREIGN FIGHTERS IN SYRIA, BY: RICHARD BARRETT, SENIOR VICE PRESIDENT, THE SOUFAN GROUP, JUNE 2014)

BanglaBook.org

বিমানবন্দরের সিসি ক্যামেরায় পাওয়া ছবি আর সময় অন্তত সেটাই বলছে। নোরা আর শাহরা এখন সিরিয়ায়। ঘটনাটি নিয়ে গত মার্চেই তদন্তে নামে প্যারিস পুলিশ। শাহরার ফোন ইন্টারনেট ফেইসবুক আইডি আর কয়েক হাজার সিসি ক্যাম ফুটেজ বিশ্লেষণের পর পুলিশ বলছে, শাহরা ও নোরা আইএস জিহাদিদের ব্রেইনওয়াশের শিকার। শিশু কিশোরদের বিষয়ে খবর প্রকাশের ব্যাপারে ফ্রান্স সরকারের কঠোর আইনের কারণে গণমাধ্যমে শাহরার খবরটি দেরিতে আসে। উগ্রপন্থার কবল থেকে তরুণ তরুণীদের ফেরাতে ফ্রান্সে সম্প্রতি Center for the Prevention of Sectarian Abuses linked to Islam নামে একটি প্রতিষ্ঠান চালু হয়েছে। জিহাদি মনোভাবাপন্ন তরুণ তরুণীদের সমাজের মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনা এবং তাদের উগ্রপন্থায় জড়িত হবার কারণ ও প্রতিকার নিয়ে বহুমুখী গবেষণা করছে এই প্রতিষ্ঠানটি। সেই গবেষণার অংশ হিসেবে সিরিয়ায় থাকা স্বদেশি জঙ্গিদের সাথেও যোগাযোগ রক্ষা করছে প্রতিষ্ঠানটি। যোগাযোগ হয়েছে শাহরার সাথেও।

রেল স্টেশনের সিসি ক্যামেরা এবং সিরিয়ায় বোরখা পরা শাহরা

প্রতিষ্ঠানটির প্রতিষ্ঠাতা এবং নৃতাত্ত্বিক গবেষক দৌনিয়া বৌজার ফ্রান্সের লাঁ মঁদ পত্রিকাকে বলেছেন, শাহরা মেহেন্নি সিরিয়ায় গিয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণের পর তিউনিশিয়ার এক জিহাদিকে বিয়ে করেছে। ভবিষ্যতে প্যারিসে হামলা চালাবার স্বপ্ন দেখছে সে। এমনকি নিজের ইহুদী বাবা মা যদি ইসলাম গ্রহণে রাজি না হয় তাহলে তাদেরও হত্যা করতে পিছপা হবে না শাহারা। তার এমন বক্তব্যে হতবাক এই নৃতাত্ত্বিক গবেষক। তার মতে ফ্রান্সের যে সব নাগরিক আইএস এ যোগ দিয়েছে তাদের প্রায় সবাই অভিবাসি মুসলিম। প্রথম জীবনে যাদের বাবা মা ফ্রান্সে এসে পরিশ্রম করে এখন কিছুটা থিতু হয়েছেন। তাদেরই দ্বিতীয় প্রজন্ম এখন নানাভাবে ইন্টারনেটের চোরাগলিতে উগ্রপন্থার অন্ধকারে হারিয়ে যাচ্ছে। তার মতে নোরা আর শাহরা নিজেরাই উগ্রবাদিদের গভীর চক্রান্তের ফাঁদে পা দিয়েছে। সেই সঙ্গে কাজ করেছে অল্প বয়সের

BanglaBook.org

অ্যাডভেঞ্চার লোভি মানসিকতা। তবে অন্যদের বেলায় যেমনটা ঘটে অর্থাৎ নাইন-ইলাভেন হামলার পর থেকে ইউরোপ আমেরিকার সমাজে হেইট ক্রাইম এবং অবিশ্বাসের সংস্কৃতি মুসলিমদের মনে যে ঘৃণার জন্ম দেয়, নিজ দেশে নিজ সমাজে পরবাসি করে তোলে, সেই বাস্তবতা থেকে মুক্ত ছিল এই দুই কিশোরী। তাহলে কেন কিংবা কোন মানসিক অতৃপ্তি থেকে একটি ইহুদী কিশোরি আইএস-এর মতো 'শত্রু শিবিরে' যোগ দেবে, সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজে ড়োচ্ছেন এই গবেষক। সম্ভবত এ কারণেই ফ্রান্সের একজন প্রভাবশালী রাব্বি (ইহুদী ধর্মীয় নেতা) শাহরার ঘটনাটিকে বিশ্বাসই করতে চাইছেন না। তার মতে এটা ইহুদি বিরোধী ষড়যন্ত্র।

BanglaBook.org

আইএস জঙ্গিদের প্রতি যুক্তরাজ্য জার্মানি ও ফ্রান্সের মুসলিমদের সমর্থনের হার।

(সূত্র: ICM Research for the Russian news agency Rossiya Scgodnya.)

ফ্রান্সের মতো উদার আর একটি সৃজনশীল সমাজের গভীরে এমনি আরও কিছু অবিশ্বাস্য কাণ্ড ঘটেছে। আগস্টে গণমাধ্যমে প্রকাশিত এক জরিপের ফল আরেক দফা আতঙ্কিত করেছে ফরাসিদের। ফ্রান্সের ১ হাজার ৬ জন মুসলিম নাগরিকের ওপর চালানো এই জরিপ বলছে, ফরাসি মুসলিমদের প্রতি ৬ জনে ১ জন আইএস জঙ্গিদের কর্মকাণ্ডকে সমর্থন করছেন। ১৮ থেকে ২৪ বছর বয়সি যুবকদের শতকরা ২৭ জন আইএসকে সমর্থন করছে। ২৫ থেকে ৩৪ বছর বয়স্ক নাগরিকদের শতকরা ২২ জন আইএসকে সমর্থন করেন। আর ৩৫ থেকে ৪৪ বছর বয়স্কদের মধ্যে সমর্থনের এই হার ২০ শতাংশ। প্রসঙ্গত ফ্রান্সে মোট মুসলিমের সংখ্যা ৫০ লাখ। জার্মানি ও ব্রিটেনের ২ হাজার মানুষের মধ্যেও চালানো হয়েছে একই জরিপ। ব্রিটেনের মুসলিম তরুণদের শতকরা ৪ জন এবং জার্মানির শতকরা ৩ জন আইএসকে সমর্থন করছেন।

ফিরে আসি আইএস-এ যোগ দেওয়া ফ্রান্সের নাগরিকদের প্রসঙ্গে। ফ্রান্সের (অক্টোবর ২০১৪ পর্যন্ত) ৭ শো থেকে অন্তত ১ হাজার নাগরিক ইরাক অথবা সিরিয়ায় লড়ছে। যাদের মধ্যে জিহাদি নারীর সংখ্যা অন্তত একশো। সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ইরাক ও সিরিয়ার রণাঙ্গনে ৩৬ জন ফরাসি জঙ্গির মৃত্যু হয়েছে। আইএস-এর সাথে যোগ দেওয়া থেকে মোট ৩৫০ জনকে ঠেকাতে পেরেছে পুলিশ। এদের মধ্যে ছিল ৮০ জন শিশুসহ ১৫০ জন নারী। যাদের ৭০ জনকে দেশ ছাড়ার আগেই আটক করে প্যারিস পুলিশ।

কিন্তু জরিপের এই ফলাফল নিয়ে উদ্বিগ্ন ফ্রান্স সরকার। বিশেষ করে আইএস-এর প্রতি সমর্থন পোষণ করা এই নাগরিকরা নিজ দেশেই জিহাদি হয়ে যায় কিনা সেটাই উদ্বেগের কারণ। দেশ কিংবা দেশের মানুষের প্রতি যাদের কোনো দায়বদ্ধতা নেই, প্রেম নেই। ধর্মের মোড়কে যাদের মনে প্রাণে এই ঘৃণার বীজই পুঁতে দেওয়া হয়েছে যে, অমুসলিম মানেই কাফের, অমুসলিম কোনো দেশ মানেই কাফেরদের ভূখণ্ড। সেই কাফেরদের বোমা হামলা চালিয়ে কিংবা জবাই করে হত্যা করা মানেই জিহাদ। নিজ দেশের কোনো মুসলিম নাগরিক যখন তার স্বদেশি অমুসলিমদের সম্পর্কে এমন ধারণা পোষণ করে নিঃসন্দেহে তার চেয়ে উদ্বেগের আর কিছু নেই। তাই ব্রিটেনের আদলে ফ্রান্সও তাদের সন্ত্রাসবিরোধী আইনের কিছু ধারায় পরিবর্তন এনেছে। সম্ভাব্য জিহাদিদের নাগরিকত্ব বাতিল, সম্পদ জব্দ এবং বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ডের বিধান রাখা হয়েছে এই আইনে।

বেলজিয়ামের ১৯ বছরের তরুণ অ্যাথলেট ব্রায়ান ডি মুলার। হাস্যোজ্জ্বল এই তরুণটি ভালোবাসতো খেলাধুলা। ক্যাথলিক খ্রিস্টান পরিবারের সন্তান ব্রায়ান দুবছর আগে থেকে পাল্টে যেতে শুরু করে। একদিন বাড়ি এসে জানাল

BanglaBook.org

সে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে। এরপর থেকে সারাক্ষণই শুধু ধর্ম কর্ম নিয়ে পড়ে থাকত। আর বলত ইসলামের জন্য সে সবকিছু এমনকি নিজের প্রাণও বিসর্জন দিতে পারবে। আর সেটা করলেই অনন্তকাল বেহেশতের সুখ ভোগ করা যাবে। ব্রায়ানের উদ্বিগ্ন বাবা মা ছেলের মন পাল্টাতে বেলজিয়ামের অ্যান্টিরেপের বাড়ি পাল্টে একশো মাইল দূরে নতুন এক এলাকায় বাসা ভাড়া নিলেন। কিন্তু তাতেও কাজ হলো না। শেষ পর্যন্ত ২০১৪-এর জানুয়ারিতে বাড়ি ছাড়ে ব্রায়ান। যাবার আগে ১২ বছরের ছোট্ট বোনটিকে আদর করে বলেছে, তাকে সে খুব ভালোবাসে কিন্তু আর কখনও বোনের সাথে তার দেখা হবে না।

বেলজিয়ামের ১৯ বছরের তরুণ অ্যাথলেট ব্রায়ান ডি মুলার ওরফে আবু হানিফা

সেই ব্রায়ানও এখন সিরিয়ায়। তার নাম এখন আবু হানিফা। আইএস যোদ্ধাদের কাছে সে আবু কাশেম ব্রাজিলি নামেও পরিচিত। সিরিয়া পৌঁছেই আরেক জিহাদি তরুণীকে বিয়ে করেছে। রাক্কায় আইএস জঙ্গিদের খিলাফত

ঘোষণার দিন ট্যাংক বহর নিয়ে র‍্যালি করার সময় একটি ট্যাঙ্কের মাথায় আইএস যোদ্ধাদের সাথে ব্রায়ানকেও দেখা গেছে। বিভিন্ন সময় টুইটার ও ফেইসবুক বার্তায় ব্রায়ানকে বীরযোদ্ধা হিসেবে প্রশংসা করেছে তার সহযোদ্ধারা। কিন্তু কেন ব্রায়ানের এমন ভয়ঙ্কর পরিণতি। সে সম্পর্কে কোনো ধারণাই করতে পারছেন না তার বাবা। তারা শুধু এটুকুই জানিয়েছেন, শেষ দিকে ব্রায়ানকে দম দেওয়া রোবটের মতো মনে হত।

ব্রাসেলসের ১৮ বছরের কিশোরী নোরা একদিন হঠাৎই তার মাকে জানাল কাল থেকে সে আর স্কুলে যাবে না। স্কুল ছেড়ে সে বরং একটা ডিপ্লোমা ইন্সটিটিউটে ভর্তি হবে। এবং চাকরির জন্য নাম রেজিস্ট্রি করবে। প্রস্তাবটা পছন্দ না হলেও মেয়েকে বাধা দিলেন না তার মা সামিরা। এরপর সবকিছু ভালোই চলছিল। মে মাসে হঠাৎ উধাও হয়ে গেল নোরা। পরে জানা গেল নোরা এখন সিরিয়ায়। সেখানে যাবার পর যথারীতি এক জিহাদিকে বিয়ে করেছে এবং এক মাসের মধ্যে নোরার স্বামিটি মারা গেছে। এরপর থেকে আর মেয়ের কোনো খোঁজ পাচ্ছেন না সামিরা। তবে নোরা বাড়ি ছাড়ার পর থেকে তার পরিবারটি পুলিশের নজরদারিতে আছে। সামাজিকভাবে পদে পদে তারা হেয় হচ্ছেন। এটা নিশ্চিত যে নোরা ফিরে এলে তাকে জেলেই কাটাতে হবে। তার নাগরিকত্ব কেড়ে নেওয়া হবে। সকল রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক সুযোগ সুবিধা বাতিল হবে। তারপরও সামিরা রোজ অপেক্ষায় করেন তার মেয়েটা ফিরে আসুক। 'গণমাধ্যমে দেওয়া সাক্ষাৎকারে মধ্যবয়স্ক এই মা বলেছেন, 'তোমার জন্য চিন্তা করতে করতে আমরা পরিবারের প্রতিটি সদস্য অসুস্থ হয়ে পড়েছি। জানি না তুমি কোথায় আছ কেমন আছ। আমার জীবন তো সেই ২০ মে-তেই থেমে গেছে। তারপরও তোমার জন্য আমাদের এই অপেক্ষা কোনোদিন ফুরাবে না। ফিরে এসো নোরা।'

নোরার মতোই বেলজিয়ামের আরেক তরুণী Inez L . যার নাম এখন উম্ম মোহাম্মদ। কয়েক বছর আগেও সেলিব্রেটি মডেল হবার স্বপ্ন দেখত এই তরুণী। নিজের ফেইসবুক একাউন্টে খোলামেলা পোষাকে ছবি আপলোড করা আর বন্ধুদের লাইক-কমেন্টসে মেতে থাকা ছিল তার প্রিয় কাজ। সেই মেয়েটি হঠাৎই একদিন তার পোষাক পাল্টে নেকাব আর হিজাব পরা শুরু করল। ২০১৪ সালের গোড়ার দিকে বেলজিয়াম ছাড়ার আগে নিজের ফেইসবুক একাউন্টে সে লিখেছে, "standing with my legs in Belgium, but with my heart in Syria", মডেল হবার স্বপ্ন ছেড়ে গত মার্চে দুই বন্ধুকে সাথে নিয়ে সিরিয়ার উদ্দেশ্যে ব্রাসেলস ছেড়েছে মেয়েটি। তুরস্ক পৌঁছার পর ইস্তাম্বুল বিমানবন্দর থেকে ফেইসবুকে বোরখা পরা ছবিসহ

BanglaBook.org

একটি পোস্টে সে বলেছে, "I used to earn money by showing my body. And back then, lots of people predicted that I would achieve a lot. I have achieved a lot now by finding the way of islam and carrying the Holy Quran on my tongue and in my heart."

মডেল তারকা হতে চাওয়া বেলজিয় কিশোরী উম্ম মোহাম্মদ আইএস এ যোগ দেওয়ার আগে পরে। এবং বেলজিয় অভিনেত্রী রোজালিন

ব্রায়ান, নোরা আর উম্ম মোহাম্মদ একা নয়। সরকারি হিসাব বলছে বেলজিয়ামের বিভিন্ন বয়সি অন্তত আড়াইশ থেকে তিনশ সদস্য আইএস-এর

পক্ষে সিরিয়ায় যোগ দিয়েছে। কিন্তু কেন এই উচ্চাকাঙ্ক্ষি তরুণ তরুণীরা আইএস-এর মতো এমন উগ্রপন্থার সাথে নিজেদের জড়িত করছে, সেটা তদন্ত করতে গিয়ে বেশ কিছু কারণ আবিষ্কার করেছে বেলজিয় পুলিশ। অনলাইনে আইএস জঙ্গিদের উগ্র প্রচারণাতো আছেই। তাছাড়া পুলিশের সবরকম নজরদারির বাইরে বেলজিয়ামের মাটিতে বসেই উগ্রপন্থার পক্ষে কাজ করেছে দেশটির বেশকিছু ধর্মীয় সংস্থা। এমনি একটি সংস্থার নাম 'শরিয়া ফর বেলজিয়াম'। সিরিয়ায় বাশার আল আসাদ বাহিনীর হত্যাযজ্ঞ শুরুর পর থেকেই সংগঠনটি সিরিয়ার যুদ্ধে লড়াইয়ের জন্যে তরুণদের উদ্বুদ্ধ করতে থাকে। অনলাইন চ্যাটসহ নানাভাবে তরুণদের মধ্যে প্রচারণা চালায় সংগঠনটি। মাঠ পর্যায়েও কাজ করে তাদের সদস্যরা। এমনই এক নারী সদস্য রোজালিন এডেলিন গিরমান। ২১ বছর বয়স্ক এই তরুণী একসময় অভিনেত্রী ছিলেন। দুবছর আগে তিনি ধর্মান্তরিত হয়ে 'উম্ম উতমান' নাম গ্রহণ করেন। এরপর কয়েক দফা সিরিয়ায় যাওয়া আসা করেছেন রোজালিন। সবশেষ গত জুলাইয়ে হাকিমা এবং জেসি নামে ১৭ ও ১৮ বছর বয়সি দুই তরুণীকে নিয়ে সিরিয়া যাবার পথে বিমানবন্দরে পুলিশের হাতে ধরা পড়েন। তাকে আটকের মধ্য দিয়ে বেলজিয়ামে আইএস জঙ্গিদের অন্যতম নেটওয়ার্কটি ভেঙে দেয় পুলিশ। তবে তার আগেই রোজালিনের হাত ধরে অনিশ্চিত সিরিয়ায় পাড়ি জমিয়েছে ব্রায়ান, মোরা আর উম্ম মোহাম্মদের মতো তরুণ তরুণীরা। রোজালিন এডেলিনকে জিজ্ঞাসাবাদ করেই 'শরিয়া ফর বেলজিয়াম'-এর কর্মকাণ্ড নজরে আসে পুলিশের। সংগঠনটির কার্যালয়ে অভিযান চালিয়ে এর প্রধান নেতা ফুয়াদ বেকাচিমসহ ৮ জনকে আটক করে পুলিশ। সেপ্টেম্বরে সন্ত্রাসবিরোধী আইনে এডেলিনসহ তাদের বিচার কাজ শুরু হয়। বিভিন্ন সংস্থার হিসাব বলছে বেলজিয়ামের অন্তত ২৫০ জন সদস্য আইএস-এর পক্ষে লড়ছে। সিরিয়ার সরকারি বাহিনীর হামলায় এদের ২৯ জনের (জুন পর্যন্ত) মৃত্যু হয়েছে। খালিদ নামের ১৭ বছরের এক তরুণ ও তার ভাইও রয়েছে নিহতদের তালিকায়।

অস্ট্রিয়ার দুই বান্ধবী সামরা আর সাবিনার আইএস জঙ্গি দলে যোগ দেবার খবর ছোট্ট এই দেশটির হাজারো মানুষের হৃদয় ভেঙে দিয়েছিল। কালাশনিকভ রাইফেল হাতে সামারার অমন ছবি দেখে বিস্মিত হন তার বাবা মা। শেষ পর্যন্ত খবর আসে মোহভঙ্গ হয়েছে সামরা আর সাবিনার। তারা আর আইএস রাজ্যে থাকতে চান না। কিন্তু ততদিনে ওদের ফেরার পথ বন্ধ হয়ে গেছে। সামারা ও সাবিনার মতোই ১৬ এবং ১৪ বছর বয়সি আরও দুই কিশোরীকে বিমানবন্দর থেকে আটক করেছে ভিয়েনা পুলিশ। যাদের পরিবার

BanglaBook.org

ইরাক থেকে ভিয়েনায় আশ্রয় নিয়েছিল। বিভিন্ন সূত্রে পাওয়া তথ্য বলছে, অস্ট্রিয়ার মোট ১৩০ জন নাগরিক সিরিয়ায় আইএস জঙ্গিদের পক্ষে লড়ছে। এদের বেশিরভাগই অভিবাসি মুসলিম পরিবারের সন্তান।

কালাশনিকভ রাইফেল হাতে অস্ট্রিয়ার ১৬ বছরের কিশোরী সামারা

কসোভোর ৮ বছরের শিশু ইরিয়ন সেপ্টেম্বরে বিশ্ব গণমাধ্যমের শিরোমান হয়ে উঠে। না ছোট্ট শিশু ইরিয়ন স্বেচ্ছায় সিরিয়ায় জিহাদে যোগ দিতে যায়নি। বরং তার বাবা শিশুটিকে তার মায়ের বুক থেকে একরকম ছিনিয়ে নিয়ে প্রথমে ইরাক পরে সিরিয়ায় পাড়ি জমান। ইরিয়নের মার সাথে তার বাবা আরবিনের বনিবনা হচ্ছিল না। আরবিন মাঝে মাঝে ছেলেকে নিয়ে নিজের কাছে রাখতেন। ২০১৪ জুন থেকেই আরবিন স্ত্রীকে বলছিলেন তিনি ছেলেকে নিয়ে চলে যাবেন। স্ত্রী প্রাণভেরা বরাবরই এর প্রতিবাদ করেছে। একমাস ছেলেকে নিয়ে পাহাড়ে বেড়াতে যাবার কথা বলে রাজধানী প্রিস্টিনা থেকে আলবেনিয়া হয়ে ইরিয়নকে নিয়ে তুরস্কে পৌঁছান আরবিন। খবরটা জানার পর বুক ভেঙে যায় প্রাণভেরার। কারণ ছেলেকে জিহাদি বানিয়ে আল্লাহর জন্য উৎসর্গ করতে চেয়েছিল তার বাবা। তাই সিরিয়া কিংবা ইরাকের রক্তাক্ত পরিস্থিতিতে ইরিয়নের মতো একটা ছোট্ট শিশু যার বাবা কিনা আইএস জঙ্গি, সেই শিশুর ভাগ্যে কী ঘটতে পারে সেটা সহজেই অনুমেয়। সন্তানকে জীবিত ফিরে পাবার আশা প্রায় ছেড়েই দিয়েছিলেন প্রাণভেরা। এক সময় অসম্ভব এক লড়াইয়ে নামলেন এই দৃঢ়চেতা নারী। মাসের পর মাস তিনি সরকারি বেসরকারি নানা দপ্তরে সাহায্যের আশায় ঘুরে বেড়িয়েছেন । গণমাধ্যমের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য সংবাদ সম্মেলন করেছেন। মানবাধিকার সংগঠনের কাছে হাত পেতেছেন। ছেলেকে উদ্ধারে জনমত গড়তে ফেইসবুকে টুইটারে পেইজ খুলেছেন। এক

BanglaBook.org

সময় গণমাধ্যমের নজর কাড়েন প্রাণভেরা। তার সন্তান হারানোর এবং ধর্মউন্মাদ একজন বাবার কারণে একটি শিশুর প্রাণ বিপন্ন হতে চলার খবরটি সাড়া ফেলেছিল কসোভে সমাজে। টনক নড়ে সরকারেরও।

Hashim Thaçi

Erion comes back to his mother! Our service localised, found & organised return of Erion Abazi to Kosovo after father took him to Syria.

৫ মাস পর মায়ের কোলে ইরিয়ন এবং কসোভো প্রধানমন্ত্রী হাশিম থাচি'র টুইটার বার্তা

ইরিয়নকে সুস্থ অবস্থায় দেশে ফিরিয়ে আনতে দেশের গোয়েন্দা সংস্থাকে দায়িত্ব দিলেন প্রধানমন্ত্রী হাশিম থাচি। শেষ পর্যন্ত দীর্ঘ ৫ মাসের চেষ্টায় ৮ বছরের শিশু ইরিয়ন তার মায়ের কোলে ফিরে আসে। সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে, কসোভো প্রধানমন্ত্রী হাশিম থাচি শুধু এটুকুই বলেছেন, 'তুরস্কের গোয়েন্দা সংস্থার সাহায্যে কসোভোর গোয়েন্দারা ইরিয়নকে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছেন। তবে এই অভিযান ছিল অত্যন্ত জটিল আর পদে পদে বিপদসংকুল।'

BanglaBook.org

ব্লেরিম হেটা আইএস-এ যোগ দেওয়ার আগে ও পরে

ইরাক ও সিরিয়ায় যুদ্ধফেরত স্বদেশি দুই আইএস জিহাদিকে আটক করেছে কসোভো পুলিশ

ইরিয়নের বাবা আরবিনের মতো কসোভোর এমন আরও অন্তত দুশো নাগরিক এখন সিরিয়ার বিপদসংকুল রণাঙ্গনে লড়ছে। এদেরই একজন ২৪ বছরের যুবক ব্লেরিম হেটা। একমাত্র ছোট ভাইটির ছবির দিকে তাকিয়ে ভেজা কণ্ঠে তার বড় বোন এরিয়েটা বলছিলেন, 'দেখুন ওর চোখ দুটি কেমন শান্ত আর নিষ্পাপ।' ওদের মধ্যবিত্ত পরিবারে টানাটানি হয়তো ছিল, কিন্তু সুখেরও কোনো অভাব ছিল না। সেই সুখি পরিবারের সন্তান ব্লেরিমের বদলে যাওয়ার শুরুটা ২০১৩ সালে। সিরিয়ায় তখন তুমুল লড়াই। প্রতিদিন মানুষ মারা যাচ্ছে। এই সময় বয়সে বড় আরেক তরুণের সাথে ব্লেরিমের বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। প্রায় প্রতিদিন তারা একসঙ্গে নামাজ পড়তে যেত। সময় কাটাত। হঠাৎ করে ভাইটা দাড়ি রাখা শুরু করল। মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিমদের মতো পাজামা উচু করে পরতে শুরু করল। বাসায় ফিরেও ধর্মকর্ম নিয়েই পড়ে থাকত। ইউটিউবে ধর্মীয় বয়ান শুনত। ২০১৩ সালের আগস্টে কাউকে কিছু না বলে বাড়ি ছেড়েছিল ব্লেরিম। দুদিন পর বোনকে ফোন করে জানাল সে তুরস্কে আছে। এরপর যতবারই ফোন দিয়েছে তুরস্কের কথা বলেছে। একদিন পাল্টা ফোন করতে গিয়ে এরিয়েটা বুঝতে পারেন তুরস্ক নয় তার ভাই সিরিয়ায় আছে। কারণ ফোনের অটো

ম্যাসেজ বলেছে 'ওয়েলকাম টু সিরিয়া'। প্রথমবারের মতো সেদিনই এরিয়েটা বুঝতে পারেন তার ভাইটি জিহাদের পথে পা বাড়িয়েছে। এরপর প্রায়ই ভাইবোনের মধ্যে স্কাইপে যোগাযোগ হত। ব্লেরিম তার বোনকে বলেছে সে ধর্মের জন্য যুদ্ধ করছে। ইসলাম রক্ষা আর প্রতিষ্ঠার জন্য লড়ছে। আর এতে তার মৃত্যু হলে সেটা হবে পরম সৌভাগ্যের। কারণ সে বিনা হিসাবে বেহেশতে যাবে। আইএস জঙ্গিদের হাতে সিরিয়ার হাজারো মানুষের মৃত্যু নিয়ে ভাইয়ের সাথে তর্ক করেছেন এরিয়েটা। বলেছেন ধর্মের কোথায় আছে জিহাদের জন্য সাধারণ মানুষ হত্যা করতে হবে। অমুসলিম হত্যা করতে হবে? এই প্রশ্নের কোনো জবাব দেয়নি ব্লেরিম।

মাঝে দীর্ঘ বিরতির পর ২৪ মার্চ বোনকে ফোন করেছিল ব্লেরিম হেটা। তার শেষ কথা ছিল দুয়েকদিনের মধ্যেই আল্লাহর সাথে তার সাক্ষাৎ হবে। পরদিন ২৫ মার্চ বাগদাদের একটি শিয়া অধ্যুষিত এলাকায় আত্মঘাতী হামলা চালান ব্লেরিম। যাতে তিনিসহ মোট ৫৩ জনের মৃত্যু হয়। বলাবাহুল্য ইরাকের আর সব হামলার মতোই ব্লেরিমমের সেই হামলাতেও নিহতরা ছিল নিতান্তই সাধারণ আর নিরস্ত্র শিয়া মুসলিম।

মূলত ব্লেরিমের ঘটনাটি বিশ্বব্যাপী আলোড়ন তোলার পর থেকে স্বদেশি আইএস যোদ্ধাদের ব্যাপারে কঠোর হতে শুরু করে কসোভো। কারো ছেলে আইএস-এ যোগ দিলে বাবাকে চাকরিচ্যুত করার মতো কঠোর আইন করেছে সরকার। উগ্রপন্থী ও তাদের মদতদাতাদের আটক করতে চালানো হচ্ছে পুলিশ অভিযান। বছরব্যাপী এমন অভিযানে শীর্ষ মুসলিম নেতাসহ শতাধিক নাগরিককে আটক করেছে কসোভো পুলিশ। এদের মধ্যে ইরাক ও সিরিয়ায় যুদ্ধ শেষে দেশে ফিরে আসা স্বদেশি আইএস জিহাদিও রয়েছে। তবে উগ্রপন্থী ধর্মীয় নেতা এবং দেশে ফিরে আসা এই জিহাদিদের বহুমুখি প্রচারণার কারণে কসোভোর সাধারণ মসুলিমদের মধ্যে আইএস-এর প্রতি নীরব সমর্থন রয়েছে। আর এটাই ৯০ শতাংশ মুসলমানের দেশ কসোভোর গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক নেতৃত্বকে উদ্বিগ্ন করে তুলছে। এমনিতেই নব্বই দশকে কসোভো যুদ্ধে মুসলিমদের ওপর সার্বদের বর্বর গণহত্যার পর থেকে দেশটির মুসলিমদের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমা বিরোধী একাট্টা জনমত রয়েছে। জোরালো রয়েছে ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল (বাসকেসিয়া ইসলাম-ই কসোভো) বিআইকে'র প্রতি জনসমর্থন। কসোভো'র মতো একই পরিস্থিতি বলকান অঞ্চলের মুসলিম প্রধান সবকটি দেশের। বসনিয়া সার্বিয়া রুমানিয়া আলবেনিয়া'র মতো দেশগুলোর কয়েকশ নাগরিক এখন সিরিয়ায় আইএস-এর পক্ষে লড়ছে। দেশগুলোর দীর্ঘ রাজনৈতিক সংকট আর মুসলিম

BanglaBook.org

জনগোষ্ঠির ওপর ধারাবাহিক দমন নিপীড়ন এই অঞ্চলের যুবকদের প্রতিশোধ পরায়ন করে তুলেছে।

যেমন চেচনিয়া। বছরের পর বছর ধরে একটি স্বাধীন ভূখণ্ডের জন্যে লড়ছে চেচনিয়ার মানুষ। ধর্মযুদ্ধ বা জিহাদ নয়। চেচেনদের এই লড়াইয়ের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল আত্মমর্যাদাসম্পন্ন স্বাধীন একটা ভূখণ্ড। দীর্ঘ কয়েক দশকের রুশ আগ্রাসন গণহত্যা আর দমন নিপীড়ন সয়েছেন চেচনিয়ার মানুষ। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের নাইন-ইলাভেন হামলার পর চেচেনদের স্বাধীনতা আন্দোলনের দাবিকে চাপা দেবার দীর্ঘমেয়াদি ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে সেই যোদ্ধাদের সন্ত্রাসী গণ্য করা হলো। মুক্তিযোদ্ধার পরিবর্তে তাদের পরিচিত করা হলো জঙ্গি হিসেবে। রুশ সরকারের সেই ফাঁদে পা দিয়ে চেচেন যোদ্ধারাও হাত মেলালো আল কায়দার মতো চরমপন্থার সাথে। এবং আশ্চর্যজনকভাবে গত একদশকে একটি ভূখণ্ডের স্বাধীকার আন্দোলনের যোদ্ধারা একে একে ধর্মভিত্তিক উগ্রপন্থী হিসেবে নিজেদের পরিচিত করার দ্বার উম্মুক্ত করলেন। আল কায়দার পর এবার সেই চেচেন গেরিলাদের নতুন বন্ধু আইএস। চেচেন গেরিলাদের অন্যতম প্রভাবশালী নেতা আবু ওমর আল চেচেন বলছেন, 'আমরা অনেক সুযোগ নষ্ট করেছি। কিন্তু সত্যিকার অর্থে আজ বিশ্বে একটি ইসলামি খিলাফত কায়েমের সুযোগ এসেছে। আর তা হলো আইএস'। জর্জিয়ার এক সময়কার সেনা কর্মকর্তা আবু ওমর এখন আইএস যোদ্ধাদের একজন প্রভাবশালী কমান্ডার।

জর্জিয়ার সাবেক সেনা কর্মকর্তা আবু ওমর আল চেচেন এখন আইএস-এর কমান্ডার

চেচনিয়ার শতাধিক নাগরিক এখন আইএস-এর হয়ে লড়ছে। এছাড়া Jaish al-Muhajireen wal-Ansar এবং Muhajireen Brigade নামে চেচেন

যোদ্ধাদের দুটি দল সিরিয়ার আল কায়দা সমর্থিত জঙ্গি গোষ্ঠি আল নুসরা ফ্রন্টের সাথে যোগ দিয়েছে। সেপ্টেম্বরে আল নুসরা ফ্রন্টের সাথে এই গ্রুপ দুটিও আইএস-এর পতাকাতলে এসে মিলেছে। গেল বছরের মাঝামাঝি আলেপ্পোতে আসাদ অনুগত সেনাদের সাথে একদিনের লড়াইয়েই অন্তত ১৭ জন চেচেন সদস্য মারা গেছে। তবে চেচনিয়াসহ সাবেক রুশ ফেডারেশন ভুক্ত দেশগুলোর আইএস-এ যোগ দেওয়া নাগরিকদের সম্পর্কে খুব কমই তথ্য মেলে। ইতিহাস পরম্পরায় বলকান অঞ্চলের মুসলিম জনগোষ্ঠি রাশিয়ার ধারাবাহিক আগ্রাসনের শিকার। অথচ ইতিহাস বলে এই অঞ্চলের মুসলিমদের একটা বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ছিল। যা এশিয়া বা মধ্যপ্রাচ্যের চেয়ে সম্পূর্ণ আলাদা। ধর্ম ছিল তাদের যাপিত জীবনের সংস্কৃতির অংশ। নিজ দেশে পরবাসি হয়ে বঞ্চনার যে দীর্ঘ ইতিহাস, সেটাই তাদের শেষ পর্যন্ত উগ্রপন্থার দিকে ঠেলে দিয়েছে। তাই নিজের মাতৃভূমির চাইতেও তাদের বিশ্বাসের ভূখণ্ড হয়ে উঠেছে আইএস-এর কথিত খিলাফত। আর এই মানুষদের এমন পরিণতির জন্য অবশ্যই দায়ী রাশিয়া তথা রুশপন্থী আঞ্চলিক সরকারগুলোর আগ্রাসন।

বাবা খালিদ শারৌফ

অস্ট্রেলিয়ার নাগরিক খালিদ শারৌফ। যিনি এই মুহূর্তে আইএস-এর কথিত খিলাফত রাজ্যের রাজধানী রাক্কায় আছেন বলে ধারণা করা হচ্ছে। আগস্টে

নিজের টুইটার একাউন্টে ছবি সমেত একটা স্ট্যাটাস পোস্ট করেছিলেন শারৌফ। নিজের ছেলের একটা ছবি দিয়ে শারৌফ লিখেছিলেন 'That's my boy'. কথাটা নেহাত পুত্রের জন্যে স্নেহপ্রবণ এক পিতার নির্দোষ উক্তির মতো শোনালেও ছবিটা মোটেই নির্দোষ ছিল না। শারৌফ'র সাত বছর বয়সি ছেলের বীরত্বসূচক ছবিটা ছিল গা শিউরে ওঠা। অস্ট্রেলিয়াসহ পশ্চিমা গণমাধ্যমে ঝড় তোলে এই ছবি। পরে খালিদ শারৌফের একাউন্টটি বাজেয়াপ্ত করে টুইটার কর্তৃপক্ষ।

কাটা মাথা হাতে তার ৭ বছরের ছেলে

এই ছবি দেখে অস্ট্রেলিয়ার সিনিয়র মুসলিম স্কলার এবং গ্র্যান্ড মুফতি আবু মোহাম্মদ বলেছেন: 'It is utterly deplorable for extremists to use Islam as a cover for their crimes and atrocities, Their misguided actions do not represent the overwhelming majority of Muslims who emulate the pure teachings of Islam such as justice, mercy and freedom' (CNN August, 2014)

অর্থাৎ 'এটা খুবই হতাশাজনক যে চরমপন্থীরা তাদের অপরাধ ও নৃশংসতার জন্য ঢাল হিসেবে ইসলামকে ব্যবহার করছে। সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিমরা কোনোভাবেই তাদের বিপথে চালিত এসব কার্যক্রমের প্রতিনিধিত্ব করেন না। বরং সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম ইসলামের বিশুদ্ধ শিক্ষাকে ধারণ করে ক্ষমা আর মুক্তির পথে বিশ্বাস করেন।'

কিন্তু কে এই খালিদ শারৌফ? অস্ট্রেলিয়ার গণমাধ্যমে প্রকাশিত জীবন বৃত্তান্তে জানা যায় ১৯৮১ সালে জন্ম নেওয়া পেশায় নির্মাণ শ্রমিক খালিদ শারৌফের অস্থিমজ্জায় মিশে আছে অপরাধ আর অপরাধ প্রবণতা। লেবানিজ বংশোদ্ভুত খালিদ মাত্র ৯ বছর বয়সে দাঙ্গা হাঙ্গামা ও বদ সঙ্গের দায়ে স্কুল থেকে বহিষ্কার হন। এরপর যৌবনের পুরোটা সময় তাকে আদালতের ভেতরে

BanglaBook.org

বাইরে দৌড়াতে হয়েছে। এমনকি নিজের জন্মদাতা পিতা মাতার সাথেও দাঙ্গা হাঙ্গামায় লিপ্ত হয়েছেন খালিদ। ১৯৯৫ ও ৯৮ সালে তার বিরুদ্ধে মাদক গ্রহণের অভিযোগ আদালত পর্যন্ত গড়িয়েছে। আদালতের তথ্য প্রমাণ বলছে সিজোফ্রেনিয়া রোগের কারণে তিনি এলএসডি (উচ্চামাত্রার মাদক) সেবন করতেন। ২০০৫ সালে সিডনিতে সন্ত্রাসী হামলার জন্য টাইম বোমা তৈরির মধ্যদিয়ে ধর্মযুদ্ধ পরিকল্পনার অভিযোগে গ্রেফতার হওয়া নয়জনের একজন ছিলেন খালিদ। কিন্তু তার মানসিক বৈকল্য ধরা পড়ার কারণে ওই ঘটনার বিচার কাজ বিলম্বিত হয়। সে সময় আদালতের নিয়োগ করা সাইক্রিয়াটিস্ট নিউ সাউথ ওয়েলসের সুপ্রিম কোর্টকে জানিয়েছিলেন খালিদ একজন 'Acute exacerbation of the illness schizophrenia' রোগি। সরকারি চিকিৎসায় ভালো হবার পর ২০০৯ সালে আদালত তাকে ৫ বছরের কারাদণ্ড দেয়। ২০১৪ সালে মুক্তি পান খালিদ। জেল থেকে মুক্তির পর চার সন্তান আর স্ত্রী নাথানকে নিয়ে নতুন করে জীবন শুরুর চেষ্টা না করে তিন সপ্তাহের মাথায় ছেলেকে নিয়ে পালিয়ে সিরিয়ায় চলে যান শারৌফ। স্ত্রী নাথানের সাথে রয়ে গেছে তার বাকি তিন সন্তান। স্বামী খালিদ শারৌফের এমন পৈশাচিক কর্মকাণ্ড এবং ৭ বছরের একটি শিশুকে নিজের মতো 'অসুস্থ' করে গড়ে তুলার এমন ভয়ঙ্কর চেষ্টা হতবাক করেছে অস্ট্রেলিয়ার মানুষকে। এই ঘটনা নাথান আর তার বাকি তিন সন্তানের সামাজিক প্রাণী হিসেবে বেঁচে থাকার অধিকারটুকুও কেড়ে নিতে চলেছে। গণমাধ্যমে দেওয়া সাক্ষাৎকারে নাথানের প্রশ্ন 'আমি এখন তিন তিনটি সন্তানকে কিভাবে মানুষ করব?' খালিদ শারৌফদের মতো মুসলিমদের কারণে বিপাকে পড়া অস্ট্রেলিয়ার মুসলমানরা বলছেন, এ যেন বদ্ধ এক উম্মাদের হাতে ধর্মের তলোয়ার তুলে দেওয়া। মানসিক বৈকল্যে ভোগা একজন মানুষের হাতে অস্ত্র আর ধর্মের ঝাণ্ডা তুলে দিলে তার পরিণতি কী হতে পারে, খালিদ শারৌফই সম্ভবত তার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। আর সেটাই আইএস।

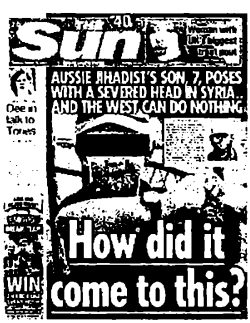

বিতর্কিত সেই ছবি ছাপিয়ে সমালোচনার মুখে পড়েছিল দ্য অস্ট্রেলিয়ান পত্রিকা

THE AUSTRALIAN

Obama signals long Iraq mission

That's my boy: Kids witness war's horror

US arms agency failing to embrace the Asian powerhouse: Report

At last, church says sorry for decades of abuse

Public servants 'double dip' PPL

বারাক ওবামা ও টনি অ্যাবোটকে হত্যার হুমকি দেওয়া অস্ট্রেলিয় নাগরিক আব্দুল্লাহ এলমির ওরফে আবু খালেদ

১৭ বছর বয়সি অস্ট্রেলিয়ার আরেক যুবক আব্দুল্লাহ এলমির ওরফে আবু খালেদ। অক্টোবরে আইএস জঙ্গিদের আপলোড করা একটি ভিডিওতে দেখা যায় এই কিশোরকে। ক্যামেরার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সে বলছে: 'this message I deliver to you the people of America, this message I deliver to you the people of Britain and this message I deliver especially to you the people of Australia'. অর্থাৎ 'এই বার্তা আমেরিকার মানুষদের জন্য, এই বার্তা ব্রিটেনের মানুষদের জন্য এবং এই বার্তা বিশেষভাবে অস্ট্রেলিয়ার মানুষদের জন্য।' আর বার্তাটি হলো, এই দেশগুলোর সবাই অমুসলিম, দেশগুলোর সরকার কাফের—ইসলামের শত্রু, অতএব তাদের হত্যা করতে আবদুল্লাহ এলমির ওরফে আবু খালেদ ফিরে আসছেন। তিন দেশের রাষ্ট্র প্রধানদের হত্যার হুমকি দেওয়ার পর সিডনীর এই কিশোর এখন গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর অন্যতম টার্গেট।

গত জুনে পশ্চিম সিডনীর ব্যাংক স্টোনের বাড়ি থেকে উধাও হয়ে যায় এলমির। মাছ ধরার কথা বলে বড়শি আর শিকারের সরঞ্জাম নিয়ে সে বাড়ি

BanglaBook.org

ছাড়ে। কিন্তু খালিদ শারৌফের ছেলের হাতে কাটা মাথার সেই ছবি গোটা অস্ট্রেলিয়াকে এমনভাবে নাড়া দিয়েছে যে আইএস-এ যোগ দেওয়া এলমির'র জন্যে তাই তার স্বজনদের মনে এতটুকু অনুকম্পা নেই। অমন একটি ভিডিওতে বাড়ির ছোট ছেলেটির এই হঠাৎ আবির্ভাব স্বজনদের কোনো সহানুভূতি কাড়তে পারেনি। বরং তাকে 'স্টুপিড-ইডিয়ট' নামে আখ্যায়িত করছে পুরো পরিবার। কিন্তু কারা তাদের সহজ-সরল সন্তানদের ব্রেইন ওয়াশ করে এমন 'স্টুপিড-ইডিয়ট'-এ পরিণত করছে সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজছে এলমির স্বজনরা। সেই সঙ্গে গোয়েন্দা সংস্থার মাধ্যমে ছেলেকে ফিরিয়ে এনে বরং আইনের মুখোমুখি করার আবেদন জানিয়েছে এলিমরের স্বজনরা। তাদের মতে সিরিয়ায় মরার চাইতে দেশের কারাগার অনেক ভালো।

ধরা যাক, সিডনীর বাসিন্দা ৩৩ বছর বয়স্ক মোহাম্মদ আলী বারায়লির কথা। যিনি এখন আইএস-এর অন্যতম শীর্ষ নেতা। এবিসি টেলিভিশনের অনুসন্ধানী প্রতিবেদন বলছে, বারায়লির হাত ধরে অস্ট্রেলিয়ার ৫০ থেকে ৬০ জন তরুণ তরুণী সিরিয়ায় পাড়ি জমিয়েছে। যাদের অন্যতম ছিলেন গোল্ড কোস্টের বাসিন্দা আমিরা কাররোম ও তার স্বামী টেইলর ক্যাসি। বছরের জানুয়ারিতে সিরিয়ার আলেপ্পোতে এই দম্পতির মৃত্যু হয়। সাত বছর বয়সে বাবা মায়ের সাথে অস্ট্রেলিয়ায় অভিবাসি হন আফগান বংশোদ্ভুত বারায়লি। ২০১৩ সালের এপ্রিলে আইএস-এ যোগ দেওয়ার আগে বারায়লি ছিলেন একজন অভিনেতা। অস্ট্রেলিয়ার জনপ্রিয় টিভি শো আন্ডারবেলির একজন জনপ্রিয় অভিনেতা সেই পথে পুরোদস্তুর একজন ভোগবাদি মানুষ। মেতে থাকতেন উদ্দাম পার্টি হার্ড ড্রিংকস ওয়াইল্ড জীবন যাপনে। তখনই কোনো একসময় ইউটিউবে সিরিয়ার আল নুসরা ফ্রন্টের ভিডিও এবং বাশার আল আসাদ বাহিনীর ধারাবাহিক হত্যাকাণ্ড একজন ওয়াইল্ড বারায়লিকে চরমপন্থার দিকে ধাবিত করে। অস্ট্রেলিয়ারই কোনো এক যুবকের হাত ধরে সিরিয়ায় পাড়ি জমান বারায়লি। এরপর একে একে আইএস-এর বিশ্বাসভাজন আর অন্যতম শীর্ষস্থানীয় এক জঙ্গিতে পরিণত হন বারায়লি। ধারণা করা হচ্ছে তার অবস্থান এখন সিরিয়ার রাক্কায়। জঙ্গিদের পুরো একটি ব্যাটেলিয়নের নেতৃত্ব দিচ্ছেন বারায়লি। সিরিয়ার সরকারি বাহিনীর বিরুদ্ধে জঙ্গিদের বেশ কটি রণাঙ্গনেও দেখা গেছে তার উপস্থিতি।

কিন্তু অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে উপস্থিত না থেকেও দেশটির সরকার ও শান্তি প্রিয় সাধারণ মানুষের উদ্বেগের কারণ হয়েছেন মোহাম্মদ আলি বারায়লি। রাক্কাক্ত থেকেই অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে হামলা পরিকল্পনা করেছেন তিনি। ফোন এবং টুইটারে দিয়েছেন হামলার নির্দেশনা। অস্ট্রেলিয়ায় থাকা তার অনুসারিরা

BanglaBook.org

একযোগে সিডনি ও ব্রিজবেনে হামলা চালিয়ে সাধারণ মানুষদের অপহরণ ও জবাই করে হত্যা এবং সেসব হত্যাকাণ্ডের ভিডিও ধারণ করে বিশ্বব্যাপী আতঙ্ক ছড়িয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা করছিল। তবে ফোন ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে গোয়েন্দাদের নজরদারির কারণে জঙ্গিদের সন্ত্রাসী হামলার এই পরিকল্পনা নস্যাৎ করে দেয় পুলিশ। ১৮ সেপ্টেম্বর সিডনি ও ব্রিজবেনে অভিযান চালায় অস্ট্রেলিয় পুলিশের সন্ত্রাসবিরোধী ইউনিটের এক হাজার সদস্য। যাকে স্মরণকালের সবচেয়ে বড় রকমের সন্ত্রাসবিরোধী অভিযান হিসেবে আখ্যায়িত করেছে অস্ট্রেলিয় গণমাধ্যম। টানা পাঁচদিনের এই অভিযানে আটক হয় অন্তত ১৫ জন। যাদের মধ্যে নোমান হায়দার নামে ২৩ বছর বয়সি এক যুবক পুলিশের গুলিতে মারা যায়। তার মেলবোর্নের বাসায় অভিযান চালিয়ে আইএস জঙ্গিদের একটি কালো পতাকা উদ্ধার করেছে পুলিশ।

মাথা হাতে অস্ট্রেলিয়ার সাবেক বক্সার মোহাম্মদ ইলোমার এবং আলেপ্পোতে নিহত অস্ট্রেলিয় নারী আমিরা কাররোম

অস্ট্রেলিয়ার অন্তত দুই থেকে আড়াই শো তরুণ-তরুণী আইএস-এ যোগ দিয়েছে। এদের মধ্যে কমপক্ষে ৬০ জন সিরিয়ার রণাঙ্গনে অস্ত্র হাতে লড়ছে। বাকিরা জঙ্গিদের নানাভাবে সাহায্য করছে। বছরের গোড়ার দিকে ইরাক

অথবা সিরিয়ায় লড়াই শেষে ফিরে এসেছে ২০ জন। এছাড়া আইএস-এর পক্ষে লড়তে সিরিয়া যাবার চেষ্টা ও পরিকল্পনা করার দায়ে অন্তত ৬০ জনের পাসপোর্ট বাজেয়াপ্ত করেছে অস্ট্রেলিয় পুলিশ। অস্ট্রেলিয়ায় অবস্থান করা অন্তত একশো ব্যক্তি আইএস-এর প্রতি নানাভাবে সমর্থন পোষণের চেষ্টা করছে। এদের কেউ কেউ আইএসকে আর্থিক সাহায্য দিয়েছে।

পুলিশের সন্ত্রাসবিরোধী অভিযানে সিডনিতে আটক এক যুবক

আইএস-এ যোগ দেওয়া মোহাম্মদ আলি বারায়লি

সিডনী ও ব্রিজবেনে আইএস-এর সন্ত্রাসী হামলা পরিকল্পনা ফাঁস হবার পর উদ্বেগজনক এই তথ্যগুলো তুলে ধরেন স্বয়ং অস্ট্রেলিয় প্রধানমন্ত্রী টোনি অ্যাবোট। সেই সঙ্গে তিনি স্বীকার করেছেন, 'সমাজের একজন বা দুজন হয়তো বর্বর কোনো সন্ত্রাসী তৎপরতায় জড়িয়ে পড়ে। কিন্তু এই সন্ত্রাসীদের একটি ছুরি আর একটি মাত্র আই-ফোনই গোটা বিশ্বের জন্যে যে ভয়াবহ উদ্বেগের কারণ হতে পারে, সম্প্রতি সেটাই গভীরভাবে প্রত্যক্ষ করেছে অস্ট্রেলিয়ার মানুষ।'

খবরটা অক্টোবরের। ১৫, ১৬ এবং ১৭ বছর বয়সি তিন মার্কিন কিশোরী তাদের ডেনভারের বাড়ি ছেড়ে সিরিয়ার উদ্দেশ্যে পাড়ি জমায়। এদের একজন বাড়ি থেকে আড়াই হাজার ডলার চুরি করে যথারীতি বিমানে চেপে বসে। কিন্তু জার্মানির ফ্রাঙ্কফুর্টে কানেকটিং ফ্লাইট ধরতে গিয়ে পুলিশের হাতে আটক হয় তিনজন। তাদের এফবিআই'র হাতে তুলে দেয় জার্মান পুলিশ। এফবিআই'র তদন্তে যা জানা গেছে, তা এরকম। সিরিয়ায় লড়াই করা কোনো এক যুবকের সাথে ১৭ বছর বয়সি (অপ্রাপ্তবয়স্কা হিসেবে তিন কিশোরীর নাম পরিচয় ও ছবি প্রকাশ করেনি এফবিআই) এক কিশোরীর প্রেমের সম্পর্ক গড়ে উঠে। রণাঙ্গনে তরুণটির নায়কোচিত যুদ্ধের গল্পে মুগ্ধতা বাড়ে কিশোরীর। আইএস সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ এই কিশোরী এক সময় পা বাড়ায় সিরিয়ার পথে। সঙ্গে নেয় নিজেরই ১৫ বয়স্ক আরেক বোন ও ১৬ বছর বয়সি বান্ধবীকে। তবে সিরিয়া পর্যন্ত পৌঁছতে না পারায় এবং সচেতনভাবে জিহাদের উদ্দেশ্য না থাকায় আইনের হাত থেকে মুক্তি দিয়ে আইএস সম্পর্কে তাদের সচেতন করার উদ্যোগ নিয়েছে পুলিশ।

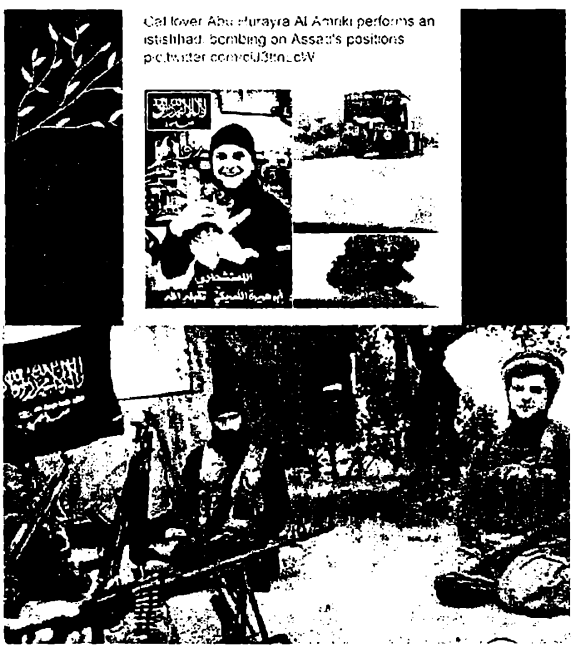

জঙ্গিদের টুইটার একাউন্টের এই পোস্ট বলছে বিড়াল প্রেমি আবু হুরায়রা আল আমরিকি (আবু সালাহ) আসাদ সেনাদের ওপর বিরোচিত বোমা হামলা করেছে। পাশেই বিস্ফোরক বোঝাই ট্রাকের ছবি।

BanglaBook.org

কিন্তু তিন কিশোরী সিরিয়ার মাটিতে পৌঁছতে না পারলেও, পৌঁছে গেছে যুক্তরাষ্ট্রের অন্তত একশো নাগরিক। এফবিআই'র তদন্ত বলছে সিরিয়া আইএস-এর সাথে লড়াই করা মার্কিন নাগরিকদের সংখ্যাটা একশোর কম হবে না। এই নাগরিকদের এরই মধ্যে চিহ্নিত করেছে এফবিআই ও হোমল্যান্ড সিকিউরিটি। এদেরই একজন ফ্লোরিডার বাসিন্দা মুনির মোহাম্মদ আবু সালাহ। বছরের গোড়ার দিকে সিরিয়ার আল কায়দা সমর্থিত জঙ্গি গোষ্ঠি আল নুসরা ফ্রন্টে যোগ দেয় আবু সালাহ। সিরিয়ার ইদলিব শহরে পৌঁছেই নিজের মার্কিন পাসপোর্টটি ছিঁড়ে ফেলে বছরের এই তরুণ। নুসরা ফ্রন্টের এক সদস্য টুইটার বার্তায় লিখেছেন, 'একটি মার্কিন পাসপোর্ট পেতে মানুষ কত চেষ্টাই না করে। অথচ আজ এই তরুণ তার পাসপোর্টটি অস্বীকার করল। তবে খুব বেশিদিন নুসরা ফ্রন্টের হয়ে লড়ার সুযোগ পায়নি আবু সালাহ।

২৫ মে সিরিয়ার ইদলিবে একটি রেস্টুরেন্টে সরকারি সেনাদের বড় একটি জমায়েতে আত্মঘাতী হামলা চালায় আবু সালাহ। এতে অজ্ঞাত সংখ্যক সিরিয় সেনা নিহত হয়। এই হামলা সম্পর্কে হয়তো কিছুই জানা যেত না যদি না জঙ্গিরা আবু সালাহর ছবিসহ ওই আত্মঘাতী হামলার খবরটা টুইটারে প্রকাশ না করত। প্রকাশিত সেই খবর অনুযায়ী আবু সালাহ ১৬ টন বিস্ফোরক বোঝাই একটি ট্রাক নিয়ে ইদলিবের জনাকীর্ণ সেই এলাকায় হামলা চালায়। যে ছেলেটি নিজের পোষা বিড়ালটিকে খুব ভালোবাসত, তার জন্য উদ্বিগ্ন থাকত, সেই ছেলেটি কিনা আত্মঘাতী হলো!

আবু সালাহের মতো আরও কয়েকজন মার্কিন নাগরিক আইএস-এর পক্ষে লড়তে গিয়ে অকালে মৃত্যুবরণ করেছে। তাদেরই একজন আব্দুর রহমান মোহাম্মদ। সোমালি বংশোদ্ভুত ২৯ বছর বয়স্ক রহমান ডেল্টা এয়ারলাইন্সের একজন ক্লিনার হিসেবে কাজ করছিলেন। তারই আরেক বন্ধু ডগলাস ম্যাকার্থার ম্যাককেইন অক্টোবরে আলেপ্পোতে আসাদ বাহিনীর হামলায় মারা যায়। মৃত্যুর পর তার পকেটে পাওয়া যায় মার্কিন পাসপোর্ট। বাস্কেট বলের ভক্ত ম্যাককেইন সিরিয়া গিয়ে খালিদ নাম ধারণ করেছিল। এই নামের টুইটার একাউন্ট থেকে নিয়মিত আইএস-এর পক্ষে বিভিন্ন প্রচারণা চালিয়েছে ম্যাককেইন। তার স্বজনরা জানতেন ম্যাককেইন তুরস্কে আছেন। ডগলাস ম্যাকার্থার ম্যাককেইন, আব্দুর রহমান মোহাম্মদ এবং তাদের আরও এক বন্ধু যিনি ২০০৯ সালে সোমলিয়ায় আল শাবাব জঙ্গিদের সাথে লড়তে গিয়ে মারা গেছেন; তারা তিনজনই ছিলেন বন্ধু এবং মিনেসোটার বাসিন্দা। চরমপন্থার সাথে যোগ দিয়ে তিন বন্ধুকেই মর্মান্তিক মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে। সিরিয়ায় দুই মার্কিন সাংবাদিকের বর্বর হত্যাযজ্ঞের পর, সিরিয়ায় থাকা স্বদেশি এই

BanglaBook.org

জঙ্গিদের ওপর কঠোর নজরদারি শুরু করেছে এফবিআই ও সিআইএ। এই জঙ্গিদের দেশে ফেরার সব পথই আপাতত বন্ধ করেছে যুক্তরাষ্ট্র।

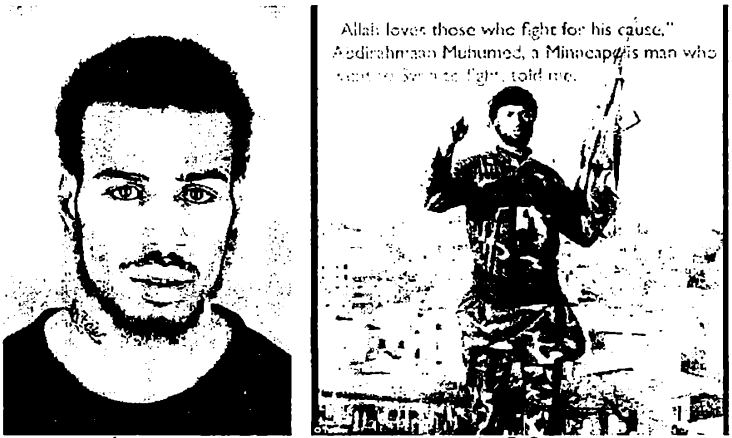

ডগলাস ম্যাকার্থার ম্যাককেইন ও আব্দুর রহমান দুজনেই সিরিয়ার রণাঙ্গনে মারা গেছে

তিউনিশিয়ার নারীদের যৌনজিহাদ

বছরের মাঝামাঝিতে তিউনিশিয়া ও বিভিন্ন আরব গণমাধ্যমের শিরোনাম হয়ে উঠেন ১৯ বছর বয়সি তরুণী লামিয়া। তিউনিশিয়ার Al Sharaouk পত্রিকাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে লামিয়া যা বলেছেন তা এ রকম: '২০১১ সাল থেকেই টিভি আর অনলাইনে বিভিন্ন ইমামদের বয়ান শুনে আমি যেটা বুঝতে পেরেছি যে, নারীদের চোখ মুখ ঢাকা হিজাব পরা ছাড়া বাড়ির বাইরে যাওয়াটা পাপ। এরপর থেকে আমি হিজাব পরতাম, নিয়মিত ধর্মকর্ম করতাম। তখনই অনলাইনে জানতে পারি, একজন নারী অস্ত্র দিয়ে যুদ্ধ না করেও জিহাদে অংশ নিতে পারেন। নিজের শরীরকেই তিনি অস্ত্রে পরিণত করতে পারেন। আর এই পথে তিনি যদি নিজের জীবনও উৎর্গ করেন, তিনি হবেন শহীদ। কেয়ামতের দিন বিনাবিচারে তিনি বেহেশতবাসি হবেন।' এমন উপলব্ধি থেকেই সিরিয়ার জিহাদে যোগ দিতে মরিয়া হয়ে উঠেন লামিয়া।

২০১৩ সালের শেষদিকে ঘর ছেড়ে লিবিয়ার বেনগাজি, তুরস্ক আর আলেপ্পো হয়ে সিরিয়ায় পৌঁছে যান এই তরুণী। এরপর সিরিয়ায় আইএস-এর কথিত জিহাদের রাজত্বে শুরু হয় লামিয়ার দুর্বিসহ এক জীবন, যার নাম: যৌনজিহাদ অথবা যৌনদাসত্ব। কিংবা নামমাত্র বিয়ের আড়ালে পতিতাবৃত্তি। জিহাদিদের ভাষায় 'জিহাদ আল নিকাহ' অথবা 'জিহাদের প্রয়োজনে বিয়ে'।

BanglaBook.org

এমন বিয়ে নারীকে কোনো সম্মান মর্যাদা আর সংসারের অংশীদার করে না। কথিত 'জিহাদ আল নিকাহ'র নামে জঙ্গিদের অবাধ যৌনাচারের পুতুল হয়ে উঠেন নারী। যা এরই মধ্যে মুসলিম বিশ্ব তো বটেই, বিতর্ক আর নিন্দার ঝড় তুলেছে বিশ্বজুড়ে।

যৌনজিহাদে অংশ নেওয়া তিউনিশিয় নারী ও তার ক্ষণিকের স্বামী

কেমন ছিল সেই 'জিহাদ আল নিকাহ'? নিজের অভিজ্ঞতা থেকে সাংবাদিকদের বলছিলেন লামিয়া: 'সিরিয়ায় পৌছার পর আমাকে একটি কম্পাউন্ডে থাকতে দেওয়া হলো। সেটা একটা পুরনো হাসপাতাল ছিল। ভবনটিকে জিহাদিরা নিজেদের মনোরঞ্জনের মতো ব্যবহার করে। ছোট ছোট ঘরে অসংখ্য নারী তরুণী আর কিশোরীরা থাকত। আমাকেও একটি ঘর দেওয়া হলো। প্রথম রাতেই আমার ঘরে যিনি এলেন, তার নাম আবু আয়ুব। তিনি একজন তিউনিশিয়ান। আর সেটাই ছিল শুরু। একজন পতিতার জীবনেও বিশ্রাম বিনোদন আর অবসরের সুযোগ থাকে। কিন্তু আমি সেটাও পাইনি। সিরিয়ায় যাবার পর থেকে প্রায় প্রতিদিন নিত্য নতুন জিহাদির সাথে আমাকে বিছানায় যেতে হয়েছে। পাকিস্তানী, আফগানি, ইরাকি, লিবিয়ান তিউনিশিয়ান, সিরিয়ান, সোমালী, সৌদিহর প্রায় প্রত্যেকটি দেশের জিহাদিদের সাথে আমি রাত কাটিয়েছি। তাদের সংখ্যা আজ আর আমার মনে

BanglaBook.org

নেই।' আলাদা করে সেইসব জিহাদিদের কাউকেই আজ আর মনে করতে পারেন না লামিয়া। যা মনে করতে পারেন তা হলো, বিছানায় যেতে না চাইলে নির্মম নির্যাতন, হাত পা বেঁধে পিটুনি এবং নির্যাতনে অচেতন হয়ে গেলেও অনিবার্য ধর্ষণ। লামিয়া বলছেন 'আইএস-এর সেই কম্পাউন্ডে আমি আরও অনেক তিউনিশিয় নারী ও কিশোরীকে দেখেছি। নির্যাতন সইতে না পেরে একজন তিউনিশিয় নারী পালাতে চেয়েছিলেন। আর এই অপরাধে তাকে দিনের পর দিন অত্যাচার চালিয়ে হত্যা করা হয়েছে।' অবশেষে গত মে মাসে নানা পথ, নানা সীমান্ত ঘুরে তিউনিশিয়ায় ফিরে এসেছেন লামিয়া। আইএস-এর কথিত খিলাফত রাষ্ট্র তাকে যা দিয়েছে তা হলো, শরীর ও মন জুড়ে কদাকার দগদগে ঘা, আর পাঁচ মাসের অনাগত সন্তান। সেই সঙ্গে পেটের সন্তান ও মা দুজনের শরীরেই বাসা বেঁধেছে প্রাণঘাতি এইডসের ভাইরাস।

২০১৩ সালের শেষ দিকে হঠাৎই তিউনিসিয়া থেকে উধাও হয়ে যায় ১৩ জন নারী। যাদের অনেকের বয়স ১৫ থেকে ১৭। ফেইসবুক, টুইটার এবং আইএস-এর বিভিন্ন প্রচারণায় এই নারীদের সাধুবাদ জানিয়ে যৌনজিহাদের পক্ষে অপ-প্রচারের জোয়ার তৈরি হয়। বিতর্কিত এমন কার্যক্রমের স্বপক্ষে অনলাইনে ছড়িয়ে দেওয়া হয় কথিত সালাফিপন্থী এক তিউনিশিয় সুন্নি নেতার ফতোয়া। এই ফতোয়া আর অপপ্রচার দেখেই যৌনজিহাদে আকৃষ্ট হন তিউনিশিয়ার ১৭ বছর বয়সি আরেক কিশোরী রাহমাহ। হঠাৎই একদিন সকালে উধাও হয়ে যান রাহমাহ। পরে তার বাবা-মা জানতে পারেন তাদের মেয়ে সিরিয়ায় যোগ দিয়েছে। কিছুদিন পর দেশে ফিরে এলেও আজও স্বাভাবিক হতে পারেনি। সারাক্ষণ নিজেকে লুকিয়ে রাখে আর মানুষ দেখলে পালিয়ে যায় রাহমাহ।

'Sexual Jihad: Promised 'Paradise,' Tunisian woman 'gave' herself to 152 men' এটাই ছিল সিরিয়া থেকে তিউনিশিয়ায় ফিরে আসা নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ২১ বছর বয়সি আরেক নারীর যৌনজিহাদে যোগ দেওয়ার মর্মান্তিক খবরের শিরোনাম। এই তরুণী বলছেন, তিনি বরাবর ধর্মপ্রাণ। সব সময় হিজাব পরে কলেজে যান। ক্লাসের ফাঁকে নামাজ আদায় করেন। একদিন তারই এক বান্ধবীর কাছে যৌনজিহাদের কথা জানতে পারেন। ওই বান্ধবী নানাভাবে তাকে বোঝানোর চেষ্টা করে যে, এরমধ্য দিয়ে ধর্ম রক্ষা হবে আবার আল্লাহর সন্তুষ্টি আদায় করে পরকালের জন্য বেহেশত নিশ্চিত করা যাবে। শেষ পর্যন্ত সিরিয়ায় যান সেই নারী। মাত্র ছয় মাসের জিহাদি জীবনে তার দেড়শটি স্বামী জুটেছে। প্রতি চার-পাঁচদিন অন্তর তাকে একটি করে বিয়ে করতে হয়েছে। আবার একই দিন কথিত একাধিক স্বামীর

BanglaBook.org

সাথে বিছানায় যেতে হয়েছে। শেষ পর্যন্ত এই নারীটিও ফিরে এসেছেন এইডসের জীবাণু নিয়ে।

তিউনিশিয়ার স্থানীয় গণমাধ্যমের খবর বলছে, বছরের জুন-জুলাই পর্যন্ত এমন অন্তত একশো নারী সিরিয়া থেকে দেশে ফিরে এসেছেন। যাদের অনেকেই অনাগত সন্তান ও নিজের দেহে এইডসের জীবাণু বহন করছেন। শুরুতে তিউনিশিয়ার মতো একটি রক্ষণশীল সমাজের নারীদের এমন ধারার বিতর্কিত জিহাদে জড়িয়ে পড়ার খবরটি সে-দেশের মানুষ বিশ্বাস করতে চায়নি। এসব খবরকে ধর্মপ্রাণ মুসলিমদের বিরুদ্ধে পশ্চিমা গণমাধ্যমের অপপ্রচার হিসেবেই দেখেছে। এমন একটি বিতর্কিত এবং অজনপ্রিয় বিষয় নিয়ে হয়তো চুপ থাকতেই চেয়েছিল তিউনিশিয় সরকার। যে কারণে সিরিয়ায় জিহাদের নামে স্বদেশি নারীদের অবাধ যৌনাচারের কথা স্বীকার করে গণমাধ্যমে বক্তব্য দেওয়ার অপরাধে বরখাস্ত হন, তিউনিশিয়ার ইসলামিক সেন্টারের প্রধান মুফতি ওতমান বাতিখ। কিন্তু কয়েকমাস পর, সিরিয়া থেকে শতাধিক নারীর ফিরে আসা আর বিশ্বব্যাপী গণমাধ্যমে তাদের যৌনজিহাদের খবর প্রকাশের পর বিস্মিত হতে হয় তিউনিশিয়ার রক্ষণশীল সমাজকে। শেষ পর্যন্ত এ বিষয়ে মুখ খুলতে হয় বিব্রতবোধ করা সরকারকেও। দেশটির স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী লোতফি জেডু নিজ মুখে পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে স্বীকার করেন, তার দেশের কতিপয় নারী সিরিয়ায় যৌনজিহাদে যোগ দিয়ে ২০/ ৩০ এমনকি ১০০ জনের সঙ্গেও স্ত্রীর ভূমিকা পালন করছেন এবং জিহাদ আল নিকাহর নামে অবাধ যৌনাচার শেষে গর্ভবতী হয়ে দেশে ফিরছেন। তাদের কতজন নারী সিরিয়ায় গেছেন, কতজন ফিরে এসেছেন, কতজনের শরীরে এইডসের জীবাণু পাওয়া গেছে কিংবা কতজনই বা গর্ভবতী হয়েছেন এসব প্রশ্নের কোনো উত্তর মেলেনি। বিষয়গুলোকে কঠোর গোপনীয়তার বেড়াজালে আটকে রেখে, ভবিষ্যতে এ ধরনের কর্মকাণ্ড ঠেকাতে সম্ভব সব রকম প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণের ঘোষণা দিয়েছেন তিনি।

কিন্তু কেন, কার ইন্ধনে এমন ভয়ঙ্কর পথে পা বাড়াল তিউনিশিয় নারীরা? এ বিষয়ে ২০১৩ সালের অক্টোবরে বিবিসি'র সাংবাদিক আহমেদ মাহের একটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে বলেছেন, কেবল সিরিয়ার আইএস জঙ্গিদের সাথেই নয়। ২০১২ সালে নিজ দেশের আল কায়দা সমর্থিত উগ্রপন্থীদের 'জিহাদ আল নিকাহ'র ডাকেও সাড়া দিয়েছিল তিউনিশিয়ার অজ্ঞাত সংখ্যক নারী। দীর্ঘদিন ধরেই আলজেরিয়া ও তিউনিশিয়ার সীমান্তবর্তী চাম্বি পার্বত্য এলাকায় ঘাঁটি পেতেছিল আল কায়দা সমর্থিত স্থানীয় জঙ্গি গোষ্ঠি। তাদের সাথে আলজেরিয়ার উগ্রপন্থীদেরও সংশ্লিষ্টতা রয়েছে। তিউনিশিয় ও আলজেরিয়

BanglaBook.org

সেনাবাহিনীর সাথে আল কায়দা পন্থী এই জঙ্গিদের রক্তক্ষয়ী সংঘাত এখানে নিয়মিত ঘটনা। ২০১২ সালের মাঝামাঝি এই জঙ্গিগোষ্ঠির পক্ষ থেকে অনলাইনে জিহাদ আল নিকাহ'র পক্ষে প্রচারণা চালানো হয়। যাতে যোগ দিয়েছিলেন অজ্ঞাত সংখ্যক নারী। পরে জঙ্গিদের বিরুদ্ধে চালানো সেনা অভিযানের সময় এমন বেশকিছু নারীকে আটক করা হয়। ১৭ বছর বয়সি এমনি এক কিশোরীর পরিবারের সাক্ষাৎকার নিয়েছেন আহমেদ মাহের। যেখানে তার স্বজনরা স্বীকার করেছেন তাদের মেয়েটি উগ্রপন্থীদের অপপ্রচারের শিকার।

২০১৩ সালের শেষ দিকে তিউনিশিয়াসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের তরুণীদের মধ্যে যৌনজিহাদে যোগ দেবার একটা হিড়িক তৈরি হয়। এর পেছনে কাজ করেছে আইএস জঙ্গিদের সমর্থন দেওয়া কিছু সালাফিপন্থী কথিত মুসলিম নেতা। এদেরই একজন সালাফিপন্থী, শেখ মোহাম্মদ আল আরিফি। যিনি রয়্যাল সৌদি নেভাল একাডেমির কিং ফাহাদ মসজিদের প্রধান ইমাম (মুফতি বা ইসলামি চিন্তাবিদ নন)। ২০১৩ সালের জুনে তার বিতর্কিত ফতোয়াটি আরব গণমাধ্যমসহ অনলাইন দুনিয়ায় ঝড় তোলে। ফতোয়ায় তিনি যা বলেছেন তার বিস্তারিত অনেকটা এরকম: 'বিশ্বের সকল মুসলিম যুবতী নারী (১৪ বছর বয়স থেকে) স্বেচ্ছায় জিহাদ আল নিকাহ বা যুদ্ধকালীন বিয়ের মাধ্যমে দীর্ঘ সময় ধরে লড়াইয়ে ক্লান্ত মুজাহিদদের 'উদ্দীপ্ত' করতে পারেন। আর এটা জিহাদেরই অংশ। জিহাদ আল নিকাহ একজন নারীকে অনির্দিষ্ট সংখ্যক বিয়ের এবং একই দিনে একাধিক স্বামীর সাথে সহবাসের অনুমোদন দেয় (যা আসলে পতিতাবৃত্তি)। আর সেই নারী অবশ্যই আল্লাহর কাছ থেকে প্রতিদানস্বরূপ পরকালে বেহেশতবাসি হবেন।'

তিউনিশিয়ার ইসলামিক স্কলার শেখ ফরিদ এলবাজি

BanglaBook.org

এই ফতোয়ার আওতায় এমনকি 'সিরিয় নারী' ও জিহাদ আল নিকায় অংশ নেওয়া নারীদের ধর্ষণেরও বৈধতা দিচ্ছেন কথিত এই আলেম। অনলাইনে প্রকাশিত সেই খবরের শিরোনামটি ছিল এরকম: 'The rules for the 'rape and prostitution jihad' revealed'. প্রদত্ত এই ফতোয়ায় ধর্ষণের জন্য কিছু নিয়মও বেঁধে দিয়েছেন তিনি। যেমন: 'যে যোদ্ধা বিগত দুই বছর যাবৎ সহবাস করেননি, তিনি ধর্ষণে অগ্রাধিকার পাবেন। ঘণ্টাব্যাপী ধর্ষণ করা যাবে না। কারণ পরবর্তীজনকে সুযোগ দিতে হবে। ধর্ষিতা কোনোভাবেই এই ধর্ষণ কাজে বাধা দিতে পারবেন না। কারণ জিহাদিদের উদ্দীপ্ত করাই তাদের কাজ। বিধবা, স্বামী পরিত্যাক্তা অথবা সর্বনিম্ন ১৪ বছর বয়সি শিশুকেও ধর্ষণ অথবা জিহাদ আল নিকাহ'র আওতায় আনা যাবে'। এই ফতোয়ার স্বপক্ষে কোরানের একটি আয়াত পর্যন্ত হাজির করেছেন এই ইমাম: Allah has purchased of the believers their persons [their bodies] and their goods; for theirs (in return) is the garden (of Paradise): they fight in His cause, and slay and are slain (Yusuf Ali trans. 9:111)'

প্রধান মুফতি ওতমান বাতিখ

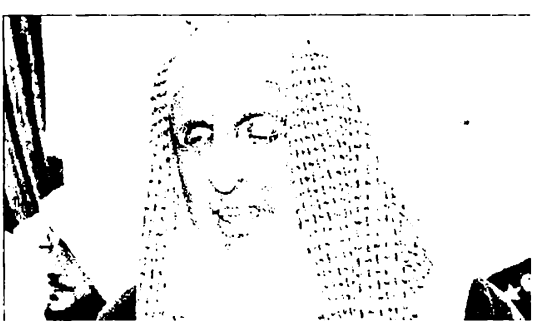

সৌদি গ্র্যান্ড মুফতী শেখ আব্দুল আজিজ আল শেখ

বলাবাহুল্য সৌদি আরবের গ্র্যান্ড মুফতী শেখ আব্দুল আজিজ আল শেখ-এর নেতৃত্বাধীন ফতোয়া বিষয়ক বোর্ড, শেখ মোহাম্মদ আল আরিফি'র বিতর্কিত এই ফতোয়াকে অনুমোদন করেনি। এমনকি সৌদি আরবের গ্র্যান্ড মুফতী শেখ আব্দুল আজিজ একাধিকবার আইএস-এর কর্মকাণ্ডকে অনৈসলামিক উল্লেখ করে বিবৃতি দিয়েছেন। সবশেষ অক্টোবরে আরেক বিবৃতিতে আইএসকে ইসলামের এক নম্বর শত্রু হিসেবে উল্লেখ করে। বিবৃতিতে তিনি বলেছেন–

"The ideas of extremism, radicalism and terrorism do not belong to Islam in any way, but are the first enemy of Islam, and Muslims are their first victims, as seen in the crimes of the so-called Daash (ISIS) and Al-Qaeda and their affiliated groups."

সেই সঙ্গে 'জিহাদ আল নিকাহ'র নামে এমন যথেচ্ছ যৌনাচারকে সম্পূর্ণ অবৈধ উল্লেখ করে আইএস-এর কর্মকাণ্ডকে ইবলিশ শয়তানের সাথে তুলনা করে পুরো মুসলিম বিশ্বের যুবক যুবতীদের এদের ব্যাপারে সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়েছেন।

একই কথা বলেছেন, তিউনিশিয়ার দুই মুসলিম স্কলার—শেখ ফরিদ এলবাজি ও প্রধান মুফতি ওতমান বাতিখ। তাদের মতে, ইসলামের মতো সহনশীল ও পরিশীলিত একটি ধর্ম কখনও বিয়ের নামে এমন অবাধ যৌনাচারকে স্বীকৃতি দেয়নি। এমনকি জিহাদকালীন একজন জিহাদির জীবনাচারণ কেমন হবে সেটাও ইসলামে নির্দিষ্ট করে দেওয়া আছে। তা থেকে বিচ্যুত হবার কোনো সুযোগ নেই। এই দুই মুসলিম চিন্তাবিদ বলছেন, ইসলামের মূল বিধি-বিধান ও তার দর্শনের সাথে সাংঘর্ষিক অথবা বিকৃতি বলে গণ্য হয় এমন কোনো ফতোয়াকে ইসলাম কখনও স্বীকৃতি দেয় না। উপরন্তু বিশ্ব মুসলিম সমাজ ও মুফতি কর্তৃক অনুমোদন ছাড়া কোনো ফতোয়াকে স্বীকৃতি দেওয়া হয় না। সেই আলোকে কথিত 'জিহাদ আল নিকাহ' ইসলামের বিকৃতি ছাড়া কিছু নয়। এমন পাপাচার থেকে নিজ দেশের নারীদের সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়েছিলেন তারা। মিসরের আল আজহারের মুসলিম দার্শনিকরাও 'যৌনজিহাদকে' মনগড়া ফতোয়া আখ্যা দিয়ে তা প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং এ থেকে দূরে থাকতে নারী সমাজকে অনুরোধ করেছেন।

কিন্তু তাদের এই আহবান ও সতর্কবার্তা কোনো কাজে আসেনি। বরং শেখ মোহাম্মদ আল আরিফির বিতর্কিত এই ফতোয়াকে ধর্ম আর বেহেশতের অনন্ত সুখ লাভের মোড়কে ধর্মপ্রাণ নারীদের সামনে হাজির করেছে আইএস

BanglaBook.org

জঙ্গিরা। আর তাদের পাতা ফাঁদে ছারখার হয়েছে হাজারো নারীর জীবন। কত শত নারীকে আইএস-এর রাজ্যে পতিতার জীবন বেছে নিতে হয়েছে, কত শত নারীকে নির্যাতিত হতে হয়েছে, পাশবিক অত্যাচারের অভিঘাতে কতজনকে আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে হয়েছে, কতজন সারা জীবনের জন্য মানসিক ভারসাম্য হারিয়েছেন তার কোনো হিসাব হয়তো কখনই জানা যাবে না।

বছরের মাঝামাঝিতে যখন একের পর এক ইরাকের বিভিন্ন শহরে উড়েছে আইএস-এর আতঙ্কের কালো নিশান তখন একটি পোস্টারে ছেয়ে যায় শিয়া অধ্যুষিত শহর মোসুলের দেওয়াল। শহরটি দখলে নেওয়ার পর শহরের দেওয়ালে দেওয়ালে শোভা পায় আইএস জঙ্গিদের একটি বিজ্ঞপ্তি।

যৌনজিহাদে অংশ নেওয়া তিউনিশিয় নারী

জিহাদ আল নিকাহ'র পক্ষে আইএস-এর প্রচারণামূলক পোস্টার

যাতে লেখা ছিল শেখ মোহাম্মদ আল আরিফি'র সেই ফতোয়া, "We call upon the people of this county to bring their unmarried girls so they can fulfill their duty in sex jihad for their warrior

brothers in the city and anyone who will not appear will feel the full force of the sharia [Islamic law] upon him."

যার বাংলা অনেকটা এরকম 'শহরের সকল নাগরিকদের প্রতি আহবান জানাচ্ছি, আপনাদের অবিবাহিত কন্যাদের যৌনজিহাদে যোগ দিয়ে জিহাদ এবং মুজাহিদ ভাইদের প্রতি তাদের দায়িত্ব সম্পন্ন করতে বলুন। যারা স্বেচ্ছায় এই আহবানে সাড় দেবেন না তাদেরকে ইসলামি শিরিয়া আইন অনুযায়ি এতে বাধ্য করা হবে।' অর্থাৎ কথিত সেই ফতোয়া অনুযায়ি, 'যারা স্বেচ্ছায় যোগ দেবে না তাদের তুলে নেওয়া হবে।' আর ঠিক সেটাই ঘটেছে আইএস-এর হাতে দখল হওয়া ইরাকি শহরগুলোতে। ইরাকের মোসুল তিকরিত নাজাফ আর ইরবিলের মতো শহরগুলোর হাজার হাজার শিয়া কুর্দী ইয়াজিদি ও খ্রিস্টান নারীকে তুলে নিয়েছে আইএস জঙ্গিরা। এমনকি এসব সম্প্রদায়ের কন্যা শিশুরাও তাদের হাত থেকে রেহাই পায়নি। শিয়া নারীদের চাইতেও ইয়াজিদি ও খ্রিস্টান নারীদের ওপর চলেছে মাত্রাহীন নির্যাতন। আইএস-এর কথিত খিলাফত রাষ্ট্রের রাজধানী রক্কা ও মোসুলে এমন কয়েক হাজার ইয়াজিদি, কুর্দী, শিয়া ও খ্রিস্টান নারী বন্দি রয়েছে বলে ফিরে আসা জিহাদিরা গণমাধ্যমকে বলেছে। আইএস জঙ্গিদের বিশ্বাস 'অমুসলিম মানেই কাফির। আর জিহাদে কাফিরদের সাথে যে কোনো আচরণ এমনকি হত্যাও বৈধ।' তাই আইএস-এর ভাষায় কথিত অমুসলিম কাফির 'শিয়া কুর্দী ইয়াজিদি আর খ্রিস্টান' নারীদের সাথে কী আচরণ চলেছে অথবা চলছে, সেটা সহজেই অনুমেয়।

রুহুল আমীন ওরফে আব্দুল রাকিব সুমন ওরফে বারা আল হিন্দি। হিন্দ্ মুল্লুকের সাথে এই যুবকের কোনো সংশ্লিষ্টতা না থাকলেও শেষের এই নামটি ধরে অনলাইনে সার্চ দেওয়া হলে ২৫ বছর বয়সি এই যুবকের হাজার হাজার ছবি ও ভিডিও মেলে। প্রায় সব ভিডিওতে তিনি বলছেন, 'এই দুনিয়াদারী কিছু নয়। আপনার মার্সিডিস গাড়ি থাকতে পারে, বাড়ি থাকতে পারে কিন্তু এই সবই মিছে। সত্যি হলো পরকাল। অনন্ত সেই জীবনই হলো আসল জীবন। আর সেই জীবনের অনন্ত সুখের জন্য জিহাদই হলো আসল পথ। কাফেরদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরে ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য জিহাদ করাই হলো আল্লাহর পথ।'

সিরিয়ার কোথাও ধারণ করা রুহুল আমীন ওরফে আব্দুল রাকিব সুমনের এই ভিডিও দেখে কত যুবক-যুবতী আইএস দলে যোগ দিয়েছে এই তথ্য জানা না গেলেও, এই ভিডিওর বদৌলতে মোটামুটি দুনিয়া ব্যাপী পরিচিতি পেয়েছেন রুহুল আমীন। আইএস-এর শীর্ষস্থানীয় একজন জঙ্গি সদস্য হয়ে ওঠা রুহুল আমীন ওরফে রাকিব সুমনের জন্ম ১৯৮৯ সালে সিলেটের

BanglaBook.org

মৌলভীবাজারে। পাসপোর্টে (বৃটিশ পাসপোর্ট নম্বর ৭০৫৪৭৭২১২) তথ্য অনুযায়ী যুক্তরাজ্য ও বাংলাদেশের এই দ্বৈত নাগরিকের ঠিকানা আবেরডিন, স্কটল্যান্ড, যুক্তরাজ্য। বৃটিশ সরকারের চোখে আইএস-এর অন্যতম এই শীর্ষ সন্ত্রাসীর অবস্থান এখন সিরিয়ার রাক্কা বা আলেপ্পোর কোথাও।

রুহুল আমীন ওরফে আমিন আব্দুল রাকিব সুমন ওরফে বারা আল হিন্দি এবং বিবিসিকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে স্কাইপের ছবিতে সিরিয়ায় নিহত ইফতেখার জামান

সেপ্টেম্বরে বৃটিশ সরকারের পক্ষ থেকে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কাছে একটি জরুরি চিঠি আসে। চিঠির বিষয়বস্তু হলো, বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত বৃটিশ তরুণ রুহুল আমীন ওরফে আমিন আব্দুল রাকিব সুমন ওরফে বারা আল হিন্দি নামে বাংলাদেশের ব্যাংকগুলোতে অতীতে বা বর্তমানে কোনো একাউন্ট থেকে থাকলে, সেই একাউন্টে লেনদেনের সব তথ্য যুক্তরাজ্য

সরকারকে জানাতে হবে। বৃটিশ গোয়েন্দাদের ধারণা, আমিন যুক্তরাজ্যে অথবা সেই দেশের স্বার্থসংশ্লিষ্ট কোথাও সন্ত্রাসী আক্রমণের পরিকল্পনা বাস্তবায়নে অর্থ জোগানে সক্রিয় রয়েছেন। যুক্তরাজ্য সরকারের এই চিঠির পর দেশের সবগুলো ব্যাংকে 'নোটিস' পাঠায় বাংলাদেশ ব্যাংকের ফিন্যান্সিয়াল ইন্টিলিজেন্স ইউনিট বা বিএফআইইউ (যে সংস্থা জঙ্গি অর্থায়ন ও মানিলন্ডারিং ঠেকাতে কাজ করছে)। শেষ পর্যন্ত দেশের ব্যাংকে তার কোনো একাউন্টের হদিস পাওয়া গেল কিনা এ নিয়ে কোনো তথ্য প্রকাশ করেনি বাংলাদেশ ব্যাংক (সাধারণত এসব তথ্য আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করা হয় না)। তবে ধরে নেওয়া যায় দেশের ব্যাংকে এই আইএস জঙ্গির কোনো অর্থায়নের ঘটনা হয়তো ঘটেনি। ঘটে থাকলে সেটি নিশ্চয়ই গণমাধ্যমে প্রকাশ পেত। আমিনের মতো উগ্রপন্থী যুবকদের ঠেকাতে গত জুলাইয়ে সন্ত্রাসী ও সন্ত্রাসী অর্থায়ন বিষয়ক আইন সংশোধন করে বৃটিশ সরকারের ট্রেজারি বিভাগ । টেররিস্ট অ্যাসেট ফ্রিজিং-এ্যাক্ট ২০১০ নামের এই আইন সংশোধনের পর তার সব সম্পদ বাজেয়াপ্ত করেছে বৃটিশ সরকারের ট্রেজারি বিভাগ। তাকে চিহ্নিত করা হয়েছে আন্তর্জাতিক জঙ্গি দলের অন্যতম সক্রিয় সদস্য হিসেবে।

২০১৩ সালের শেষভাগে সিরিয়ার পথে পাড়ি জমান রাকিব সুমনসহ পাঁচ বৃটিশ বাংলাদেশি। তাদের নেতৃত্বে ছিলেন পোর্টস্মাউথেরই আরেক বৃটিশ-বাংলাদেশি মাসুদুর চৌধুরী। বয়স ৩৩। বিবাহিত এবং দুই সন্তানের বাবা। পোর্টস্মাউথের দশ বাংলাদেশি যুবককে নিয়ে একটি দল গঠন করেছিলেন মাসুদুর। অল বৃটানী ব্রিগেড বাংলাদেশি ব্যাড বয়েজ নামের এই দলের অন্যতম আরেক সদস্য হলেন, আবু আব্দুল্লাহ আল ব্রিটানী। যিনি এই মুহূর্তে আইএস-এর প্রভাবশালী একজন সদস্য। বৃটিশ সাহায্যকর্মী অ্যালানকে হত্যার ঘটনায় তারও সংশ্লিষ্টতা রয়েছে বলে বিশ্বাস গোয়েন্দাদের। ওই হত্যাকাণ্ডের আগে পরে নিজের টুইটার একাউন্টে বার্তা দিয়েছিলেন আবু আব্দুল্লাহ। কয়েকটি অনলাইন বার্তা সংস্থা তাকে বৃটিশ বাংলাদেশি বলে উল্লেখ করলেও বিষয়টি নিশ্চিত নয়। *ডেইলি মেইল*, *গার্ডিয়ান* আর *টেলিগ্রাফের* মতো মূলধারার বৃটিশ গণমাধ্যমগুলো তাকে বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত বলে উল্লেখ করেনি। ধারণা করা হয়, এটি তার প্রকৃত নাম নয়। অপরাপর জঙ্গিদের মতো তিনিও সিরিয়া গিয়ে ছদ্মনাম ধারণ করেছেন। তবে মাসুদুর রহমান, রাকিব সুমন এবং ইফতেখার জামানের সাথে তার ঘনিষ্ঠতা ছিল।

স্ত্রী ও সন্তানদের মর্মান্তিক একটি মিথ্যা তথ্য দিয়ে বাড়ি ছেড়েছিলেন মাসুদুর। তিনি বলেছিলেন তার ক্যানসার ধরা পড়েছে। তাকে বাঁচাতে হলে অনেক টাকার দরকার। মাসুদুরের উদ্বিগ্ন আত্মীয় স্বজন আর পাড়াপ্রতিবেশীরা

BanglaBook.org

ধার-কর্য করে তার হাতে চিকিৎসার জন্য ৩৫ হাজার পাউন্ড (প্রায় সাড়ে ৪ লাখ টাকা) তুলে দেন। ওই টাকা দিয়ে গোপনে একটি বিলাসবহুল ওডি গাড়ি কিনে একজন পতিতাকে সঙ্গে নিয়ে বৃটেনের বাইরে ছুটি কাটাতে যান মাসুদুর। সেখান থেকে ফিরে ২০১৩ সালের অক্টোবরে আরও চার বাংলাদেশি তরুণকে নিয়ে গ্যাটউইক বিমান বন্দর দিয়ে তুরস্ক হয়ে সিরিয়ায় পাড়ি জমান মাসুদুর। এছাড়াও আরও তিন বৃটিশ বাংলাদেশি আশাদুজ্জামান, মেহদি হাসান ও মামুনুর রশিদও তারই প্ররোচণায় সিরিয়া পাড়ি জমায় বলে নিশ্চিত হয়েছে বৃটিশ পুলিশ। ২০১৩ সালের শেষভাগেই বৃটেনে ফিরে আসেন মাসুদুর। ধারণা করা হয় তিনি আরেকদল বৃটিশ যুবককে নিয়ে আবারো সিরিয়ার যাবার চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু গোয়েন্দা সংস্থা এমআই-ফাইভের তৎপরতার মুখে বাধা পড়ে তার চেষ্টা। পুলিশের হাতে ধরা পড়েন মাসুদুর।

BanglaBook.org

মাসুদুর রহমান

গ্যাটউইক বিমানবন্দরের সিসি ক্যামেরায় মাসুদুর রহমন, মামনুর রশীদ, হামিদুর রহমানসহ ৫ বাংলাদেশি তরুণের দেশ ত্যাগের ছবি

বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত ইফতেখার জামান এবং হামিদুর রহমান

সন্ত্রাসী তৎপরতায় জড়িত থাকার অপরাধে ২০ মে তাকে দোষী সাব্যস্ত করে কিংস্টোন ক্রাউন কোর্ট। ডিসেম্বরে ঘোষিত রায়ে তাকে ৪ বছরের কারাদণ্ড দিয়ে আদালত বলেছে, দেশে সন্ত্রাসী হামলা ও তৎপরতা চালানোর অভিপ্রায়ে মাসুদুর দল গঠন করেছেন, দলের সদস্যদের নিয়ে সিরিয়া গেছেন এবং অস্ত্র প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। মাসুদুরই হলেন প্রথম বৃটিশ নাগরিক আইএস-এর সাথে যুক্ত হবার অপরাধে বৃটিশ আদালতে যার শাস্তি হলো।

সিরিয়ায় নিহত প্রথম বৃটিশ বাংলাদেশি হলেন ইফতেখার জামান। জুলাইয়ে বিবিসির জনপ্রিয় অনুষ্ঠান নিউজনাইটে সিরিয়া থেকে সরাসরি স্কাইপে ইফতেখার বলেছিলেন, 'এই পার্থিব জীবন কিছুই নয়, পরকালের জীবনটাই আসল। আল্লাহর পথে জীবন দিলেই চিরকালের জন্য বেহেশতে যাওয়া যায়'। এর কিছুদিন পর সম্ভবত সিরিয়ার দিয়ের আল জিউর প্রদেশে সরকারি বাহিনীর একটি অস্ত্র গুদামে হামলা চালাতে গিয়ে ডিসেম্বরে মারা যান ইফতেখার। সিরিয়ায় নিহত দ্বিতীয় বাংলাদেশিটি হলেন ২৫ বছরের যুবক হামিদুর রহমান। লন্ডনের বিখ্যাত রিটেইলার প্রাইমার্কের একজন সুপারভাইজার হিসেবে কাজ করতেন হামিদুর। ভবিষ্যতের উজ্জ্বল সম্ভাবনাকে উপেক্ষা করে সিরিয়ার পথে পা বাড়িয়েছিলেন এই তরুণ। বাবা মাকে তিনি

BanglaBook.org

বলেছিলেন একটি সাহায্য সংস্থার পক্ষ থেকে সিরিয়ায় ত্রাণ কার্যক্রম চালাতে যাচ্ছেন। নিহত ইফতেখারের সাথে একসঙ্গে কালাশনিকভ রাইফেল হাতে সিরিয়ার রণাঙ্গনে দেখা গেছে হামিদুরকেও। ঈদুল ফিতরের আগের দিন সিরিয়ার সরকারি বাহিনীর হামলায় মারা যান হামিদুর। ঈদের দিন সিরিয়া থেকে পাওয়া একটি এসএমএস-এ ছেলের মৃত্যু সংবাদ পান তার বাবা আব্দুল হান্নান। সিরিয়ায় নিহত তৃতীয় বৃটিশ বাংলাদেশি যুবকটির নাম মামনুর অথবা মামুনুর রশিদ। সিরিয়া তুর্কী সীমান্তের কোবানিতে মার্কিন নেতৃত্বাধীন যৌথ বাহিনীর বিমান হামলায় তার মৃত্যু হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। মাসুদুর চৌধুরীর সাথে গত বছর সিরিয়া পাড়ি জমিয়েছিলেন মামনুর। গ্যাটউইক বিমানবন্দরের ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরায় তার ছবিও ধরা পড়েছে। সব মিলে অন্তত ১০ জন বৃটিশ বাংলাদেশি আইএস-এর সাথে যোগ দিয়েছেন। মামুনুরের মতো বাকিরাও কোবানীর লড়াইয়ে অংশ নিয়েছেন বলে গোয়েন্দাদের ধারণা।

নিশ্চিতভাবেই এই তরুণদের যুক্তরাজ্যে ফেরার সব পথ বন্ধ করেছে বৃটিশ সরকার। দ্বৈত নাগরিক হিসেবে একই সঙ্গে তারা বাংলাদেশের পাসপোর্টও ব্যবহার করে থাকেন। কিন্তু এই তরুণদের বাংলাদেশে ফিরে আসা বা তাদের দ্বারা সম্ভাব্য জঙ্গিবাদের বিস্তার ঠেকাতে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে দৃশ্যমান কোনো পদক্ষেপ নেই। আইএস-এর নতুন হুমকি মোকাবেলায় সরকার আদৌ প্রতিরোধমূলক কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে কিনা সেটাও অস্পষ্ট।

BanglaBook.org

আইএস জঙ্গি দলে যোগ দেওয়ার আগে সামিউন ওরফে ইবনে হামদান

অন্তত সামিউন ওরফে ইবনে হামদান নামের এক বৃটিশ বাংলাদেশির দেশে ফিরে আসাটা সেটাই প্রমাণ করে। সামিউন যে কেবল নির্বিঘ্নে সিরিয় থেকে দেশে ফিরে এসেছেন তাই নয়। দেশে ফিরে তিনি রীতিমত সিরিয়ায়

লড়াইয়ের জন্য জিহাদি সংগ্রহের চেষ্টা করছিলেন। ২৮ সেপ্টেম্বর ঢাকার কমলাপুর থেকে তাকে আটক করে পুলিশ। (যদিও আদালতে সাংবাদিকদের তিনি দাবি করেছেন এর পাঁচদিন আগে তাকে তার গ্রামের বাড়ি হবিগঞ্জ থেকে আটক করা হয়েছে)। এক সময় চরম উশৃঙ্খল যুবক ছিলেন সামিউন।

আইএস জঙ্গি দলে যোগ দেওয়ার পরে সামিউন ওরফে ইবনে হামদান

লন্ডনের হলবর্নে মা, বড় ভাই বোনের সাথে তার বসবাস। *ডেইলি টেলিগ্রাফ* বলছে, সামিউন আদৌ কোনো ধর্মপ্রাণ তরুণ ছিলেন না। বখে যাওয়া মাদকাসক্ত বলতে যা বোঝায় তিনি ছিলেন তাই। পাড়াপ্রতিবেশীর কাছেও তার পরিচিত ছিল একজন মদ্যপ যুবক হিসেবে। মাদকের টাকা নিয়ে ভাইয়ের সাথে ঝগড়া মারামারি ছিল তার নিত্য বিষয়। মাদক সংক্রান্ত কোনো ফৌজদারি অভিযোগে একবার জেলে গিয়েছিলেন সামিউন। জেল জীবন থেকেই তার পরিবর্তনের সূচনা। জেল থেকে বের হবার পর সামিউন এক ভিন্ন মানুষ। গায়ে লম্বা কুর্তা, মাথায় পাগড়ি, দাড়ি রাখা শুরু করলেন সামিউন। নিয়মিত মসজিদে যেতে দেখা গেল তাকে। ধর্ম তাকে মাদক থেকে দূরে রাখলেও এক চরমপন্থা থেকে আরেক চরমপন্থার দিকে ধাবিত হলেন সামিউন। এরপরই তাকে মধ্যপ্রাচ্যে যেতে দেখা গেল। তার মাও জানতেন সামিউন ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য যুদ্ধে গেছে। যদিও এই খবরটা তার মায়ের কাছে ছিল চরম আতঙ্কের। এরপর বেশ কিছুদিন সিরিয়ায় কাটিয়ে বাংলাদেশে আসেন সামিউন। ধারণা করা যায়, সিরিয়ায় জঙ্গিদলের সাথে যোগ দেওয়ার অপরাধে লন্ডনে ফিরলে তিনি বিচারের মুখোমুখি হতেন। সেই তুলনায় ঢাকায় ফেরাটা তার জন্য নিরাপদ ছিল। আর কোনো বাধা ছাড়াই নিরাপদে সিলেটে চলে যান সামিউন।

পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদে তিনি সিরিয়ার আল কায়দা সমর্থিত জঙ্গিদল আল নুসরা ফ্রন্টের হয়ে লড়াই করার কথা স্বীকার করেছেন। দেশে ফেরার পর

BanglaBook.org

জিহাদি সংগ্রহে গুলশানের আজাদ মসজিদ ও সিলেটের হযরত শাহজালাল মাজার মসজিদে বেশ কটি গ্রুপের সাথে বৈঠক করেন সামিউন। এসব বৈঠকে জেএমবি ও আনসারউল্লাহ 'বাংলা টিমসহ কয়েকটি উগ্রপন্থী দলের সদস্যরা উপস্থিত ছিল। তবে দেশে ফেরার আগেই ফেইসবুকে তার সাথে কয়েকজন বাংলাদেশি তরুণের যোগাযোগ হয়। প্রথম দফায় এমন অন্তত পাঁচজন তরুণ পরে আরও অন্তত ১শ জনকে সিরিয়া পাঠানোর মিশন নিয়েই তার ঢাকায় আসা। আইএস-এর সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে বা যোগাযোগ তৈরির চেষ্টা করছে, সেপ্টেম্বরে এমন অন্তত ১৪ জন সন্দেহভাজনকে গ্রেপ্তার করেছে ঢাকার পুলিশ। সেই হিসেবে বলা যায় আইএস তথা নুসরা ফ্রন্টের প্রথম চেষ্টাটি ব্যর্থ করেছে বাংলাদেশি গোয়েন্দারা।

সামিউনের আটক হবার মধ্য দিয়ে প্রমাণ হয় আইএস-এর জঙ্গি রিক্রুটের তালিকা থেকে মুক্ত নয় বাংলাদেশ। সামিউন আটক হবার পর এই চেষ্টা থেমে যাবে—এমনটা ভাবার কোনো কারণ নেই। অন্তত সামাজিক যোগাযোগ ওয়েবসাইটে ধর্মীয় চরমপন্থার অবাধ প্রচারণা সেটাই প্রমাণ করে। ঢাকার অক্টোবরের একটি গোয়েন্দা প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, আল-কায়দা বা আইএস স্টাইলে জিহাদে বিশ্বাসী বাংলাদেশের এমন অন্তত ২০ হাজার ব্যক্তি অনলাইনে সক্রিয় রয়েছে। এদের মধ্যে কয়েকশ নাগরিক কোনো-না-কোনো উগ্রপন্থী দলের সাথে সক্রিয় রয়েছে। তারা ধর্মপ্রাণ মানুষদের মধ্যে অনলাইন, গোপন বৈঠক, মসজিদ মাদ্রাসায় নানাভাবে জনমত তৈরির চেষ্টা করছে। ধর্মীয় নানা ইস্যুতে উস্কানি দিয়ে লোকজনকে ক্ষেপিয়ে তোলার চেষ্টা করছে। বিশেষ করে আল কায়দা নেতা আইমান আল জাওয়াহিরি যিনি ২০০১ সালে ছদ্ম পরিচয়ে বাংলাদেশে ঘুরে গেছেন বলে গোয়েন্দা প্রতিবেদনেও উল্লেখ করা হয়েছে, তার ভিডিও বার্তায় বাংলাদেশে ঘাঁটি করার ঘোষণা আসার পর অনলাইনে ধর্মীয় উগ্রবাদিতার প্রচারণা বেড়েছে। এমনকি মানবতাবিরোধী অপরাধিদের বিচারকেও তারা মুসলিম স্কলার তথা মুসলমানের বিরুদ্ধে বিচার বলেও প্রচারের চেষ্টা করছে। যেমন bab-ul-islam.net নামের একটি ওয়েবসাইটে আইএস-এর পতাকার ছবি ব্যবহার করে এবং বাংলায় সিরিয়ার পরিস্থিতি'র বয়ান করে; কেন একজন সাচ্চা মুসলামানের আইএস'কে সমর্থন করা উচিত—সেই ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে এবং প্রকারান্তরে আইএস-এর পক্ষে প্রচারণা চালানো হচ্ছে। নিশ্চিত করেই বলা যায় এই ওয়েব পোর্টালের ওপর বাংলাদেশের কোনো কর্তৃপক্ষের কোনো রকম নজরদারি নেই।

দেশে সাইবার ক্রাইম অ্যাক্ট (তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন-২০০৬) নামে একটি আইন হলেও সাইবার জগতে ঘটে চলা অপরাধ নিয়ন্ত্রণ বা

BanglaBook.org

প্রতিরোধের লক্ষে বাংলাদেশে দৃশ্যমান কোনো তৎপরতা নেই। অপরাধ ঠেকানোর লক্ষ্যে কার্যকর নজরদারির কোনো কার্যক্রমও নেই। বিবিসির রিপোর্ট বলছে (জানুয়ারি ২০১৪) বাংলাদেশে সাইবার অপরাধীদের তৎপরতা গত এক বছরে দ্বিগুণ হয়েছে। অপরাধীদের দক্ষতার সঙ্গে কুলিয়ে উঠতে পারছে না পুলিশ। পুলিশের প্রশিক্ষণ এবং প্রযুক্তিগত সক্ষমতাও নতুন ধরনের এই অপরাধ দমনে যথেষ্ট নয়। বিশ্বের যে কোনো দেশ এমনকি প্রতিবেশী ভারতের চাইতেও ইনফরমেশন টেকনোলিজর প্রযুক্তিগত সুবিধা ও দক্ষতা থেকে অনেকটা পিছিয়ে বাংলাদেশের পুলিশ। কিন্তু আইএস-এর মতো একটি নতুন বাস্তবতা ও তার ভয়ঙ্কর বিস্তার থেকে দেশ ও দেশের মানুষকে মুক্ত রাখতে হলে দরকার বিশ্বমানের একটি পুলিশ বাহিনী ও বিশ্বমানের দক্ষতা।

ক্লান্ত জিহাদি ফিরতে চায়

বোরখার আড়ালে মুখ ঢাকা—এই দুই নারীর পরিচয় হয়তো কোনোদিনই জানা যেত না, যদি না ইন্টারপোল তাদের হাস্যোজ্জ্বল এই নিষ্পাপ মুখের ছবি প্রকাশ না করত। জানা যেত না যে, ওরা সদ্য কৈশোর পার হতে চলা দুই তরুণী। ২০১৪-এর মাঝামাঝি সময়ে আইএস জঙ্গিদের পোষ্টার আর অনলাইনে চালানো প্রচারণায় দেখা যায় বোরখাপরা এই দুই নারীর ছবি। বিশ্বজুড়ে মুসলিম তরুণীদের জিহাদে টানার কৌশল হিসেবই ওদের এই ছবি প্রচার করা হয়। এক সময় জানা যায় তাদের পরিচয়। জিহাদের নামে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে পা বাড়ানো এই দুই কিশোরী হলেন, ১৭ বছরের সামারা কেসিনোভিক আর তার বান্ধবী ১৫ বছরের সাবিনা সেলিমোভিক। যুদ্ধ বিধ্বস্ত বসনিয়ায় ছিল তাদের আদি নিবাস।

নব্বইয়ের দশকে বসনিয়ার রক্তক্ষয়ী লড়াইয়ে সার্বদের তাড়া খেয়ে অস্ট্রিয়ায় আশ্রয় নেয় দুই বান্ধবীর পরিবার। না, মুসলিমদের ওপর সার্ব সেনানায়ক মিলেসভিচ বাহিনীর নির্মম নির্যাতন ওদের দেখতে হয়নি। তারও অনেক পরে অস্ট্রিয়ার ভিয়েনায় তাদের জন্ম। ভিয়েনা হলো সেই নিরপেক্ষ শহর যেখানে বিশ্বের বিবাদমান বিভিন্ন রাষ্ট্রের নেতারা তাদের দ্বন্দ্ব সংঘাতের অবসান করতে আসেন। এক সময় সমঝোতার হাত মিলিয়ে হাস্যোজ্জ্বল ছবি তুলে দেশে ফেরেন। অশান্তি কিংবা দাঙ্গা হাঙ্গামার কারণে নিকট ইতিহাসে ভিয়েনা কোনোদিন খবর হয়েছে, এমনটা কেউ বলতে পারবে না। তারপরও শান্তির এই শহর ওদের টানল না। ২০১৪ সালের এপ্রিলের কোনো এক

BanglaBook.org

ভোরে ওরা রক্তক্ষয়ী সিরিয়ার পথে পা বাড়াল। সুইসাইড নোট না হলেও, চিঠিটা অনেকটা সেরকম, 'আমাদের খুঁজো না। আমরা আল্লাহর কাজে ঘর ছেড়েছি। আল্লাহর জন্যই মরব। দেখা হবে বেহেশতে'।

সামারা ও সাবিনা

কিন্তু মাত্র ছয় মাসেই সামারা আর সাবিনা'র মোহভঙ্গ হয়েছে। ওরা আর এক মুহূর্তও জিহাদের পথে থাকতে রাজি নয়। ওদের জীবন বিষিয়ে উঠেছে। প্রতি মুহূর্তে ওরা টের পাচ্ছে, কথিত এই জিহাদে আইএস-এর পুরুষ সদস্যদের চোখে নারীরা কতটা তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের, কতটা ভোগের। কারণ আইএস-এর চোখে পশুও অনেক বেশি সম্মানের, কিন্তু নাররি নয়। একটা নিজেদের ভুল স্বীকার করে ওরা জানিয়েছে, জিহাদের নামে নারীর প্রতি এত নিষ্ঠুরতা আর অবমাননার কথা জানা থাকলে কখনই ওরা এই পথে পা বাড়াত না। সিরিয়ায় রাক্কায় আইএস জঙ্গিদের কথিত খেলাফত রাষ্ট্র এই দুই কিশোরীকে আর কিছু দিতে না পারলেও, দুটি জিহাদি স্বামী আর গর্ভে অনাগত দুটি সন্তান দিয়েছে।

BanglaBook.org

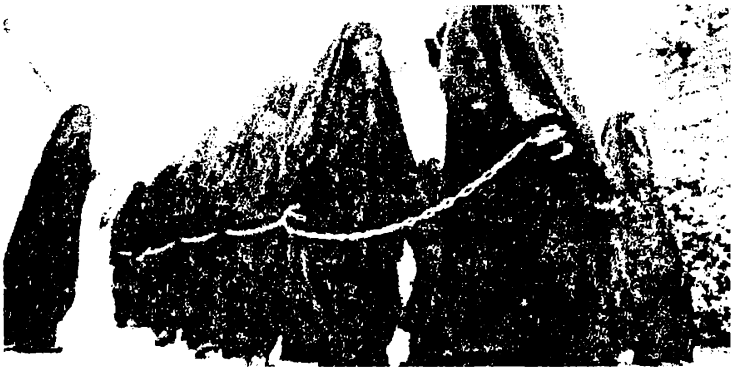

আইএস-এর নিষ্ঠুর দাসত্বের শেকলে বন্দি এই নারীদের পরিচয় হয়তো কখনই জানা যাবে না

এখন সামারা আর সাবিনা'র উপলব্ধি, যথেষ্ট হয়েছে আর না। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে স্বজনদের কাছে দেশে ফেরার আকুতি জানিয়েছে দুই বান্ধবী। কিন্তু ওদের দেশে ফিরিয়ে আনাটা প্রায় অসম্ভব। প্রথমত জঙ্গিদের হাত থেকে পালিয়ে আসার সাধ্য নেই গর্ভবতী এই দুই কিশোরীর। দ্বিতীয়ত অস্ট্রিয়া সরকারও আইএস ফেরত কোনো নাগরিককে দেশে ফেরানোর ঝুঁকি নিতে নারাজ। হোম অফিস জানিয়ে দিয়েছে এটা প্রায় অসম্ভব। অর্থাৎ সামারা আর সাবিনা এখন চাইলেও ফেরার পথ প্রায় বন্ধ। কিন্তু মুসকিল হচ্ছে, অধিকাংশ তরুণ জিহাদি কখনও বুঝতে পারে না অথবা বুঝতে চায় না যে, ইরাক-সিরিয়া এখন এক ওয়ান ওয়ে প্রাঙ্গণ। যেখান থেকে ফিরে আসার আর কোনো পথ নেই। আশ্রয় মেলার কোনো ভূখণ্ড নেই।

সাবিনা আর সামারার চেয়ে সিরিয়ার খাদিজার ভাগ্যটা ভালোই বলতে হবে। ২৫ বছর বয়সী খাদিজা প্রাণ নিয়ে পালাতে পেরেছেন। তবে যে অভিজ্ঞতা নিয়ে ফিরেছেন সেই যন্ত্রণা থেকে তার মুক্তি মিলছে না। সিএনএনকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে খাদিজা বলেছেন, সিরিয়ার একটি শিক্ষিত উদারপন্থী পরিবারে তার বেড়ে ওঠা। কলেজ শেষ করার পর একটি স্কুলে শিক্ষকতার চাকরি করছিলেন। মিসর আর লিবিয়ার হাত ধরে সিরিয়াতেও তখন আরব বসন্তের হাওয়া। সিরিয়ার লাখো সুন্নির মতো তার পরিবারও আসাদ সরকারের স্বৈরাচারি শাসনে বিতশ্রদ্ধ। গণআন্দোলনের জোয়ারে খাদিজারও মনে হলো কিছু একটা করা উচিত। আসাদ বিরোধী আন্দোলনে যোগ দিলেন তিনি। নিজের হাতে ব্যানার পোস্টার লিখেছেন। দেওয়ালে লিখেছেন আসাদ বিরোধী প্রতিবাদি স্লোগান। এক সময় বিক্ষোভ দমনে নৃশংস হয়ে উঠলেন বাশার আল আসাদ। শুরু হলো হত্যাযজ্ঞ। সরকারি সেনা আর

BanglaBook.org

তার কিলিং স্কোয়াড সাবিহা মিলিশিয়া'র বর্বরতা খাদিজার মতো কোমল মনের মানুষটিকেও জিহাদের পথে টেনে আনল। খেলাফত কায়েম নয়, আসাদ মুক্ত ভবিষ্যত সিরিয়ার স্বপ্নেই আইএস-এ যোগ দিয়েছিল খাদিজা। আর সেখান থেকেই তার স্বপ্ন ভঙ্গের সূচনা।

খালাত বোনের পরামর্শে খাদিজার আইএস-এ যোগ দেওয়া। ওই বোন আর তার স্বামী তখন আইএস-এর হয়ে কাজ করছে। পরিবারের সদস্যদের রাজি করিয়ে, ২০১৪ এর মে'র কোনো একদিন আইএস-এর খিলাফত রাষ্ট্রের রাজধানী রাক্কায়, জঙ্গিদের নারী বাহিনী খানসা ব্রিগেডে যোগ দিলেন খাদিজা। বেতন মাসিক দুশো ডলার আর রেশন। সিএনএন এর সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবে তিনি বলছিলেন, সেটা ছিল তার জীবনের এক কুৎসিত অধ্যায়।

আইএস-এর খানসা ব্রিগেডের নারীরা

খানসা ব্রিগেড মূলত সিরিয়ার রাক্কা শহরে পুলিশ বাহিনীর কাজ করে। ২৪ ঘণ্টা রাস্তায় টহল দেওয়া লোকজনের গতিবিধির ওপর নজর রাখা তাদের কাজ। এই বাহিনীর বিশেষ দায়িত্বটা হলো নারীরা শরিয়া আইনমতো চলছে কিনা তার ওপর নজর রাখা। যেমন, বোরখা থাকার পরও কোনো নারীর যদি চোখ দেখা যায়—তাকে পেটানো হবে। কেবল সাধারণ নারীই নন। ব্রিগেডের কেউ যদি শরিয়া আইন ভাঙে তার জন্যেও একই শাস্তি। শাস্তি দেওয়ার কাজটি করেন ব্রিগেড প্রধান উম্মে হামজা। বোরখায় ঢেকে থাকলেও উম্মে হামজা'র নির্মম নিষ্ঠুর মুখটা মনে পড়লে খাদিজা আৎকে উঠেন। একদিনের কথা তিনি কখনও ভুলবেন না। ধর্ষণের অপরাধে ১৬ বছর বয়সি এক

BanglaBook.org

কিশোরকে প্রকাশ্যে রাক্কার রাস্তায় ক্রুশবিদ্ধ করে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হলো। কোনো প্রমাণ ছাড়াই গুপ্তচর সন্দেহে এক শিয়া মুসলিমকে প্রকাশ্যে জবাই করে হত্যা করা হলো। এইসব কিছুরই নিরব সাক্ষী খাদিজা।

কোন নারী আইএস-এ যোগ দেওয়ার পর প্রথম যে কাজটি করা হয়, সেটা হলো বিয়ে দেওয়া। সেচ্ছায় রাজি না হলে জোর করেই জঙ্গিদের সাথে বিয়ে দেওয়া হয়। কনের বয়স তেরো হোক বা ত্রিশই হোক। বিয়ের পর স্বামীর নির্যাতন আর যৌন সহিংসতা এখানে রোজকার বিষয়। স্বামী নামের মানুষটির যৌনসন্ত্রাসের কারণে আইএস-এর বালিকা বধূদের হাসপাতলে ভর্তি হবার নজির এখানে রোজকার বিষয়।

বিয়ের কথা হচ্ছিল খাদিজারও। কমান্ডার উম্মে হামজা বিয়ের জন্য রোজ চাপ দিচ্ছেন। বিয়ের কথা ভাবতেই আঁৎকে উঠলেন খাদিজা। স্বামী নামের বিদেশি জঙ্গিদের যে চেহারা তিনি দেখেছেন, তাতে বিয়ে শব্দটাই তার কাছে আতঙ্কের। কিন্তু আইএস-এর মতো দলে থেকে নিজের পছন্দে বিয়ে করতে পারাটা স্বপ্নের মতোই। এখানে ব্রিগেড প্রধানের ইচ্ছাই চূড়ান্ত। রাতের পর রাত ভেবে পালানোর সিদ্ধান্ত নিলেন খাদিজা। শেষ পর্যন্ত সেপ্টেম্বরে সিরিয়ায় মার্কিন নেতৃত্বাধীন যৌথ বাহিনীর বিমান হামলার ঠিক আগের দিন রাক্কা থেকে পালিয়ে তুরস্কে আশ্রয় নিলেন তিনি। স্বপ্ন দেখছেন স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার। আইএস সম্পর্কে নিজের মূল্যায়ন জানাতে গিয়ে তার মন্তব্য ছিল এরকম 'যে নারী নিজের পছন্দে বিয়ে করতে চান, জীবনকে ভালোবাসতে চান, ঘুরে বেড়াতে চান, বিকেলের নরম রোদে রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে কানে হেডফোন লাগিয়ে গান শুনতে চান তারা আইএস নামের অমন দুঃস্বপ্নকে বরণ করবেন না।' এখন মুক্ত জীবনে নিজের এই পছন্দগুলোই পূরণ করতে চান খাদিজা।

বাড়ি ফিরতে চান এই ব্রিটিশ জিহাদিরা

BanglaBook.org

তবে আইএস-এর মৃত্যু উপত্যকা থেকে খাদিজার মতো জিহাদিদের ফিরে আসার কোনো পথ নেই। রণাঙ্গনে মৃত্যু ছাড়া জিহাদি জীবন থেকে প্রকাশ্যে মুক্তির কোনো উপায় নেই। নিজের পাসপোর্ট পুড়িয়েই জিহাদে নাম লেখাতে হয় তরুণদের। তা সত্ত্বেও কোনো যোদ্ধাকেই আপাতত জীবিত অবস্থায় দেশে ফেরত দিতে রাজি নয় আইএস। মত পার্থক্য, তুচ্ছ কারণে নিরীহ লোকজনের ওপর নির্যাতন আর রক্তপাত দেখতে দেখতে ক্লান্ত যে সব জিহাদি দেশে ফিরতে চান তাদেরকে বেঈমান হিসেবে চিহ্নিত করে আইএস।

এই তিন ব্রিটিশ জিহাদির দুজন এরই মধ্যে মার্কিন বিমান হামলায় মারা গেছে

সুযোগ বুঝে পালাতে পারে কিংবা আর জিহাদে থাকতে রাজি নয় এমন সদস্যদের প্রথম সুযোগেই নিরস্ত্র করে রাক্কার নির্যাতন ক্যাম্পে কয়েদ করে রাখা হয়। প্রয়োজনে বুঝিয়ে শুনিয়ে তাদের দলে রাখার চেষ্টা করা হয়। তাতেও কাজ না হলে চালানো হয় নির্যাতন। তারপরও কোনো সদস্যকে ঝুঁকিপূর্ণ মনে হলে বেঈমানির দায়ে তাকে মৃত্যুদণ্ড দিয়ে হলেও নিজেদের নিরাপদ রাখতে চায় জঙ্গিরা। কারণ দলত্যাগী জিহাদিরাই আইএস বিরোধী প্রচারণার সবচেয়ে বড় অস্ত্র হয়ে উঠেছে। জঙ্গি নেতাদের জন্যে সবচেয়ে বড় ভয় হলো, ফিরে যাওয়া জিহাদিরা মুখ খুললে তাদের নতুন সদস্য নিয়োগ বন্ধ হয়ে যাবে। কট্টরপন্থী মুসলিমদের কাছে যেটুকু গ্রহণযোগ্যতা আছে তাও বিলীন হবে।

তাই আইএস ছাড়তে চাওয়ার অপরাধে রাক্কার হেডকোয়ার্টারে জঙ্গিদের হাতে বন্দি হয়েছে ৫ বৃটিশ ৩ ফ্রান্স এবং জার্মানি ও বেলজিয়ামের দুজন করে নাগরিক। বন্দি হবার আগে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তারা বলেছে, তারা এসেছিল আসাদ সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই করতে। জিহাদের নামে শিয়া কুর্দী

BanglaBook.org

কিংবা সাধারণ মানুষ হত্যা করতে নয়। অথচ তাদের সেটাই করতে হচ্ছে। আসাদ সরকার বা তার বাহিনী নয়, তাদের হাতে মারা যাচ্ছে সিরিয়ার বিভিন্ন দল উপদল আর উপজাতির মানুষ। যারা সবাই মুসলিম। সিরিয়ার সরকারি বাহিনী ও মার্কিন বিমান হামলায় চোখের সামনে নিজ দেশের ২০ জন তরুণের মৃত্যু দেখতে হয়েছে তাদের। অহেতুক জীবনের এত অপচয় দেখতে দেখতে ক্লান্ত এই জিহাদিদের সামনে ফিরে যাবারও কোনো পথ নেই। বন্দি হবার পর তাদের ভাগ্য কী ঘটেছে তাও জানার উপায় নেই।

দেশে ফেরার জন্য মরিয়া বৃটেনের আইএস জঙ্গিদের ত্রিশজনের একটি দল এরই মধ্যে সিরিয়ার রাক্কায় জঙ্গিদের হেডকোয়ার্টার থেকে পালিয়ে তুরস্ক সীমান্তের কোথাও আশ্রয় নিয়েছে। তাদের দলনেতা লন্ডনের কিংস কলেজের অধ্যাপক পিটার ন্যুমানের (মধ্যপ্রাচ্যের ইতিহাস রাজনীতি ও সংঘাত বিষয়ের গবেষক) সাথে সাহায্য চেয়ে যোগাযোগ করেছেন। এদেরই একজন আবু মোহাম্মদ বলেছেন, 'এক মুসলিমের হাতে আরেক মুসলিমের মৃত্যু কোনোভাবেই মানা যায় না। দিন শেষে ওরা মুসলমান। অথচ জিহাদের নামে ইরাক সিরিয়ার বহু মুসলিমকে হত্যা করা হয়েছে। মার্কিন সাংবাদিক জেমস ফলে ও স্টিফেন সটলফের ওমন নির্মম হত্যাকাণ্ডকেও অনেক জিহাদি সমর্থন করেনি। কারণ ইসলামে এমনকি যুদ্ধের সময়েও বার্তাবাহক বা সংবাদকর্মী হত্যার কোনো বিধান নেই। অথচ ওরা মুসলিম পণ্ডিতদের কোনো বিধি বিধানও মানতে চায় না। আমি নিশ্চিত এই নিষ্ঠুরতা ইসলামের পথ নয়। আমি এও নিশ্চিত ওরা ভুল পথে হাঁটছে।' যেমন ভুল পথে হেটেছিল আবু মোহাম্মদের মতো বৃটিশ নাগরিকরা।

অধ্যাপক পিটার ন্যুমান বলছেন, এদের মতো আরও অনেক বৃটিশ যুবকেরই মোহভঙ্গ হয়েছে। তাদের প্রকৃত সংখ্যা হয়তো কখনই জানা সম্ভব নয়। খুব অল্প সময়েই তারা উপলব্ধি করেছেন যথেষ্ট হয়েছে আর নয়। এখন চাপের মুখে বাধ্য হয়ে কখনও কুর্দী মুসলিম কখনও শিয়া মুসলিম ভাইদের রক্ত ঝরাচ্ছেন। তাই বাকি জীবন কারাগারে কাটাতে হলেও বর্বরতার এই জীবন ছেড়ে বরং দেশে ফিরে যেতে চান অনেক বৃটিশ জিহাদি। কিন্তু তাদের ফেরার পথ চিরতরে বন্ধ হয়ে গেছে। সেপ্টেম্বরে বৃটিশ ত্রাণকর্মীকে জবাই করে হত্যার আগ পর্যন্ত, স্বদেশি জিহাদিদের দেশে ফিরিয়ে নেওয়ার ব্যাপারে কিছুটা উদার ছিল বৃটিশ সরকার। অস্ত্র ছেড়ে আইনের মুখোমুখি হবার শর্তে ইরাক ও সিরিয়ায় থাকা আড়াইশ বৃটিশ জিহাদিকে দেশে ফিরিয়ে আনার পদক্ষেপও শুরু হয়েছিল। এরমধ্যে ৪০ জনকে দেশে ফেরার পর বিভিন্ন মেয়াদে সাজাও দেওয়া হয়েছে।

BanglaBook.org

কিন্তু দুই মার্কিন সাংবাদিক ও এক বৃটিশ ত্রাণকর্মীর নির্মম হত্যাকাণ্ডের পর আর নিজ দেশে কোনো জিহাদিকে বরদাশত করতে চায় না বৃটেন। এমনকি এই জিহাদিদের বিশ্বাস করার মতো কোনো ঝুঁকি নিতেও নারাজ প্রধানমন্ত্রী ডেভিড ক্যামেরন।

টাইম ম্যাগাজিনকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে অধ্যাপক ন্যুমান বলছেন, অনুতপ্ত এই জিহাদিদের প্রয়োজনে আইনের মুখোমুখি হবার শর্তে ফিরে আসার একটি শেষ সুযোগ দেওয়া হোক। আইএস-এর শীর্ষ জঙ্গিরা যে ভয়টা পাচ্ছে সেটাই তাদের দিয়ে করানো যেতে পারে। তার মতে এই যুবকদের দেশে ফিরিয়ে এনে বরং আইএস বিরোধী প্রচারণার কাজে যুক্ত করা যেতে পারে। তাহলে জিহাদি মানসিকতা পোষণ করা অন্য বৃটিশ যুবকদের কাছে আইএস-এর কথিত ইসলামি খিলাফতের প্রকৃত চেহারাটা খোলাসা হবে। এই জন্য প্রয়োজনে সরকারকে একটি সংশোধন প্রকল্প হাতে নেওয়ার অনুরোধ জানিয়েছেন এই অধ্যাপক। বিষয়টি ভেবে দেখার আহবান জানিয়েছেন লেবার নেতা মিলিব্যান্ডও।

নিজের ফেইসবুক অ্যাকাউন্টে রীতিমত ঘোষণা দিয়ে সিরিয়ায় পাড়ি জমান, নিউজিল্যান্ডের জিহাদি মার্ক জন টেইলর। সিরিয়ায় আলেপ্পোতে আইএস জঙ্গিদের সাথে যোগ দিয়ে মোহাম্মদ দানিয়েল নাম ধারণ করেছেন। জিহাদিদের সাথে কখনও ট্যাঙ্কে বসে, কখনও মেশিনগান হাতে, আবার কখনও আইএস-এর কালো পতাকা হাতে ফেইসবুকে ছবি পোস্ট করেছেন মার্ক। কিন্তু অ্যাডভেঞ্চার প্রিয় সেই মার্ক ওরফে দানিয়েলও এখন হাফিয়ে উঠেছেন। ফেইসবুকে তার সবশেষ পোস্ট ছিল, 'যুদ্ধ বিধ্বস্ত এই দেশটার ভীষণভাবে মানবিক সাহায্য প্রয়োজন, জিহাদ বা জিহাদি নয়।'

নিউজিল্যান্ডের জিহাদি মার্ক জন টেইলরও এখন দেশে ফেরার অপেক্ষায়

BanglaBook.org

২০১৪ এর জুনে আলেপ্পো ছেড়ে তুরস্কের সীমান্তে পা বাড়ান দানিয়েল। চেষ্টা করেন নতুন পাসপোর্ট করার। কিন্তু সেটা মোটেই সহজ নয়। কারণ তার ব্যাপারে যথেষ্টই সতর্ক নিউজিল্যান্ড সরকার। তার ওপর ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা জারি করে বিশ্বের প্রায় প্রতিটি বিমানবন্দরে সতর্কতামূলক প্রজ্ঞাপন পাঠিয়েছে কিউই সরকার। এর আগে ২০০৯ সালে পাক-আফগান সীমান্তের ওয়াজিরিস্তানে গ্রেফতার হন দানিয়েল। কিছুদিন জেল খাটার পর চলে যান অস্ট্রেলিয়ায়। অস্ট্রেলিয় গোয়েন্দারা বলছেন, সিডনীতে থাকার সময় জন নামে দানিয়েলের এক বন্ধু আল কায়দায় যোগ দিয়েছিল। পরে ইয়েমেনে মার্কিন ড্রোন হামলায় তার মৃত্যু হয়। সিরিয়ায় যোগ দেবার আগে কিছুদিন ইন্দোনেশিয়ায় ছিলেন তিনি। ধারণা করা হয় ইন্দোনেশিয়ার কট্টরপন্থী কোনো গ্রুপের হাত ধরেই দানিয়েল সিরিয়া যাবার সূত্র তৈরি করেন। কারণ ইন্দোনেশিয়ার শতাধিক নাগরিক ইরাক ও সিরিয়ায় যোগ দিয়েছে। জাকার্তা থেকে নিউজিল্যান্ড ফিরেই দানিয়েল চলে যান সিরিয়ায়। কিন্তু চাইলেও এখন আর তার দেশে ফেরার উপায় নেই। প্রথমত তার কোনো পাসপোর্ট নেই। দ্বিতীয়ত দেশে ফিরলেই সন্ত্রাসবিরোধী আইনে বিচারের মুখোমুখি হতে হবে তাকে। শেষ পর্যন্ত কোথায় দানিয়েলের আশ্রয় মিলেছে সেই সত্য হয়তো কখনই জানা যাবে না।

শেখ আবু আব্দুল্লাহ আল মাসরি। মিসরীয় বংশোদ্ভূত সাবেক এই প্রভাবশালী জঙ্গি নেতা সম্প্রতি আইএস ছেড়েছেন। তাঁর অবস্থান এবং সাম্প্রতিক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে খুব বেশি কিছু জানা না গেলেও, অনলাইনে প্রকাশ করা এক বিবৃতিতে তিনি বলেছেন, 'কোরান সুন্নাহর আলোকে আইএস-এর বেশিরভাগ কর্মকাণ্ডই অনৈইসলামিক। এমনকি কোরান ও হাদিসকে নিজেদের সুবিধামতো ব্যাখ্যা দিয়ে অনেক কর্মকাণ্ডকেই জায়েজ বলে প্রচার করার চেষ্টা করছে আইএস। যা কোরান এবং হাদিসের বিকৃতি ছাড়া আর কিছু নয়।' এই জঙ্গিনেতা বলছেন, 'সিরিয়ার সাধারণ মানুষের প্রতি আইএস সদস্য ও এর নেতাদের আচরণ অহেতুক আক্রমণাত্মক। তারা যখন তখন সিরিয়ার এসব সাধারণ মানুষদের এবং ফ্রি সিরিয়ান আর্মির যোদ্ধাদের নাস্তিক কিংবা অবিশ্বাসী আখ্যায়িত করে নির্মম শাস্তি দিচ্ছেন। অভিযোগের স্বপক্ষে যৌক্তিক কোনো প্রমাণ বা সাক্ষীসাবুদ ছাড়াই যাকে তাকে অপরাধি হিসেবে রায় দিচ্ছেন। এমনকি অপরাধির অপরাধ ও শাস্তির মধ্যকার ভারসাম্যের বিষয়টিও অনুসরণ করছেন না। এসব বিষয়ে ইসলামের সুনির্দিষ্ট তাত্ত্বিক নির্দেশনা থাকলেও, তা অনুসরণ না করে বরং সেই কর্মকাণ্ডকে আবার তারা ইসলামসম্মত বলে দাবি করছেন।' সাবেক এই জঙ্গি নেতা বলেছেন

BanglaBook.org

'আইএস নেতারা তাদের ব্যক্তিগত পছন্দ অপছন্দ ক্ষোভ আর ঘৃণার বিষয়গুলোকেও ইসলামের আবরণ দিয়ে বরং ইসলামেরই ভয়ঙ্কর ক্ষতি করছেন, যা কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যায় না'। তার উপলব্ধি, আইএস জঙ্গিদের এসব কর্মকাণ্ডের মধ্যদিয়ে আল্লাহর সন্তুষ্টিও আদায় হবে না। আবার যুদ্ধবিধ্বস্থ সিরিয়ার সাধারণ মানুষেরও ক্ষতি ছাড়া উপকারও কিছু হবে না।

BanglaBook.org

আইএস এবং ইসলাম
আত্মস্বীকৃত খলিফা বাগদাদি ও আইএস-এর প্রতি ১২৬ জন ইসলামি চিন্তাবিদের খোলা চিঠি

আইএস-এর উদ্দেশ্যে একটি খোলাচিঠি লিখেছিলেন ইউরোপ আমেরিকা আফ্রিকা মধ্যপ্রাচ্য আর এশিয়ার ১২৬ জন ইসলামি স্কলার। আইএস প্রচারিত হত্যাকাণ্ডের ছবি, সাক্ষাৎকার আর প্রচারণা বিশ্লেষণ করে এই ইসলামি চিন্তকরা একমত হয়েছেন যে, ইসলামের মোট ২৪ টি বিধি-বিধানের মারাত্মক লংঘন করছে আইএস। এটি নিছক কোনো চিঠি নয়; রীতিমত একটি গবেষণা পত্র। আইএস-এর মতো ইসলামের নামে উগ্রপন্থার যে কোনো প্রেক্ষাপটে এই গবেষণা ভবিষ্যতের জন্যেও একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল হয়ে থাকবে।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

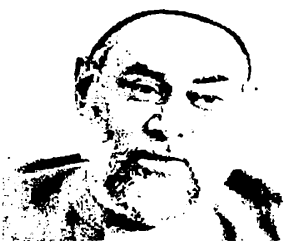

যাদের নেতৃত্বে এই চিঠি : উপরে বাঁ থেকে ছবির ক্রমানুসারে

শায়খ আব্দুল্লাহ বিন বায়া, প্রেসিডেন্ট, পিস ইন মুসলিম সোসাইটি, আবুধাবি
অধ্যাপক শেখ সোয়াকি আলম, গ্র্যাণ্ড মুফতি, মিসর
শেখ ড. আলী গোমাম, সাবেক গ্র্যাণ্ড মুফতি, মিসর
শেখ ফরজ রাব্বানী, ইসলামি স্কলার, কানাডা
সুলতান মোহাম্মদ সা'দ আবু বকর, প্রেসিডেন্ট, নাইজেরিয়ান ন্যাশনাল কাউন্সিল ফর ইসলামিক অ্যাফেয়ার্স
অধ্যাপক এম দ্বীন সামসুদ্দীন, চেয়ারম্যান, ইন্দোনেশিয়ান ওলামা কাউন্সিল

জিহাদ ও ইসলামি শাসন কায়েমের নামে ইরাক সিরিয়ায় নজিরবিহীন বর্বরতার নিত্যনতুন উদাহারণ সৃষ্টি করে চলেছে আইএস জঙ্গিরা। আইএস-এর এসব কর্মকাণ্ড এই গ্রন্থের বিভিন্ন পরিচ্ছেদে তথ্য প্রমাণের ভিত্তিতে বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে। আইএস-এর নৃশংস কর্মকাণ্ড কেবল বিশ্ব মানবতার জন্যেই বিপদ ডেকে আনেনি। শান্তির ধর্ম ইসলামকেও প্রশ্নের মুখে ফেলেছেন—আইএস-এর আত্মস্বীকৃত খলিফা আবু বকর আল বাগদাদি ও তার জিহাদিরা। ধর্মচিন্তকরা বলছেন, হাজার বছরের ইতিহাসে শত্রুরাও ইসলামের যে ক্ষতি করতে পারেনি, আইএস জঙ্গিরা সেই ক্ষতিটাই করছে। ইউরোপ আমেরিকা কানাডা আর অষ্ট্রেলিয়ার মতো দেশগুলোতে আজ ইসলাম বিরোধী যে ঝাণ্ডা জোরদার হয়ে চলেছে, বর্ণবাদী বিদ্বেষের শিকার হচ্ছেন মুসলিমরা, তার দায় এড়াতে পারে না আইএস। ধর্মের নামে কোরান হাদিসের নামে আইএস-এর বিতর্কিত এসব কর্মকাণ্ডে দ্বিধান্বিত বিশ্বের মুসলিম যুব সমাজ বলছে—'আইএস তো কোরান হাদিসের কথাই বলে, তাহলে কোনটা ঠিক।' কোনটা ঠিক আর কোনটা ঠিক নয়, ধর্মের এই স্বাভাবিক ভেদ-বিচারকেও আজ প্রশ্নের মুখে ফেলে দিয়েছেন বাগদাদি ও তার যুদ্ধ উম্মাদ জিহাদিরা। যথাযথ ধর্মীয় জ্ঞানের অভাবে অনেক মুসলিম যেমন আইএস-এর কথিত খিলাফতকে সমর্থনের পথ খুঁজছেন, তেমনি আবার দলটির নির্মম গণহত্যায় দ্বিধান্বিত হয়ে প্রশ্ন করছেন, 'সত্যিই কি কোরান হাদিস এমন নির্মম হত্যাযজ্ঞ আর ব্যাভিচারের অনুমোদন দেয়?'

বিশ্বের দেশে দেশে জাতিতে রাষ্ট্রে আজ সংকটের কারণ হয়েছে আইএস। কথিত জিহাদের জোয়ারে গা ভাসানো ব্রিটিশ যুবকদের ফেরাতে দেশটির মুসলিম নেতারা বার বার বলেছেন 'আইএস-এর কর্মকাণ্ড কেবল ইসলাম বিরোধীই নয় মানবতা বিরোধীও'। অষ্ট্রেলিয়ার মুসলিম নেতারা বলেছেন, 'গণহত্যা ইসলামে গর্হিত অপরাধ'। সৌদি আরবের গ্র্যান্ড মুফতি বলেছেন 'আইএস ইসলামের বন্ধু নয় বরং শত্রু'। আইএস-এর কথিত যৌনজিহাদে যোগ দেওয়া তিউনিশিয়ার হাজারো নারীকে ফেরাতে দেশটার প্রধান মুফতি বলেছেন, 'যৌনজিহাদের নামে যথেচ্ছ যৌনাচার ব্যাভিচারেরই নামান্তর, ইসলামে এর কোনো স্থান নেই।' আইএস-এর উত্থান ও নৃশংসতার পর থেকেই ইসলামি চিন্তকরা বিচ্ছিন্নভাবে বিশ্বের প্রতি এই সতর্ক আহ্বানগুলো জানিয়ে আসছিলেন।

তবে আইএসকে সবচেয়ে মোক্ষম জবাবটা দিয়েছেন, বিশ্বের ১২৬ জন ইসলামি চিন্তাবিদ। ২০১৪ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর আইএস-এর উদ্দেশ্যে একটি খোলাচিঠি লেখেন ইউরোপ আমেরিকা আফ্রিকা মধ্যপ্রাচ্য আর এশিয়ার এই

BanglaBook.org

ইসলামি স্কলাররা। আবু ধাবির পীস ইন মুসলিম সোসাইটির প্রেসিডেন্ট শায়খ আব্দুল্লাহ বিন বায়া, মিসরের গ্র্যান্ড মুফতি অধ্যাপক শেখ সোয়াকি আলম, সাবেক গ্র্যান্ড মুফতি শেখ ড. আলী গোমাম, কানাডার ইসলামি স্কলার ড. ফরজ রাব্বি, নাইজেরিয়ান ন্যাশনাল কাউন্সিল ফর ইসলামি অ্যাফেয়ার্সের প্রেসিডেন্ট সুলতান মোহাম্মদ সা'দ আবু বকর এবং ইন্দোনেশিয়ার ওলামা কাউন্সিলের চেয়ারম্যান অধ্যাপক এম দ্বীন সামসুদ্দীনের নেতৃত্বে গঠিত একটি কমিটি ১২৬ জনের এই দলটির নেতৃত্ব দিয়েছেন। যাদের পঞ্চাশ জনই ছিলেন মিসরের আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কলার। আইএস-এর সার্বিক কর্মকাণ্ড, পত্র পত্রিকার খবর, আইএস প্রচারিত কয়েক হাজার ভিডিও, বিভিন্ন হত্যাকাণ্ডের ছবি, সাক্ষাৎকার; এসব বিশ্লেষণ শেষে এই ইসলামি চিন্তকরা একমত হয়েছেন যে আইএস জঙ্গিরা ইসলামের মোট ২৪টি বিধি-বিধাণের মারাত্মক লংঘন করছে। কোরআন, সুন্নাহ, নবী রাসুলদের জীবনকর্ম খিলাফতের ইতিহাস তথা ইসলামের ইতিহাসের আলোকে আইএস-এর সার্বিক কর্মকাণ্ডকে ব্যাখ্যা করেছেন বরেন্য এই চিন্তাবিদরা। ছাব্বিশ পৃষ্ঠার এই ব্যাখ্যাটি নিছক একটি চিঠি নয়। এটি রীতিমত একটি গবেষণা পত্র। আইএসকে কেন্দ্র করে তৈরি হওয়া সংকটই শুধু নয়, আস্তিক নাস্তিক বিতর্ক, ধর্মের নামে জোর জবরদস্তি আর ইসলামের নামে উগ্রপন্থার যে কোনো প্রেক্ষাপটে তাদের এই গবেষণা নিঃসন্দেহে ভবিষ্যতের জন্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল হয়ে থাকবে।

স্পর্শকাতর এবং জটিল এই একাডেমিক গবেষণার অনুবাদ করতে গিয়ে যথাসম্ভব সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে। সর্বোচ্চ চেষ্টা করা হয়েছে অনুবাদটি যাতে যথার্থ হয় এবং এর মূল বক্তব্যের যাতে কোনো বিচ্যুতি না ঘটে। শুধু আক্ষরিক অনুবাদ নয় বরং ভাবার্থ ঠিক রাখতে সরাসরি কোরআনের বাংলা অনুবাদেরও সাহায্য নেওয়া হয়েছে। চিঠিতে কোরআন হাদিসের যেসব আয়াতের উল্লেখ এসেছে, সেগুলো সরাসরি মূল আয়াতের সাথে মিলিয়ে ক্রস চেক করা হয়েছে। আরবি ভাষার অলঙ্কারিক শব্দগুলো ইংরেজি থেকে বোঝা খুব কঠিন। এক্ষেত্রে আয়াতগুলো সরাসরি কোরআন থেকে দেখে নিশ্চিত হয়ে নেওয়া হয়েছে। এই চিঠিতে 'আপনি ও আপনারা' বলতে বাগদাদি এবং আইএসকে বোঝানো হয়েছে। www.lettertobaghdadi.com এই ঠিকানার অফিশিয়াল ওয়েবসাইটে ইংরেজি আরবি ফার্সিসহ অন্তত দশটি ভাষায় চিঠিটির পিডিএফ ফাইল দেওয়া রয়েছে। কৌতূহলী পাঠক প্রয়োজনে ওয়েবসাইটে গিয়ে মূল চিঠিতেও চোখ বুলিয়ে নিতে পারেন।

BanglaBook.org

একনজরে—ইসলামের যে ২৪টি বিধি-বিধান ভঙ্গ করছে আইএস

১. উপযুক্ত ও প্রয়োজনীয় শিক্ষা ছাড়া ফতোয়া জারি ইসলামে নিষেধ আছে। ফতোয়া অবশ্যই কোরআন হাদিসের আলোকে হতে হবে। এছাড়া কোনো বিষয়ে কোরআন ও হাদিসের পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যার পরিবর্তে নিজের সুবিধার্থে কুরআনের কোনো আয়াতের আংশিক ব্যাখ্যা দেওয়াও ইসলামে নিষিদ্ধ। ফতোয়া জারির ক্ষেত্রে ইসলামে কঠোর কিছু পূর্বশর্ত রয়েছে। এক্ষেত্রে কোরআন বা হাদিসের গোটা বিষয়বস্তু মাথায় রাখতে হবে। কোনো বিশেষ অংশের আলোকে কোনো বিষয়ের ব্যাখ্যা দেওয়া যাবে না।

২. আরবি ভাষায় সুদক্ষ না হলে কোনো বিষয়ের বৈধতার বিষয়ে কোনো ব্যাখ্যা দেওয়া যাবে না বা কোনো করণীয় নির্ধারণ করা যাবে না।

৩. শরীয়া আইনের অতি সহজ ব্যাখ্যা করা ইসলামে নিষিদ্ধ। আর প্রতিষ্ঠিত ইসলামিক সায়েন্সকেও অবহেলা করা যাবে না।

৪. কেবলমাত্র ইসলামি চিন্তাবিদরাই কোনো বিষয়ের ব্যাখ্যা দেওয়ার এখতিয়ার রাখেন। এর বাইরে অন্য কারো কোনো ব্যাখ্যা দেওয়ার অধিকার নেই।

৫. ইসলামি আইনের অজুহাতে কোনো করণীয় নির্ধারণের ক্ষেত্রে সমসাময়িক বাস্তবতা বা সময়কে এড়িয়ে যাওয়া যাবে না।

৬. নিরপরাধ মানুষ হত্যা ইসলামে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।

৭. কোনো গুপ্তচর রাষ্ট্রদূত বা কূটনীতিককে হত্যা ইসলামে জায়েজ নয়। এরই আওতায় সাংবাদিক সংবাদবাহক সাহায্যকর্মী চিকিৎসাকর্মী হত্যাও জায়েজ নয়।

৮. ইসলামে জিহাদ হলো আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ। সঠিক কারণ, লক্ষ্য ও সঠিক নিয়ম না মেনে যুদ্ধ সংঘাতে লিপ্ত হওয়া ইসলামে নিষিদ্ধ।

৯. কোনো ব্যক্তি নিজে থেকে ইসলামের প্রতি অবিশ্বাস বা নিজেকে নাস্তিক ঘোষণা না করা পর্যন্ত তাকে অমুসলিম ঘোষণা করা যাবে না।

১০. খ্রিস্টান বা অন্য যে কোনো ধর্মের মানুষের সাথে অসদাচরণ বা তাদের কোনো ক্ষতি করা ইসলামে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। এমনকি সেটা যুদ্ধাবস্থাতেও।

১১. ইয়াজিদিদেরও ধর্মীয় অনুরাগী হিসেবে গণ্য করা বাধ্যতামূলক।

BanglaBook.org

১২. দাস প্রথার পুনঃপ্রচলন নিষিদ্ধ। সার্বজনীন ঐক্যমতের ভিত্তিতেই দাসপ্রথা বাতিল করা হয়েছে।

১৩. কোনো মানুষকে বল প্রয়োগ বা অস্ত্রের মুখে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।

১৪. নারীর অধিকারকে অস্বীকার করা ইসলামের পরিপন্থী।

১৫. শিশুদের অধিকারকে অস্বীকার করা ইসলামের পরিপন্থী।

১৬. ন্যায়-বিচার ও ক্ষমা নিশ্চিত না করে এবং সঠিক নিয়ম না মেনে কারো বিচার করা বা কাউকে কোনো শাস্তি দেওয়া যাবে না।

১৭. মানুষের ওপর নির্যাতন করা ইসলামে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।

১৮. এমনকি সে অমুসলিম হলেও কারো মরদেহ বিকৃত করা ইসলামে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।

১৯. কোনো খারাপ কাজের দায় সৃষ্টিকর্তার ওপর চাপিয়ে দেওয়া ইসলামে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।

২০. নবী-রাসুল বা আলেম ওলামার মাজার বা কবর ধ্বংস করা অথবা অবমাননা করা ইসলামে নিষিদ্ধ।

২১. কোনো রাষ্ট্র সরাসরি ইসলামের বিরুদ্ধে অবস্থান না নিলে বা মানুষকে প্রার্থনায় বাধা না দিলে তার বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ ইসলামে নিষিদ্ধ।

২২. সব মুসলমানের সহমত ছাড়া খেলাফত ঘোষণা ইসলামের পরিপন্থী।

২৩. যে কোনো মানুষের নিজের দেশ ও তার জাতির প্রতি অনুগত থাকার অধিকার ইসলামে স্বীকৃত।

২৪. শেষ নবী হযরত মোহাম্মদ (সঃ)-এর মৃত্যুর পর আর কোথাও ইসলাম প্রচারের প্রয়োজন নেই।

ড. ইব্রাহিম আওয়াদ আল বাদরি ওরফে আবু বকর আল বাগদাদির প্রতি এবং স্বঘোষিত ইসলামিক স্টেট তথা আইএস-এর সমর্থক ও যোদ্ধাদের প্রতি, আল্লাহ আপনাদের ওপর শান্তি ও ক্ষমা বর্ষণ করুন।

গত ৬ রমযান, ৪ জুলাই, ২০১৪, আপনাদের দেওয়া ধর্মীয় বক্তব্যে হযরত আলী (রঃ) এর বরাত দিয়ে আপনারা বলেছেন, 'আমি যা বলি বা করি তা যদি তোমাদের সত্য মনে হয়, তবে আমাকে সহায়তা করো আর তোমাদের কাছে যদি আমার কথা ও কাজ মিথ্যা মনে হয়, তবে আমাকে পরামর্শ দাও এবং আমাকে সোজা পথে পরিচালিত করো।' হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) বলেছেন, 'ধর্ম হলো উপদেশ মাত্র।' এখানে যা কিছু বলা হচ্ছে, (উপরোক্ত ২৪টি পয়েন্ট) তার সবই আইএস-এর কর্মকাণ্ড ও বক্তব্য প্রসঙ্গে।

BanglaBook.org

কারণ তারা মানুষকে বিভ্রান্ত করছে। ইসলামের অপব্যাখ্যা ও ভুল বোঝাবুঝি দূর করার সব প্রয়াসকেই তারা ব্যাহত করছে। গণমাধ্যমেও তারা সত্য তথ্য আসতে দিচ্ছে না। এখানে যা কিছুই বলা হয়েছে সবই বিভিন্ন সুন্নি চিন্তাবিদের বক্তব্যের ওপর ভিত্তি করে বলা হয়েছে। আর অবশ্যই সাহায্য নেওয়া হয়েছে ইসলামের ইতিহাসের।

আবু মুহাম্মাদ আল আদানি আইএস-এর শীর্ষনেতাদের একজন। তিনি এক বিবৃতিতে বলেছেন, 'আল্লাহ নবী মোহাম্মদের সহায় হোন। সারা বিশ্বের জন্য ক্ষমা প্রার্থনার অস্ত্র হিসেবে তাঁকে পাঠানো হয়েছে।' একটি ভুল উদাহরণ আর বিভ্রান্তির মিশ্রণ হলো এই বক্তব্য। আর এই কথাটাই আইএস সদস্যরা বারবার বলে থাকেন। হ্যাঁ এটা সত্যি যে পবিত্র কোরআনেও এ বিষয়ে বলা আছে যে, 'হে নবী, আমি তো তোমাকে সৃষ্টিকূলের জন্য রহমত হিসেবেই পাঠিয়েছি।' (২১:১০৭) এটা সবসময় আর সব জায়গার ক্ষেত্রেই সত্যি। নবী মোহাম্মদ যে গোটা সৃষ্টির জন্যই আশির্বাদস্বরূপ এ ব্যাপারে কোনো মুসলমানেরই কোনো দ্বিমত নেই। এটা কোরআনের একটি সাধারণ ও নিঃশর্ত বক্তব্য। তবে 'অস্ত্র দিয়ে পাঠানো হয়েছে' কথাটা নিয়ে একটি হাদিসে বলা আছে, এই কথাটি দিয়ে বিশেষ একটি সময় ও স্থানকে বোঝানো হয়েছে যা এরই মধ্যে শেষ হয়ে গেছে। এভাবে কোরআন ও হাদিসকে মেলানো ইসলামে নিষিদ্ধ। তেমনি সাধারণ বিষয় আর সুনির্দিষ্ট বিষয়কে মেলানোও নিষেধ আছে।

তবে রহমত নাজিলের ভারটি আল্লাহ নিজের হাতেই রেখেছেন। এ সম্পর্কে কোরআনে বলা আছে, 'তোমাদের ক্ষমা করাটা তোমাদের সৃষ্টিকর্তা নিজের কর্তব্য বলে স্থির করে রেখেছেন।'(৬:৫৪) আল্লাহর এই ক্ষমা সবার জন্য। এ বিষয়ে আল্লাহ বলেছেন, 'আমার দয়া সব জিনিসকেই পরিবেষ্টন করে রেখেছে।'(৭:১৫৬) নির্ভরযোগ্য একটি হাদিসে নবী বলেছেন, 'আল্লাহ যখন বিভিন্ন প্রজাতি সৃষ্টি করলেন, তিনি তাঁর সিংহাসনের ওপরে লিখেছেন, 'সত্যিই আমার ক্ষমা আমার ক্রোধের চেয়ে বড়।' ইসলামে ক্রোধ নৃশংসতা আর অস্ত্র সমানভাবে নিষিদ্ধ। আর 'বিশ্বের সবার জন্যই ক্ষমা আর অস্ত্র দিয়ে পাঠানো' এই বিষয়গুলোকে এক করে দেখা যাবে না। কারণ এর অর্থ দাঁড়ায়, ক্ষমা নির্ভর করে অস্ত্রের ওপর। কিন্তু অস্ত্র কিভাবে একটি রাজত্ব কায়েম করতে পারে? কারণ বেহেশত বা ইসলামের অন্য কোনো ক্ষেত্রেই তো অস্ত্রের কোনো প্রভাব নেই। এমনকি অস্ত্রের সাথে ইসলামের কোনো সম্পর্কই নেই। নবী মোহাম্মদ (স.) সবার জন্য যে ক্ষমার কথা বলেছেন, তার সাথে, তিনি যে ক্ষেত্র বিশেষে অস্ত্র ধরেছিলেন তার সাথেও কোনো সম্পর্ক নেই। আল্লাহর ক্ষমার সাথে অস্ত্রের সম্পর্ক খোঁজাটাই ভুল। বিষয়টির ব্যাখ্যা করা যায় এভাবে:

BanglaBook.org

১. আইনি তত্ত্ব ও কোরআনের ব্যাখ্যা

কুরআন ও হাদিসের ব্যাখ্যা অনুযায়ী কিছু ইসলামি তত্ত্ব দাঁড় করানো হয়েছে। কোরআনে আল্লাহ কিছু নির্দেশনা দিয়েছেন আর হাদিসে তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন নবী মোহাম্মদ (সাঃ)। যেমনঃ যে কোনো প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গোটা কোরআনের সারমর্মকে বিবেচনা করতে হবে। কিন্তু এর কোনো একটি অংশের আলোকে কোনো বিষয়ের ব্যাখ্যা দেওয়া যাবে না। আর কোরআন বিশ্লেষণ করেই কোনো বিষয়ের বিচার করা যাবে। আল্লাহ বলেছেন, 'তোমরা কি কোরআনের একটি অংশের ওপর বিশ্বাস আনো, আর অন্য অংশকে অবিশ্বাস করো?'(২:৮৫)। 'তারা আল্লাহর কালামকে বিকৃত করে দিতো, তাদের যা শিক্ষা দেওয়া হলো, তার বেশিরভগই তারা ভুলে গেলো' (৫:১৩)। 'এরা কোরআনকে টুকরো টুকরো করেছে'(১৫:৯১)। কোরআনের সব লেখা যখনই হাতে আসে, নির্দিষ্ট বিষয়গুলো থেকে সাধারণ বিষয় আলাদা করতে হবে। শর্তসাপেক্ষে বিষয়গুলো থেকে নিঃশর্ত বিষয়গুলোকে আলাদা করতে হবে। কোনোটার সাথেই কোনোটাকে মেলানো যাবে না। এমনকি সরাসরি অর্থ থেকে রূপকধর্মী অর্থকেও আলাদা করতে হবে। আসলে কোরআনের সব আয়াত প্রকাশের পরিস্থিতি ও কারণ বিশ্লেষণ করে প্রাচীনকালেই ইমামরা কোরআনের ব্যাখ্যা দিয়েছেন। কোরআনের ব্যাখ্যা দেওয়ার ক্ষেত্রে একটি বিজ্ঞান তৈরি করেছেন। এই বিজ্ঞানকে অবশ্যই বুঝতে হবে। কোরআনের ব্যাখ্যা বিজ্ঞানসম্মত না হলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। কোরআনের কোনো আয়াত বা হাদিসের কোনো অংশবিশেষ দিয়ে কোনো বিষয় ব্যাখ্যা করা যাবে না। বরং ওই বিষয়ে পুরো কুরআন ও হাদিসের যে ভাষ্য, তা পর্যালোচনা করে তবেই তার ব্যাখ্যা দেওয়া যাবে। এর কারণ হলো, কুরআনের সবকিছুই ধ্রুব সত্য আর বিশুদ্ধ হাদিসও কোরআনের প্রভাবেই বর্ণিত। কাজেই এর কোনো অংশকেই অবহেলা করা নিষিদ্ধ। কোরআন ও হাদিসের সব বর্ণনার যতটা সম্ভব মিল সাধন করাটাও বাধ্যতামূলক। এছাড়া একটি বিষয় থেকে আরেকটি বিষয়কে আলাদা করার সুনির্দিষ্ট কারণ থাকতে হবে। বিশ্বের অনেক ইসলামি চিন্তাবিদের মধ্যে জরিপ চালানোর পর ইমাম শফি তার আল রাইসালাহ বইয়ে বর্ণনা করেছেনঃ

'ইসলামি আইনের ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য একজন মুফতিকে অবশ্যই আরবি ভাষায় সুদক্ষ হতে হবে। কারণ শরিয়তের সব বিধান আরবিতেই

BanglaBook.org

দেওয়া হয়েছে। শুধু তাই নয়, আরবি ভাষার সব অলঙ্কারগুলোও তাকে ভালোভাবে জানতে হবে। কোরআন সম্পর্কে তার পূর্ণজ্ঞান থাকতে হবে। কারণ ইসলামের সব বিধানের মূল হলো কোরআন। কোরআনের ভাষাগত ব্যাখ্যা জানলেই কেবল হবে না, এর মৌলিক বিজ্ঞানটাও জানতে এবং বুঝতে হবে। আইনানুগ ব্যাখ্যা বুঝতে হবে। নইলে ন্যায়-বিচার প্রতিষ্ঠিত হবে না। ইসলামের সপক্ষে কট্টর যুক্তি তুলে ধরতে হলে একজন মুফতির অনেক প্রামাণ্য জ্ঞান থাকতে হবে। এই জ্ঞান হতে হবে পূর্ণ। এসব যুক্তি তর্কের ইতিহাসটাও তার জানা থাকতে হবে। শরিয়তের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে অনেক সময়ই হাদিসের সহায়তা নিতে হতে পারে। কাজেই হাদিসের বিজ্ঞানও তাকে বুঝতে হবে। যাতে তিনি শরিয়তের নির্ভরযোগ্য ব্যাখ্যা দিতে পারেন। তাকে ইসলামি আইনকানুন জানতে হবে। আর এতকিছুর জন্য অবশ্যই সদিচ্ছা থাকা জরুরি। বৈধভাবে কেউ শাসক বা ইমাম হতে চাইলে এসব গুণ তাকে অর্জন করতেই হবে। ইসলামি চিন্তাবিদরা অনেক গবেষণার পর একটি বিষয়ে একমত হয়েছেন যে, ইসলামি আইনের একজন শাসককে ইসলামের সপক্ষে সব ধরনের যুক্তি তর্ক এবং ইসলামের সব ধরনের লিখিত ও অলিখিত আইন কানুন জানতে হবে। ইসলামের সব তত্ত্ব জানতে হবে। একই ধরনের কথা বলেছেন, আল গাজ্জালি তার আল মুস্তাফা বইতে এবং আল সুয়ুতি বলেছেন তার আল ইতক্বান ফি উলুম আন কুরআন বইতে।

BanglaBook.org

২. ভাষা

আগেই বলা হয়েছে ইসলামের আইন-কানুন জানতে হলে অবশ্যই আরবি ভাষায় দক্ষতা থাকতে হবে। এর অর্থ হলো, আরবি ব্যাকরণ, শব্দতত্ত্ব, অলঙ্করণ, বাক্যগঠন, শব্দের অর্থ ও কুরআনের ব্যাখ্যা ভালোভাবে জানতে হবে। এ ধরনের দক্ষতা না থাকলে কোনোভাবেই ভুল এড়ানো যাবে না। আপনাদের খেলাফতের ঘোষণা সম্ভবত কোরআনের এই আয়াতটিকে উদ্দেশ্য করেই বলা হয়েছে। 'যারা আল্লাহ তায়ালার ওপর ঈমান আনে ও নেক কাজ করে, তাদের কাছে আল্লাহ ওয়াদা করেছেন, তিনি দুনিয়ায় তাদের অবশ্যই খেলাফত দান করবেন। যেমনিভাবে তিনি তাদের আগের লোকদের খেলাফত দান করেছেন। আর যে জীবন বিধান তাদের জন্য আল্লাহ পছন্দ করেছেন, তাও তাদের জন্য সুদৃঢ় করে দেবেন। তাদের ভীতিকর অবস্থাকে তিনি শান্তিময় করে দেবেন। তারা শুধু আল্লাহর গোলামি করবে, আল্লাহর সাথে আর কাউকে শরীক করবে না। এরপরও যারা আল্লাহর নেয়ামতের সাথে নাফরমানি করবে, তারাই গুনাহগার হবে'(২৪:৫৫)। কিন্তু কোরআনের বিশেষ

কোনো একটি আয়াত দিয়ে তো কোনো পরিস্থিতিকে ব্যাখ্যা করা ইসলামে নিষেধ আছে। তাছাড়া এই আয়াত নাযিলের চৌদ্দশত বছর পর এই আয়াতের ব্যাখ্যা দিয়ে কোনো কাজের সিদ্ধান্ত নেওয়াটা ঠিক হবে না। কিভাবে আবু মোহাম্মদ আল আদানি (আইএস-এর শীর্ষ সারির নেতা) বলেন যে, তাদের কথিত এই খিলাফত আল্লাহর ওয়াদা? যদি ধরেও নেওয়া হয়, যে আদানির দাবি সঠিক তবে তার বলা উচিত ছিল, 'আল্লাহর ওয়াদা অনুযায়ী খেলাফত'। তা না বলে তিনি ভাষাগত ভুল করেছেন। তিনি তার তথাকথিত খেলাফতকে বোঝাতে নির্দিষ্ট করে 'ইসতিখলাফ বা উত্তরাধিকার' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। এর অর্থ হলো, শব্দের সঠিক ব্যবহার হয়নি। যেমন এই আয়াতে এর ব্যবহার হয়েছে, 'শিগগিরি তোমাদের মালিক তোমাদের শত্রুকে ধ্বংস করবেন এবং দুনিয়ায় তিনি তোমাদের তাঁর স্থলাভিষিক্ত করবেন। এরপর তিনি দেখবেন তোমরা কিভাবে কাজ করো' (৭:১২৯)। উত্তরাধিকারের অর্থ হলো, অন্য লোকের জায়গায় কেউ অবস্থান করা। এর অর্থ এই নয় যে, তারা বিশেষ কোনো রাজনৈতিক ব্যবস্থার শাসক। ইবনে তাইমিয়াহ'র মতে, 'কুরআনে কোনো দ্বিরুক্তি নেই। খলিফা আর উত্তরাধিকারের মধ্যে পার্থক্য আছে। কোরআনের তফসিরে আল তাবারি বলেছেন, তোমাদের তিনি উত্তরাধিকার করবেন, এর অর্থ হলো তাদের ধ্বংসের পর তাদের জমিতে তাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন তোমাদের। এতেই প্রমাণিত হয় উত্তরাধিকার অর্থ শাসন করা নয় বরং তাদের জমিতে বাস করা।

BanglaBook.org

৩. অতিমাত্রায় সহজিকরণ

সব সময় কোরআনের বিষয়গুলোকে সহজ করার কথা বলা যাবে না। কোরআনের মূল বিষয়টি না বুঝে এর আংশিক ব্যাখ্যাও গ্রহণ করা যাবে না। কখনই এ কথা বলা যাবে না যে, ইসলাম খুব সহজ বা নবী মোহাম্মদ (সঃ) ও তার সহচররাও সহজ সাধারণ, কেন ইসলাম কঠিন হবে? আর ঠিক এই কাজটিই করেছেন আইএস সদস্য আবু আল বারা আল হিন্দি (প্রসঙ্গতঃ তিনি হিন্দ মুলুকের কেউ নন। তার প্রকৃত নাম রুহুল আমীন ওরফে রাকিব সুমন। তাঁর বাড়ি সিলেটের মৌলভীবাজার)। আইএস-এর পক্ষে জিহাদের প্রচারমূলক ভিডিওতে তিনি বলেছেন, 'কোরআন খুলে জিহাদ সম্পর্কে জানুন, এর আয়াতগুলো পড়ুন। সব পরিষ্কার হয়ে যাবে। কেউ বলেন সবার আইনসম্মত দায়িত্ব এটা আবার কেউ বলেন এটা জিহাদের সময় নয়। সবাইকে ভুলে যান কোরআন পড়ুন, তবেই বুঝতে পারবেন জিহাদ কি।'

কিন্তু আমাদের বুঝতে হবে নবী ও তাঁর সহচররা ইসলাম প্রচারের জন্য খুব অল্প উপাদানই ব্যবহার করেছেন। অডিও ভিডিও'র মতো অত্যাধুনিক প্রযুক্তি তাঁদের ছিল না। অথচ তাঁরা ইসলাম প্রচারের জন্য আমাদের চেয়ে অনেক বেশি যোগ্য ছিলেন। তাঁরা ইসলামের আইন আমাদের চেয়ে অনেক বেশি বুঝতেন। তাঁরা আমাদের চেয়ে বেশি মেধাবীও ছিলেন। অথচ তাঁরাও ফতোয়া দেওয়ার অনুমতি পাননি। কোরআনে আল্লাহ বলেছেন, 'হে নবী বলো, যারা জানে আর যারা জানে না তারা কি সমান?'(৩৯:৯)। আল্লাহ বলেছেন, 'তোমরা যদি না জানো তবে কিতাব ওয়ালাদের জিজ্ঞেস করো'(২১:৭) এবং 'তারা যদি সব বিষয় রসুল বা দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে জানিয়ে দিত তাহলে এমন সব লোকেরা জানতে পারত যারা এই খবরের যথার্থতা যাচাই করতে পারত'(৪:৮৩)। কাজেই ইসলামের আইন এত সহজ বিষয় নয়। যে কেউ এই বিষয়ে যে কোনো কথা বলে দিতে পারে না। ফতোয়া জারি করতে পারে না। আল্লাহ বলেছেন, 'একমাত্র বোধশক্তিসম্পন্ন মানুষই শুধু উপদেশ গ্রহণ করতে পারে'(১৩:১৯)। আর নবী মোহাম্মদ (সঃ) বলেছেন, 'না জেনে যে কোরআন সম্পর্কে কথা বলবে, তার জন্য দোযখের আগুন অপেক্ষা করবে'।

BanglaBook.org

৪. মতপার্থক্য

মতপার্থক্য দুই ধরনের, একটি নিন্দনীয় ও আরেকটি প্রশংসনীয়। নিন্দনীয় মতপার্থক্য প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেছেন, 'কিতাবধারী লোকেরা তাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ এসে যাওয়ার পরও বিভেদ ও অনৈক্যে নিমজ্জিত হয়ে পড়েছে'(৯৮:৪)। আর প্রশংসনীয় মতপার্থক্য প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেছেন, 'তখন আল্লাহ তায়ালা ঈমানদারদের সঠিক পথ দেখালেন, যার বিষয়ে তারা মতবিরোধ করেছিল'(২:২১৩)। আল রাইসালাহ বইতে এসব তথ্য দিয়েছেন আল ঈমাম ও আল শাফিই। যখন ঈমামদের মধ্যে কোনো বিষয়ে মতবিরোধ দেখা দেয়, তখন সবচেয়ে ক্ষমাশীল ও সবচেয়ে ভালো মতটাই গ্রহণ করতে হবে। সহিংসতা অবশ্যই পরিহার করতে হবে। কারণ সহিংসতা কেবল কষ্ট বাড়ায়। আল্লাহ বলেন, 'তোমাদের কাছে তোমাদের মালিক যে উৎকৃষ্ট গ্রন্থ নাযিল করেছেন, তোমরা তা অনুসরণ করো'(৩৯:৫৫)। এবং 'তুমি তোমার ক্ষমার নীতি এদের সাথে অবলম্বন করো, সে কাজের আদেশ দাও এবং মুর্খদের এড়িয়ে চলো'(৭:১৯৯)। আল্লাহ আরও বলেছেন, 'যারা মনোযোগ

সহকারে আমার কথা শোনে এবং ভালো কথা অনুসরণ করে তারাই সৌভাগ্যবান, যাদের আল্লাহ সৎপথে পরিচালিত করেন'(৩৯:১৮)। নির্ভরযোগ্য একটি হাদিসে বলা হয়েছে, বিবি আয়েশা বলেছেন, যখনি একাধিক বিষয়ের মধ্যে পছন্দ করার প্রয়োজন পড়ত, তখনই মোহাম্মদ (সঃ) সহজ জিনিসটা বেছে নিতেন।

হাদিসে বলা হয়েছে, কট্টরপন্থী মতামতকে কখনো ধার্মিক বা আল্লাহর মতবাদ বলে প্রচার করা যাবে না। বরং কট্টরপন্থী মতবাদে অতিরঞ্জিত বিষয় থাকে। আল্লাহ বলেছেন 'আল্লাহ তোমাদের কাজকে সহজ করে দিতে চান, তিনি কখনই তোমাদের কাজকে কঠিন করে দিতে চান না'(২:১৮৫)। নবী মোহাম্মদ (সঃ) ও বলেছেন, তোমরা কখনও কঠোর মনোভাব পোষণ করো না, নইলে আল্লাহও তোমাদের সাথে কঠোর হবেন। কট্টরপন্থা নিয়ে মানুষের মধ্যে বিভ্রম আছে। মৌলবাদীরা মনে করে যারা চরমপন্থী নয় তারা অক্ষম। কাজেই চরমপন্থীরা সবার উপরে। এ ধরনের মানসিকতা নিয়ে আল্লাহর নৈকট্য লাভ হয় না। বরং আল্লাহর কাছ থেকে দুরে সরিয়ে দেয়। আল্লাহ কোরআনে বলেছেন, 'তোমাকে কষ্ট দেওয়ার জন্য আমি কুরআন নাযিল করিনি'(২০:১-২)। বিশ্বের ইতিহাসে যত মানুষ মুসলমান হয়েছে, সবাই শান্তিপূর্ণ আহ্বানের মাধ্যমেই হয়েছে। আল্লাহ বলেছেন, 'তুমি তোমার মালিকের পথে প্রজ্ঞা ও সদুপদেশ দিয়ে আহ্বান করো। তুমি এমন এক পদ্ধতিতে যুক্তিতর্ক করো, যা সবচেয়ে ভালো পন্থা। তোমার মালিক ভালো করেই জানেন, কে তাঁর পথ থেকে বিপথগামী হয়ে গেছে আর কে তার পথে আছে'(১৬:১২৫)। নবীও বলেছেন, নম্র-ভদ্র হও সহিংসতা ও খারাপ ভাষার ব্যাপারে সতর্ক থাকো। ইসলাম যখন মধ্য এশিয়া থেকে উত্তর আফ্রিকার দিকে প্রসার পেতে শুরু করল, তখনও এসব এলাকার অনেক মানুষ খ্রিস্টানই রয়ে গেল। অনেক বছর ধরে তারা খ্রিস্টান ছিল। এরপর ধীরে ধীরে শান্তিপূর্ণ আহ্বানের মাধ্যমে আরও বেশি মানুষ ইসলাম গ্রহণ শুরু করল। এর জন্য কোনো সহিংসতা বা জোর-জবরদস্তির দরকার হয়নি। বড় বড় দেশ ও প্রদেশের সব মানুষই এক সময় মুসলমান হয়। যেমন ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া ও পূর্ব আফ্রিকা। চরমপন্থা আসলে ভক্তি বা ইসলাম প্রচারের উপায় নয়।

৫. ব্যবহারিক আইন

ব্যবহারিক আইনের অর্থ হলো, বাস্তবতার সাথে মিল রেখে শরিয়তের আইনকে প্রয়োগ করা। বাস্তব সম্পর্কে অন্তদৃষ্টি থাকলে এটা অর্জন করা যায়।

BanglaBook.org

ব্যবহারিক আইনের মধ্যে একটি বিশেষ সময়ে মানুষের বাস্তবতা, তাদের সীমাবদ্ধতাগুলো লিখিত আকারে থাকে। কিভাবে সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করা যাবে এর জন্য নিজেদের সক্ষমতা কিভাবে বাড়ানো যাবে তার দিক নির্দেশনাও থাকে। ঈমাম গাজ্জালি বলেছেন, বাস্তবতা আসলে প্রয়োজনকে নিয়ন্ত্রণ করে। ইবনে কাইয়িম আল জজিয়াহ বলেছেন, একজন আইনজ্ঞকে মানুষের ষড়যন্ত্রের প্রবৃত্তি বুঝতে হবে, মানুষের বিশ্বাসঘাতকতাকে বুঝতে হবে। এমনকি তাদের ঐতিহ্য ও সংস্কারকেও বুঝতে হবে। কারণ ধর্মীয় ফতোয়াগুলো স্থান, কাল, সময় ও পরিস্থিতি ভেদে বদলে যায়।

৬. নিরপরাধকে হত্যা

কোরআনে আল্লাহ বলেছেন, 'বিশেষ কোনো কারণ ছাড়া আল্লাহ হারাম করেছেন, এমন কোনো জীবকে হত্যা করো না'(১৭:৩৩)। এবং 'তুমি বলো, এসো আমিই তোমাদের বলে দেই, আল্লাহ কোন কোন জিনিস তোমাদের জন্য হারাম করেছেন। তোমরা তার সাথে অন্য কিছুকে শরিক করবে না, বাবা-মায়ের সাথে ভালো ব্যবহার করবে, দারিদ্রের আশঙ্কায় কখনো নিজের সন্তানকে হত্যা করবে না, কারণ আল্লাহ তোমার ও তাদের আহার যোগান, কখনও অশ্লীলতার ধারে কাছে যেও না, যে জীবনকে আল্লাহ মর্যাদাবান করেছেন, তাকে যথার্থ কারণ ছাড়া কখনো হত্যা করো না। তিনি তোমাদের যে আদেশ দিয়েছেন, নিশ্চয়ই তোমরা তা বুঝতে পারবে'(৬:১৫১)। ইসলামের আইন অনুযায়ী কোনো জীব বা আত্মাকে হত্যা করা হারাম। এটা সবচাইতে জঘন্য পাপ। আল্লাহ বলেছেন, 'ওই কারণেই আমি বনি ইসরাইলের জন্য এই বিধান জারি করলাম, কোনো মানুষকে হত্যা করা বা ধ্বংসাত্মক কাজের শাস্তি দেওয়া ছাড়া, কেউ যদি কাউকে হত্যা করে, তবে তা গোটা মানবজাতিকে হত্যার সামিল। আর কেউ কারো প্রাণ রক্ষা করলে তা গোটা মানবজাতিকে বাঁচিয়ে দেওয়ার সামিল হবে। এদের কাছে আমার রসুলরা সুস্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে এসেছিল, তবু এদের বেশিরভাগই সীমা লঙ্ঘনকারী হিসেবেই থেকে গেল'(৫:৩২)।

আপনারা অনেক নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করছেন। অনেক নিরস্ত্র মানুষকে হত্যা করছেন, যাদের কাছে এমনকি কোনো অস্ত্রও ছিল না, তারা কোনো যুদ্ধও করছিলেন না। তারা শুধু আপনাদের মতামতের বিরোধীতা করেছিল।

BanglaBook.org

৭. বার্তাবাহকদের হত্যা

সবাই জানে, সব ধর্মেই বার্তাবাহকদের হত্যা নিষিদ্ধ। এখানে বার্তাবাহক বলতে সেই ব্যক্তিকে বোঝানো হয়েছে যিনি মহৎ কাজের জন্য এক দলের পক্ষ থেকে অন্য দলের কাছে যান। যেমন, দুপক্ষের মিলন ঘটানো বা বার্তা পৌঁছে দেওয়ার জন্য। ইবনে মাসুদ বলেছেন, বার্তাবাহকদের হত্যা না করা সুন্নত। সাংবাদিকরা সৎ হলে এবং গুপ্তচর না হয়ে থাকলে তারা হলেন সত্যের বার্তাবাহক। কারণ মানুষের কাছে সত্য তুলে ধরাটাই তাদের কাজ। আপনারা নৃশংসভাবে সাংবাদিক জেমস ফোলি ও স্টিভেন সটলফকে হত্যা করেছেন। এমনকি সটলফের মা আপনাদের কাছে তার ছেলের প্রাণ ভিক্ষা চাওয়ার পরও আপনারা তাকে দয়া করেননি। ত্রাণকর্মীরাও ক্ষমা ও দয়ার বার্তাবাহক। কিন্তু আপনারা ত্রাণকর্মী ডেভিড হেইন্সকেও রেহাই দেননি। আপনারা যা করেছেন তা নিঃসন্দেহে হারাম।

BanglaBook.org

৮. জিহাদ

আল্লাহ বলেছেন, 'হে মানুষ, তোমরা যারা ঈমান এনেছ' কি হলো তোমাদের? যখন তোমাদের আল্লাহর পথে বের হতে বলা হয়, তখন তোমরা যমিন আঁকড়ে ধরো'(৯:৩৮), এবং 'সেইসব লোকের সাথেই লড়াই করো, যারা তোমাদের সাথে লড়াই করে। কিন্তু কখনো সীমা লঙ্ঘন করো না। কারণ আল্লাহ সীমা লঙ্ঘণকারীকে পছন্দ করেন না'(২:১৯০)। এমন আরও অনেক আয়াত আছে। ঈমাম শফিসহ আরও অনেক ইসলামি চিন্তাবিদ বলেছেন—জিহাদ একটি সামগ্রিক দায়িত্ব, ব্যক্তিগত নয়। কারণ আল্লাহ বলেছেন, 'এদের সবার জন্য আল্লাহ উত্তম পুরস্কারের ওয়াদা করেছেন। তবে আল্লাহ ঘরে বসে থাকা মানুষের চেয়ে জিহাদিদেরকেই বেশি পছন্দ করেন' (৪:৯৫)।

জিহাদ একটি ইসলামি শব্দ। তবে অন্য কোনো মুসলমানের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম কখনও জিহাদ নয়। ইসলামি চিন্তাবিদরাও একমত হয়েছেন যে বাবা-মায়ের সম্মতি ছাড়া জিহাদ হয় না। এর প্রমাণ হলো, একবার এক লোক নবীজির কাছে এসে জিহাদের অনুমতি চাইল। নবীজি বললেন, আপনার বাবা মা কি বেঁচে আছেন? লোকটি বলল, জি। নবীজি বললেন, তাদের সেবা করেই জিহাদ করুন।

ইসলামে মূলত দুই ধরনের জিহাদ আছে। সবচেয়ে বড় জিহাদ হলো নিজের আত্মার সাথে জিহাদ। আর ছোট জিহাদ হলো শত্রুর বিরুদ্ধে। বড় জিহাদ সম্পর্কে নবী মোহাম্মদ (সঃ) বলেছেন, 'আমরা বড় জিহাদ থেকে ছোট জিহাদের দিকে ফিরেছি'। আপনারা যদি এই হাদিসকে দুর্বল বলেন, উত্তর হলো, হাদিসটির প্রমাণ দেয় স্বয়ং কুরআন। বলা হয়েছে, 'তুমি কাফেরদের পেছনে পড়ো না বরং কুরআন দিয়ে তাদের মোকাবিলা করো'(২৫:৫২), এবং 'অন্তরের ব্যাধির নিরাময়'(১০:৫৭)। বিষয়টি এই হাদিসটি থেকে আরও ভালোভাবে বোঝা যাবে, যেখানে নবী বলেছেন, 'আমি কি তোমাদের সবচেয়ে ভালো কাজটি সম্পর্কে বলেছি? তোমাদের মালিকের চোখে সবচেয়ে ভালো ধর্মীয় কাজ কি তোমরা জানো? তোমার শত্রুর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরা বা যুদ্ধে নিজের সব সম্বল দান করার চেয়েও ভালো কাজ কি জানো? আল্লাহর জিকির করো, তাঁকে ডাকো। এভাবেই সবচেয়ে বড় জিহাদের মর্যাদা পেয়েছে নিজের আত্মার বিরুদ্ধে জিহাদ। আর এর অস্ত্র হলো জিকিরের মধ্য দিয়ে আত্মার শুদ্ধি। আরেকটি আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ দুই ধরণের জিহাদ সম্পর্ককে পরিষ্কার করেছেন, 'হে ঈমানদার, তোমরা যখন কোনো বাহিনীর মুখোমুখি হও, তখন ময়দানে অবিচল থাকবে এবং আল্লাহ তাআলাকে বেশি বেশি স্মরণ করবে। আশা করা যায় তোমরা সফল হবে'(৮:৪৫)। জিহাদ হলো শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার উপায়। আল্লাহ বলেছেন, 'তাদের সাথে তোমরা লড়াই করতে থাকো যতক্ষণ না বিবাদ অবশিষ্ট থাকে। যদি তারা ফিরে আসে, তবে তাদের সাথে আর কোনো বাড়াবাড়ি নয়'(২:১৯৩)।

২০১৪ সালের ৪ জুলাই দেওয়া ভাষণে আপনি বলেছেন, 'জিহাদ ছাড়া জীবন নয়'। এটা মূলত আল কুরতুবির দেওয়া কোরআনের একটি আয়াতের ব্যাখ্যা। আয়াতটি হলো, 'হে ঈমানদার লোকেরা, তোমরা আল্লাহ ও রসুলের ডাকে সাড়া দাও, যখন তারা তোমাদের এমন কিছুর জন্য ডাকেন, যা তোমাদের প্রকৃত জীবন দান করবে'(৮:২৪)। সত্যিকারের জিহাদ মানুষের হৃদয়কে প্রসারিত করে। যা-ই হোক, জিহাদ ছাড়াও জীবন সম্ভব। কারণ মুসলমানরা চাইলেই সশস্ত্র সংগ্রাম না করেও সমস্যার সমাধান করতে পারে। কাজেই জিহাদের দরকার নেই। আর ইসলামের ইতিহাসে এমন উদাহরণেরও অভাব নেই।

আপনি বা আপনার সহযোদ্ধারা ভয়শূন্য আর জিহাদে অংশ নিয়ে আপনারা নির্দিধায় জীবন দিতে পারেন কথাটি সত্যি। কিন্তু আইনসম্মত কারণ, বৈধ লক্ষ্য উদ্দেশ্য ও আইনসম্মত পন্থা ছাড়া কোনো জিহাদই আসলে জিহাদ নয়। বরং এটা যুদ্ধবাজি ও অপরাধ।

BanglaBook.org

ক. জিহাদের উদ্দেশ্য

আল্লাহ বলেছেন, 'মানুষ ততটুকুই পাবে, যতটুকু সে চেষ্টা করবে'(৫৩:৩৯)। আবু মুসা আল আশারি বলেছেন, একবার এক লোক নবী মোহাম্মদ (সঃ)-এর কাছে এসে জিজ্ঞেস করল, একজন মানুষ গভীর আবেগের জন্য জিহাদ করতে পারে, সাহসের জন্য করতে পারে, বা গর্বের জন্য করতে পারে, এগুলোর মধ্যে কোনটি আল্লাহর পথে বেশি দরকার? নবী উত্তর দিলেন, 'আল্লাহর বাণীর জন্য যে যুদ্ধ করবে, সেটাই আল্লাহর পথে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পাবে। শহীদদের হাশরের ময়দানে সবার সামনের সারিতে রাখা হবে। তাদের গা থেকে আলো ঝরবে যাতে সবাই তাদের চিনতে পারে। তাদের জিজ্ঞেস করা হবে, ওদের সাথে তুমি কি করেছিলে? তারা জবাব দেবে, আমি মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তোমার জন্য যুদ্ধ করেছি। আল্লাহ বলবেন, তোমরা মিথ্যা বলছো, তোমরা যুদ্ধ করেছো মানুষ তোমাদের গুণগান গাওয়ার জন্য, এবং তাই করা হয়েছে। তখন তাদের আগুনে নিক্ষেপ করার নির্দেশ দেওয়া হবে'।

খ. জিহাদের পেছনের কারণ

মুসলমানদের জন্য জিহাদের পেছনের কারণ হলো আত্মরক্ষা। অর্থাৎ তাদের বিরুদ্ধেই জিহাদ হবে, যারা মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করবে। যারা নিজে থেকে যুদ্ধ করে না তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ হবে না। জিহাদের অনুমোদন দিতে গিয়ে আল্লাহ বলেছেন, 'যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চলছিল, তাদেরও অনুমতি দেওয়া হলো কারণ তাদের ওপর অত্যাচার হচ্ছিলো। নিশ্চয়ই আল্লাহ মজলুমদের সহায়তা করতে সক্ষম। যাদের অন্যায়ভাবে তাদের বাড়ি থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে, শুধু এ কারণে যে, তারা বলেছিল, আমাদের মালিক হচ্ছেন আল্লাহ। আল্লাহ যদি দুনিয়ায় এক পক্ষ দিয়ে আরেক পক্ষকে শায়েস্তা না করতেন তবে দুনিয়া থেকে উপাসনালয় ও গির্জাগুলো ধ্বংস হয়ে যেত। এমনকি মুসলমানদের মসজিদও থাকত না, যেখানে সবচেয়ে বেশি আল্লাহর নাম নেওয়া হয়। আল্লাহ অবশ্যই তাকে সাহায্য করেন, যে তার দ্বীনকে সাহায্য করে। অবশ্যই আল্লাহ শক্তিমান ও মহাপরাক্রমশালী' (২২:৩৯-৪০)। জিহাদ আসলে নিরাপত্তা আর ধর্মের স্বাধীনতার নামান্তর। কাউকে তার ভূমি থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার নাম জিহাদ নয়। এই হাদিস দুটো নাযিল হয়, যখন নবী ও তাঁর সাহাবিরা মূর্তি উপাসকদের দ্বারা ১৩ বছর ধরে নির্যাতিত হয়েছেন। তাদেরকে নির্বিচারে হত্যা করা হয়েছে। তাদের ওপর অকথ্য নির্যাতন চালানো হয়েছে। তারপরও সহিংস জিহাদের কোনো স্থান ইসলামে নেই। শুধু মাত্র

BanglaBook.org

ভিন্ন ধর্মের অনুসারী হবার কারণে কারো বিরুদ্ধে জিহাদ করা যাবে না। আবু হানফাসহ বিভিন্ন ঈমাম, যেমন মালিক আহমেদ ও অন্যান্য ইসলামি চিন্তাবিদরাও এ কথাই বলেছেন।

গ. জিহাদের লক্ষ্য

জিহাদের লক্ষ্য নিয়ে ইসলামি চিন্তাবিদদের মধ্যে কোনো দ্বিমত নেই। কারণ আল্লাহ বলেছেন, 'পৃথিবীতে যতক্ষণ বিভেদ অবশিষ্ট থাকে, ততক্ষণ তাদের সাথে লড়াই করো, তারা যুদ্ধ থেকে ফিরে এলে তাদের সাথে আর কোনো বাড়াবাড়ি নয়, তবে যালেমদের জন্য এটা প্রযোজ্য নয়' (২:১৯৩)। এরপর নবী বলেছেন, আমার প্রতি নির্দেশ আছে ততক্ষণ পর্যন্ত লড়াই করার, যতক্ষণ না ওরা বলছে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নাই। কাজেই যারাই আল্লাহর একত্ববাদে আস্থা রাখে তারাই বেঁচে গেল। এই আয়াতে স্পষ্ট করেই বলা আছে, মুসলমানদের জিহাদে জয় পরাজয়ের নির্ধারক কি। এক্ষেত্রে জিহাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে একে মিলিয়ে ফেলার কোনো সুযোগ নেই। সব চিন্তাবিদরাই এ ব্যাপারে একমত। ওপরের হাদিসটিতে এমন একটি ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে, যা আল্লাহর নির্দেশে করা হয়েছিল। আল্লাহর একটি বাণী বিষয়টিকে আরও স্পষ্ট করবে। 'তিনিই সেই মহান সত্তা, যিনি তার রসুলকে সঠিক পথ-নির্দেশ ও জীবন বিধান দিয়ে পাঠিয়েছেন, যাতে দুনিয়ার অন্য সব বিধানের ওপর একে আল্লাহর রসুল বিজয়ী করে দিতে পারেন। আর সত্যের পথে সাক্ষ্য দিতে আল্লাহই যথেষ্ট' (৪৮:২৮। নবীদের আমলে আরবে এই ঘটনাটি ঘটেছিল। আল্লাহ বলেছেন, 'এই কিতাব দিয়ে তুমি মক্কা ও এর আশেপাশের লোকদের সাবধান করবে' (৬:৯২), এবং হে ঈমানদার, কাফেরদের মধ্যে তোমাদের কাছে যারা আছে, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো' (৯:১২৩)। নবীও বলেছেন, আরব থেকে মূর্তি উপাসকদের হটাও। আল্লাহ তাঁর রসুলকে ওয়াদা করেছেন, 'তিনি তাঁর রসুলকে সঠিক পথ-নির্দেশ ও জীবন বিধান দিয়ে পাঠিয়েছেন, যাতে দুনিয়ার অন্য সব বিধানের ওপর একে আল্লাহর রসুল বিজয়ী করে দিতে পারেন। তা মুশরিকরা যতই অপছন্দ করুক' (৬১:৯)। নবীর আমলে আরবের যে অবস্থা ছিল, তাতে জিহাদ ছিল অপরিহার্য। সে সময় মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষার জন্যই জিহাদ দরকার ছিল। এ কারণে সে সময় একে সমর্থন দেওয়া হয়েছিল। যেমন আল্লাহ বলেছেন, 'তারা যুদ্ধ থেকে ফিরে এলে তাদের সাথে আর কোনো বাড়াবাড়ি নয়। তবে যালেমদের জন্য এটা প্রযোজ্য নয়' (২:১৯৩)। হুদায়বিয়ার যুদ্ধই এর প্রমাণ।

BanglaBook.org

ঘ. জিহাদের নিয়ম-কানুন

জিহাদের নিয়ম-কানুন সম্পর্কে নবী মোহাম্মদ (সঃ)-এর একটি হাদিসে বলা হয়েছে যুদ্ধ করো, কিন্তু সহিংস হয়ো না। কখনও বিশ্বাসঘাতকতা করো না। শিশুদের ওপর কখনও নির্যাতন চালিও না বা তাদের হত্যা করো না।' মক্কা বিজয়ের পর নবী বলেছেন, 'যারা যুদ্ধ থেকে পিছিয়ে পড়েছে তাদের হত্যা করো না, আহতদের ক্ষতি করো না, যারাই যুদ্ধ থেকে দুরে থাকে, তারা যেন নিরাপদে থাকে।' একইভাবে আবু বকর সিদ্দিক যখন সেনাবাহিনী গঠন করে তাদের আশেপাশের এলাকা দখল করতে পাঠালেন, তখন বলেছিলেন, 'তোমরা এমন লোকদের খুঁজে বের করবে যারা ধর্ম কর্মে জীবন উৎসর্গ করেছেন। তাদের ছেড়ে দাও। আর এমন লোকদেরও তোমরা খুঁজে পাবে, যাদের মস্তিষ্ক ও মন শয়তানের হয়ে কাজ করে। তাদেরকে আঘাত করো। কখনই বয়স্ক ও অসুস্থদের হত্যা করো না। নারী ও শিশুদের হত্যা করো না। স্থাপনা ধ্বংস করো না, গাছ কেটো না। উপযুক্ত কারণ ছাড়া কোনো জীব হত্যা করো না। সহিংস হয়ো না, কারো সাথে অমানবিক আচরণ করো না, কাপুরুষ হয়ো না, আর লুটতরাজ করো না। আল্লাহ তাদেরই সাহায্য করেন, যারা নিজেকে সাহায্য করে, তাঁর রসুলকে সাহায্য করে। আল্লাহ মহা শক্তিমান ও দয়ালু'।

বন্দিদের হত্যা করা ইসলামি আইনে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। অথচ আপনারা অনেক বন্দিকে হত্যা করেছেন। ২০১৪ সালের জুনে ইরাকের তিকরিতে ক্যাম্প স্পিচারে সতের শো বন্দি, জুলাই মাসে শায়ের গ্যাসফিল্ডে দু শো বন্দি, দাইর আল জৌর এলাকায় সাতশো আদিবাসী, যাদের মধ্যে ছয় শো মানুষই ছিল নিরস্ত্র সাধারণ মানুষ, সিরিয়ার রাক্কার তাবকাহ বিমান ঘাঁটিতে আড়াইশ বন্দি, কুর্দি ও লেবানিজ যোদ্ধা আরও কত মানুষকে যে আপনারা যৌক্তিক কোনো কারণ ছাড়াই হত্যা করেছেন, তা আল্লাহই জানেন। এসবই নৃশংস যুদ্ধাপরাধ।

আপনারা যদি দাবি করেন, নবীও অনেক বন্দিকে যুদ্ধের সময় হত্যা করেছেন তবে উত্তর হলো, নবী কেবল একবার দুজন বন্দিকে হত্যার নির্দেশ দিয়েছিলেন। সময়টা ছিল বদর যুদ্ধে। উকবাহ ইবনে আবি মুয়াত ও নাদির ইবনে আল হারিতকে হত্যার নির্দেশ দেন তিনি। কারণ তারা ছিল যুদ্ধ ও যুদ্ধাপরাধীদের নেতা। আর যুদ্ধাপরাধীদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া যায় যদি শাসক নির্দেশ দেন। জেরুজালেম দখলের সময় সালাদিনও একই কাজ করেছিলেন। একই রকম বিচার ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর নুরেমবার্গ ট্রায়ালেও। মোট দশ

BanglaBook.org

বছরের ২৯টি যুদ্ধে হাজারো সেনা নবীজির আদালতে এসেছে। কিন্তু তিনি একজন সেনাকেও মৃত্যুদণ্ড দেননি। সবাইকেই তিনি দয়া দেখিয়েছেন,ক্ষমা করেছেন। যুদ্ধ বন্দিদের বিষয়ে আল্লাহর নির্দেশ হলো, 'এরপর বন্দিদের মুক্তি দেবে, অথবা তাদের কাছ থেকে মুক্তিপণ আদায় করে ছেড়ে দেবে'(৪৭:৪)। আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন বন্দিদের সাথে সবসময় সম্মানজনক আচরণ করতে হবে। আল্লাহ বলেছেন, 'এরা শুধু আল্লাহর ভালোবাসায় উদ্বুদ্ধ হয়েই মিসকিন এতিম ও বন্দিদের খাবার দেয়' (৭৬:৮)। বন্দিদের বিষয়ে নবীজির সুন্নত হলো মার্জনা ও ক্ষমা। মক্কা বিজয়ের সময় নবী বলেন, আমার ভাই জোসেফ যেমনটি বলল, আমিও তেমনই বলছি, আজ তোমাদের কোনো নিন্দা করা হবে না। তোমরা আজ মুক্ত।

জিহাদের আচরণ বিধিতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নীতি হলো, শুধুমাত্র যোদ্ধাদের হত্যা করা যায়, তাদের পরিবার বা বেসামরিক মানুষকে কোনো অবস্থাতেই হত্যা করা যাবে না। যুদ্ধের প্রত্যক্ষদর্শী ও নারীদের হত্যা প্রসঙ্গে নবীজিকে যখন জিজ্ঞাসা করা হয়, তিনি উত্তর দেন, তারা ওদের দলেই। অর্থাৎ যুদ্ধের সময় দুর্ঘটনাবশত যে নারী ও সাধারণ মানুষ প্রাণ হারান তাদের কথা বলা হয়েছে। এখানে অবশ্যই নিরীহ মানুষকে ইচ্ছা করে হত্যার কথা বলা হয়নি। আল্লাহ বলেছেন, 'কাফেরদের ওপর কঠোরতা অবলম্বন করো '(৯:৭৩) এবং 'কাফেররা যেন তোমাদের মধ্যে কঠোরতা দেখতে পায়'(৯:১২৩)। তবে এটা শুধু যুদ্ধ মুহূর্তের কথা বলা হয়েছে। অবশ্যই যুদ্ধের পরে নয়।

BanglaBook.org

৯. কাউকে অমুসলিম ঘোষণা করা যাবে না (তাকফির)

কিছু ইসলামি চিন্তাবিদের অতিরঞ্জিত ব্যাখ্যার ফলে তাকফির সম্পর্কে মানুষের মধ্যে ভুল ধারণা তৈরি হয়েছে। তাদের এসব অতিরঞ্জনের প্রসঙ্গে ইবনে তাইমিয়াহ ও ইবনে আল কাইয়ুম তাদের বিভিন্ন লেখনীতে তাকফিরের যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা নিম্নরূপ:

ক. বিশুদ্ধ ইসলাম বলে আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নাই। মোহাম্মদ (সঃ) আল্লাহ'র রাসুল। যারা এটা বিশ্বাস করেন তারাই মুসলমান। তাদের কোনোভাবেই অমুসলিম ঘোষণা করা যাবে না। আল্লাহ বলেছেন, 'হে ঈমানদাররা, তোমরা যখন আল্লাহর পথে বের হবে, তখন বিচার বুদ্ধি প্রয়োগ করবে। কোনো ব্যক্তি যখন তোমাদের সামনে সন্ধির প্রস্তাব করে, তখন কিছু বৈষয়িক ধন-সম্পদের প্রত্যাশায় তাকে তোমরা বলো না তুমি ঈমানদার নও।

আল্লাহর কাছে সম্পদ প্রচুর আছে। আগে তোমরাও এমনই ছিলে। এরপর আল্লাহ তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। কাজেই তোমরা যাচাই বাছাই করে নিও। তোমরা যাই করো, আল্লাহ সব জানেন' (৪:৯৪)। এখানে যাচাই বাছাইর কথা বলা হচ্ছে এই অর্থে যে, তাদের কাছে জানতে চাইতে হবে, তোমরা কি মুসলমান? তাদের মুখের উত্তরটাই এখানে যথেষ্ট হবে। তাদের বিশ্বাসের পরীক্ষা নেওয়ার কোনো দরকার নেই। নবী মোহাম্মদ (সঃ) বলেছেন, তোমাদের কাছে আমার আর্তি হলো, আমার মৃত্যুর পর তোমরাও যেন একে অন্যকে আঘাত করতে করতে কাফেরে পরিণত না হও। তিনি আরও বলেন, যারাই বলে আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নাই, তারাই নিজেদের ও তাদের সম্পদ বাঁচাল। ইবনে ওমর ও বিবি আয়েশাও বলেছেন, কিবলার দিকের মানুষকে অমুসলমান বলা যাবে না।

খ. বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এটা মুসলমানদের রক্ত ঝরানো, তাদের পবিত্রতা নষ্ট করা, তাদের সম্পদ ও তাদের অধিকার খর্ব করাটাকে বৈধতা দিতে ব্যবহার করা হয়। আল্লাহ বলেছেন, 'যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো ঈমানদারকে হত্যা করবে তার শাস্তি জাহান্নাম, সেখানে সে অনন্তকাল পড়ে থাকবে, আল্লাহ তায়ালা তার ওপর ভয়ানকভাবে রুষ্ট, তাকে তিনি লানত দেন। তিনি তার জন্য যন্ত্রণাদায়ক আযাব প্রস্তুত করে রেখেছেন' (৪:৯৩)। নবীও বলেছেন, কেউ যদি তার ভাইকে বলে সে ঈমানদার নয়, তবে সে নিজেও নিশ্চিতভাবেই সেই দলে পড়বে। যে মৌখিকভাবে ইসলামের প্রতি নিজের বিশ্বাস ঘোষণা করে, তাদের হত্যার বিষয়ে আল্লাহ সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন, 'অতএব এরা যদি তোমাদের কাছ থেকে আলাদা হয়ে যায়, লড়াই থেকে বিরত থাকে, তোমাদের কাছে শান্তি ও সন্ধির প্রস্তাব পাঠায়, তাহলে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের কোনো পন্থাই আল্লাহ তায়ালা তোমাদের জন্য খোলা রাখবেন না' (৪:৯০)। নবী মোহাম্মদ (সঃ) কাউকে মুশরিক আখ্যা দেওয়া ও তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরার বিষয়ে সবাইকে সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন, তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিকে আমি সবচেয়ে ক্ষতিকর মনে করি, যে কুরআন পাঠ করেছে এরপর তা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে তার প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে অস্ত্র তুলেছে। আর তাকে মুশরিক আখ্যা দিয়েছে।

কোনো মুসলমান যদি নিরস্ত্র হয় ও যোদ্ধা না হয়, তবে তাকে হত্যা করা জায়েজ নয়। ওসামা ইবনে জায়েদ-এর ব্যাখ্যা দিয়ে বলেছেন, তিনি যখন এমন একজন মানুষকে হত্যা করেন, যে বলেছিল, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নাই, নবীজি তাকে জিজ্ঞেস করেছেন, সে বলল আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নাই, তবু তুমি তাকে মেরে ফেললে? তিনি জবাব দিলেন, হে আল্লাহর রসুল

BanglaBook.org

সে তো অস্ত্রের ভয়ে এই কথা বলেছে। নবী বললেন, তুমি কি তার মনের ভেতরে ঢুকেছ, যে তুমি নিশ্চিত সত্যিই সে এটা বিশ্বাস করে কিনা?

অথচ ইরাকে সাকের ওয়াহিব নামের এক আইএস সদস্য নিরস্ত্র একজন মানুষকে রাস্তায় থামিয়ে তার ধর্ম জানতে চাইছে। তারা মুসলমান বলার পর সে তাদেরকে বিভিন্ন নামাজের রাকাত সম্পর্কে প্রশ্ন করেছে। কেউ ভুল জবাব দিলেই তাকে মেরে ফেলা হচ্ছে। ইউটিউবে দেওয়া ভিডিওতে আপনারাই এর প্রমাণ রেখেছেন। অথচ ইসলামে এটি নিষিদ্ধ তো বটেই এমনকি ঘৃণ্য অপরাধ।

গ. মানুষের সব কর্মকাণ্ডের সাথে তার উদ্দেশ্যের সম্পর্ক থাকে। নবী বলছেন, কাজ হলো উদ্দেশ্য আর সবাই তার উদ্দেশ্যের প্রতিফল পাবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ কোরআনের বলেছেন, 'মোনাফেকরা যখন তোমার কাছে আসে তখন তারা বলে, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি তুমি আল্লাহর রসুল। আল্লাহও জানেন, তুমি নিশ্চয়ই আল্লাহর রসুল। আর আল্লাহ এও জানেন, মোনাফেকরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী' (৬৩:১)। এখানে মোনাফিক শব্দটির ব্যাখ্যা আল্লাহ দিয়েছেন এভাবে, শব্দটির সবচেয়ে সঠিক অর্থ হলো মিথ্যা। অর্থাৎ তারা যখন কথা বলে, তাদের লক্ষ্য ছিল মিথ্যা বলা। যদিও বিষয়টি সত্য। এটা মিথ্যা কারণ, মুখে সত্যিটা স্বীকার করলেও মন থেকে যে তারা এটা অস্বীকার করে তা আল্লাহ জানেন। অর্থাৎ অবিশ্বাসের জন্যেও মন থেকে অবিশ্বাস করতে হবে। অবিশ্বাসের উদ্দেশ্যও থাকতে হবে। অবচেতন মনে কোনো কথা বললে বা কাজ করলেই তা মিথ্যা বা অবিশ্বাস হয়ে যায় না। কাউকে ইসলাম ধর্মে অবিশ্বাসী বলার অনুমোদন নেই যতক্ষণ না তার উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায়ের কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়। শুধু তাই নয়, ব্যক্তির উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায়ের যথাযথ প্রমাণ ছাড়া কাউকে অমুসলিম ঘোষণা করার অনুমোদনও ইসলাম দেয়নি। এমনও হতে পারে ওই ব্যক্তি বাধ্য হয়েছিল বা সে ওই সময় অজ্ঞ অচেতন বা উন্মাদ ছিল। এমনও হতে পারে পুরো বিষয়টিই ভুল বোঝাবুঝি হয়েছিল। আল্লাহ বলেন, 'যে ব্যক্তি একবার ঈমান আনার পর যদি বাধ্য হয়ে কুফরি করে, কিন্তু তার অন্তরে যদি ঈমান থাকে, তবে আল্লাহ তাকে মাফ করে দেবেন। কিন্তু যে কুফরির জন্য নিজের অন্তরকে উন্মুক্ত রাখে, তাদের জন্যই আল্লাহর গযব রয়েছে' (১৬:১০৬)। কোনো ব্যক্তির কাজ কর্মের ব্যাখ্যা বা সে সম্পর্কে অনুমান করা ইসলামে নিষিদ্ধ। একমাত্র ব্যক্তি নিজেই তার কাজকর্ম ও উদ্দেশ্য-অভিপ্রায় সম্পর্কে বলার এখতিয়ার রাখেন। বিশেষ করে যেসব বিষয়ে মুসলমানদের মধ্যে মতভেদ আছে, সেসব বিষয়ের ক্ষেত্রে এই নিষেধাজ্ঞা বেশি প্রযোজ্য হবে। আবার ইসলামি চিন্তাবিদদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে এমন তর্কিত বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে কাউকে অমুসলিম ঘোষণা করা

BanglaBook.org

যাবে না, কোনো গোষ্ঠীকে অমুসলিম ঘোষণা করা যাবে না। আল্লাহ বলেন, 'কেয়ামতের দিন কেউ কারো গুনাহ'র ভার বহন করবে না' (৩৯:৭)। পরিশেষে সেইসব মানুষকে অমুসলিম ঘোষণা করা যাবে না, যারা অন্যের ধর্ম বিশ্বাস নিয়ে সন্দেহ পোষণ করেন না বা নিজেকে অমুসলিম ঘোষণা করেননি।

এ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার কারণ হলো, ইরাকের মোসুল ও সিরিয়ার আলেপ্পোতে গিয়ে আপনারাই মোহাম্মদ বিন আব্দেল ওয়াহাব-এর বই বিতরণ করেছেন। যে কোনো ক্ষেত্রেই ইবনে তাইমিয়াহ থেকে শুরু করে ইবনে আল কাইইম আল জাওজিয়াহ পর্যন্ত সব ইসলামি চিন্তাবিদরা একজন বিধর্মীর কার্যক্রম ও কাউকে অমুসলিম ঘোষণার মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করেছেন। অর্থাৎ কাফির (অবিশ্বাসী) ও তাকফিরের (অমুসলিম) মধ্যে পার্থক্য আছে। কারো কাজ কর্ম যদি অবিশ্বাসীর মতো হয়, শুধু এটুকুর ওপর ভিত্তি করে তাকে অমুসলিম ঘোষণা করা যায় না। আল ধাহাবি ও তার শিক্ষক ইবনে তাইমিয়াহ বলেছেন, উম্মাহর কোনো সদস্যকেই আমি অমুসলিম বলি না। নবীও বলেছেন, যেই ওযু করে পরিশুদ্ধ হয়, সেই মুসলমান। কাজেই যেই ওযু করে নামায পড়ে সেই মুসলমান।

নবী বলেছেন, ছোট শিরক হলো কেউ যখন শুধু লোক দেখানোর জন্য নামাজে দাঁড়ায়। অর্থাৎ ভান করাটাকে তিনি ছোট শিরক বলেছেন। এই ছোট শিরকে যদি কেউ পড়ে তাকে অনেক বড় করে দেখা হয় না। শুধু এই কারণে কাউকে তাকফির বা অমুসলিম বলা যাবে না। আল্লাহ বলেছেন, 'তারা আল্লাহ তায়ালাকে তার যথাযোগ্য মূল্যায়ন করতে পারেনি' (৬:৯১), 'হে নবী এরা তোমার কাছে জানতে চায় আত্মা কি? তুমি তাদের বলো, আত্মা হচ্ছে আল্লাহর আদেশ সম্পর্কিত বিষয়, তোমাদের যা জ্ঞান দেওয়া হয়েছে তা নিতান্তই কম' (১৭:৮৫)। আল্লাহ এ ধরনের নামাজ কবুল করেন। আর মানুষ কখনও আল্লাহর মতো ধারণ করতে পারে না। কারণ 'কোনো কিছুই তার মতো নয়'(৪২:১১) এবং 'কোনো দৃষ্টিই তাঁকে দেখতে পায় না কিন্তু তিনি সব দেখতে পান' (৬:১০৩)। আল্লাহর সম্পর্কে ততটুকুই জানা যায়, যতটা তিনি নিজের সম্পর্কে প্রকাশ করেছেন, কোরআন ও নবীদের মাধ্যমে। আল্লাহ বলেছেন, 'তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে যার ওপর ইচ্ছা, তার ওপর তাঁর আদেশসহ ওহী পাঠান' (৪০:১৫)। কাজেই কীভাবে অন্য কারো বিরুদ্ধে অস্ত্র তোলা যায় শুধু এই কারণে যে, তারা বিশ্বাস করে আল্লাহর ইবাদত যেভাবে করা উচিত সেভাবে তারা পারছে না? আল্লাহর নির্দেশ ও অনুমোদন ছাড়া কেউই তাঁর মতো করে তাঁর ইবাদত করতে পারে না। আরবদের কাছে শিরক আসলে তর্ক। নবী বলেছেন, শয়তান আশা ছেড়ে দিয়েছে। ভাবছে আরবে

BanglaBook.org

যারা ইবাদত করে তারা আল্লাহর নৈকট্য পাবে। আর এজন্যই সে তাদের মধ্যে বিভেদের বীজ বপন করতে চায়।

১০. অন্য ধর্মের মানুষদের প্রতি নির্মম আচরণ

আরবের খ্রিস্টানদের জন্য আপনারা তিনটি বিকল্প দিয়েছেন। এক জিজিয়া কর, দুই অস্ত্র আর তিন ইসলাম গ্রহণ করা। তাদের ঘরগুলোকে আপনারা লাল রঙে রাঙিয়েছেন। যাতে তাদের চিহ্নিত করা যায়। তাদের গীর্জাগুলো আপনারা ধ্বংস করেছেন। আর কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাদের ধন সম্পদ লুট করেছেন। তাদের মানুষদের আপনারা হত্যা করেছেন, বাড়ি ঘর ছাড়তে বাধ্য করেছেন। তারা শুধু জীবনটা নিয়ে পালাতে পেরেছে। অথচ তারা ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছিল না। এমনকি তারা ইসলামের বিরুদ্ধে অবস্থানও নেয়নি। বরং তারা আমাদেরই প্রতিবেশী বন্ধু সাধারণ মানুষ। শরিয়া আইন অনুযায়ী এখনও তারা ১৪শ বছর আগের একটি চুক্তির অধিকার দাবি করতে পারে। যে চুক্তি তাদের নিজ বাসভূমে থাকার অধিকার দিয়েছে নিজ নিজ ধর্ম পালনের অধিকার দিয়েছে। যে কারণে জিহাদের নিয়ম নির্দেশ তাদের ওপর বর্তায় না। এমনকি তাদের পূর্বপুরুষদের কেউ কেউ নবীজির সাথে বাইজেনটাইনদের বিরুদ্ধেও যুদ্ধ করেছেন। তখন থেকেই তারা মদিনার নাগরিক। বাকিরা সেই সনদের মধ্যে পড়েন, যেই সনদ তাদের কাছে নিশ্চিত করেছিলেন ওমর ইবনে আল খাত্তাব, খালিদ ইবনে আল ওয়ালিদ, উমাইয়া সম্প্রদায় আব্বাসিয় সম্প্রদায় ও অটোমান সাম্রাজ্যের মানুষ। অর্থাৎ তারা আরবের বাইরের মানুষ নন। বরং ইসলামি যুগের অনেক আগে থেকে তারাই ছিল এই অঞ্চলের আদি মানুষ। তারা শত্রু নয়, বন্ধু। গত ১৪শ বছর ধরে তারা তাদের দেশকে ক্রুসেডরে, উপনিবেশের ইসরাইলের ও অন্যান্য যুদ্ধের হাত থেকে রক্ষা করেছে। কোন যুক্তিতে আপনারা তাদের শত্রু বলছেন? কুরআনে আল্লাহ বলেছেন, 'যারা ইসলামের বিষয়ে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি, যারা কখনও তোমাদের ঘর ছাড়তে বাধ্য করেনি, তাদের প্রতি দয়া না দেখালে, ন্যায় আচরণ না করলে আল্লাহ কোনোদিন তোমাদের ক্ষমা করবেন না। অবশ্যই আল্লাহ ন্যায়পরায়নদেরই ভালোবাসেন' (৬০:৮)।

জিজিয়া করের বিষয়ে বলা যায়, দুই ধরনের জিজিয়া কর আছে। এক. সহজেই দমন করা হয়েছে এমন কারো ওপর এটি ধার্য করা হয়। এই কর আরোপ করা হয় কেবল তাদের বিরুদ্ধে যারা ইসলামের বিরুদ্ধে যারা যুদ্ধ করে পরাজিত হয়েছে। আল্লাহর বাণী থেকেই এটা স্পষ্ট। আল্লাহ বলেছেন, 'যারা আল্লাহ তায়ালার ওপর ঈমান আনে না, যারা পরকালের ওপর ঈমান

BanglaBook.org

আনে না, আল্লাহ ও তার রাসুল যা কিছু হারাম করেছেন, তা স্বীকার করে না, যারা সত্য ও ন্যায়ের পথকে জীবন ব্যবস্থা হিসেবে গ্রহণ করে না, তাদের বিরুদ্ধে ততক্ষণ লড়াই চালিয়ে যাও, যতক্ষণ না তারা স্বেচ্ছায় পদানত হয়ে জিজিয়া করা দিতে শুরু করে' (৯:২৯)। যেমন এই সুরাটির আরেকটি আয়াতও স্পষ্ট করে, মুসলমানদের যারা ইচ্ছা করে প্রতিরোধ করার জন্য আঘাত করে তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'তোমরা কি এমন একটি দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে না? যারা নিজেদের অঙ্গিকার ভঙ্গ করেছে? যারা রাসুলকে দেশ থেকে বের করার সংকল্প করেছে এবং তারাই তো প্রথম তোমাদের ওপর হামলা শুরু করেছে, তোমরা কি তাদের ভয় করো? যদি তোমরা মুমিন হও তবে তোমাদের আল্লাহ তায়ালাকেই বেশি ভয় করা উচিত'(৯:১৩)।

দ্বিতীয় ধরনের জিজিয়া কর ধার্য হয় সেইসব মানুষের ওপর, যারা ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে না। এই জিজিয়া কর দেওয়া হয় যাকাতের পরিবর্তে। যাকাতের চেয়ে এর পরিমাণ কম। তবে এটি আদায় করতে হয় চুক্তির মাধ্যমে আপোষে। জোর জবরদস্তি করে নয়। ওমর ইবনে আল খাত্তাব বলেছেন, একে সদগাও বলা চলে। এই জিজিয়া কর জমা হয় রাষ্ট্রীয় কোষাগারে এবং নাগরিকদের মধ্যে এটি বিতরণ করা হয়। এমনকি দরিদ্র খ্রিস্টানরাও এর অংশ পান। হযরত ওমরের খিলাফতে সেটাই হয়েছে।

BanglaBook.org

১১. ইয়াজিদিদের ওপর হত্যা নির্যাতন

জিহাদের ব্যানারে আপনারা ইয়াজিদিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছেন। কিন্তু তারা তো আপনাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি। তারা ইসলামের বিরুদ্ধেও যুদ্ধ করেনি। আপনারা তাদের শয়তান আখ্যা দিয়েছেন। আর তাদের হয় মুসলমান হবার না হয় মৃত্যুকে বেছে নেবার বিকল্প দিয়েছেন। হাজারো ইয়াজিদি নারী-পুরুষ শিশু ও বয়স্কদের আপনারা হত্যা করেছেন। জ্যান্ত কবর দিয়েছেন। শুধু ওরাই নয় আপনারা আরও বহু মানুষের মৃত্যু ও ভোগের কারণ হয়েছেন। এগুলো ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ। মার্কিন ও কুর্দিদের ইন্ধনেই কী আপনারা এটা করছে না? শরিয়া আইন অনুযায়ী ইয়াজিদিরা পারস্যের আদিবাসী। মহানবী বলেছিলেন, তাদের সাথে তেমনই ব্যবহার করো, যেমন তোমরা ধর্মানুসারীদের সাথে করো। কাজেই তারাও ধর্মানুসারী। আল্লাহ বলেছেন, 'যারা ঈমান এনেছে যারা ইহুদী হয়ে গেছে যারা ছিল সাবেয়ী, খ্রিস্টান ও অগ্নিপূজক, যারা শিরক করেছে, কেয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা তাদের সবার ফয়সালা করবেন। অবশ্যই আল্লাহ প্রত্যেক বস্তুর ওপর একক পর্যবেক্ষক' (২২:১৭)। তাদের ধর্মানুসারী হবার বিষয়ে আপনাদের যদি সন্দেহ থাকে

তবে তা দুর করুন। কারণ এই হাদিসটি দিয়ে অনেক ইসলামি চিন্তাবিদ ইয়াজিদিদের বিষয়ে ফয়সালা দিয়ে থাকেন। যেমন হিন্দু ও বৌদ্ধদেরও অমুসলিম উম্মত হিসেবেই গণ্য করা হবে। আল কুরতুবি বলেছেন, জিজিয়া তাদের ওপরই ধার্য হবে, যারা প্রতীমা বা আগুন পুজা করে। এমনকি যারা ধর্মে বিশ্বাস করে না বা অজ্ঞেয়বাদী। ইমাম মালিক বলেন, মূর্তি পূজক ও বিধর্মীদের সবার উপরই জিজিয়া কর আরোপিত হবে। তারা আরবের হোক বা আরবের বাইরেই হোক। যারা স্বধর্ম ত্যাগ করেছে, তাদের ওপরও জিজিয়া কর আরোপিত হবে।

১২. দাসত্ব

ইসলামের অন্যতম লক্ষ্য হলো দাসত্বের অবসান। এ বিষয়ে ইসলামি চিন্তাবিদদের মধ্যেও কোনো দ্বিমত নেই। আল্লাহ বলেছেন, 'তুমি কি জানো সেই দুর্গম পথটি কি? দাসত্বের শেকল খুলে কাউকে মুক্ত করে দেওয়া আর দুর্ভিক্ষের দিনে কাউকে কিছু খাবার দেওয়া' (৯০:১২-১৪) এবং 'পরস্পরকে স্পর্শ করার আগে তাদের জন্য বিধান হচ্ছে একটি দাসকে মুক্ত করে দেওয়া' (৫৮:৩)। নবীজিকে তাঁর জীবদ্দশায় দাস হিসেবে যত নারী ও পুরুষ দেওয়া হয়েছে বা যাদের তিনি যুদ্ধে জয় করেছেন, তাদের সবাইকেই তিনি মুক্তি দিয়েছেন। গত এক শতকেরও বেশি সময় ধরে দাস প্রথা নিষিদ্ধ এবং এটিকে অপরাধ বলে গণ্য করার বিষয়ে মুসলিম দেশগুলোসহ গোটা বিশ্বই একমত। মানব ইতিহাসে এটি ছিল একটি মাইলফলক অর্জন। অথচ দাসপ্রথা বিলুপ্তির বিষয়ে মুসলমানদের ঐক্যমতের একশো বছর পর আপনারা সেটি ভঙ্গ করেছেন। আপনারা নারীদের উপপত্নি করেছেন। কথিত যৌনজিহাদের নামে অবাধ যৌনাচার তথা ব্যাভিচারের অনুমেদান দিয়েছেন। এবং এসবের মাধ্যমে আপনারা দুনিয়ায় ফিতনা ফ্যাসাদ দুর্নীতি আর ব্যাভিচার বাড়িয়ে দিয়েছেন। আপনারা এমন একটি বিষয় আবারো শুরু করেছেন যা একশো বছর আগেই যার মিমাংসা হয়ে গেছে। দাস প্রথা বিলোপের সনদে বিশ্বের সকল মুসলিম দেশ স্বাক্ষর করেছে। এই মারাত্মক অপরাধের দায়ও আপনাদেরই নিতে হবে। আর এর জন্য ভবিষ্যতে বিশ্বের মুসলমানদের ওপর যে দূর্ভোগ নেমে আসবে তার দায়িত্বও আপনাদের ওপরই বর্তায়।

১৩. জোর করে অস্ত্রের মুখে ধর্মান্তর

আল্লাহ বলেছেন, 'তুমি তো তাদের ওপর বল প্রয়োগকারী বা দারোগা নও' (৮৮:২২), এবং 'দ্বীনের বিষয়ে কোনো জোর জবরদস্তি নেই, কারণ সত্য

মিথ্যা থেকে পরিষ্কার হয়ে গেছে' (২:২৫৬)। 'তোমার মালিক চাইলে এ যমীনে যত জীব আছে তারা সবাই ঈমান আনত। কিন্তু তিনি তা চাননি। তুমি কি সবার ওপর জোর জবরদস্তি করবে? যাতে সবাই মুমিন হয়ে যায়? '(১০:৯৯), 'হে নবী তুমি বলো, এই সত্য তোমাদের মালিকের পক্ষ থেকে এসেছে, এরপর যার ইচ্ছা ঈমান আনুক, আর যার ইচ্ছা অস্বীকার করুক' (১৮:২৯) এবং 'অতএব তোমাদের পথ তোমাদের জন্য আর আমার পথ আমার জন্য'(১০৯:৬)।

সবাই জানে ধর্মের বিষয়ে কোনো জোর জবরদস্তি নেই এবং এটিও একটি মিমাংসিত বিষয়। এই আয়াত নাযিল হয়েছিল মক্কা বিজয়ের পর। এরপর আর কেউ বলতে পারবে না যে এটি বাতিল করা হয়েছে। আপনারা মানুষকে অস্ত্রের মুখে ত্রাসের মাধ্যমে ইসলাম ধর্ম গ্রহণে বাধ্য করছেন। আবার যারা মুসলিম তাদের আপনারা বাধ্য করছেন আপনাদের মত গ্রহণ করতে। প্রত্যেকটি মানুষকে আপনারা আপনাদের ইচ্ছায় চলতে বাধ্য করছেন। এমনকি তাদের ব্যক্তিগত জীবনাচারেও আপনারা হস্তক্ষেপ করছেন। এমন সব বিষয়েও আপনারা হস্তক্ষেপ করছেন যা কিনা শুধু ব্যক্তি নিজে ও তার সৃষ্টিকর্তার মধ্যে সীমাবদ্ধ। সিরিয়ার আল রাক্কা, দাইর আল জৌর ও অন্যান্য এলাকায় মানুষের নিজের কোনো ইচ্ছা নেই। আপনাদের ইচ্ছাই চূড়ান্ত। সেখানে আল হিজবাহ নামের একদল সশস্ত্র লোক টহল দেয় আর মানুষকে তাদের ইচ্ছা অনুযায়ী চলতে বাধ্য করে। অথচ এই কাজগুলো ব্যক্তি নিজেই আল্লাহর নির্দেশে তার নিজের মতো করেই পালন করার কথা। এ ধরনের কর্মকাণ্ড কখনই কারো জন্য সম্মাজনক নয়। আল্লাহ যদি তা চাইতেন, তবে তা তিনি ও তাঁর নবীর বাণীতেই উল্লেখ করতেন। আল্লাহ বলেছেন, 'ঈমানদাররা কী এটা জেনেও নিরাশ হয়ে পড়ল যে, আল্লাহ তায়ালা চাইলে সবাইকেই হেদায়াত করতে পারতেন' (১৩:৩১), এবং 'আমি চাইলে আসমান থেকে এমন নিদর্শন নাযিল করতে পারি, যা দেখে তাদের মাথা নিচু হয়ে যাবে' (২৬:৪)।

১৪. নারীর প্রতি আচরণ

সহজ শব্দে নারীদের সাথে আপনারা পশু আর দাসের মতো ব্যবহার করছেন। আপনাদের খেয়াল খুশি মতো তাদের কাপড় পরতে বাধ্য করছেন। তারা নিজেদের বাড়িতে থাকতে পারছে না। স্কুল কলেজে যেতে পারছে না। অথচ নবীজি বলেছেন, প্রত্যেক মুসলমানের জন্য জ্ঞান আহরণ করা বাধ্যতামূলক।

BanglaBook.org

এমনকি কোরআনেরও প্রথম শব্দ হলো 'পড়'। অথচ আপনাদের কথিত খিলাফতে নারীরা কোনো কাজ করতে পারছে না, জীবন ধারণের জন্য রোজগার করতে পারছে না। তাদেরকে জোর করে আপনাদের যোদ্ধাদের সাথে বিয়ে দিচ্ছেন। আল্লাহ বলেছেন, 'হে মানুষ, তোমরা তোমাদের মালিককে ভয় করো, যিনি তোমাদের একটি মাত্র ব্যক্তি সত্ত্বা থেকে সৃষ্টি করেছেন। এরপর তিনি তা থেকে জুটি তৈরি করেছেন। এরপর তাদের মধ্য থেকে বহু সংখ্যক নারী ও পুরুষকে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দিয়েছেন। তোমরা ভয় করো আল্লাহ তায়ালাকে, যাঁর নামে তোমরা একে অপরের কাছে অধিকার দাবি করো, এবং সন্মান করো মাকে, অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা তোমাদের ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে চলেছেন' (৪:১)। আর নবীজি বলেছেন, নারীদের সাথে ভালো ব্যবহার করো।

১৫. শিশুদের প্রতি আচরণ

আপনারা এমনকি শিশুদেরও আপনাদের যুদ্ধ ও হত্যাযজ্ঞের কাজে ব্যবহার করছেন। তাদের কেউ হাতে তুলে নিচ্ছে অস্ত্র, আর কেউ আপনাদের হাতে নিহত কোনো হতভাগ্যের ছিন্ন মস্তক নিয়ে খেলছে। আপনারা দাঙ্গা হাঙ্গামা আর যুদ্ধের মধ্যে ছুঁড়ে দিচ্ছেন শিশুকে। কেউ কেউ তাদের হত্যা করছে বা তারা নিজেরাই হত্যার শিকার হচ্ছে। আপনাদের পরিচালিত স্কুলে শিশুদের ওপর নির্যাতন চালানো হয়েছে। অনেক শিশুকে হত্যাও করা হয়েছে। এই নিরপরাধ শিশুদের সাথে এমন আচরণ অবশ্যই অপরাধ। শিশুদের তো নৈতিকভাবে গণনার মধ্যেই আনা যায় না। আল্লাহ বলেন, 'তোমাদের এ কি হয়েছে? তোমরা আল্লাহর পথে সেসব অসহায় নর-নারী ও শিশুদের বাঁচানোর জন্য লড়াই করো না, যারা কাতর হয়ে ফরিয়াদ করছে, হে আমার মালিক, যালেমদের এই জনপদ থেকে আমাদের বের করে নিয়ে যাও, এরপর তুমি আমাদের জন্য তোমার পক্ষ থেকে একজন অভিভাবক বানিয়ে দাও, তোমার কাছ থেকে একজন সাহায্যকারী দাও' (৪:৭৫)।

BanglaBook.org

১৬: হুদুদ বা শাস্তি

কোরআন ও হাদিসে হুদুদ বা শাস্তি নির্দিষ্ট ও অপরিবর্তনীয়। এবং প্রশ্নাতীতভাবে এটি ইসলামি আইনে বাধ্যতামূলক। তবে সুস্পষ্ট ধারণা ছাড়া, কোনো সতর্কতা ছাড়া বা প্রমাণ ছাড়া এটি কারো ওপর প্রয়োগ করা যাবে না।

এবং এটি কারো ওপর নিষ্ঠুরতার সাথেও প্রয়োগ করা যাবে না। নবীজি কিছু ক্ষেত্রে বরং হুদুদ এড়িয়ে চলেছেন। আর সবাই জানে যে, ওমর ইবনে আল খাত্তাব একবার দুর্ভিক্ষের সময় শাস্তি বাতিল করেছিলেন। আইনের সব ক্ষেত্রেই হুদুদের বিষয়ে বলা আছে যে তা প্রয়োগ করতে হবে ক্ষমাশীলতার সাথে। আর কঠোর শর্তের মধ্য দিয়ে হলুদের প্রয়োগকে কঠিন করা হয়েছে যাতে এর যথেচ্ছ ব্যবহার না হয়। কোনো ক্ষেত্রে হুদুদ প্রয়োগের বিষয়ে যদি সন্দেহ দেখা দেয়, সেক্ষেত্রে হুদুদ প্রয়োগ করা যাবে না। অভাবগ্রস্ত ও নিঃস্বদের ওপর শাস্তি প্রয়োগে নিষেধাজ্ঞা আছে। এছাড়া ফল ও সবজি চুরির জন্য শাস্তি প্রয়োগ করা যাবে না। আর নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের নিচে চুরি করলেও হুদুদ কার্যকর হবে না। অথচ আপনারা খুব সহজেই হুদুদ চালু করেছেন। যেখানে সত্যিকার অর্থে ধর্ম অনুযায়ী বেশ কঠিন অপরাধ ও উপযুক্ত প্রমাণের ভিত্তিতেই কেবল শাস্তি প্রয়োগের বিধান রয়েছে।

১৭: নির্যাতন

আপনাদের হাতে বন্দি ও আপনাদের সহযোগীদের অনেকেই বলেছে আপনারা মানুষকে নানাভাবে ভয় দেখান। মারধর ও হত্যার মাধ্যমে নির্যাতন চালান। এমনকি একজনকে ভয় দেখানোর জন্য তার চোখের সামনে জীবন্ত আরেকজনকে কবর পর্যন্ত দেন। আপনারা ভোঁতা ছুরি দিয়ে মানুষের শিরশ্ছেদ করেন যাতে অনেক অবর্ণনীয় কষ্ট ভোগ করে ওই মানুষটির মৃত্যু হয়। অথচ নির্যাতনের এই নিষ্ঠুরতম উপায়গুলো শরিয়া আইনে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। গণহত্যার ক্ষেত্রে আপনারা যা করেছেন তাও শরিয়া আইনে নিষিদ্ধ। যাদের হত্যা করা হবে, আপনাদের যোদ্ধারা তাদের বিদ্রুপ করতে করতে মারতে মারতে ভেড়ার পালের মতো নিয়ে যাচ্ছেন। যেন ভেড়ার মতোই তাদের হত্যা করা হবে এবং তাদের মাংস কাটা হবে। আপনাদের যোদ্ধারা তাদের হত্যা করেই কেবল সন্তুষ্ট নন। এরপর তাদের মৃতদেহগুলোকেও আপনারা অপমান অপদস্ত ও উপহাস করছেন। আল্লাহ বলেছেন, 'হে ঈমানদার' তোমাদের কোনো সম্প্রদায় যেন একে অপরকে উপহাস না করে। কারণ হতে পারে তারা উপহাস্কারীদের চেয়েও উত্তম' (৪৯:১১)।

১৮. মরদেহের অঙ্গচ্ছেদ

আপনারা শুধু আপনাদের হাতে নিহতদের অঙ্গহানিই করছেন না, নিহতদের প্রতি চরম অমর্যাদার চিহ্ন হিসেবে ছিন্ন মস্তক সূঁচালো রডের মধ্যে গেঁথে

BanglaBook.org

রাখছেন। ছিন্ন মস্তক নিয়ে ফুটবল খেলেছেন। এসব ছবি আবার বিশ্বকাপ ফুটবলের সময় আপনারা সারা বিশ্বে প্রচার করেছেন। অথচ ইসলাম ফুটবল খেলাকে সমর্থন করে। আর এই খেলার মাধ্যমে মানুষ নিজের মানসিক চাপ হালকা করতে পারে। সিরিয়ার যে সেনা ঘাঁটি আপনাদের দখলে, সেখানে প্রকাশ্যে আপনারা মানুষের শিরশ্ছেদ করছেন। যারা ইসলামকে বর্বর বলতে চায় তাদের হাতে আপনারা রোজ প্রচুর অস্ত্র তুলে দিচ্ছেন। আপনাদের এমন বর্বর আচরণ দেখে নির্দিধায় যে কেউ ইসলামকে বর্বর বলতে পারে। আপনারা দাবি করেন, এসব কাজ আপনারা ইসলামের জন্য করছেন। অথচ ইসলামকে আঘাত করার জন্য আপনারাই ইসলাম বিরোধীদের হাতে একের পর এক এমন সব মোক্ষম অস্ত্র তুলে দিচ্ছেন যা কয়েকশ বছর আগে ইসলামে নিষিদ্ধ হয়েছে। এবং আবারও বলছি এসব বর্বরতার স্থান ইসলামে নেই।

১৯. নম্রতার নামে সৃষ্টিকর্তার ওপর দোষারোপ

সিরিয়ার ১৭ তম ডিভিশনের সেনাদের সূঁচালো তার দিয়ে বেঁধে আপনারা তাদের শিরশ্ছেদ করেছেন। আর সেই ছবি প্রকাশ করেছেন ইন্টারনেটে। সেখানে আপনারা বলেছেন, ইসলামিক স্টেটের সব সেনারাই আপনাদের ভাই। আল্লাহ তার রহমত দিয়ে আপনাদের অনুগ্রহ করেছেন বলেই আপনারা ১৭তম ডিভিশন জয় করতে পেরেছেন। আল্লাহর অনুগ্রহেই এই জয় এসেছে। আর এভাবে আপনারা আপনাদের নিকৃষ্টতম অপরাধগুলোকেও আল্লাহর ওপর আরোপ করেছেন। এমন একটা ভাব করেছেন, যেন এটা আল্লাহর প্রতি আপনাদের আনুগত্য ও নম্রতা। যেন এই সবকিছু আল্লাহই করাচ্ছেন, আপনারা কিছুই না। আল্লাহ বলেছেন, 'তারা যখন কোনো অশ্লীল কাজ করে তখন তারা বলে, আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের এর ওপর পেয়েছি, স্বয়ং আল্লাহ তায়ালাই আমাদের এই নির্দেশ দিয়েছেন। হে নবী, তুমি বলো, আল্লাহ তায়ালা কখনও কোনো অশ্লীল কাজের হুকুম দেন না। তোমরা কী আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে এমন কিছু বলছো যা সম্পর্কে তোমরা কিছুই জানো না?' (৭:২৮)।

BanglaBook.org

২০. নবী-সাহাবিদের কবর ও মাজার ধ্বংস করা

আপনারা অনেক নবী ও সাহাবিদের কবরে বোমা হামলা চালিয়ে সেগুলো গুঁড়িয়ে দিয়েছেন। ইসলামি আইনে নবী ও সাহাবিদের কবর ধ্বংসের কোনো অনুমোদন নেই। আর তাদের দেহাবশেষ তোলাও নিষিদ্ধ। আল্লাহ বলেন,

'যেসব মানুষ তাদের কাজের ওপর বেশি প্রভাবশালী ছিল, তারা বলল চলো আমরা তাদের ওপর একটি মসজিদ বানিয়ে দেই' (১৮:২১) এবং 'তোমাদের আদেশ দিয়েছিলাম, তোমরা ইব্রাহীমের দাঁড়ানোর স্থানটিকে নামাযের স্থান হিসেবে গ্রহণ করো' (২:১২৫)। নবীজি বলেছেন, প্রথমে আমি নিষেধ করেছিলাম কবর জিয়ারত করতে। কিন্তু মোহাম্মদের জন্য তাঁর মায়ের কবর জিয়ারত অনুমোদিত হয়েছে। কারণ কবর মানুষকে মৃত্যু ও পরকালের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। কুরআনে আল্লাহ বলেছেন, 'লোভের প্রতিযোগিতা তোমাদের শত্রু করে রেখেছে, এমনি করেই তোমরা কবরের কাছে গিয়ে হাজির হবে' (১০২:১-২)। আপনাদের নেতা বাগদাদি বলেছেন, শিরকের সব রকম প্রকাশকে ধ্বংস করা বাধ্যতামূলক। আপনারা এটা বলেছেন, কারণ সহি হাদিসে আবু আল হাইয়াজ আল আসাদি, আলী ইবনে আবি তালিব বলেছেন, 'তোমাদের কি আমি বলিনি' মোহাম্মদ আমাকে কি করতে পাঠিয়েছেন? আমাকে বলা হয়েছে সব মূর্তি ভেঙে ফেলতে এবং সব মাজারও ধ্বংস করে ফেলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।' তবে নিশ্চয়ই তা নবী ও সাহাবিদের কবরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না। সাহাবিরা তো নবীর সাথে তাঁর প্রিয় দুই সাহাবি হযরত ওমর ও হযরত আবু বকরকে মসজিদে নববীর পাশে একই ভবনে কবর দেওয়ার বিষয়ে একমত হয়েছেন।

BanglaBook.org

২১. নেতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা

যেই নেতা স্পষ্টভাবে ইসলামে অবিশ্বাস করার ঘোষণা দেননি সেই নেতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার অনুমোদন ইসলামে নেই। যদি এমন না হয়, নেতার কথা শুনে অনেক মুসলমানের বিশ্বাসে চিড় ধরবে, বা সে যদি নামায পড়তে বাধা না দেয়, তবে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা যাবে না। এই বক্তব্যের প্রমাণ আল্লাহ তায়ালা নিজেই তার বাণীতে দিয়েছেন, 'হে ঈমানদার, তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো আর আনুগত্য করো রসুলের ও সেইসব ব্যক্তির যারা তোমাদের মধ্যে দায়িত্বপ্রাপ্ত' (৪:৫৯)। নবীজিও বলেছেন, কিশমিশের মতো মাথাওয়ালা কোনো হাবশিকেও যদি তোমাদের নেতা করা হয়, তবে তার আনুগত্য করো ও তার কথা মেনে চলো। তিনি আরও বলেছেন, তোমাদের মধ্যে সেই সবচেয়ে ভালো শাসক, যাদের তোমরা ভালোবাসো আর যে তোমাদের ভালোবাসে, যে আল্লাহর অনুগ্রহ পেতে তোমাদের সাহায্য করে। আর সবচেয়ে খারাপ শাসক হলো, যাকে তোমরা ঘৃণা করো আর যে

তোমাদের ঘৃণা করে।' নবীজিকে একবার জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, তাদের কি আমরা অস্ত্রের মুখে প্রত্যাখ্যান করব না? তিনি বলেন, 'না, যতক্ষণ শাসক তোমাকে নামায পড়তে বাধা না দেয় ততক্ষণ নয়। এরপরও তাদের কোনো কাজ তোমাদের খারাপ লাগলে সেই কাজটাকে ঘৃণা করতে পারো কিন্তু শাসকের প্রতি আনুগত্যের অবসান ঘটানো যাবে না।' তবে শাসক যদি দুর্নীতি পরায়ণ হয়, তবে শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের মাধ্যমে একজনকে বেছে নিয়ে তার স্থলাভিষিক্ত করতে হবে। এই কাজটি হতে হবে যথাসম্ভব শান্তিপূর্ণ উপায়ে। কোনো সশস্ত্র ও রক্তক্ষয়ী পন্থায় নয়। শরিয়া আইন প্রবর্তন না করলেও শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের অনুমতি ইসলাম দেয়নি। আল্লাহ বলেছেন, 'যারা আল্লাহর নাযিল করা আইন অনুযায়ী বিচার ফয়সালা করে না, তারাই কাফের' (৫:৪৪) এবং 'যারাই আল্লাহর বিধান অনুযায়ী বিচার ফয়সালা করে না, তারাই যালেম' (৫:৪৫) এবং 'যারা আল্লাহর নাযিল করা আইন অনুযায়ী বিচার করে না তারাই হচ্ছে ফাসেক' (৫:৪৭)। কাজেই যারা শরিয়া আইনের প্রবর্তন করে না তাদেরকে আল্লাহ তিন স্তরে ভাগ করেছেন, কাফের, যালেম ও ফাসেক। যারাই শরিয়া আইন প্রবর্তনে বাধা দেয় তারা অবিশ্বাসী। কিন্তু শরিয়া আইনের বিশেষ কোনো অংশকে কেবল প্রয়োগ করা যাবে না। পুরোটা করতে হবে। তবে কোনো দেশে যদি জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে এবং সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য শরিয়া আইন চালু করা হয়, সেটিকে ইসলাম সমর্থন করে। ইবনে আব্বাস বলেছেন, শরিয়া আইন যে শাসক চালু করে না সে অবিশ্বাসী, তাই বলে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা যাবে না। ইবনে আব্বাস এও বলেছেন, আল্লাহ ছাড়া আর কারো আনুগত্য করলে সে অবিশ্বাসী হয়। কিন্তু এই অবিশ্বাসী শব্দটি দিয়েও তিনি বিধর্মী বোঝাননি।

BanglaBook.org

২২. খিলাফত

ইসলামি চিন্তাবিদরা একটি বিষয়ে একমত হয়েছেন, উম্মতের জন্য খিলাফত কায়েম করা বাধ্যতামূলক। ১৯২৪ সালে বিশ্ব থেকে খিলাফত উঠে যায়। নতুন করে খিলাফত প্রতিষ্ঠার জন্য সব মুসলিম রাষ্ট্রের ঐক্যমতের দরকার হবে। বিশ্বের এক কোনার কিছু মানুষ চাইল আর খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল এমন ধারনার কোনো ভিত্তি নেই। ওমর ইবনে আল খাত্তাব বলেছেন, মুসলমানদের আলোচনা ছাড়া ঘোষিত খিলাফতের ওপর যারা আনুগত্য পোষণ করল তারাও বোকামি করল। কারণ তাদের জীবানশঙ্কা হলে তার নেতা বা সে নিজেও তা ঠেকাতে পারবে না। মুসলমানদের সাথে আলোচনা না করে

খিলাফত ঘোষণা আসলে ফিতনা। এ ধরনের খেলাফত বেশিরভাগ মুসলিম জনগোষ্ঠির বিরুদ্ধেই যায়। কারণ বিশ্বের বেশিরভাগ মুসলমানই এখন খিলাফতের বাইরে। এ ধরনের ঘোষণা বিপরীতমুখী খিলাফতের জন্ম দেয় এবং দুই পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ সংঘাতের সৃষ্টি করে। মুসলমানদের মধ্যে তৈরি হয় বিভাজন। ইরাকের মোসুল থেকে সিরিয়ার রাক্কায় আপনারা ঠিক এই ফিতনারই সৃষ্টি করেছেন। আইএস এবং নুসরা ফ্রন্টের মধ্যে এই সংঘাতই সৃষ্টি হয়েছিল। সুন্নি ইমামরা আপনাদের সাথে সংঘাতে না জড়ানো স্বত্বেও আপনারা যখন তাদের হত্যা করেছিলেন।

আপনারা হযরত আবু বকর সিদ্দীকের একটি উক্তির উল্লেখ করেছেন, 'আমাকে তোমাদের ওপর কর্তৃত্বের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।' প্রশ্ন হলো কে আপনাদের এ ধরনের কর্তৃত্ব আরোপ করার এই দায়িত্ব দিল? আপনাদের দল? তাই যদি হয় বিশ্বের বিপুল সংখ্যক মুসলমানদের মধ্যে এমন আরও বহুদল গঠিত হবে আর তারা সবাই নিজ নিজ কর্তৃত্ব জাহির করতে চাইবে। আপনাদের এমন মনোভাবের জন্ম হয়েছে এই যুক্তিতে যে, শুধু আমরাই মুসলমান। আর আমরাই ঠিক করব আমাদের খলিফা। আমরা একজনকে ঠিক করলাম। আর যারা তাকে মানবে না তারা মুসলমানই নয়'। এক্ষেত্রে কথিত এই খলিফা আসলে বিশেষ একটি দলের নেতা ছাড়া আর কিছুই নন। যারা ৯৯ ভাগেরও বেশি মুসলিমকে বিধর্মী বলে ঘোষণা করেছে। দুই ধরনের পরিণতিতে আপনারা পড়তে পারেন।

১. আপনারা একমত হবেন যে তারাও মুসলমান। কিন্তু তারা আপনাদের খলিফা হিসেবে নিয়োগ দেয়নি। কাজেই আপনারা খলিফা নন।

২. মুসলমানরা ছোট একটি দল। কাজেই তাদের খলিফার দরকারই নেই। এক্ষেত্রে খলিফা শব্দটির ব্যবহারই চলে না। সত্যি বলতে, সারা বিশ্বের মুসলিম দেশ, ইসলামি চিন্তাবিদ ও ইসলামি সংগঠনগুলোর ঐক্যমত ছাড়া খিলাফত ঘোষণা করা যায় না। ইসলামে খলিফা আর খিলাফতের গণ্ডি এত ক্ষুদ্র আর এত সংকীর্ণ নয়। আরও ব্যাপক আরও মহান।

২৩. জাতীয় সংহতি

আপনারা বলেছেন, সিরিয়া সিরিয়ানদের জন্য নয় আর ইরাকও নাকি ইরাকিদের নয়। একই বার্তায় সারা বিশ্বের সব মুসলমানকে আপনারা ইসলামিক স্টেটের দখল করা জমিনে হিযরতের আহ্বান জানিয়েছেন। এর

BanglaBook.org

মাধ্যমে আপনারা অধিকার পেলেন এসব এলাকার সম্পদ লুণ্ঠনের। আর তা বিদেশিদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়ার। ফিলিস্তিনিদের সাথে ঠিক এই কাজটাই করেছে ইসরাইল। ফিলিস্তিনিদের নিজের দেশ থেকে বের করে দিয়ে সারা বিশ্বের ইহুদিদের ডেকে এনে সেই ভূমি ও সম্পদের ভাগ বাটোয়ারা করেছে ইসরাইলিরা। তাহলে আগ্রাসি সেই ইসরাইলের সাথে আপনাদের পার্থক্যটা কোথায় আর এখানে ন্যায় বিচারটাই বা কোথায়।

অথচ দেশপ্রেম আর মাতৃভূমির প্রতি ভালোবাসাকে ইসলাম কোনোদিন অস্বীকার করেনি। বরং দেশকে ভালোবাসা সুন্নতের মধ্যেই পড়ে। নবীজি মক্কায় ভাষণ দিতে গিয়ে বলেছেন, 'এই মাটি এত ভালো আর এই মাটি আমার এত প্রিয় যে, আমারই মানুষ যদি আমাকে দেশ ছাড়তে বাধ্য না করত, আমি কখনই অন্য কোথাও গিয়ে থাকতাম না।' কুরআন ও সুন্নায় দেশপ্রেমের হাজারো নজির আছে। আল্লাহ বলেছেন, 'আমি যদি তাদের ওপর আদেশ জারি করতাম, যে তোমরা জীবন বিসর্জন দাও অথবা ভিটেমাটি ছেড়ে অন্যকোথাও চলে যাও অল্প মানুষই তা করত' (৪:৬৬)। ফাখর আল দীন আল রাজি বলেছেন, কাউকে দেশ ছাড়া করা আর তাকে হত্যা করার সামিল। অথচ আপনারা ইরাক সিরিয়ার কত লাখো মানুষকেই না তাদের প্রিয় মাতৃভূমি ছাড়তে বাধ্য করেছেন।

BanglaBook.org

২৪. হিযরত

আপনারা সারা বিশ্বের মুসলমানদের আহ্বান জানিয়েছেন, যাতে তারা আইএস-এর দখল করা ভূখণ্ডে হিযরত করে। আবু মুসলিম আল কানাদি নামের এক আইএস যোদ্ধা বলেছেন, দরজা বন্ধ হয়ে যাবার আগেই সিরিয়ায় এসে আমাদের সাথে যোগ দিন। অথচ নবীজি বলেছিলেন, 'মক্কা বিজয়ের পর আর কোনো হিযরত হবে না। কিন্তু জিহাদ ও এর লক্ষ্য পুরণের দরজা খোলা। যখনই তোমাদের যুদ্ধে ডাকা হবে এগিয়ে যাও।'

ইসলামের চতুর্থ খলিফা আলী ইবনে আবু তালেবের একটি হাদিসের ব্যাখ্যা দিয়েছেন নায়ুম ইবনে হাম্মাদ। হাদিসটি হলো 'তোমরা যখন কালো পতাকা দেখবে, যেখানে আছ সেখানেই দাঁড়িয়ে যাবে। তোমাদের হাত পা নাড়বে না। তারপর সেখানে থাকবে কিছু দুর্বল ও তুচ্ছ মানুষ। তাদের হৃদয় থাকবে লোহার মতো কঠিন। তাদের একটি রাষ্ট্র থাকবে। তারা কোনো সনদ বা চুক্তি মানবে না। তাদের সত্যের পথে ডাকা হবে, কিন্তু তারা কোনো সত্যের কথা শুনবে না। তাদের নামগুলো হবে পৈতৃক। কিন্তু তাদের পদবি হবে তাদের শহরের নামে। তাদের চুল হবে নারীদের মতো লম্বা। এই অবস্থা চলতে থাকবে। যতক্ষণ না তারা তাদের নিজেদের মধ্যে মতভেদ শুরু করবে। এরপর আল্লাহ তায়ালা যাকে ইচ্ছা তাঁর মাধ্যমে সত্যকে সামনে আনবেন'। অনেকেই প্রশ্ন করেছেন বর্তমান পরিস্থিতির সাথে কি এই হাদিসের কোনো সম্পর্ক আছে? হাদিসটিকে কি এভাবে ব্যাখ্যা করা যায়?

তোমরা যখন কালো পতাকা দেখবেঃ ইসলামিক স্টেটের পতাকা কালো

যেখানে আছ সেখানেই দাঁড়িয়ে যাবেঃ হে মুসলমান ওদের সাহায্য করো না।

তোমাদের হাত-পা নাড়বে নাঃ ওদের অর্থ বা সরঞ্জাম দিয়ে সহায়তা করবে না।

তারপর সেখানে থাকবে কিছু দুর্বল ও তুচ্ছ মানুষঃ দুর্বল ও তুচ্ছ বলতে ধর্ম-নৈতিকতা ও ধর্ম পালনকে বোঝানো যায়।

তাদের হৃদয় থাকবে লোহার মতো কঠিনঃ তারা যুদ্ধ বন্দিদের নৃশংসভাবে হত্যা করবে আর মানুষের ওপর নির্মম নির্যাতন চালাবে।

তাদের একটি রাষ্ট্র থাকবেঃ গত প্রায় একশো বছর ধরে কেউ ইসলামি খিলাফতের দাবি করেনি। কিন্তু আইএস খিলাফত ঘোষণা করেছে।

তারা কোনো সনদ বা চুক্তি মানবে নাঃ শায়তাত আদিবাসীদের সাথে আইএস-এর যে চুক্তিটি হয়েছে পরে আইএস সেই চুক্তি ভঙ্গ করে শত শত মানুষকে হত্যা করেছে।

তাদের সত্যের পথে ডাকা হবেঃ আইএসকে ইসলামের পথে ডাকা হয়েছে এবং হচ্ছে।

তারা কোনো সত্যের কথা শুনবে নাঃ সত্যের পথের মানুষরা ক্ষমাশীল। নবীজিও বলেছেন ক্ষমা করো, তাহলে নিজেও ক্ষমা পাবে।

তাদের নামগুলো হবে পৈতৃকঃ যেমন আবু বকর, আবু মুথাননা, আবু মোহাম্মদ, আবু মুসলিম ইত্যাদি।

তাদের পদবি হবে তাদের শহরের নামানুসারেঃ যেমন আল বাগদাদি, আল জারকাবি, আল তিউনিসি ইত্যাদি।

BanglaBook.org

তাদের চুল হবে নারীদের মতো লম্বা: ইসলামিক স্টেটের যোদ্ধাদের চুল সেরকমই।

যতক্ষণ না নিজেদের মধ্যে মতভেদ শুরু করবে: ইসলামিক স্টেটের সাথে নুসরা ফ্রন্টের সংঘাত সংঘর্ষে এক বছরে প্রায় দশ হাজার মানুষের মৃত্যু হয়েছে।

এরপর আল্লাহ তায়ালা যাকে ইচ্ছা তাঁর মাধ্যমে সত্যকে সামনে আনবেন: সঠিক ও স্পষ্ট ঘোষণাপত্রের মাধ্যমে (যেমন এই খোলা চিঠির মতো)।

উপসংহার:

আল্লাহ বলেছেন, তিনি ক্ষমাশীলদের চেয়েও অনেক বেশি ক্ষমাশীল। মানুষকেও তিনি তাঁর ক্ষমা দিয়েই তৈরি করেছেন। আল্লাহ বলেন, 'পরম করুণাময় আল্লাহ তায়ালা, তিনি কোরআন শিক্ষা দিয়েছেন, তিনি মানুষ বানিয়েছেন'(৫৫:১-৩)। আর আল্লাহ তাঁর করুণা থেকেই মানুষ বানিয়েছেন, এ প্রসঙ্গে কোরঅনে বলা হয়েছে, 'তোমার মালিক চাইলে দুনিয়ার সব মানুষকে তিনি একই উম্মত বানিয়ে দিতে পারতেন। কিন্তু আল্লাহ নিজের ইচ্ছা কারো ওপর চাপিয়ে দেন না। তারা এভাবেই মতবিরোধ করতে থাকবে, তবে তোমার মালিক যাকে দয়া করেন, তার কথা আলাদা, তাদের তো তিনি এজন্যই সৃষ্টি করেছেন' (১১: ১১৮-১১৯)। এ কারণেই আল্লাহর সাথে করুণা আর দয়া শব্দটির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। আল্লাহর করুণা পাবার সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা হলো নামায। আল্লাহ বলেছেন, 'আমি মানুষ ও জিন জাতিকে আমার ইবাদত করা ছাড়া আর কোনো উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করিনি' (৫১:৫৬)। আল্লাহর ইবাদত মানে আল্লাহকে কিছু দেওয়া নয় বরং তার কাছ থেকে চাওয়া ও আদায় করা—'আমি তো তাদের কাছ থেকে কোনো জীবিকা দাবি করি না, তাদের কাছে আমি খাবারও চাই না বরং নিঃসন্দেহে আল্লাহ তায়ালাই জীবিকা সরবরাহকারী। তিনি মহাপরাক্রমশালী প্রবল ক্ষমতার অধিকারী' (৫১:৫৭-৫৮)। এছাড়া আল্লাহ তার করুণা স্বরূপই কোরআন নাযিল করেছেন, 'আমি কোরআনে যা কিছু নাযিল করেছি, তা ঈমানদারদের জন্য উপশমকারী ও রহমত' (১৭:৮২)। ক্ষমাই ইসলাম আর এর ধর্মও ক্ষমাশীল। বিশ্বের ওপর করুণাস্বরূপ পাঠানো হয়েছিল মহানবী (সঃ) কে। অন্যদের সাথে মুসলমানদের আচরণ কেমন হবে তা নিয়ে নবী বলেন, 'যে অন্যকে ক্ষমা করে না সে নিজেও ক্ষমা পাবে না। ক্ষমা করো, নিজেও ক্ষমা পাবে।'

কিন্তু আপনাদের সামগ্রিক কর্মকাণ্ডে ক্ষমার লেশমাত্র কোনো নজির নেই। আপনারা ইসলাম সম্পর্কে নিজেদের সুবিধামতো মনগড়া ব্যাখ্যা দিচ্ছেন। আবার সেই ব্যাখ্যাকেই সঠিক বলে বলপূর্বক মানুষের ওপর চাপিয়ে দিচ্ছেন।

BanglaBook.org

আপনারা ইসলামের যে রুপ দাঁড় করিয়েছেন, তা হলো ক্ষমাহীন নিষ্ঠুর নির্মম অমানবিক এক বিধান, যেখানে দয়া আর মানবিকতার লেশমাত্র নেই। অথচ এর পুরোটাই ভুল। অপরাধ। এই অপরাধ কেবল আল্লাহর উম্মত ও গোটা মানবজাতির ওপরই নয়, এই অপরাধ ইসলামের ওপরও। কারণ ইসলাম যা নয়, আপনারাই তা-ই বলে দাবি করছেন। সবশেষে আহ্বান জানাব আপনারা আপনাদের এসব কর্মকাণ্ড আরও একবার ভেবে দেখুন। এসব অন্যায় অপরাধ আর নির্মমতা থেকে বিরত থাকুন। নিরপরাধ মানুষকে আঘাত করা থেকে বিরত থাকুন। দয়া ও করুণার ধর্মে ফিরে আসুন। আল্লাহ বলেছেন, 'তুমি বলো হে আমার বান্দারা, তোমরা যারা নিজেদের প্রতি জুলুম করেছো, তারা কখনও আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না, অবশ্যই আল্লাহ তোমাদের সব পাপ ক্ষমা করে দেবেন, তিনি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু' (৩৯:৫৩)।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ ও মহাজ্ঞানী, আল্লাহ আপনাদের সহায় হউন।

২৪ জিলক্বদ, ১৪৩৫ হিজরি/ ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৪ খ্রিস্টাব্দ

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

সাক্ষাৎকার পর্ব

রিয়েল নিউজ নেটওয়ার্ক। কর্পোরেট সাংবাদিকতার বাইরে নিঃশর্ত সত্য প্রকাশই এই বিকল্প গণমাধ্যমের উদ্দেশ্য। আন্তর্জাতিক রাজনীতির চলমান নানা ঘটনাবলীর অন্তরালের সত্য প্রকাশ করে থাকে এই ওয়েব পোর্টাল। প্রকাশ করে নানা ক্ষেত্রে সফল বিজ্ঞজনের বিস্তারিত সাক্ষাৎকার। আইএস জঙ্গিদের উত্থান ও অন্তরালের ষড়যন্ত্র নিয়ে অসংখ্য সাক্ষাৎকার প্রচার করেছে রিয়েল নিউজ নেটওয়ার্ক। সেখান থেকে বাছাই করা আলোচিত কিছু সাক্ষাৎকার পাঠকের জন্য

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

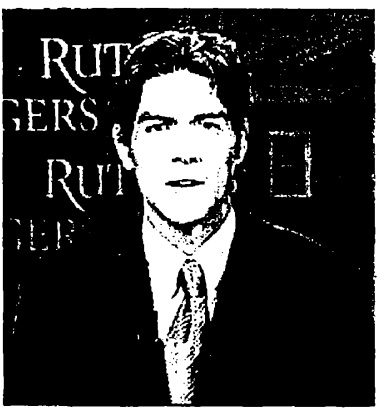

উপরে বাঁ থেকে ছবির ক্রম: অনুসারে ফ্লোরিডার সাবেক গভর্নর ও সিনেটর বব গ্রাহাম ◆ আলি আল আহমেদ, সৌদি পণ্ডিত, ইতিহাসবিদ ◆ নাফিজ আহমেদ, লেখক সাংবাদিক বিশ্লেষক ◆ টোবি জোন্স, আধুনিক মধ্যপ্রাচ্যের ইতিহাসবিদ ◆ লরেন্স উইলকারসন, সাবেক মার্কিন সেনা কর্মকর্তা ও রিপাবলিকান রাজনীতিক

নাইন-ইলাভেনের ঘটনায় সৌদি সরকারের সম্পৃক্ততা এবং মোহমুক্তির পথ: সিনেটর বব গ্রাহাম (প্রথম কিস্তি)

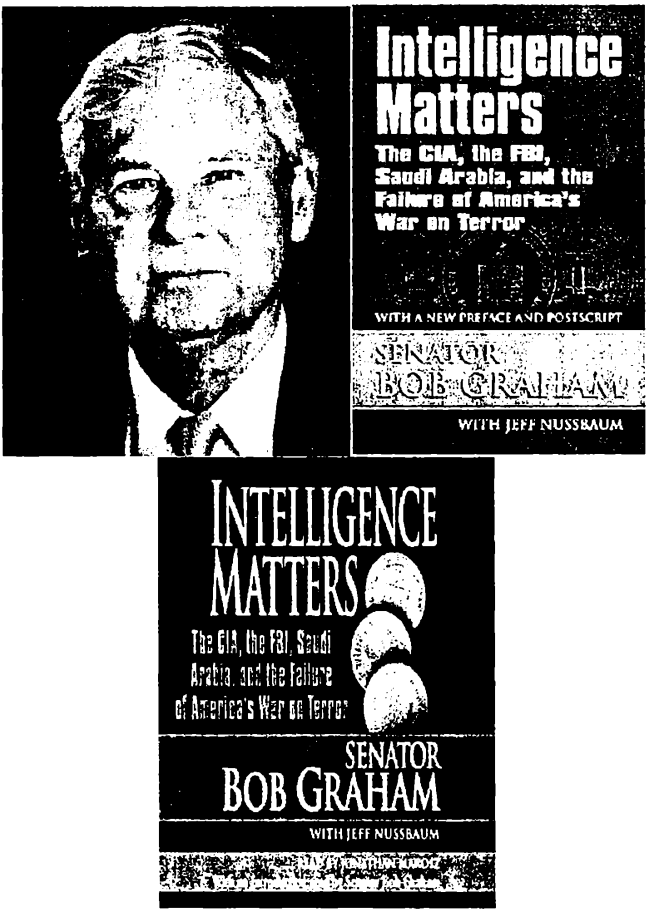

সিনেটর বব গ্রাহাম ও তার বিখ্যাত বই

ডেনিয়েল রবার্ট 'বব' গ্রাহাম একজন আমেরিকান রাজনীতিবিদ ও লেখক। ১৯৩৬ সালে ৯ নভেম্বর জন্মগ্রহণ করা বব ফ্লোরিডা অঙ্গরাজ্যের ৩৮ তম গভর্নর ছিলেন (১৯৭৯ থেকে ১৯৮৭)। ওই রাজ্য থেকেই সিনেটর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন ১৯৮৭-২০০৫ সাল পর্যন্ত। ২০০৪ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে মনোনয়নের জন্য চেষ্টা করেন। ২০০৩ সালের ৬ অক্টোবর মনোনয়ন দৌড় থেকে ছিটকে পড়ার পর ৩ নভেম্বর সিনেট থেকে অবসরের ঘোষণা দেন। বর্তমানে নিজের প্রতিষ্ঠান *বব গ্রাহাম সেন্টার ফর পাবলিক সার্ভিস* নিয়ে

BanglaBook.org

কাজ করছেন। দায়িত্ব পালন করেছেন Commission on the Prevention of WMD proliferation and terrorism এর চেয়ারম্যান হিসেবে। এই পলিসি সেন্টারের মাধ্যমে তিনি কমিশনের রিপোর্ট 'ঝুঁকিতে বিশ্ব' নিয়ে প্রচারণা চালাচ্ছেন। এছাড়াও BP Deepwater Horizon Oil Spill and Offshore Drilling এর ন্যাশনাল কমিশনের কো-চেয়ার তিনি। ২০১১ সালে প্রকাশিত হয় গ্রাহামের প্রথম থ্রিলার উপন্যাস *The Keys to the Kingdom* । লিখেছেন তিনটি নন ফিকশন গ্রন্থ।

নাইন-ইলাভেনে হামলার ঘটনা নিয়ে গঠিত কংগ্রেসের যৌথ তদন্ত কমিশনের কো-চেয়ার ছিলেন তিনি। তদন্তের চূড়ান্ত প্রতিবেদনে ২৮ পৃষ্ঠার একটি অধ্যায়ে নাইন-ইলাভেনের ঘটনায় সৌদি সম্পৃক্ততার কথা বর্ণনা করা হয়েছিল। কিন্তু ওই ২৮ পৃষ্ঠা আজও প্রকাশ করা হয়নি। দ্যা রিয়েল নিউজ নেটওয়ার্কের **সত্য নিজেই উন্মোচিত হয়** (Reality Asserts Itself) অনুষ্ঠানে এই সাক্ষাৎকার দেন বব গ্রাহাম।

পল জে, সিনিয়র এডিটর: মার্কিন পররাষ্ট্র নীতিতে সৌদি আরবের ভূমিকা ও এর প্রভাব বা বিস্তার নিয়ে আমরা কথা বলতে চাই। আলোচনা করতে চাই মার্কিন-সৌদি সম্পর্ক নিয়ে। সিরিয়ায় যে ঘটনাগুলো ঘটছে তার পেছনে অন্যতম মুখ্য ভূমিকা পালন করছে সৌদি আরব। সিরিয়ার সশস্ত্র দলগুলো সৌদি আরবের কাছ থেকে অস্ত্র পাচ্ছে। ইরানের পারমাণবিক প্রকল্পের বিষয়টিও এর সাথে সম্পৃক্ত রয়েছে। ইরান বলছে, তাদের প্রকল্পটা বেসামরিক। মার্কিন গোয়েন্দাদেরও সেটাই ধারণা। তাই শেষ পর্যন্ত সমঝোতাই হতে যাচ্ছে। কিন্তু সৌদি আরব এতে খুশি নয়। খুশি নয় ইসরাইলও। সৌদি বলছে, সমঝোতার প্রসঙ্গটা ওঠাই উচিৎ হয়নি। সৌদি ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিলের প্রধান প্রিন্স বানদার ইউরোপীয় কূটনীতিকদের বলেছেন, সিরিয়ার আসাদ সরকারের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান না চালানো এবং ইরানের কাছে নতি স্বীকার করার মধ্যদিয়ে যুক্তরাষ্ট্র মধ্যপ্রাচ্যে তার গ্রহণযোগ্যতা হারাচ্ছে। সৌদি আরব শুধু সিরিয়ায় যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক অভিযানই চায় না, যুক্তরাষ্ট্র ইরানের সাথে যুদ্ধ বাধাক এটাও চায়। যুক্তরাষ্ট্রের ওপর সৌদি আরবের এতটাই যদি প্রভাব থাকে, তাহলে আমাদের কী উচিৎ না যে একবার সিনেটর বব গ্রাহামের চিন্তাধারার দিকে নজর দেওয়া। যিনি এ নিয়ে একটি বইও লিখেছেন। "Intelligence Matters: The CIA, the FBI, Saudi Arabia, and the Failure of America's War on Terror " নামের এই বইয়ে গ্রাহাম সৌদি আরব সম্পর্কে অনেক কঠোর সত্য তুলে ধরেছেন। যার একটি হলো, "আমি বিশ্বাস করি মার্কিন

BanglaBook.org

যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরেই একটি রাষ্ট্রীয় মদদপুষ্ট সন্ত্রাসী চক্র আছে। যা এখনো সক্রিয় ও অক্ষত।"

পুরো বইটি নাইন-ইলাভেনে সৌদি আরবের ভূমিকা ও এর সম্পৃক্ততার নিয়ে লেখা। বব গ্রাহামের ভাষ্য অনুযায়ী, নাইন-ইলাভেন ষড়যন্ত্রকারী সংস্থাগুলোকে উৎসাহ, অর্থের যোগান ও সহায়তা দিতে সরাসরি সম্পৃক্ত ছিল সৌদি সরকারের সদস্য ও রাজ পরিবার। যা তিনি কংগ্রেসের যৌথ তদন্তেও প্রমাণ করেছেন। সুতরাং সৌদি আরব যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে এবং বর্তমান পলিসির ওপর তার যে প্রভাব ও ভূমিকা তা আলোচনা করতে গেলে সৌদি আরবের সাম্প্রতিক ইতিহাসের দিকেও নজর দিতে হবে।

বব গ্রাহাম: ধন্যবাদ। এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আপনার আগ্রহের প্রশংসা করতেই হয়।

পল জে: কিন্তু আজ আমরা মার্কিন পররাষ্ট্র নীতিতে সৌদি আরবের ভূমিকা নিয়েই কেবল নয় অন্যান্য কিছু ইস্যু নিয়েও কথা বলতে চাই। যাকে আপনি এরই মধ্যে চলমান সন্ত্রাসী সংগঠন বলে অভিহিত করেছেন।

বব গ্রাহাম: যদি সৌদি আরব নাইন-ইলাভেনের একজনসহ ষড়যন্ত্রকারী হয়ে থাকে আর এই ঘটনার যদি একটা গ্রহণযোগ্যতাও তৈরি হয়ে থাকে, তাহলে তাদের সক্রিয় ভূমিকা ও সেই সক্রিয় ভূমিকার প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি কীভাবে আলাদা হয়? বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যের বর্তমান ঘটনার আলোকে সৌদি আরবকে যেভাবে দেখা হচ্ছে সেটারই বা কতটুকু পরিবর্তন ঘটে?

পল জে: যদি মধ্যপ্রাচ্যে সৌদি আরবের সাথে প্রাথমিক মিত্রতাটা গড়ে না উঠত তাহলে এই ঘটনা সৌদি আরব সম্পর্কে যুক্তরাষ্ট্রের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করে দিতে পারত।

বব গ্রাহাম: দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকে যুক্তরাষ্ট্র সৌদিকে একটা বিশেষ দৃষ্টিতে দেখে আসছে। তারপর থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত সৌদি আরব ও যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্কটা অপরীক্ষিত থেকে গেছে।

পল জে: নাইন-ইলাভেনের ইন্টেলিজেন্স কমিটির প্রতিবেদনের অনেক বড় একটা অংশ গোপন রাখা হয়েছে। কিন্তু সেখানে এমন কিছু ককিআছে যা ইন্টেলিজেন্স কমিটিতে থাকার কারণে আপনি জানতে পেরেছেন, যার মাধ্যমে আমরা মোহ-মুক্তির পথ পেতে পারি?

বব গ্রাহাম: নাইন-ইলাভেনকে ও ইরাক যুদ্ধকে কেন্দ্র করে যে ঘটনাগুলো ঘটেছিল আমার উপলব্ধিতে সেই মুহূর্তগুলো খুব গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে আরও কিছু ঘটনা ঘটে যা আমার সেই উপলব্ধিকে শক্ত করতে সাহায্য করেছিল।

BanglaBook.org

পল জে: যখন আপনার কমিটি রিপোর্টটি প্রকাশ করে তখন সেটা অনেক সংবাদের জন্ম দিয়েছিল। আর তখন সেটা আমারও নজরে আসে। যারা এই ঘটনাটিকে অনুসরণ করেছিল এটা তাদের জন্য একটি গল্প হয়ে আছে। রিপোর্টটি মনে হয় ২৭ বা ২৮ পৃষ্ঠার ছিল, নয় কি?

বব গ্রাহাম: ফাইনাল রিপোর্টের মোট ৮শো পৃষ্ঠার মধ্যে সেখানে ২৮ পৃষ্ঠা ছিল। যা পুরোটাই সেন্সরড করা হয়েছে। যেখানে নাইন-ইলাভেনের অর্থায়নের পুরো বিষয়টি বিষদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। নাইন-ইলাভেনের মতো এত জটিল এবং এত ব্যয়বহুল একটি ধ্বংসযজ্ঞে কারা সাহায্য করেছিল, এই বিষয়টিও এখানে ছিল। আমি হতভম্ব হয়ে গেলাম যে, গোয়েন্দা সম্প্রদায় মনে করবে নাইন-ইলাভেনকে যে বা যারা অর্থনৈতিকভাবে সম্ভব করেছে তা জানা আমেরিকার জনগণের জাতীয় নিরাপত্তার জন্য একটি হুমকি। এবং আমি রিপোর্টটির বিষয়ে আজও মর্মাহত যে, এটি পেশ করার ঠিক ১২ বছর পরেও, সেই ২৮ পৃষ্ঠা আজও জনগণ জানতে পারল না।

পল জে: এখন বেশ স্পষ্টভাবেই জানা গেল ওই ২৮ পৃষ্ঠায় কী ছিল। *দ্যা টাইমস* ওই ২৮ পৃষ্ঠা নিয়ে একটি প্রতিবেদন করেছিল। টাইমসের এক সাংবাদিক এমন একজনের সাথে কথা বলেছেন যিনি ওই ২৮ পৃষ্ঠা দেখেছেন। কিন্তু অবশ্যই সেখানে নাইন-ইলাভেন ষড়যন্ত্রের অর্থায়নে জড়িত সৌদি সরকার ও রাজ পরিবারের সদস্যদের নাম ছিল। আপনার বই এটা স্পষ্টভাবেই জানিয়ে দিয়েছে। প্রথমত, আপনি এটা বলতে পারবেন না, এ ধরনের নির্দেশ কোথা থেকে আসে?

বব গ্রাহাম: আমি নিজেও এই ক্লাসিফিকেশনের কাঠামোর অংশ। ২০০২ সালে এটা লেখা হয়েছিল, সংগত কারণে এখনো আমার মনে আছে ওই ২৮ পৃষ্ঠায় কী ছিল। কিন্তু আমি হতাশ এই কারণে যে, এ বিষয়ে আমার কিছুই বলার সাধ্য নেই।

BanglaBook.org

নাইন-ইলাভেন ষড়যন্ত্রের উন্মোচন যুক্তরাষ্ট্র-সৌদি সম্পর্ককে ধ্বংস করত:
সিনেটর বব গ্রাহাম (দ্বিতীয় কিস্তি)

পল জে: রিপোর্ট হয়েছিল যে, যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত সৌদি রাষ্ট্রদূত প্রিন্স বানদার নাইন-ইলাভেনের কয়েক ঘণ্টার মধ্যে প্রেসিডেন্ট বুশের সাথে যোগাযোগ করেন। কারণ অন্যান্য এজেন্সির প্রধানরা তখন ব্যস্ত ছিলেন। নাইন-ইলাভেন কমিশন এফবিআই প্রধানকে জিজ্ঞাসা করেছিল, ঘটনার পর আপনি কি সৌদি নাগরিকদের পালাবার সুযোগ সৃষ্টি করেছিলেন? তিনি উত্তরে বলেছেন—না।

একই উত্তর দিয়েছে সিআইএ-ও। কিন্তু এখন আমার মনে হয় এটা সবাই জানে যে অনুমতিটা এসেছিল হোয়াইট হাউজ থেকে। তবে আক্রমণের কয়েকঘণ্টার মধ্যে প্রিন্স বানদার অধিকাংশ সৌদি নাগরিককে যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে বের করে দিতে চাইলেন, কারণ বিমানগুলোর ১৫ থেকে ১৯ জন ষড়যন্ত্রকারীই ছিল সৌদি। তাহলে আক্রমণের কয়েকঘণ্টার মধ্যেই তিনি কিভাবে জানতে পারলেন এই ঘটনার সাথে সৌদি নাগরিকরা জড়িত?

বব গ্রাহাম: তিনি যে ঘটনাটি জানতেন তা আমাকে বিস্মিত করে না। সবচেয়ে বাজে ব্যাপার হলো, আপনি বলতে পারেন তিনি এটা জানতেন কারণ, নাইন-ইলাভেনের অনেক আগে থেকেই তিনি জানতেন এমন একটা বিধ্বংসী পরিকল্পনা চলছে। তার জনসংযোগ কর্মকর্তাদের ওয়্যার সার্ভিসে প্রবেশাধিকার ছিল। যার কারণে তারা খুব দ্রুত ১৫-১৯ জন সৌদি নাগরিকের এই ঘটনার সাথে জড়িত থাকাটা সনাক্ত করে ফেলে।

পল জে: আমেরিকান সরকার ও ওয়্যার সার্ভিস কীভাবে এত তাড়াতাড়ি ঘটনাটি জানতে পারল?

বব গ্রাহাম: কারণ প্লেনের যাত্রী তালিকায় তাদের নাম ছিল। কিছু কিছু মানুষ আছে যাদের নাম একবার তালিকায় উঠলে গোয়েন্দা সংস্থা তাদের চিনে রাখে। গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর কাছে তারা পরিচিত হয়ে যায়। এদের মধ্যে দুজন ২০০০ সালের জানুয়ারিতে মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুরে সন্ত্রাসীদের একটা সম্মেলনে অংশ নিয়েছিল। অন্যরা এত পরিচিত নয়। কিন্তু তাতে এই ১৯ জনের জাতীয়তা বুঝতে কোনো অসুবিধা হয় না। তাই এটি আমাকে বিস্মিত করে না। যুক্তরাষ্ট্র কীভাবে সৌদি আরবের এই অনুরোধে প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছিল বরং সেটাই আমাকে বিস্মিত করে। আর সবচেয়ে বেশি বিস্মিত করেছিল যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের আচরণ।

এখানে একটি গণহত্যা হয়েছে, নিহতদের অধিকাংশই যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক। আপনার লোক ছিল যারা এই গণহত্যার তথ্য জানত। তারা আমাদের আইনের আওতার বাইরে যাওয়ার আগে আমাদের আইন প্রয়োগকারীরা তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারত, একটা চার্টার্ড বিমানে করে ১৪৪ জন সৌদি যাত্রী নিয়ে কেন্টাকি থেকে মধ্যপ্রাচ্যে যাওয়ার সৌদি রাষ্ট্রদূতের অনুরোধ কীভাবে রাখতে পারলেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট? এই ঘটনা সম্পর্কে তারা কিছু জানেন কিনা, তা জানার চেষ্টা না করেই কীভাবে তাদের যেতে দেওয়া হলো? বিমানটি যাওয়ার পর এফবিআই বলেছিল আমরা যদি জানতাম এই লোকগুলো কারা ছিল তাহলে অনেককে জিজ্ঞাসাবাদের সুযোগ পেতাম। তারা আমাদের সন্দেহ তালিকায় ছিল।

BanglaBook.org

পল জেঃ সুতরাং এটাকে আপনি কীভাবে ব্যাখ্যা করবেন?

বব গ্রাহামঃ আমার মনে হয় ব্যাখ্যাগুলো ধোঁয়াশাচ্ছন্ন। আর তারা সংখ্যায় অনেক। তার একটা কারণ হলো, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় যুক্তরাষ্ট্র ও সৌদি আরবের একটি বিশেষ সম্পর্ক তৈরি হয়—যার ভিত্তি ছিল যুক্তরাষ্ট্র সৌদিকে প্রতিরক্ষা সহায়তা দেবে আর তার বিনিময়ে পেট্রোলিয়ামের একটি নির্ভরযোগ্য উৎস হবে সৌদি আরব। এর আরেকটা কারণ হলো বুশ পরিবারের সাথে কিছু বিশেষ সম্পর্ক। প্রেসিডেন্টের দাদার আমলে এই সম্পর্ক বেশ গভীর ছিল। অন্যান্য কারণের মধ্যে আছে অস্থিতিশীল মধ্যপ্রাচ্যে একমাত্র সৌদি আরবই স্থিতিশীল। তাই তাদের গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠা ও অনুরোধে সাড়া দেওয়া দরকার। বানদার এই সুযোগটাই নিয়েছিলেন।

পল জেঃ আর বিন লাদেন পরিবারের সদস্যরাও...

বব গ্রাহামঃ তারা ছিল বিন লাদেন পরিবারের সদস্য ও এই পরিবার সৌদি রাজ পরিবারের খুব কাছের ছিল। এই দুটি ধারণা এটাই সমর্থন করে যে বিন লাদেন পরিবারের কতিপয় সদস্যও এতে জড়িত ছিল। যখন এই অনুরোধ করা হলো তখন যুক্তরাষ্ট্রের অধিকাংশ বেসরকারি বিমান চলাচল বন্ধ। কিন্তু যখন তারা ফ্লাইটটি পরিচালনা করে তখন নিষেধাজ্ঞা মোটামুটিভাবে তুলে নেওয়া হয়েছিল।

পল জেঃ আমার মনে হয় বিমানটি কীভাবে দেশ ছাড়ল সেটা বড় কথা নয়, বড় কথা হলো তারা কীভাবে এতগুলো মানুষকে চলে যেতে দিল, যাদের ঘটনার সাথে জড়িত থাকার সম্ভাবনা ছিল।

বব গ্রাহামঃ কারণ চলে যাওয়া ব্যক্তিরা যা জানত তা জানার বিষয়ে তারা (গোয়েন্দারা) ততটা আগ্রহী ছিল না। আমি মনে করি এর পেছনে এমন কোনো ঘটনা আছে যা নাইন-ইলাভেনের জিজ্ঞাসাবাদ ও তথ্যানুসন্ধানের স্বাভাবিক ঘটনা প্রবাহকে সরিয়ে দিয়ে, জিজ্ঞাসাবাদ ও তথ্যানুসন্ধান ছাড়াই তাদেরকে দেশ ছাড়ার অনুমতি দিয়েছিল।

পল জেঃ আমরা যখন বিষয়টি নিয়ে সামনে এগিয়েছি তখন আপনি আপনার বইয়ে অনেকগুলো পয়েন্ট দেখিয়েছিলেন, যেভাবে নাইন-ইলাভেন ঘটনা প্রতিহত করা যেত।

বব গ্রাহামঃ হ্যাঁ অনেকগুলো।

পল জেঃ জর্জ টেনেটের ভাষ্য মতে, সিআইএ প্রধান তার প্রথম বক্তৃতায় প্রেসিডেন্ট বুশকে বলেন যে, যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান নিরাপত্তা হুমকি হচ্ছে বিন লাদেন ও আল কায়েদা। এরপর তারা রিচার্ড ক্লার্কের পদমর্যাদা কমিয়ে দিল। যখন আপনাকে দেশের সর্বোচ্চ নিরাপত্তা হুমকি সম্পর্কে জানানো হলো, তখন

BanglaBook.org

আপনি কীভাবে সন্ত্রাসবিরোধী অভিযানের প্রধানের পদমর্যাদা কমিয়ে দেন? আপনি ক্লার্ককে পছন্দ করেন না ভালো, আপনি আরেক জনকে ভাবেন, কিন্তু আপনি কেন তার পদমর্যাদা কমাবেন? নাইন-ইলাভেন সম্পর্কে ক্লার্ক বলেন, তিনি কারোরই মনোযোগ পাননি। এটা অনেকটা এমন যে, ঘটনাটা চাপা পড়ে গেল শুধু কৌতুহলের অভাবে।

বব গ্রাহাম: হ্যাঁ, সৌদিদের বাঁচানোর এই সংস্কৃতিটাই ফেডারেল সরকারের উত্থান পতন ঘটাত। ২০০১ সালে অরল্যান্ডো বিমান বন্দরে একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে। সৌদি আরব থেকে একজন এসেছিলেন, তিনি বিমানবন্দরের একজন কাস্টমস এজেন্টের নজরে পড়েন। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলো, কেন তিনি মাত্র কয়েকদিন বা কয়েক ঘণ্টার জন্য সৌদি থেকে অরল্যান্ডো এলেন? যুক্তরাষ্ট্রে খুন করে দ্রুত পালিয়ে যাওয়ার মতো কিছু পেশাদার খুনিকে আনা হত। এমন কিছু ঘটনা তখন ঘটেছিল। আর কাস্টমস এজেন্ট তাকে সেই রকম একজন বলেই সন্দেহ করে। তাই তিনি তাকে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করতে দেননি। অন্যান্য কাস্টমস এজেন্টরা তার সাথে সেদিন দুর্ব্যবহার করেছিল আর বলেছিল তার ক্যারিয়ার শেষ। কারণ অন্যান্যদের চেয়ে সৌদিদেরকে আলাদাভাবে দেখার নির্দেশ ছিল, তার কি সেটা মনে নেই? কিন্তু সে অটল ছিল। ওই ব্যক্তিকে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের অনুমতি না দিয়ে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। চারটি বিমানে ৪ জন করে যে হাইজ্যাকারদের থাকার কথা ছিল সম্ভবত সে ছিল ২০ তম ব্যক্তি। কিন্তু এমনকি যুক্তরাষ্ট্রের একটি বিমানবন্দরের কাস্টমস এজেন্ট লেভেলে এই ধারণা ছিল যে, সৌদিদেরকে আলাদাভাবে বিবেচনা করতে হবে।

পল জে: যদি এইসব ঘটনাকে একসাথে করা হয় তাহলে আমরা যে বার্তাটি পাই তা হলো, পুলিশের মাধ্যমে এফবিআই ও অন্যান্য গোয়েন্দা সংস্থাকে জানানো হয় যে, আমরা আর সন্ত্রাসের বিষয়ে আগ্রহী নই। এফবিআই-এর কলিন রোওলি (Coleen Rowley) মিসৌরির কাছ থেকে একটি ওয়ারেন্ট পাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। কে এই ব্যক্তি যিনি ল্যান্ড করানো না শিখে শুধু বিমান ওড়ানো শিখছেন, আর ফ্লাইট ইন্সট্রাক্টর এই কথাটা এফবিআইকে জানিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত তারা কোনো ওয়ারেন্ট পাননি। এফবিআই ওয়ারেন্ট দেয়নি। এটি একটি বিশাল ঘটনা। আমরা কলিন রোওলির সাক্ষাৎকার নিয়েছি। তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম আপনি এটা কেন করছিলেন? তিনি বলেছিলেন, প্রশাসনের উচ্চ পর্যায় থেকে নিচ পর্যন্ত এমন একটা সংস্কৃতি তৈরি হচ্ছিল বলে মনে হচ্ছে: সন্ত্রাসবাদকে অনুসরণ করো না; এতে আমরা আর আগ্রহী নই।

BanglaBook.org

বব গ্রাহাম: এ ধরনের অনেক ঘটনা আছে। একজন বয়স্ক ব্যক্তি যিনি অবসরপ্রাপ্ত প্রফেসর, সৌদি তরুণদের ডেকে এনে তার বাড়ি ভাড়া দিতেন। এটা উপার্জন ও স্বচ্ছলতার একটা ভালো উৎস ছিল। এখানকার দুজন ভাড়াটে পরে বিমান হাইজ্যাকার হয়েছিল। সাবেক ওই প্রফেসরের সাক্ষাৎকার নিতে চেয়েছিলাম আমরা। জানতে চেয়েছিলাম এক ছাদের নিচে থেকে ওই হাইজ্যাকারদের কাছ থেকে তিনি কী জানতে পেরেছিলেন? আমাদেরকে তার সাক্ষাৎকার নিতে দেওয়া হয়নি। সিনেটের যৌথ তদন্ত কমিটি ও প্রতিনিধি পরিষদকে বলা হয়েছিল, আপনারা এই ব্যক্তির সাথে কথা বলতে পারবেন না। বলেছিলাম আমরা কি আপনাদেরকে লিখিত প্রশ্ন পাঠাতে পারি।

পল জে: এই আপনারাটা কে?

বব গ্রাহাম: এফবিআই...এবং তারা বলে না, আমরা তার কাছে প্রশ্নও নিয়ে যেতে পারব না। এরপর আমরা ফেডারেল জাজের কাছে গেলাম এবং ওই ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদের অনুমতি পেলাম। এটা ছিল শুক্রবার বিকেলে। অনুমতি পত্রটি আমার হাতে ছিল। দায়িত্বে থাকা এফবিআই এজেন্ট দেওয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়ালেন এবং বললেন, আমাদের লোকদের জিজ্ঞাসাবাদ করা আমরা পছন্দ করছি না। উপরন্তু তরুণ সৌদিদের ওপর নজর রাখার জন্য এফবিআই তাকে অর্থ দিত।

পল জে: এটা কি সেই পয়েন্ট নয়, যে তিনি এফবিআই-এর একজন তথ্যদাতা?

বব গ্রাহাম: হ্যা, তাই তারা তাকে ভীষণভাবে গোপনে রেখেছিল। যাই হোক ওই এজেন্ট বললেন, এখন থেকে ৭২ ঘণ্টা পর আমরাই তাকে হাজির করব। তার কথা সত্যি হিসেবে ধরে নেওয়াটাই আমার সরকারি জীবনে সবচেয়ে বড় ভুল ছিল। তার কথা শুনে আমি আর জোর করে অনুমতিপত্রের অধিকার খাটালাম না। ৭২ ঘণ্টা পার হলো। কিন্তু কোনো সাক্ষী এলো না। সেই সময় থেকে কংগ্রেসের সেশন শেষ হওয়া পর্যন্ত তারা শুধু কালক্ষেপণ করল। এবং আমার জানা মতে কেউ আর ওই ব্যক্তির সাক্ষাৎকার পায়নি।

পল জে: কাজটি শেষ করতে না পারা আপনাকে নিশ্চয়ই সীমাহীন হতাশ করে? এরপর আর তদন্ত হয়নি?

বব গ্রাহাম: এই যে ১৯ জন হাইজ্যাকার তারা কি নিজেরাই এই ঘটনাটি ঘটিয়ে ছিল? না কি তাদের পেছনে একটি সুসংগঠিত নেটওয়ার্ক ছিল। বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে এটাই গুরুত্ববহ। যদি সৌদি সরকার অর্থনৈতিক ও যৌক্তিক সমর্থনের উৎস হয়ে থাকে, এই দেশটির ভেতরে এতদিন ধরে এতজন লোককে ছদ্ম পরিচয়ে লুকিয়ে রাখা ও শেষ পর্যন্ত তাদের অনাবিষ্কৃত থেকে

BanglaBook.org

যাওয়া, যদি সৌদি আরবের সেই নেটওয়ার্কই করে থাকে তাহলে চিন্তা করে দেখুন বর্তমান প্রেক্ষিতে যুক্তরাষ্ট্র-সৌদি সম্পর্কটা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে। গোটা দৃষ্টিভঙ্গিটাই উল্টে দেবে। আমরা জানতাম যে, তারা যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্বস্ত মিত্র কিন্তু এখন দেখছি তারা এমন একটি দেশ যারা পৃথিবীর ক্ষতি করার জন্য তাদের আত্মাকে পর্যন্ত বিক্রি করে দেয়। এমনকি যদি সেটা যুক্তরাষ্ট্রকে বিপদের সম্মুখিন করে দেয় এবং তাতে ৩ হাজার মানুষের প্রাণ যায়, তাতেও তাদের কিছু যায় আসে না।

নাইন-ইলাভেনে ক্ষতিগ্রস্তদের পক্ষে নয় বরং সৌদি আরবের পক্ষে আদালতে গিয়েছিল যুক্তরাষ্ট্রঃ সিনেটর বব গ্রাহাম (তৃতীয় কিস্তি)

পল জেঃ আমরা মিডিয়ার ভূমিকা সম্পর্কে বলছিলাম এবং বাস্তব অর্থে এ বিষয়ে কোনো বিতর্ক নেই যে আপনার কমিশন অথবা অন্যান্য বইগুলো নাইন-ইলাভেন সম্পর্কে যে ইস্যুগুলো তুলেছিল মিডিয়া তা খুব কমই আলোকপাত করেছে। বিষয়টিকে আপনি কীভাবে দেখেন?

বব গ্রাহামঃ এটা কেন এমন হলো সেটা আমার কাছে এখনো রহস্যজনক। যেখানে বিষয়টির গুরুত্ব শুধুমাত্র ঐতিহাসিক কারণে নয়, এখানে ন্যায় বিচারের প্রশ্নটাও যুক্ত। প্রায় তিন হাজার পরিবার এবং বেঁচে যাওয়ারা যখন ন্যায়-বিচারের জন্য ফেডারেল কোর্টে আবেদন করে যাচ্ছিল, সৌদিদেরকে বাঁচানোর এটি আরেকটি কারণ ছিল। আপনি সৌদি আরবের বিরুদ্ধে মামলা করতে পারেন না। আর যুক্তরাষ্ট্র সরকার নাইন-ইলাভেনের ভয়াবহ শিকার মার্কিন নাগরিকদের পক্ষে না গিয়ে বরং সৌদিদের পক্ষে কোর্টে গিয়েছিল। সুতরাং এটি একটি সমসাময়িক ইস্যু এবং আজও এর প্রভাব ও গুরুত্ব সমাজে বিরাজ করছে। আর বেশিরভাগ মার্কিন গণমাধ্যমই এটিকে গভীর অনুসন্ধানের ও নজরে রাখার মতো বিষয় কেন মনে করল না তা আমার কাছে আজও রহস্য।

পল জেঃ সৌদিদেরকে এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলে, প্রাক্তন সৌদি গোয়েন্দা প্রধান তুর্কি বলেছিলেন, সৌদি গোয়েন্দা সংস্থা একটি আঘাত আসছে বলে বুশ প্রশাসনকে সতর্ক করার চেষ্টা করেছিল। বলেছিল যে, কিছু একটা ঘটতে চলেছে, এমন কিছু তথ্য তাদের কাছে আছে। কিন্তু তাদের নাকি

BanglaBook.org

উপেক্ষা করা হয়েছিল। সে বিষয়ে বুশ প্রশাসনের নাকি কোনো আগ্রহ দেখা যায়নি।

বব গ্রাহাম: আমিও এটা শুনেছি। ব্যক্তিগতভাবে আমি নিশ্চিত নই যে, বিবৃতিটা সত্য। কিন্তু আমি আশ্চর্য হব না। যুক্তরাষ্ট্রে এরকম ঘটনা ঘটতে পারে এটাই বিশ্বাসযোগ্য ছিল না। এটাকে নাইন-ইলাভেন কমিশন কল্পনার ঘাটতি বলে উল্লেখ করেছিল।

পল জে: যখন আপনি বলবেন সৌদি সরকার এটার সাথে জড়িত তখন এটা পরস্পর বিরোধী হয়ে যাবে, কারণ সৌদি গোয়েন্দা সংস্থা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে সতর্ক করেছিল। আমি বোঝাতে চাচ্ছি আপনি কী বিষয়টি সরকারি নীতি হিসেবে দেখেন, নাকি সরকারের কর্মকর্তারা ব্যক্তিগতভাবে জড়িত ছিল বলে মনে করেন?

বব গ্রাহাম: বাস্তবতা হলো একটি রাজতন্ত্রের কোনটি ব্যক্তিগত আর কোনটি সরকারি এবং সৌদি আরবে হাউজ অব সৌদের ব্যাপক প্রভাব—এই দুইয়ের সম্পর্ক ক্ষণস্থায়ী। আসলে এইসব ক্ষেত্রে যেখানে আমেরিকানরা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে মামলার চেষ্টা করেছে, তার মধ্যে কিছু আছে সরকারি প্রতিষ্ঠান আর কিছু বেসরকারি, এমনকি কিছু দাতব্য প্রতিষ্ঠানও। কারণ তারা নাইন-ইলাভেনের সাথে জড়িত ছিল। এদের মধ্যে যেগুলো সৌদি প্রতিষ্ঠান তাদেরকে বাঁচানোর জন্য সৌদি সরকার একটি সার্বভৌম রক্ষাকবচ তৈরি করেছে। তারা সংঘবদ্ধ একটি দেশ। তাদের কর্মকাণ্ড দিয়ে তারা এটাই বোঝায় এবং সম্ভবত এটা বৈধভাবেই বলা যায়, যা কিছু ঘটেছে সবই ছিল সরকারের ঘটানো।

পল যে: বিষয়টির আরও গভীরে যেতে চাই। এবং যেখানে সিনেটর গ্রাহামের বই ইন্টেলিজেন্স ম্যাটার-এ আরও বিস্তারিতভাবে বলা আছে যে, তার কমিটি সত্যিকার অর্থেই কিছু কার্যকর পয়েন্ট খুঁজে পেয়েছিল যা দিয়ে সৌদি কর্মকর্তাদের ষড়যন্ত্রের সাথে যুক্ত থাকার প্রমাণ পাওয়া যায়। আমরা আরেকটু পরে এই ঘটনার ভেতর যাব। আমি এখন আরেকটু বড় পরিসরে কথা বলতে চাই। সৌদিরা কেন এটা করবে? তাদের কী লাভ?

বব গ্রাহাম: আমি অনেক বেশি হতাশা নিয়ে কি'স টু কিংডম (Keys to the Kingdom) উপন্যাসটি লিখেছি। আমি যা জেনেছিলাম, সেটা আমেরিকার মানুষের কাছে উন্মোচন করা হয়নি। কারণ প্রতিটি ক্ষেত্রে তারা এটাকে ক্লাসিফাইডের নামে আড়াল করেছে। আমাকে আরেকজন প্রাক্তন উচ্চ পদস্থ সরকারি কর্মকর্তা বলেছিলেন যে, একইরকম হতাশা থেকে তিনিও একটি নন-ফিকশন লিখেছেন কিন্তু ঝামেলা এড়াতে নাম দিয়েছিলেন

BanglaBook.org

উপন্যাস। পরে বইটি সেন্সর বোর্ড আটকে দেয়। তো, আমার ওই উপন্যাসটিতেও তোমার কিছু প্রশ্নের উত্তর আছে। আমার মনে হয় সেগুলো অতিরঞ্জিত নয়। তার মধ্যে একটা হলো আমরা জানি যে, প্রথম উপসাগরীয় যুদ্ধের শেষ দিকে সৌদি আরবের একটি অংশে মার্কিন সেনাদের ঘাঁটি গাড়তে দেওয়ায় বিন লাদেন রাজ পরিবারের ওপর অনেক ক্ষেপে গিয়েছিলেন। আফগানিস্তানে রাশিয়ানদের বিরুদ্ধে যে লাখো সেনা তার সাথে যুদ্ধ করেছিল তাদেরকে নিয়ে যখন সৌদি আরব রক্ষার প্রস্তাব দেওয়া হলো, তখন তার রাগ আরও বেড়ে যায়। লাদেনের এই রাগই রাজ পরিবারকে ভীত করে।

আমার মনে হয় যে, এমনকি হতে পারে না বিন লাদেন রাজ পরিবারকে বলল তোমরা যদি আমেরিকার সাথে দুর্ব্যবহার না করো আমরা করব, কিন্তু আমাদেরকে সাহায্য-সহযোগিতা এবং আমাদের কর্মী যারা আমেরিকায় থাকতে যাচ্ছে তাদের খরচ বহন করার দায়িত্ব তোমাদের নিতে হবে। কিন্তু তোমরা যদি সাহায্য করতে অস্বীকার করো তাহলে আমরা সৌদি আরবের মধ্যে গৃহযুদ্ধ বাঁধাব। এবং ইরানের সাবেক শাহকে যেমন ক্ষমতাচ্যুত করা হয়েছিল তোমাদেরও তাই করা হবে।

পল জেঃ আমরা জানি সৌদি লাদেনের হুমকিকে খুব গুরুত্বের সাথে নিয়েছিল। এবং তারা আমেরিকান ঘাঁটি কাতারে সরিয়ে দিয়েছিল।

বব গ্রাহামঃ হ্যাঁ, এবং আমার মনে হয় যে এরকম কিছু একটাই ছিল তাদের প্রেরণা। অজুহাত এবং যুক্তি যাতে করে তারা বলে যে ঠিক আছে আমরা ১৯ হাইজ্যাকারকে অথবা তাদের মধ্যে যত জনকে সম্ভব সহায়তা করব। হতে পারে তারা এটা করেছিল গৃহযুদ্ধ এড়াতে।

পল জেঃ কিন্তু সৌদিরা বোকা নয়। তাদের জানা উচিৎ ছিল, যদি আমেরিকা জানতে পারে সৌদি সরকার এর সাথে জড়িত তাহলে বিন লাদেন তাদের যে ক্ষতি করতে পারত তা আমেরিকার সাথে সম্পর্কের ক্ষতির তুলনায় কিছুই না। তাহলে কি ব্যাপারটা এমন যে, তারা জানত লাদেনকে সহায়তা করলেও তাদের কিছুই হবে না।

বব গ্রাহামঃ একটি দেশ যার রাষ্ট্রদূত (প্রিন্স বানদার) এত নির্লজ্জ হতে পারে যে, হামলার কয়েক ঘণ্টার মধ্যে হোয়াইট হাউজের ব্যক্তিগত কোয়ার্টারে গিয়ে প্রেসিডেন্টের কাছে আবদার করতে পারে, হামলার নেতৃত্বদানকারী ১৫ জনসহ ১৪৪ জন সৌদি নাগরিককে পালাবার পথ করে দিতে হবে, এমন একটি দেশ যারা মনে করে সৌদির স্বার্থে আমেরিকা সৌদির পাশে দাঁড়াবে এবং তাতে একটুও লজ্জিত হয় না, আমেরিকার প্রতি এরকম একটি দেশের আচরণ এমন হবে তাতে আশ্চর্যের কী আছে।

BanglaBook.org

পল জে: এটা কি আপনাকে এই চিন্তা করতে সাহায্য করেনি যে, তারা যে লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হবে না এর পক্ষে তাদের যথেষ্ট যুক্তি ছিল?

বব গ্রাহাম : যুক্তরাষ্ট্র যে কোনো প্রতিক্রিয়া দেখাবে না বা কোনো কঠিন পদক্ষেপ নেবে না এ বিষয়ে তাদের আত্মবিশ্বাস ছিল। সৌদিরা এটার সাথে জড়িয়ে পড়েছিল আর তাদের এই সংশ্লিষ্টতা তাদেরকে ধামা চাপা দিতে হয়েছিল। কারণ তারা জানত যে বিন লাদেনের সৌদি রাজতন্ত্র উৎখাতের ইচ্ছা ও ক্ষমতা দুই-ই আছে!

পল জে: আমার ধারণা বিন লাদেন স্পষ্টত বেশ হতাশ হয়েছিলেন যে, গুরুত্বটা ইরাকের ওপর পড়ে গিয়েছিল, কারণ তারা চেয়েছিল বিশাল সংখ্যক আমেরিকান সেনাকে আফগানিস্তানে আটকে রাখতে। এবং এক অর্থে তারা যেটা চেয়েছিল পরে সেটা ঘটেছিল, কিন্তু যতটা চেয়েছিল ততটা নয়। তারা চেয়েছিল আফগানিস্তানে বিশাল সংখ্যক সেনার উপস্থিতি ও যুগ যুগ ধরে তারা সেখানে থাকবে এবং আমেরিকার অর্থনীতিকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে।

বব গ্রাহাম: বিন লাদেন যদি এমনভাবে চিন্তা করে যে সে যুক্তরাষ্ট্রকে আফগানিস্তানে চুষে খেতে পারবে, রাশিয়ার সাথে যেমনটি করা হয়েছিল, আমেরিকার সাথেও সেটা করতে পারবে, যুদ্ধটি হবে যুক্তরাষ্ট্র ধ্বংসের তাহলে বলতে হবে তার বুদ্ধিবৃত্তি উচ্চ পর্যায়ের ছিল না। যুক্তরাষ্ট্র প্রায় সাথে সাথেই আফগানে সফলতম বিমান হামলা পরিচালনা করে। এটা ড্রোন আবিষ্কার হওয়ারও আগের কথা। আমরা প্রচলিত সামরিক বিমান ব্যবহার করেছিলাম যার মধ্যে ছিল, লেজার বোমা, স্মার্ট বোমা যাতে আগে থেকেই কোথায় বিস্ফোরিত হবে তা নির্ধারণ করে দেওয়া সম্ভব। এবং যুক্তরাষ্ট্র তালেবানের সামরিক ক্ষমতাকে ধুলিস্মাৎ করে দিয়েছিল।

পল জে: কিন্তু সৌদিকেও বুঝতে হবে যে, যুক্তরাষ্ট্র চুপ করে বসে থাকবে না। এবং কাউকে না কাউকে এর মূল্য দিতে হবে। যদি তাদের আত্মবিশ্বাস থাকে যে তাদের ভূমিকা লুকিয়ে ফেলা হবে, আমি বলতে চাইছি পরবর্তী পদক্ষেপ কী হবে ও তার ফলাফল কী হবে এটা নিয়ে কি তাদের চিন্তা ছিল না?

বব গ্রাহাম: তারা নিশ্চিত ছিল যে, তাদেরকে আক্রমণ করা হবে না কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র অন্য কোথাও এর প্রতিশোধ নেবে।

পল জে: আমরা জানি, হামলার কিছু দিনের মধ্যেই আফগানিস্তানকে কী করা হবে না হবে তা নিয়ে কথা হচ্ছিল, একই সঙ্গে প্রেসিডেন্ট বুশ ইরাক যুদ্ধের প্রস্তুতি নেওয়ার নির্দেশও দিতে শুরু করেন।

বব গ্রাহাম: আমরা জানি তারা স্যান ডিয়েগোতে জড়ো হয়েছিল। যেখানে তারা যার চাকরি করত সে সৌদি সরকারের লোক ছিল। সেখানে ১৯

BanglaBook.org

হাইজ্যাকারের ২ জনের নিরাপত্তা দেওয়া হয়েছিল। ফ্লোরিডার সারাসোটায় সন্দেহজনক কিছু ছিল, যেখানে পাইলটদের মধ্যে তিনজন বিমান চালনার প্রশিক্ষণ নিত। এবং তারা একটি সৌদি পরিবারের সাথে সম্পৃক্ত ছিল। আর সেই সৌদি পরিবারটি রাজ পরিবারের সাথে সম্পৃক্ত ছিল। অন্য জায়গাগুলোতে কী হয়েছে তা আমরা জানি না, যেমন ফলস্ চার্চ, ভার্জিনিয়া, নিউ জার্সির জায়গাগুলোতে। তারা বাইরের কোনো সাহায্য পাচ্ছিল কিনা এ বিষয়ে কী পুরো তদন্ত হয়েছিল? যদি হয়ে থাকে তাহলে কেন সেটা প্রকাশিত হয়নি?

পল জেঃ আপনার মূল পয়েন্টটি হলো যে একটি নেটওয়ার্কের সহায়তা ছাড়া এই ১৯ জন ঘটনাটি ঘটাতে পারত না, এবং এই সাহায্যকারী নেটওয়ার্কটির কিছু অংশ হলেও সৌদি সরকারের সাথে জড়িত এ বিষয়ে আপনার কাছে প্রমাণ আছে।

বব গ্রাহামঃ হ্যা, কংগ্রেসের যৌথ তদন্ত কমিটির অন্য কো-চেয়ারের সাথেও আমি ব্যক্তিগতভাবে কথা বলেছি, পরে কথা বলেছি একজন সিআইএ পরিচালকের সাথে, নাগরিকদের নাইন-ইলাভেন কমিশনের দুইজন প্রধানের সাথে, তাদের সবার কাছে আমার একটাই জিজ্ঞাসা ছিল, আপনার কি মনে হয়, যে এই ১৯ জন হাইজ্যাকারের পক্ষে বাইরের কোনো সাহায্য ছাড়াই নাইন-ইলাভেনের মতো একটি জটিল হামলার পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন সম্ভব? তারা সবাই প্রায় একটি শব্দ ব্যবহার করেছিলেন 'অকল্পনীয়'।

BanglaBook.org

আইএস সৌদি আরবের হাতিয়ার আলি আল-আহমেদ, সৌদি পণ্ডিত ও সৌদি রাজনৈতিক বিশ্লেষক

আলি আল-আহমেদ একজন সৌদি পণ্ডিত ও সৌদি রাজনৈতিক বিশ্লেষক। সন্ত্রাস, ইসলামি আন্দোলন, ওয়াহাবি ইসলাম, সৌদি রাজনৈতিক ইতিহাস, সৌদি-আমেরিকা সম্পর্ক ও আল-সৌদ পরিবারের ইতিহাস সম্পর্কে তিনি অভিজ্ঞ। প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়, অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল, দ্যা হাডসন ইনস্টিটিউট ও মেরিডিয়ান ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার থেকে তাকে আলোচনার জন্য আহবান জানানো হয়। সাংবাদিক হিসেবে তিনি বেশ বড় কিছু ঘটনা প্রকাশ করেছিলেন। যার মধ্যে, রয়েছে নাইন-ইলেভেন নিয়ে বিন লাদেনের যে অনুবাদ পেন্টাগন ধ্বংস করেছিল তা এবং সাংবাদিক ড্যানিয়েল পার্লের খুনের ভিডিও প্রকাশ। তিনি সৌদি আরবের ধর্মীয় স্বাধীনতা, নির্যাতন, সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা ও ধর্মীয় কার্যক্রম নিয়ে রিপোর্ট করেছেন। সিবিএস নিউজ, সিএনএন, পিবিএস, ফক্স নিউজ, ওয়াশিংটন পোস্ট ও অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের মতো দুনিয়ার বড় বড় গণমাধ্যমের নিয়মিত আলোচক তিনি। তার লেখা ওয়াশিংটন পোস্ট, ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল, ইউএসএ টুডে, দ্যা বোস্টোন, গ্লোবের মতো বিভিন্ন ভাষার সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়ে আসছে। বর্তমানে তিনি ওয়াশিংটন ডিসিতে ইনস্টিটিউট অব গালফ অ্যাফেয়ার্সের পরিচালক।

BanglaBook.org

পল জেঃ রিয়েল নিউজ নেটওয়ার্কে আপনাকে স্বাগত। মধ্যপ্রাচ্য এখন একটা কঠিন সময়ের মধ্যদিয়ে যাচ্ছে। বিশেষ করে সিরিয়ায় যুদ্ধ ও ইরাকে আইএসের উত্থানের কারণে। একটা জিনিস আমি বুঝি না, আমি জানি প্রেসিডেন্ট ওবামা বলেছেন আমেরিকান গোয়েন্দারা আইএসকে তুচ্ছ জ্ঞান করেছে। এটা খুবই অদ্ভুত, কারণ কিছু মানুষ আইএসের এই সামরিক সফলতাকে আধুনিক ইতিহাসের অনেক বড় বিজয় বলে মনে করছে। পৃথিবীর যেখানে যাই ঘটুক না কেন মার্কিন গোয়েন্দারা তা জানে। কিন্তু এটা কিভাবে সম্ভব যে তারা জানতেই পারল না আইএস এত শক্তিশালী? এখন নির্দিষ্ট করে বলতে গেলে বলতে হয় যে, সৌদি তা ঠিকই জানত। তাহলে তারা আমেরিকানদের তা জানাল না কেন?

আল আহমেদঃ আমার মনে হয় এখানে একটা নীতিগত সমস্যা আছে তা হলো, অ্যামেরিকার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ও জর্ডান, সৌদি আরবসহ অন্যান্য মিত্রের ওপর আমেরিকার বিশ্বাস। যারা হয়তো যুক্তরাষ্ট্রকে ভুল পথে চালিত করেছে। ইরাকি সরকারও ব্যতিক্রম নয়। ইরানের চাপের কারণে ইরাকি সরকার যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে দৃঢ় সম্পর্ক রক্ষা করে না চলার সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছে। সুতরাং যুক্তরাষ্ট্রের আসলে কোনো বিশ্বাসযোগ্য বন্ধু নেই। আর সৌদি আরবের কথা বলতে গেলে, সৌদি আরব আসলে বরবরাই যুক্তরাষ্ট্রকে ভুল পথে চালিত করতে আগ্রহী।

পল জেঃ কিন্তু এটা কেন?

আল-আহমেদঃ আইএসআইএস ও তার ক্ষমতা, কারণ আইএসআইএস এবং সিরিয়া ও ইরাকে অন্যান্য সন্ত্রাসী গ্রুপের গডফাদার হলো সৌদি আরব। সুতরাং অবশ্যই তারা ঠকানোর জন্যেই এটা করেছে। ১৯৩০ সাল থেকে তারা এই খেলা খেলে আসছে। আর এটা তারা ভালোই খেলে।

পল জেঃ সৌদিরা চিন্তা করেছিল সিরিয়া যুদ্ধে এরকম উগ্র ইসলামি জিহাদি ঢুকিয়ে পরিস্থিতিকে তারা নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে, তাদেরকে ব্যবহার করে আসাদকে ক্ষমতাচ্যুত করতে পারবে, আর যখন আসাদ সরে যাবে তখন তারা এসব শক্তিগুলোকে ধারণ করতে পারবে। আপনার কী মনে হয়? তারা কি আইএসের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছে? অথবা আইএস কি এখনো সৌদি স্বার্থ রক্ষা করে চলছে?

আল-আহমেদঃ আইএস অবশ্যই সৌদি স্বার্থের একটা অংশ। আপনি যদি খেয়াল করেন আইএসআইএস কী করছে, তাহলে বুঝবেন এটা ইরাক ও সিরিয়ার প্রতি সৌদি পররাষ্ট্রনীতিরই একটা অংশ। সৌদি সরকার ইরাকি ও সিরিয়ার সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত বা দুর্বল করতে চায়। আইএসআইএসও

BanglaBook.org

তাদের হয়ে সেটাই করছে। কিন্তু আমি জানি না সৌদি তাদের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছে কিনা। এখনও সেরকম কোনো প্রমাণ নেই। কিন্তু সৌদি ও কাতারের লক্ষ্য সিরিয়া থেকে আসাদকে বিদায়, সেখানে গণতন্ত্র প্রতিস্থাপন নয়। বরং তারা শুধু এটুকু চায় যে, আসাদ থাকবে না। তারা এটা চায়নি যে সিরিয়ায় একটা প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার গড়ে উঠুক যা ওই অঞ্চলে মডেল হতে পারে। উপসাগরীয় দেশগুলো, যারা রাজতান্ত্রিক তারা গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থাকে ভয় পায়। কারণ তারা ডিএনএ-'র ওপর নির্ভরশীল, জনগণের প্রতিনিধিত্বের ওপর নয়।

পল জেঃ ঠিক, এখন এই মুহূর্তে একটা জিনিস আমার কাছে অদ্ভুত ঠেকলঃ আমার মনে হলো, সৌদি ইরানের সাথে মিলিত হয়ে আইএসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আগ্রহী। আমি এটা দেখেছি যে INEGMA নামে একটি সংগঠন আছে যেটা এক ধরনের সামরিক থিংক ট্যাংক। যার সৌদি ও অন্যান্য সামরিক নেতাদের ওপর বেশ প্রভাব আছে। আমার মনে হয় তারা প্রায়ই সৌদি মতামতকে প্রতিনিধিত্ব করে। এবং তারাও আসাদকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য ব্যাপক আগ্রহী। তারা বলেছিল আমরা ইরানের সাথে কাজ করতে আগ্রহী শুধুমাত্র যদি তারা আসাদকে সমর্থন করা বন্ধ করে। কিন্তু আমার মনে হয় সৌদির আসাদকে ক্ষমতাচ্যুত করার একমাত্র কারণ হতে পারে ইরানকে পাওয়া।

আল-আহমেদঃ অবশ্যই। এটা তাদের খেলারই একটা অংশ ছিল যে ইরাক ও সিরিয়ার সরকারের সাথে ইরানের একটি বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক থাকবে। আসলে এটা সিরিয়ান সরকারকেও অনেকভাবে সমর্থন দিয়ে আসছিল। সুতরাং সৌদির উদ্দেশ্য ছিল সিরিয়া, ইরাক এবং ওই অঞ্চলে একটি মডেলের উত্থানকে প্রতিহত করা। তারা প্রবলভাবে চেয়েছিল ইরানের ক্ষমতা ও প্রভাব বজায় থাকুক। এবং তারা বেশ প্রায়োগিকও ছিল বটে। তারা ৩০-'র দশকেও এটা করেছিল যখন সৌদিদের দ্বারা আইএসআইএসের মতো আরেকটি গ্রুপ তৈরি করা হয়েছিল এবং বৃটিশদের দ্বারা তাদেরকে আক্রমণ করানো হয়েছিল। প্রায় হুবহু আইএসআইএসের মতো একটা গ্রুপ সিরিয়া ও ইরাক আক্রমণ করেছিল। এটি ছিল খাঁটি সৌদি বাহিনী। পরে সৌদি সরকার নিজেই ওই বাহিনীকে ধ্বংস করেছিল। একটিমাত্র লক্ষ্যই তাদেরকে পরিচালিত করে, আর তা হলো রাজতন্ত্র টিকিয়ে রাখা। এবং এটা টিকিয়ে রাখার জন্য তাদের যা কিছু করা দরকার সবকিছুই তারা করবে। এমনকি নিজস্ব উত্তরসুরিদের হত্যা করতেও তারা পিছপা হবে না। এবং সিরিয়া ও ইরাকে তাদের যে শাখা প্রশাখা আছে তাও তারা কেটে বাদ দেবে।

BanglaBook.org

পল জেঃ আপনি ইরাক ও সিরিয়ায় আইএস-এর ওপর বোমা হামলায় সৌদির যোগ দেওয়ার বিষয়টি বোঝাতে চাচ্ছেন? আমি বলতে চাচ্ছি এটা তাদের একটা সমান্তরাল নীতিঃ আপনি এখানে আমেরিকার বন্ধুর মতো আচরণ করছেন আবার অন্যখানে এই জঙ্গিদেরকে অর্থ দিয়ে সুসংগঠিত করতে সহায়তা করছেন।

আল-আহমেদঃ একদম ঠিক। সবাই জানে আফগানিস্তানে এরকম একটি উদাহরণ আছে যেখানে যুক্তরাষ্ট্রের মিত্র পাকিস্তান যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার সাহায্য পেয়ে থাকে। আসলে, পাকিস্তানের হাতে পারমাণবিক বোমা আছে কিন্তু সেটা নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র কোনো হৈচৈ করেনি। যেমনটা করেছে ইরানের কথিত পারমাণবিক কর্মসূচি নিয়ে। সুতরাং তালেবান মূলত সমর্থন পায় পাকিস্তান সরকারের কাছে, পাক গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআই-এর কাছে। পাকিস্তানি সরকারকে করা মার্কিন সাহায্যও তাদেরকে তালেবনাকে সমর্থন করা থেকে বিরত করতে পারে নি। যেখানে তালেবান সমানে আমেরিকান সেনা, পশ্চিমাদের ও আফগান জনগণদের হত্যা করে যাচ্ছে। সুতরাং পরিস্থিতি হলো এমন যে যুক্তরাষ্ট্র তার মিত্র বাছাইয়ের ক্ষেত্রে সফল হয়নি। সৌদিদের চোখে তাদের সবচেয়ে ভালো অবস্থান হলো মিত্র শক্তির ভেতরে থাকা, যাতে সরাসরি এটা দেখা না যায় যে তারা আইএসআইএসকে সমর্থনের মধ্যদিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের বিপক্ষে অবস্থান নিচ্ছে।

পল জেঃ এখন আইএসও সৌদিকে লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করেছে। এবং আমেরিকানদের সাথে জোট বাধা আইএস সদস্যের চোখে সর্বোচ্চ অপরাধ। তো আপনি বলতে চাচ্ছেন যে, আইএস সৌদি আরবের সাথে লাগতে যাচ্ছে, বিষয়টা এমন নয়, এটা অনেকটা বাড়িয়েই বলা হয়েছে।

আল আহমেদঃ অবশ্যই, একদম ঠিক। সৌদি আরব ও তার এজেন্টরা বলেই চলেছে সৌদি আরবের জন্য আইএস একটা হুমকি। কিন্তু সৌদি মাটিতে আমরা আইএস-এর কোনো আক্রমণ দেখি না। আসলে আইএস সৌদি-ইরাকি সীমান্তে অবস্থান করে কিন্তু তারা কোনো দিন সৌদি সীমানায় ঢুকে পড়ার কিংবা বোমা মারার কোনো চেষ্টা করেনি। তার মানে এই নয় যে সেখানে আমরা কোনো ছোটখাটো আক্রমণ দেখব না। হ্যা আমরা সেটা দেখতেও পারি। কিন্তু যদিও সেটা হয়ে থাকে তা হবে লোক দেখানো।

পল জেঃ ঠিক। শুরুতে আপনি বলেছিলেন সৌদিরা আমেরিকাকে ভুল পথে পরিচালিত করছে। আমি ধারণা করছি আপনি বোঝাতে চাচ্ছেন যে তারা আমেরিকান গোয়েন্দাদের বুঝতে দিতে চায়নি আইএস আস্তে আস্তে কতটা শক্তিশালী হয়ে উঠছে। কিন্তু আমেরিকানদের নিজেদের কেন কোনো বিচার বুদ্ধি নেই?

BanglaBook.org

আল- আহমেদঃ আমার মনে হয় এখানে পদ্ধতিগত একটি সমস্যা আছে। আমি নাম বলতে চাই না কিন্তু বুশ প্রশাসনের সময় সন্ত্রাস সম্পর্কিত ফাইল নাড়াচাড়া করতেন এরকম একজন আমেরিকান আছেন। সেই নারী আসলে সৌদি মুখপাত্র। সাবেক এফবিআই প্রধানও এখন সৌদি দলে। এই বিষয়গুলো, এই সম্পর্কগুলো, এই ব্যক্তিগত অর্থনৈতিক সম্পর্কগুলো আসলে যুক্তরাষ্ট্রের কর্মকর্তাদের ক্ষমতা কমিয়ে দিচ্ছে, যারা গোয়েন্দা তথ্য পর্যালোচনা করে সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে। সুতরাং যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থ সুরক্ষার চেয়েও কখনও কখনও ব্যক্তির স্বার্থই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। এ কারণেই সিনেটর বব গ্রাহাম যখন বলেন সৌদি আরব নাইন-ইলাভেনের সাথে জড়িত ছিল, তখন আমরা আমেরিকার মধ্যে সৌদি আরবের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার কোনো চেষ্টা দেখি না। অথবা জনসম্মুখে বলতে শুনি না আমার দেশ ছাড়ো।

পল জেঃ হ্যা, আমরা বব গ্রাহামের বেশ কয়েকটি সাক্ষাৎকার নিয়েছি এবং তিনি বিশেষত বলেছিলেন যে, কেবলমাত্র কতিপয় বেয়াড়া রাজপুত্র নয়, সৌদি সরকারই সরাসরি সুযোগ সুবিধা ও অর্থ দিয়ে নাইন-ইলাভেন আক্রমণের সাথে সংযুক্ত ছিল। আমি বব গ্রাহামকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম প্রিন্স বানদার এটার সাথে জড়িত কিনা। তিনি বলেছিলেন, হ্যাঁ। বানদার সে সময় যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত সৌদি রাষ্ট্রদূত ছিলেন। বুশ পরিবারের সাথে তার এত সুসম্পর্ক ছিল যে তিনি বানদার বুশ নামেও পরিচিত ছিলেন। অর্থাৎ আমি বোঝাতে চাইছি, আমেরিকান কর্তৃপক্ষ এইসব ক্ষেত্রে সৌদি ভূমিকা জানত এবং তারপরও তারা স্বাভাবিক মিত্র হিসেবে বিবেচিত হয়। আপনি বলছেন, ব্যক্তিগত আর্থিক সুবিধা দিয়ে চুপ রাখা হয়েছে। কিন্তু এর চেয়েও কি বেশি কিছু নেই?

আল আহমেদঃ আমি এই বিষয়ে পলিটিকো ম্যাগাজিনে একটি আর্টিকেল পড়েছিলাম। যেখানে বলা হয়েছিল, মারাত্মক মানবাধিকার লঙ্ঘন এবং যে সন্ত্রাস অনেক আমেরিকানকে হত্যা করেছে সেই সন্ত্রাসকে সমর্থন করার পরও কিভাবে সৌদি আরব ও অন্যান্য উপসাগরীয় দেশগুলো যুক্তরাষ্ট্রের সমালোচনা ও আক্রোশ থেকে বাঁচতে পারে। এটা সত্যিই খুব সহজ। একটুও জটিল নয়, যদি আপনি সৌদি আরবের সঙ্গে চীনের তুলনা করেন। চীনের কাছে আমেরিকার ১ দশমিক ৩ ট্রিলিয়ন ডলার দেনা আছে। তারা অনেক বড় ও অনেক শক্তিশালী দেশ। প্রতি বছর তারা আমেরিকার কাছে ৪৫০ বিলিয়ন ডলারের পণ্য বিক্রি করে। সেখানে সৌদি আরব বিক্রি করে মাত্র ৫৫ বিলিয়ন ডলারের তেল ও তেলজাতীয় দ্রব্য। তারপরেও চীনারা অনেকক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞা ও সরাসরি সমালোচনার শিকার এবং যুক্তরাষ্ট্র অনেক ভিন্নমতাবলম্বী

BanglaBook.org

চীনা নাগরিকদেরও আশ্রয় দেয়। কিন্তু তারা সৌদি রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে কখনই এটা করে না।

সুতরাং পার্থক্যটা কোথায়? অমিলটা কোথায়? ব্যাপারটা এই যে সৌদি সরকার ও উপসাগরীয় দেশগুলো ওয়াশিংটন ডিসির মতামত ও আনুগত্য কিনতে বিনিয়োগ করছে। এবং আমাদের কাছে তার লম্বা প্রমাণ আছে। যার মধ্যে আছে থিংক ট্যাংক, বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রাক্তন কর্মকর্তারা। বর্তমান কর্মকর্তাদের সাধারণত জানিয়ে দেওয়া হয় যে, যখন আপনি চাকরি ছাড়তে যাচ্ছেন আপনার জন্য খুব ভালো একটা চুক্তি অপেক্ষা করছে। দুর্ভাগ্যজনকভাবে এটাই হচ্ছে ঘটনা। এ বিষয়ে কংগ্রেসের খুব বড় একটা শক্ত শুনানি আছে যে, কেন একটি রাজতন্ত্র শুধুমাত্র যুক্তরাষ্ট্রের কর্মকর্তা নয় বরং প্রশাসনিক ও থিংক ট্যাংকগুলোকেও কিনে ফেলতে পারছে।

পল জেঃ শেষ প্রশ্ন। ইরাকে আইএসের বিরুদ্ধে সফল সামরিক অভিযান চালানো হলে আইএস সিরিয়ায় ফিরে যাবে। কারণ সিরিয়া হচ্ছে ইরাকে আইএসের অভিযান পরিচালনার ঘাঁটি। সুতরাং তারা মর্ডারেট বা উদারপন্থী বাহিনীগুলোকে সশস্ত্র করার কথা বলেছে। এই পুরো নীতিটাই কেমন যেন খাপছাড়া মনে হচ্ছে। আবার আসাদের বিষয়টাও সবচেয়ে জটিল। সৌদিরা চায় আসাদ ক্ষমতাচ্যুত হোক। কিন্তু সিরিয়ায় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা নিয়ে যদি তারা ভয়ই পায়, তাহলে আসাদ থাকলেই বা তাদের কী সমস্যা?

আল-আহমেদঃ আসাদের থাকা না থাকায় তাদের কিছু যায় আসে না। তারা চায় যে আসাদ বলুক ইরান তার শত্রু, এবং ভূমধ্যসাগরীয় এলাকায় ইরানের প্রবেশ নিষিদ্ধ। আর হেজবুল্লাহকে সমর্থন করা বন্ধ করে দিক। ব্যাস এটাই তাদের কৌশলগত উদ্দেশ্য। দ্বিতীয় লক্ষ্য হচ্ছে সৌদি আরবের আশেপাশে সিরিয়া অথবা ইরাকে কোনো আধুনিক অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক এমনকি অর্ধ-গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থাও যাতে গড়ে না ওঠে। সুতরাং তাদের লক্ষ্য আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা গড়ে ওঠাতে বাঁধা দেওয়া, যেটা তাদের মধ্যযুগীয় রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে চ্যালেঞ্জ করে।

পল জেঃ আর যদি আইএস কম বেশি সৌদি হাতিয়ার হয়ে থাকে তাহলে কেন আমেরিকার গোয়েন্দারা বিষয়টি বুঝতে পারেনি?

আল-আহমেদঃ আমার মনে হয় তারা জেনেও এড়িয়ে যাওয়াটাই পছন্দ করে। কাতার, কুয়েত এদের ক্ষেত্রেও তাই। আমরা খুব ভালো করে জানি যে এই বিষয়গুলো প্রকাশ্য কিন্তু বিব্রতকর। ঘটনা হচ্ছে কাতার নুসরা ফ্রন্টকে সমর্থন করে। যে সংগঠনটি যুক্তরাষ্ট্রের জন্যেও হুমকি। কিন্তু জন কেরি এখনও কাতারকে কিছু বলা থেকে বিরত আছেন। ভাবটা এমন যেন কাতার সুপার

BanglaBook.org

পাওয়ার। যুক্তরাষ্ট্র কেন কাতার বা বাহরাইনকে কিছু বলছে না? কারণটা আগেই বলেছি, এটা হলো টাকা—যা থিংক ট্যাংক এবং বিশেষত প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ও অন্যান্য মার্কিন কর্মকর্তাদের পেছনে ব্যয় করা হয়।

পল জেঃ ঠিক। কিন্তু এখানে অবশ্যই স্বার্থের এককেন্দ্রিকতাও আছে। এমন নয় যে যুক্তরাষ্ট্র মধ্যপ্রাচ্যের সর্বত্র গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা চাচ্ছে।

আল-আহমেদঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সেখানে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পক্ষে নয়। দ্যা নিউ ইয়র্ক টাইমসের জন্য লেখা একটি আর্টিকেলে বলেছিলাম, মার্কিন সরকারকে আমরা কখনও গণতন্ত্রের পক্ষে বলতে শুনিনি। অধিকন্তু আমরা শুনেছি, বাহরাইনে সাংবিধানিক রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পক্ষে বলতে। অর্থাৎ প্রকাশ্যে যুক্তরাষ্ট্রের নীতি হলো ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে রাজতন্ত্রের সমর্থন করা। আমরা তাদের একবারও বলতে শুনিনি, বাহরাইন, সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, কাতার এই দেশগুলোর জনগণের সরকার গঠনে ব্যাপক ভূমিকা থাকতে হবে।

BanglaBook.org

পেন্টাগনের একটা নীতি ছিল, বিভক্ত করো ও শাসন করো:

ড. নাফিজ আহমেদ, লেখক, সাংবাদিক, বিশ্লেষক

ড. নাফিজ আহমেদ। বেস্ট সেলিং লেখক, অনুসন্ধানী সাংবাদিক ও আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা বিশ্লেষক। লেখালেখি করেন নাফিজ মোসাদ্দেক আহমেদ নামে। গার্ডিয়ান পত্রিকার নিয়মিত সংবাদদাতা। লিখেছেন পরিবেশ, জ্বালানি, ভূরাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংকট নিয়ে। 'আ ইউজার গাইড টু দ্যা ক্র্যাইসিস অব সিভিলাইজেশন এন্ড হাউ টু সেভ ইট' নামের আলোচিত বইটির লেখক তিনি। তার এই বই অবলম্বনেই তৈরি হয়েছে 'দ্যা ক্রাইসিস অব

সিভিলাইজেশন' নামের ডকুমেন্টারি ফিচার ফিল্ম। সত্য ঘটনার আলোকে তাঁর প্রথম সায়েন্স ফিকশন উপন্যাস 'জিরো পয়েন্ট' আরও একটি আলোচিত গ্রন্থ।

জেসিকা দেজভারিউক্স, প্রযোজক, রিয়েল নিউজ নেটওয়ার্ক: স্বাগত। ইরাকের চলমান অস্থিরতা এবং আইএস জঙ্গিদের উত্থানের সাথে মূলধারার গণমাধ্যমেও ইরাক যুদ্ধের দামামার শব্দ বাড়ছে। এ বিষয়ে আলোচনার জন্যেই আমরা আপনাকে ডেকেছি। নাফিজ আপনাকে অনুষ্ঠানে স্বাগত।

জেসিকা: নাফিজ, আইএসআইএল, আইএসআইএস, ইসলামিক স্টেট গ্রুপটি একেক সময় একেক নাম ধারণ করছে। কিন্তু তারা তো আসলে একটাই গ্রুপ তাই তো? আপনি কি ধারণা দিতে পারেন, কিভাবে এই সন্ত্রাসী গ্রুপের জন্ম আর উত্থান?

নাফিজ: এটি আসলে সত্যিকার অর্থে আল কায়েদার সাথে সংশ্লিষ্ট একটি জঙ্গি গ্রুপ ছিল। সিরিয়া ও ইরাকে তাদের তৎপরতা ছিল। আমরা জানি এখানেই তাদের জঙ্গি কর্মকাণ্ড ব্যাপ্তি লাভ করে। এবং বরাবরই এখানে অনেক পক্ষের উপস্থিতি বিদ্যমান। ইরাকে এমনকি বা'থ পার্টির প্রাক্তন সাদ্দাম সমর্থকদেরও উপস্থিতি ছিল। তারা আল কায়েদা জঙ্গিদের দ্বারা নিয়োগপ্রাপ্ত ছিল। ইরাক ও সিরিয়া সীমান্তে ইরাকি সেনা ও সিরিয় গ্রুপগুলোর মধ্যে যুদ্ধ বেড়েই চলল। এবং কখনও কখনও তারা সীমান্তের ভেতরে প্রবেশ করেও যুদ্ধ করতে লাগল। যখন এরা অর্থ অস্ত্রের মদদ পাওয়া শুরু করল তখন থেকে পরিস্থিতি ক্রমশ ভয়ঙ্কর রুপ নিতে শুরু করে। এবং এই জঙ্গিরা প্রভাবশালী হয়ে ওঠে। এদের অর্থ সরবরাহ করে থাকে উপসাগরীয় দেশগুলো যা তাদেরকে আরও বেশি শক্তিশালী করে তোলে। সুতরাং আমরা সিরিয়ার এই গ্রুপগুলোকে অর্থ সরবরাহের জন্য দায়ী হিসেবে পেলাম সৌদি আরবকে।

জেসিকা: এর পক্ষে কি আমাদের কোনো প্রমাণ আছে?

নাফিজ: অবশ্যই স্পষ্ট প্রমাণ আছে। আসলে বিষয়টি দিবালোকের মতো প্রকাশ্য। ব্যাপারটা এমন যে এটা সবাই জানে, কিন্তু সরাসরি বলে না। সামরিক বিশ্লেষকদের দেওয়া প্রমাণাদি থেকে শুরু করে নিউ ইয়র্ক টাইমস, ওয়াশিংটন পোস্টের মতো সংবাদপত্রের প্রকাশিত অনুসন্ধানী প্রতিবেদন থেকে এসব প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। আর আমাদের কাছে সিআইএ, পররাষ্ট্র দপ্তরের কর্মকর্তা, পেন্টাগনের কর্মকর্তা, এমনকি উপসাগরীয় দেশগুলোতে যেসব বৃটিশ কর্মকর্তা নিযুক্ত ছিলেন তাদের কাছ থেকেও প্রমাণ পাই যে, উপসাগরীয় দেশগুলো এই ভয়ঙ্কর জঙ্গিদের সাহায্য করে আসছে। এগুলোর সরাসরি প্রতিফলন ইরাকের ওপর পড়ে কারণ এই সমর্থন পাওয়া গ্রুপগুলো এখন সীমান্তের দুই পাড়েই তৎপর। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় হলো জঙ্গিদের প্রতি

BanglaBook.org

সৌদি, কুয়েত ও কাতারের এসব ইন্ধনের সাথে যুক্ত থাকার বিষয়টি যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য তত্ত্বাবধান করে আসছে। এটা অনেকে স্বীকারই করেন না যে আল কায়েদার সাথে যুক্ত থাকা সত্ত্বেও যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেন জেনে শুনে এই গ্রুপগুলোকে সমর্থন দিয়েছে।

জেসিকা: কিন্তু তারা কেন এত ব্যাকুলভাবে আসাদ অর্থাৎ সিরিয়াকে অস্থিতিশীল করতে চাইল?

নাফিজ: এই বিষয়ের ওপর আলোকপাত করার অনেকগুলো ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি আছে। আমার মনে হয় বিষয়টি ব্যাখ্যা করার জন্য যে কোনো একটি সুনির্দিষ্ট পয়েন্ট উল্লেখ করাটা কঠিন। আমি প্রথমে কারণগুলো বলতে চাই। তা হলো, আসাদ রাশিয়াকে কিছু বিষয়ে সাহায্য করে, ঐ অঞ্চলে রাশিয়ার একটি ঘাঁটি গড়ার সুযোগ করে দেয়। ঐ অঞ্চলে তেলের পাইপলাইন সংক্রান্ত ভৌগোলিক রাজনীতির সঙ্গেও ব্যাপারটা জড়িত। তো, আপনি এখানে পাইপলাইন সংক্রান্ত এমন একটা ভৌগোলিক রাজনীতি পেলেন যা হলো, পাইপলাইনটি সিরিয়ার বিতর্কিত এলাকার মধ্যদিয়ে গেছে, যেখানে ইরান ও কাতারের অধিকার আছে। এখন ইরান ও কাতার দুই দেশই ঐ জায়গাটি নিজের কাজে লাগানোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। পাইপলাইনটি আসলে সিরিয়া পার হয়ে ইউরোপে সরবরাহ পৌঁছে দেবে। এটা অনেক উচ্চাকাঙ্ক্ষী একটা প্রকল্প। অনেকেই বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে প্রকল্পটি আসলে পাইপস্বপ্ন কিনা। যে পাইপলাইন নিয়ে এত রাজনীতি, তা কি টেকসই? আর এই ঘটনা তো বছরের পর বছর ধরে চলছে। কিন্তু এই প্রকল্পকে বাস্তবে পরিণত করতে অনেক পরিশ্রমও করতে হয়েছে। সুতরাং ইরান ও সিরিয়া একটি চুক্তি স্বাক্ষর করে। কাতার, সৌদি, তুরস্কসহ অন্যান্য দেশের সাথেও ব্যাপক আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছিল। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, পাইপলাইনের রুট নিয়ে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী দাঁড়িয়ে গেছে। এটা অবশ্যম্ভাবি যে কাতার যে দলে ছিল সেই দলকে যুক্তরাষ্ট্র সমর্থন দেবে ও ইরানের রাশিয়াকে সমর্থন দেবার বিষয়টি তাদের খুশি করবে না, এটাই স্বাভাবিক।

যুক্তরাষ্ট্র অনেকদিন থেকে পাইপলাইন প্রজেক্ট থেকে রাশিয়া ও ইরানকে হটিয়ে দেওয়াটা নিশ্চিত করতে চাইছিল। সুতরাং যখন ইরান আসাদের সাথে এ রকম একটি চুক্তি করে ফেলল সেটা একটা বড় ধরনের কৌশলগত পরিবর্তন বলে ধরে নেওয়া হয়েছিল। আর কিছু একটা করা দরকার বলে মনে করেছিল যুক্তরাষ্ট্র। সেখানে একটি রুশ সামরিক ঘাঁটি থাকার বিষয়টি ছাড়াও আরও কিছু ভূ-রাজনৈতিক বিষয় জড়িত ছিল। কিছু বিষয় ছিল যেমন, মধ্যপ্রাচ্যের সংঘাতে আসাদের ভূমিকা, হামাসকে সাহায্য করা ও ইরানিদের

BanglaBook.org

সাথে তাদের সম্পর্ক। তো সাধারণভাবে বিষয়টি এক অর্থে এমন যে সিরিয়া তথাকথিত খারাপ দলের একটি সদস্য হয়ে গেল (যুক্তরাষ্ট্রের চোখে)। সুতরাং এই পুরো পাইপলাইনের ব্যাপারটা ভয়কে আরও বাড়িয়ে দিল এবং আমার মনে হয় তাদেরকে কোনো একটা পদক্ষেপ নিতে বাধ্য করল। উইকিলিকসের ফাঁস হওয়া তথ্যে দেখা যায়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা যে বিষয়টি নিয়ে কথা বলছে তা হলো, সিরিয়া খুব দ্রুত গৃহযুদ্ধের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছাবে। তারা এটা জানত সিরিয়ায় কোনো একটা ঝামেলা শুরু হতে যাচ্ছে। জিহাদিদেরকে এরকম পরিস্থিতির মধ্যে ফেলে আরব বসন্তের আন্দোলনটাকেই ছিনতাই করতে চেয়েছিল ও এমনভাবে সেটা পরিচালিত করতে চেয়েছিল যাতে তারা সেটা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। কিন্তু আমরা দেখলাম যে পরিস্থিতিটা আর তাদের নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রইল না।

জেসিকা: হ্যাঁ এটা নিয়ন্ত্রণের বাইরে। এর দ্বারা আমি ব্যক্তিগতভাবেও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি। এই অনুষ্ঠানে আমি আগেই বিষয়টি বলেছি যে, আমি আমার বন্ধু সাংবাদিক জিম ফলিকে হারিয়েছি। তিনি সিরিয়ার সংঘাতের খবর সংগ্রহ করছিলেন। আইএস তার শিরশ্ছেদ করল। এরা আসলে উগ্রপন্থী উন্মাদ আর ইসলামের প্রকৃত ক্ষমতায়নটাকেই তারা বাধাগ্রস্ত করছে। পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে আপনি কী বলবেন?

নাফিজ: আইএস-এর উত্থান অনুমেয় ছিল, আর কিছু বিশ্লেষক অনেক বছর ধরেই সাবধান করে আসছিলেন যে ইরাক গৃহযুদ্ধের দ্বারপ্রান্তে। এই পরিস্থিতি যে আসবে তা ধারণায় ছিল। আমরা এই গ্রুপগুলোকে অনেক দিন ধরেই অর্থ সহায়তা দিয়ে আসছি, আমরাই এই ভয়ঙ্কর গ্রুপগুলোকে অস্ত্র দিয়ে পরস্পরের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়েছি। আবার আমরাই এখন তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছি অথবা করতে চাচ্ছি। যদিও ওবামা প্রশাসন কথার কথা বলেছে যে, আমরা শুধুমাত্র উদারপন্থী বিদ্রোহীদের অর্থ সহায়তা দিতে চাই। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র অর্থগুলো সেই গ্রুপগুলোকেই দিয়েছে যাদেরকে আরব দেশগুলো পছন্দ করত। তাদের অধিকাংশই ছিল আল-কায়েদার সাথে যুক্ত ভয়ঙ্কর জিহাদি সংগঠন। সুতরাং আমাদের যা কিছু বলা হয়েছে আর যা করা হয়েছে তার মধ্যে স্ববিরোধীতা আছে। অর্থাৎ নীতি নির্ধারকরা এমন একটি সংকট তৈরি করে এখন তার কোনো দায় দায়িত্ব নিতে চাইছেন না।

আমরা যদি এই অঞ্চলের পরিকল্পনা সম্পর্কিত গত কয়েক বছরের প্রতিবেদনগুলো পর্যবেক্ষণ করি তাহলে দেখব যে, পেন্টাগনে একটা নীতি ছিল, বিভক্ত করো ও শাসন করো, ইরানের ক্ষমতাকে দুর্বল করে দেওয়ার জন্য সালাফিপন্থীদের ক্ষমতায়নের কথা প্রকাশ্যে বলা হয়েছিল। ভূমধ্যসাগরীয়

BanglaBook.org

দেশগুলোকে ক্ষমতায়নের কথা প্রকাশ্যে বলা হচ্ছিল কারণ তাদের প্রচুর পরিমাণে পেট্রোলিয়াম রয়েছে। সুতরাং এই দেশগুলোকে ব্যবহার করে সন্ত্রাসী গ্রুপগুলোকে সহায়তা দিলে আন্তঃমুসলিম সম্পর্কগুলোর মধ্যে ঘূর্ণি তৈরি হবে ও তারা শিয়া-সুন্নি সংঘাতে জড়িয়ে পড়বে। এর ফলে বিভিন্ন এলাকার সন্ত্রাসী ও জঙ্গিরা একে অন্যের সাথে যুদ্ধ শুরু করবে। যা তাদের সবাইকেই দুর্বল করবে। আর যখন তারা নিজেদের মধ্যে সংঘাতে ব্যস্ত থাকবে তখন তারা নিজেরাই মার্কিনি ও ইসরাইলিদেরকে তাদের নিজস্ব স্বার্থসিদ্ধির পথ তৈরি করে দেবে। সুতরাং আমরা দেখি যে, সন্ত্রাসবাদের বিপক্ষে জয়ী হওয়ার ক্ষেত্রে যখন আপনার অদূরদর্শী ভূরাজনৈতিক ধারণা থাকবে তখন আপনি দেখবেন যে এক পর্যায়ে সেটা আপনাকে বিপজ্জনক পথে নিয়ে গেছে। এই সন্ত্রাসী গ্রুপগুলোকে অর্থ সহায়তা দেওয়াটা ছিল চরম অদূরদর্শীতা।

জেসিকা: কিন্তু এখন আমাদের করণীয় কী? কারণ কেউ কেউ বলছেন যে এই গ্রুপগুলো নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে, পরিস্থিতি আরও বেশি তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। আরও মানুষের মৃত্যু হতে যাচ্ছে। কীভাবে এই পরিস্থিতির মোকাবিলা করা যায়?

নাফিজ: এটা খুব জটিল প্রশ্ন। কারণ, আমরা সামরিক শিল্পের মতো শক্তিশালী জটিল বিষয়ের সম্মুখিন যখন হই, যা কিনা অস্বচ্ছ ও আমরা জানি না এটা কোন দিকে যাচ্ছে, আমরা জানি না তারা কিভাবে উস্কানি ছড়াচ্ছে। তখন এই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের উত্তরটা কঠিন। যুদ্ধ শুরু করো ও জনগণকে বোমা মেরে উড়িয়ে দাও, উত্তরটা কোনোভাবেই এমন হতে পারে না। সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করলে সাধারণ জনগণকেও খারাপের দলে ফেলার একটা সাধারণ প্রবণতা তৈরি হয়। জঙ্গিরা তখনই ইরাকে ঢুকেছে যখন মার্কিনিরা ইরাকে সহায়তা দিচ্ছিল। যখন মালিকি প্রেসিডেন্ট ছিলেন তিনি সাম্প্রদায়িক নীতির পেছনে ছুটছিলেন। এগুলোই সত্যিকার অর্থে এই এলাকাকে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিপক্ষ করে তুলেছে। বর্তমানের আইএসআইএস আসার অনেক আগেই ফালুজায় আমরা একদল জঙ্গির উত্থান দেখেছিলাম।

জেসিকা: অবশ্যই, আমরা সেটা কাভার করেছি। কিন্তু এখন আমাদের কী করার আছে?

নাফিজ: প্রথমত আমার মনে হয় তাদের সকল আর্থিক ও সামরিক উৎস বন্ধ করা উচিৎ। অনেকে বলেন আইএস জঙ্গিরা বিভিন্ন শহরে লুটপাট করে প্রচুর অর্থের মালিক হচ্ছে। তাদের নিজস্ব অর্থায়নে চলছে। তাদের অর্থনৈতিক ক্ষমতাবৃদ্ধি নিয়ে আমার কোনো দ্বিমত নেই। কিন্তু আমাদের কাছে প্রচুর প্রমাণ আছে তারা বিদেশি অর্থ অস্ত্রের মদতও পাচ্ছে। আমরা খুব ভালো করে জানি

BanglaBook.org

অর্থগুলো কোথা থেকে আসছে। এই অর্থ সাহায্য বন্ধের কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। ঘটনাপ্রবাহ অনুসরণ করে আসা আন্তরিক কিছু গোয়েন্দা কর্মকর্তা অনেকদিন ধরে অভিযোগ করে আসছিল যে, নাইন-ইলাভেন থেকেই তারা এটা বন্ধের চেষ্টা করে যাচ্ছে কিন্তু রাজনৈতিক ও আমলাতান্ত্রিক জটিলতার কারণে সত্যিকার অর্থে কোনো পদক্ষেপ নিতে পারছে না। এখানে একটা প্রশ্ন জাগে তাহলে আমরা করছিটা কী?

দ্বিতীয়ত আমি বলব, ইরাকের গণতন্ত্রকে সত্যিকার অর্থে শক্তিশালী করা জরুরি। অথচ আমাদের সকল আগ্রহ শুধু তেল পাওয়ার দিকে নিবদ্ধ। আসলে আমরা এত কিছু করছি শুধু তেলের জন্যই। অথচ ইরাকের মানুষদের নিয়ে কেউ ভাবেনি। যুদ্ধটা গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও অংশগ্রহণমূলক সরকার ব্যবস্থা তৈরির নয়, আমরা যদি ইরাকি জনগণকে মুক্ত করতে পারি ও একটি দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা করতে পারি তাহলে আমরা আইএসকেও মোকাবিলা করতে পারব। কারণ কোনো গেরিলা যুদ্ধের শুরুতে জনসমর্থন দরকার হয়। আমরা যদি সেটা বন্ধ করতে পারি তাহলে ইরাককে মুক্ত করা সম্ভব। কিন্তু এখানেও ইচ্ছার অভাবটাই বিদ্যমান।

BanglaBook.org

আইএস'কে অবমূল্যায়ন করেছে যুক্তরাষ্ট্র—ব্যর্থ হয়েছে মধ্যপ্রাচ্যে এক দশকের মার্কিন নীতি: লরেন্স উইলকারসন, সাবেক মার্কিন সেনা কর্মকর্তা

লরেন্স উইলকারসন। প্রাক্তন মার্কিন সেনা এবং সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী কলিন পাওয়েলের চিফ অব স্টাফ ছিলেন। কলেজ অব উইলিয়াম এন্ড মারিতে যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তা বিষয়ে পড়ান। জর্জ ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটিতে সম্মান বিভাগের জন্যে জাতীয় নিরাপত্তা নীতি নির্ধারণ বিষয়ক সেমিনার পরিচালনা করেন উইলকারসন।

শরমিনি পেরিজ, নির্বাহি প্রযোজক, দ্যা রিয়েল নিউজ নেটওয়ার্ক: প্রেসিডেন্ট ওবামা এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্র আইএসকে অবমূল্যায়ন করেছে ও আইএসকে প্রতিরোধে ইরাকের সামরিক বাহিনীকেই যোগ্য বলে মনে করেছে। এই প্রেক্ষিতে আপনার কাছে আমার প্রশ্ন এটা কি সম্ভব যে, বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী সেনারাই তাদের প্রতিপক্ষ আইএস-এর শক্তি'র মূল্যায়ন করতে পারল না?

উইলকারসন: যুক্তরাষ্ট্র তার ১৭টি আলাদা গোয়েন্দা সংস্থার পেছনে যে ১ শো বিলিয়ন ডলারেরও বেশি ব্যয় করেছে তা যে সঠিক পথে ব্যয় হচ্ছে না এটা তারই আরেক নিদর্শন। আমি মনে করি না যে, আমাদের গোয়েন্দারা কোনো কাজের কাজ করতে পারছে। এমনকি আমরা মাঠ পর্যায়েও যথেষ্ট ভুগছি। আমরা জানতাম না যে, ইরাকি সেনারা অকার্যকর ছিল। বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার ব্যয় করে এক দশকেরও বেশি সময় ধরে আমরা এই বাহিনীকে প্রশিক্ষণ দিয়েছি এবং তারা দক্ষ হয়ে উঠেছে বলে নিশ্চিত করেছি।

BanglaBook.org

ইরাকি সেনাদের তাদের সত্যিকার ক্ষমতার চাইতে বেশি শক্তশালী বলা মানে এটাই বলা যে, আমরা একদশকেরও বেশি সময় ধরে নিজেদেরই বোকা বানিয়েছি। প্রচুর করদাতার অর্থ ধ্বংস করেছি আর বৃথাই অনেক রক্ত অপচয় করেছি।

পেরিজঃ মার্কিন প্রতিনিধি পরিষদের স্পিকার জন বোয়েনার বলেছেন যুক্তরাষ্ট্রের সেনাদের ইরাক সিরিয়ার রণাঙ্গনে নামা উচিত। তার যুক্তি হলো বর্বর আইএসকে যদি প্রথমেই ধ্বংস করা না যায় তাহলে ভবিষ্যতে এই জঙ্গিরাই আমেরিকাকে ধ্বংস করবে। এবং এই যুদ্ধে সমর্থন দেওয়ার জন্য রিপাবলিকানরা তৈরি। আপনি এ বিষয়ে কী মনে করেন?

উইলকারনসঃ এটা ফালতু কথা। জন বোয়েনারের তার এম-সিক্সটিন রাইফেলটি নিয়ে সিরিয়ায় চলে যান না কেন। এবং সম্ভবত তার একটি পরিবার আছে, তার উচিৎ পরিবারকেও সেখানে পাঠিয়ে দেওয়া। কারণ তিনি যেটা চিন্তা করছেন তা হলো, আমাদের সেনাদের ইরাক-সিরিয়ার ধ্বংসযজ্ঞের মাঝখানে পাঠিয়ে দেওয়া হোক। আমি মনে করি এখানে দুটি বিপদজনক সম্ভাবনা আছে। প্রথমত আপনি অধিকাংশ আমেরিকান সেনাকে সেখানে পাঠিয়ে দেবেন এবং আপনার মানসিকতা থাকবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অসম শক্তিগুলোকে একত্রিত করে একটি আরব সমগ্র তৈরি করা যেখানে কোনো সাম্প্রদায়িক বিভেদ থাকাবে না। দ্বিতীয় ভয়ঙ্কর সম্ভাবনাটি হলো, আমরা শিয়া সুন্নিদের যুদ্ধ বাঁধিয়ে দেব এবং নিঃসন্দেহে এটাও রক্তক্ষয়ী হবে আর আমরা তার মাঝখানে থাকব। সুতরাং আমি সেখানে আমেরিকান সেনা পাঠানোর কোনো ইতিবাচক দিক খুঁজে পাই না অবশ্যই যতক্ষণ পর্যন্ত না বোয়েনার ও আমার দলের অন্যান্য যুদ্ধবাজ নেতা যেমন লিন্ডসে গ্রাহাম ও জন ম্যাককেইন তাদের পরিবারসহ সেখানে যাচ্ছেন এবং আমেরিকায় ফিরে এসে ৫ থেকে ১০ লাখ তরুণ নারী-পুরুষকে বাধ্যতামূলকভাবে সেনাদলে নিয়োগ দিয়ে শান্তি প্রতিষ্ঠার মতো গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজের দায়িত্ব নিচ্ছেন। সুতরাং মি. বোয়েনার, আমার পার্টির অন্যান্য যুদ্ধবাজ নেতার মতোই কথা বলেন যে বিষয়ে তিনি কিছুই জানেন না।

পেরিজঃ প্রেসিডেন্ট ওবামাও বলেছেন শিয়া সুন্নি দ্বন্দ্বই এখন মধ্যপ্রাচ্যে সবচেয়ে বড় বিষয়। এবং তা এখন শুধু মধ্যপ্রাচ্যে নয় সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে।

উইলকারসনঃ আমি মনে করি আমরা ইরাক আক্রমণের আগে সত্যি এখানে কোনো দ্বন্দ্ব ছিল না। কিন্তু এটা তখনই শুরু হলো যখন আমরা দুই সম্প্রদায়কে একসাথে জুড়ে দিলাম। আমার মনে হয় ২০০৩ সালে ইরাক

BanglaBook.org

আক্রমণ করাটা একটা মহাভুল সিদ্ধান্ত ছিল এবং সেই আক্রমণের ফলাফল আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি। আমি মনে করি না সেখানে আরও আমেরিকান সেনা যোগ করাটা এই সমস্যার কোনো সমাধান আনতে পারে। সমাধানটা হতে হবে রাজনৈতিক। কিন্তু এই রাজনৈতিক সমাধানটাও খুবই জটিল ও সময় সাপেক্ষ। এটার সাথে থাকবে তুর্কিরা, থাকবে ইরানি জনগণ, থাকবে সৌদি আরব ও গলফ কো-অপারেশন কাউন্সিল, থাকবে লেবানন, আর আমি ইসরাইলকেও বাদ দিতে পারি না। এদের সবার সমস্যাগুলো আমাদের শুনে নিতে হবে। অর্থাৎ সেই সমস্যাগুলোর সমাধান দরকার। যে সমস্যাগুলোর কারণে আইএস জঙ্গিরা মুসলিমদের সমর্থন পাচ্ছে। জর্জ বুশ, কলিন পাওয়েল ও অন্যান্যরাও বলেছিলেন, যারা জঙ্গিদের সমর্থন করে তাদেরও সরিয়ে দিতে হবে। কিন্তু আমি মনে করি তারা কেন অস্ত্র ধরল এই প্রশ্নেরও উত্তর জানা দরকার। তারা যে অস্ত্রবহন করছে, মানুষ খুন করছে এটার পেছনে অবশ্যই কোনো কারণ আছে। এটার জন্য অনেক সময়ের দরকার, অনেক প্রচেষ্টারও দরকার।

পেরিজ: সত্যি কথা বলতে কি প্রেসিডেন্ট ওবামাও এই রাজনৈতিক সমাধানের কথাটি বলেছিলেন। কিন্তু ঘটনাটি এরকম দাঁড়াল যে তাকে সিরিয়া ও ইরানকেও এই আলোচনায় যুক্ত করতে হয়েছিল। এরকমই কি ঘটার কথা ছিল? আর যদি তারা রাজনৈতিক সমাধানের এই আলোচনায় ঢোকে তাহলে বর্তমান সরকারের সাথে দর কষাকষিতে কার এখানে প্রধান হওয়া উচিৎ?

উইলকারসন: আমার মনে হয় সমাধানের ক্ষেত্রে তুরস্কের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। তুরস্ক এমন কিছু কাজ করছে যা থেকে তাকে থামানো দরকার। দেশটিকে দুই পক্ষের সাথে তাল দেওয়া বন্ধ করতে হবে এবং এমন কিছু কাজ করতে হবে যা দীর্ঘমেয়াদি সমাধান আনে। সেই সাথে তেহরান, রিয়াদ, বাগদাদ, দামেস্কও যার যার অবস্থান থেকে কমবেশি জড়িত। বাশার আল আসাদের বিষয়টা আমরা যেভাবে দেখছি সেটাও পুনর্বিবেচনা করা উচিৎ। আসাদ ক্ষমতা ছাড়ছেন না কারণ সিরিয়ায় এখনো তার সমর্থন আছে। তিনি কেমন স্বৈরশাসক সেটা বিষয় নয়, তিনি ক্ষমতায় আছেন ও ক্ষমতা ধরে রাখতে যাচ্ছেন। যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা মধ্যপ্রাচ্যে বড় ধরনের অভিযান চালানোর জন্য তৈরি হচ্ছি ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের আসাদের হাত থেকে মুক্তি নেই। আঙ্কারা যতই চাক না কেন, অথবা তেহরান যতই চাক তিনি ক্ষমতায় থাকুন, তারা বা আমরা কেউই নির্ধারক নই। নির্ধারক হলো সিরিয়ার মানুষ আর বাশার আল আসাদ। আর আসাদ সেটাই করছেন। সুতরাং যেভাবে আমরা তার বিরোধীতা করছি, সেটা কেন করছি?

BanglaBook.org

আমি ভাবতে পছন্দ করি যে আমরা আসাদের সাথে অথবা ন্যুনতম তার লোকদের সাথে আলাদাভাবে কথা বলছি, আমি এভাবেও ভাবতে চাই যে আমরা তেহরানের সাথেও তাদের স্বার্থ নিয়ে আলাদাভাবে কথা বলছি এবং এ নিয়ে কাজ করছি। আমার আশা এগুলো ঘটবে। কারণ সিরিয়া ও ইরান সরকারের সাথে আমাদের আলোচনা চালিয়ে যেতে হবে এবং আমাদের এই জটিল, কঠিন ও বিরক্তিকর অবস্থা থেকে বের হবার পথ খুঁজতে হবে।

BanglaBook.org

শিয়া-সুন্নি সংঘাতের অন্তরালে সৌদি উসকানি
টোবি জোন্স, আধুনিক মধ্যপ্রাচ্যের ইতিহাসবিদ

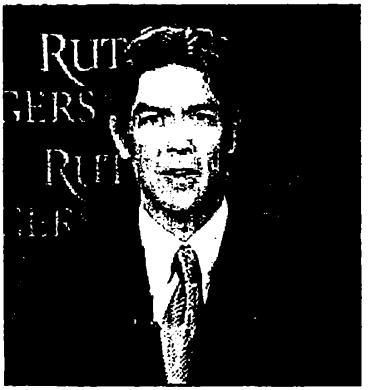

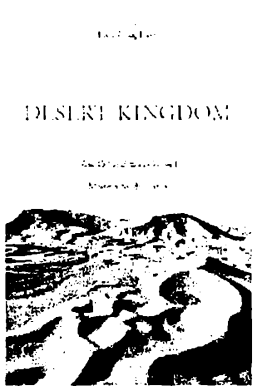

টোবি জোন্স আধুনিক মধ্যপ্রাচ্যের ইতিহাসবিদ। নানা বিষয়ে তার আগ্রহ। জোন্সের পাণ্ডিত্ব মূলত বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, পরিবেশ, জ্ঞান, যুদ্ধ ও ইসলামিজমের সাথে রাজনীতির সম্পর্ক বিষয়ে। Rutgers Universityতে ইতিহাস বিভাগে যোগ দেবার আগে তিনি এসওয়ার্থমোর কলেজে পড়াতেন। ২০০৮-০৯ সালের দিকে তিনি প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের তেল, শক্তি ও মধ্যপ্রাচ্য প্রকল্পে ফেলো হিসেবে কাজ করেন। ২০০৪ থেকে ২০০৬ সালের প্রথম দিক পর্যন্ত তিনি পারস্য উপসাগরীয় রাজনৈতিক বিশ্লেষক হিসেবে কাজ করেছেন ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইসিস গ্রুপের জন্য। রাজনৈতিক সংস্কার ও সাম্প্রদায়িকতা নিয়ে লেখেন। বিখ্যাত গ্রন্থ: Desert Kingdom.

BanglaBook.org

পল জে: আমরা মধ্যপ্রাচ্যে ও বিশ্বে সৌদি আরবের ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম। এখানে আমরা বর্তমানে ঘটতে থাকা কিছু ইস্যু নিয়ে আলোচনা করব। শুরু করব সিরিয়া দিয়ে। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে সিরিয়া আইসবার্গের ওপর অবস্থান করছে। মূল ঘটনা আসলে এর নিচে। অর্থাৎ ঘটতে চলেছে। এ রকম অনেক শক্তি আছে যারা চায় শিয়া সুন্নি যুদ্ধ বাধুক। আর এই যুদ্ধে শুধু ধর্ম ও আদর্শগত ইস্যুই স্বার্থ নয় বরং আরও অন্যান্য স্বার্থও জড়িত। এ বিষয় নিয়ে আমাদের সাথে কথা বলবেন টোবি জোন্স।

তো টোবি দোজখের দরজা তাহলে সিরিয়ার দিকে একটু খুলেছে। হাজার হাজার মানুষ মারা গেছে আর লাখ লাখ শরণার্থী হয়েছে। ইরাকে শিয়া-সুন্নি

যুদ্ধ আবার পূর্ণগতি পেতে যাচ্ছে। আর এ সবকিছুর মূলে সৌদি। সৌদিরাই এই বিভিন্ন বিরোধীদেরকে অর্থ সহায়তা দিচ্ছে। তারা দাবি করে যাচ্ছে যে, তারা আল কায়দার সাথে সম্পর্কযুক্ত কোনো জঙ্গি বা সংগঠনকে অর্থসাহায্য করছে না, কিন্তু বিশেষজ্ঞদের মতে তারা এখনও করছে। ঐ অস্ত্রগুলো ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃতভাবে ইরাকের দিকেই যাচ্ছে। ফালুজা ও আনবার প্রদেশের মতো জায়গায় ব্যবহৃত হচ্ছে। সৌদিরা কি এই অঞ্চলে শিয়া সুন্নিদের মধ্যে বড় আকারে যুদ্ধ বাধানোর চেষ্টা করছে?

জোন্স: হ্যাঁ তারা তাই করতে যাচ্ছে। তারা সিরিয়ার বিজয়ের জন্য দৃঢ় প্রত্যয়ী। তারা আলোচনার ভিত্তিতে কোনো সমাধানে যেতে চাচ্ছে না। আর আপনি জানেন যে, সৌদিদের টাকা আছে ও অস্ত্র সরবরাহের ক্ষমতাও আছে। তবে তাদের কোনো নীতিবোধ নেই। তাদেরকে জঙ্গি নেটওয়ার্কগুলোকে সমর্থন দিতে হবে। একমাত্র ঐ জঙ্গি গ্রুপগুলোই সৌদিদের সাথে কাজ করতে আগ্রহী। আর সিরিয়ায় সৌদিদের কিছু স্বার্থ ও কিছু লক্ষ্য আছে যা তারা পূরণ করতে চায় এবং তারা মনে করে এগুলো তাদেরকে আরও সুযোগ দেবে, তা হলো তারা চায় আসাদ সরকারকে যতটা সম্ভব দুর্বল করতে। এতটা দুর্বল যেন তারা কোনোভাবেই আর ইরানের স্বার্থ না দেখতে পারে। আসলে তারা এভাবে আরব অঞ্চলে ইরানের মিত্রকে ধ্বংস করে ইরানের বিরুদ্ধে একটা প্রতিকী বিজয় অর্জন করতে চায়। এমনকি যদি তারা এ বিজয় সৌদি শিবিরে নিয়ে নাও যেতে পারে, তারা চায় যাতে সিরিয়া জুড়ে সমস্যা আর দুর্দশা ছড়িয়ে পড়ে। আর সেখান থেকে ইরানিরা কোনো সুবিধা নিতে না পারে।

তো এটাই যদি তাদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, যার অনেকটাই ভূ-রাজনৈতিক, হাজার হাজার, লাখ লাখ মানুষকে যুদ্ধে পাঠানোর চেয়ে দ্বন্দ্ব বাধিয়ে দেওয়াটাই তুলনামূলক সহজ। যেটা ইরানের সাথে ক্ষমতা সমতার দ্বন্দ্ব। তো এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য সৌদিরা একদিকে টাকা খরচ করে যাচ্ছে, অন্যদিকে তারা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিশ্বাসকে কাজে লাগাচ্ছে। যেমন তারা শিয়া বিরোধীতাকে সমর্থন দিয়েছে ও বেড়ে উঠতে সাহায্য করেছে। যদিও তারা সেটা শুরু করেনি। তা সৌদিরা সেটা শুরু না করলেও প্রয়োজনমতো পরিস্থিতিকে তারা ব্যবহার করেছে। এখন সেই রকম একটা পরিস্থিতিতে সৌদিরা শিয়া বিরোধীতার ফায়দা নিতে বদ্ধ পরিকর ও তাদের ভূ-রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তারা শিয়া সুন্নি যুদ্ধ শুরু করতে যাচ্ছে।

পল জে: আমি বোঝাতে চাচ্ছি, মিসরের প্রতি আমেরিকার মনোভাব পরিস্কার তা হলো, কাতার ও মুসলিম ব্রাদারহুডকে ব্যবহার করে নতুন মিসরকে ম্যানেজ করার চেষ্টা করা। কিন্তু সৌদিরা সেটা গোড়াতেই বিনষ্ট করে

BanglaBook.org

দিল। তারা মিসরীয় সামরিক বাহিনীকে বলল, আমেরিকার সাহায্য না পেলে ভয়ের কিছু নেই। তোমরা মুরসিকে ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারো। আমেরিকা তোমাদের যে দেড় দুই বিলিয়র ডলার দিত সেটা ভুলে যাও। আমরা তোমাদেরকে ১২ বিলিয়ন ডলার দেব। তারপর তারা পুতিনকে হুমকি দিল : মানে, সৌদিরা নিজেকে এত বড় মনে করছে যা তাদের নিজেদেরকেই না ধ্বংস করে।

জোন্স: এমন যে, সৌদিরা একটা ব্যাপার নিয়ে জুয়া খেলেছিল, তা হলো তারা মনে করছিল মিসরীয় সেনাবাহিনী একবার ক্ষমতায় ফিরে গেলে আমেরিকাও তাদের সমর্থন দেবে। আর আমেরিকানরা মিসরীয়দের প্রতি খানিকটা কঠোরও। সামরিক সহায়তা বন্ধ করে দেওয়া নিয়ে অনেক কথা হয়েছিল। আমি জানি না ঘটনাটাকে পরবর্তীতে অনুসরণ করা হয়েছিল কিনা। কিন্তু আমেরিকানরা শান্ত হয়নি ও তারা মিসরীয়দের দোষ দিয়ে গেছে ও সমালোচনা করেছে।

পল জে: আমি বলব, এই কারসাজিতে কাতারের হাত আছে নাকি সৌদির—এটা নিয়ে আমেরিকা মোটেও মাথা ঘামায়নি। আমি আপনার সাথে একমত। একমাত্র মিসরীয় সেনাবাহিনী নিয়েই আমেরিকা মাথা ঘামিয়েছে।

জোন্স: এমন একটা সাধারণ দাবি আছে যে, আমেরিকা আর সৌদির সম্পর্ক ভালো যাচ্ছে না। আর আপনি জানেন যে, পারমাণবিক ইস্যু নিয়ে ইরান আমেরিকার মধ্যে যে মনোমালিন্য ছিল তা দূর হয়ে যাবার সম্ভাবনা রয়েছে, যদিও সেটা সৌদিদের জন্য একটা বিপত্তির কারণ হবে বলে মনে হচ্ছে। আমার মনে হয়, ইরান যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্কের উন্নতি হওয়াটা সৌদিদের জন্য সমস্যাজনক। এবং এই ব্যাপারটা সিরিয়াতে দর্শনীয়ভাবে উপস্থিত যেখানে কর্মপন্থা কী হবে এ বিষয়ে সৌদি ও আমেরিকা একমত হতে পারেনি। যদিও সৌদিরা সিরিয়ায় কি করতে চাচ্ছে বা করে যাচ্ছে সে বিষয়ে জানার জন্য আমেরিকা কোনো চেষ্টাই করেনি। তো এটাও আমাদের মাথায় রাখতে হবে।

কিন্তু এটা বাদে, সৌদি ও আমেরিকা খুব শক্ত বন্ধনে আবদ্ধ। কিছুদিন আগে যুক্তরাষ্ট্র বলেছে, তারা বাহরাইনে ফিফথ ফ্লিট এর সদরদপ্তরের পরিধি বাড়াতে যাচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্র তার ক্ষমতা ইয়েমেনে সরিয়ে নিতে রাজি হয়েছে, যার ফলে সেই পুরোনো সালেহ-ই ক্ষমতায় থাকছে। তাহলে দেখা যাচ্ছে এই এলাকার ক্ষেত্রে যতগুলো সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে তার মধ্যে যতগুলোতে তারা অরাজি হয়েছে রাজি হয়েছে তার চেয়ে বেশিগুলোতে। তবে সিরিয়া একটি ব্যতিক্রম। কিন্তু আমি জানি না, এমনকি সেখানেও আমেরিকানরা কী পছন্দ

BanglaBook.org

করে না করে এমন কোনো সুনির্দিষ্ট কিছু আছে কিনা। সিরিয়ার ক্ষেত্রে আমেরিকার এটাই চাওয়া—হয় একপক্ষ নিঃশেষ হয়ে যাবে অথবা তারা একে অপরের সাথে লড়তে লড়তে ক্ষয়ে গিয়ে এক সময় আপোষে থামবে। সিরিয়ায় সৌদিরা জিততে চায় এবং এর একটি বিশেষত্ব আছে। আমার মনে হয় শেষ পর্যন্ত আমেরিকা সৌদিদের বিজয়ের ধরণ বা চাওয়াটাকেই মেনে নেবে। আর তা হলো—আসাদ তথা সিরিয়া যার সমস্যা তার দেশের ভেতরেই বর্তমান থাকবে।

পল জেঃ ঠিক, কিন্তু সৌদিরা চায় না ইরান শীতলতা থেকে উঠে আসুক। INEGMA নামে একটি সংগঠন আছে যা একটি সামরিক নীতিমালা বিষয়ক থিংক ট্যাংক। এটা আমেরিকাতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং এরা অধিকাংশ অর্থসহায়তা পেয়ে থাকে আমেরিকান সামরিক পণ্য বাজারজাতকারীদের কাছ থেকে। আর তাদের সাপ্তাহিক একটি নিউজ লেটারও প্রকাশিত হয়। তারা বিশ্লেষণ করে এটা অনেকটা আরএএনডি (RAND) বা Stratfor-এর মতো উপসাগরীয় দেশগুলোর জন্য। সম্প্রতি প্রকাশিত হওয়া নিউজ লেটারটি তারা শেষ করেছে এই বলে যে, যদি সৌদিকে p5+1 বৈঠকে বসার অনুমতি না দেওয়া হয় তাহলে তারা সকল সন্ত্রাসী দলকে ব্যবহার করার হুমকি দিয়েছে, সিরিয়ার ওই এলাকায় তাদের ওপর নরক ভেঙে পড়বে। কথাটা পুরোপুরি এটা না হলেও মোটামুটি ম্যাসেজ এমনই দাঁড়ায়। সৌদি কোনোভাবেই চায় না যে ইরান পুরোদমে তেল ও গ্যাস উৎপাদনে ফিরে আসুক ও তারা শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠুক।

জোন্সঃ হ্যা, ঠিক। আর সৌদিরা তাদের ঝোলায় যত হুমকি ছিল তা বের করতে শুরু করেছে। এই এলাকায় নরক গুলজার হয়ে যাবে। আল কায়েদাসহ অন্যান্য সন্ত্রাসী সংগঠনগুলো আরও বেশি শক্তিশালী হয়ে উঠবে। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে, সৌদিরা এরকম আস্ফালন ও রাগ দেখিয়েই যাবে যতক্ষণ পর্যন্ত না কিছু করাটা তাদের কাছে যুক্তিযুক্ত ও সময়োপযোগী মনে হয়।

ইরানকে নিয়ে সৌদি বেশি বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে। ওবামা প্রশাসন এই এলাকায় অনেকটা ব্যর্থ। মধ্যপ্রাচ্য নীতিমালার অভাব এমনকি মিসরীয় বা সিরিয়ান নীতিমালারও অভাব রয়েছে এই প্রশাসনের। একমাত্র ইরানের নিউক্লিয়ার ইস্যুতেই তারা সত্যিকার গুরুত্ব দিয়েছিল। কংগ্রেস বাধা দেওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ওবামা বিষয়টিতে ব্যাপক আগ্রহ দেখিয়েছিলেন। এখন সৌদিকে একাই বিষয়টি নিয়ে ভাবতে হচ্ছে। তাহলে দাঁড়াচ্ছে যে, সৌদিরা নরক ভেঙে পড়ার কথা বলছে কিন্তু আমার মনে হয় না তারা যে যে শক্তিগুলো ব্যবহার করেছে তার বাইরে তারা আরও কোনো শক্তি ব্যবহার করতে পারবে।

BanglaBook.org

পল জেঃ তাদের কি আসলেই সেটা করার ক্ষমতা নেই? কিন্তু এরই মধ্যে ওরা কি দেখিয়ে দেয়নি? ওরা কি সিরিয়ার গৃহযুদ্ধকে বাড়িয়ে ইরাকের মধ্যে ঢুকিয়ে দেয়নি? কিংবা আবার লেবাননে শিয়া-সুন্নি যুদ্ধ বাধিয়ে দেয়নি? আমি বোঝাতে চাচ্ছি তারা জ্বলন্ত আগুনে ঘি ঢেলে আগুনটাকে এতটা বাড়িয়ে দিতে পারে যাতে লাখ লাখ মানুষ মারা যেতে পারে।

জোন্সঃ দেখুন, আমি বলতে চাচ্ছি, সৌদিরা হিসেব করে দেখেছে যে এটা ঘটবে না। সৌদিরা তা করতে যাচ্ছে না। কারণ তখন সমস্যা আরও ভয়ানক আকার ধারণ করে পুরো আঞ্চলিক সমস্যায় রূপ নেবে। লেবাননকে সিরিয়ান যুদ্ধে যুক্ত করা হয়েছিল আর তাতেই ইরাকের ওপর বাড়তি প্রভাব পড়েছে বলে মনে হচ্ছে।

আমরা জানি না ইরাকে যা ঘটছে তাতে সৌদি কতটা জড়িয়ে আছে বা তারা কতটা দায়ী। আমি সন্দেহ করি লেবাননের ঘটনার সাথে তারা ব্যাপকভাবে জড়িত। কিন্তু সৌদিরাও জানে যে, সবকিছুরই একটা সীমা আছে।

পল জেঃ আর একটা বিষয় যোগ করতে চাই, সৌদি লেবানিজ সরকারকে ৩ বিলিয়ন ডলার সামরিক সহায়তা দিতে অস্বীকার করেছে। এ থেকে যে কেউ ভাবতে পারে তারা হেজবুল্লাহর সাথে যুদ্ধ শুরু করতে পারে।

জোন্সঃ অথবা তারা অন্তত বিকল্প শক্তি হিসেবে হেজবুল্লাহর সাথে যুদ্ধ করতে পারত। আমার মনে হয় এটাই শেষ কথা। সৌদিরা সম্ভবত এলাকাগত গৃহযুদ্ধ শুরু করতে চায় না। তারা বোধহয় মধ্যপন্থী সংযমী হতে চায়, যা ভয়ঙ্কর সমস্যা তৈরি করছে। যাতে এই এলাকার পরিস্থিতি ঘোলাটে হয়ে যায়। কিন্তু সৌদিরা এখনকার চেয়ে খারাপ অবস্থা তৈরি হোক তা চায় না। কারণ তখন অবস্থা আরও বেগতিক হওয়ার আশঙ্কা থেকে যায়। যা তাদের জন্যও হুমকির কারণ হতে পারে। আমাদের মনে রাখা দরকার যে নিজেদেরকে সামরিক কায়দায় রক্ষা করার ক্ষেত্রে সৌদি মারাত্মকভাবে দুর্বল। তাই তারা চায় গণ্ডগোলটা নিজেদের দেশ বাদে অন্য যে কোনো জায়গাতে হোক। সুতরাং তারা যদি এইখানে আরও জঙ্গি ব্যবহার করে তাহলে পরিস্থিতি কোন দিকে যাবে কেউ আন্দাজও করতে পারবে না।

পল জেঃ এই মুহূর্তে আলোচনার মূল বিষয়বস্তু হতে পারে ইরাক, যা এখন সবচেয়ে গুরুত্ব বহন করে। আমি বোঝাতে চাচ্ছি, প্রথমে দেখতে হবে তাদের কৌশলগত অবস্থান ও আকার, তার কতটা তেল আছে এবং সুন্নি ও আল-কায়েদার কতটা শক্তি আছে। ইরাক যুদ্ধ দিয়ে ইরানকে সরাসরি আক্রমণ করার একটা উপায়। তাই যুদ্ধটা যে শেষ হবে না এটা যে কেউই

BanglaBook.org

বলে দিতে পারে। যুদ্ধটা তাই ইরাকে আরও মারাত্মক আকার ধারণ করছে, তাই না?

জোন্স: হ্যাঁ ঠিক। গ্রীষ্মের মধ্যেই ইরাক যুদ্ধ প্রবল হয়ে ওঠে। ২০১৩ সালের শেষার্ধে মৃতের সংখ্যা ভয়ঙ্কর রূপ নেয়। এক বছরে যত লোক সত্যিকার অর্থে মারা গিয়েছে তা পশ্চিমা গণমাধ্যমের প্রকাশিত সংখ্যার চেয়ে খুব বেশি কম হবে না। গত ১২টি মাস ইরাকের জন্য সত্যিই খুব খারাপ ছিল। আর এটা যে আরও খারাপ হবে তাতে আমি একমত।

কিন্তু মনে রাখতে হবে কয়েক বছর আগেও ইরাক খুব খারাপ অবস্থায় ছিল। গৃহযুদ্ধ চলাকালীন হাজার হাজার মানুষ মারা গেল। তবে সবচেয়ে খারাপ ছিল আমেরিকার হস্তক্ষেপ করা। কিন্তু যখন এটা সত্যিকার অর্থে আঞ্চলিক যুদ্ধে পরিণত হবার কথা ছিল। তখনও সেটা হয়নি। তার একটা কারণ ছিল। সৌদিরা পরিস্থিতিটা বিবেচনা করে দেখেছিল যে সেটা তাদের জন্য ভালো কিছু বয়ে আনবে না। শেষ পর্যন্ত কথা হলো, সৌদিরা যে শক্তিগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না, সে-গুলোকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করছে। কিন্তু আমি বলব না যে তারা জিনিসগুলো নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে।

পল জে: সত্যিই এটা খুব সহজেই তাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে পারে। অবশ্যই এখানে আরও পক্ষ আছে। মানে, শিয়া-সুন্নি যুদ্ধ বাধলে ইসরাইলীরাও অখুশি হবে না। আমার মনে হয়, তারা সর্বগ্রাসী বিধ্বংসী যুদ্ধ চায় না। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত শিয়া-সুন্নি একে অন্যের পেছনে লেগে থাকবে, ততক্ষণ তারা ইসরাইল সম্পর্কে কথা বলবে না। আবার ইরান, সৌদি আরব একে অন্যর সাথে দ্বন্দ্বে লেগে থাকলে বিষয়টা মনে হয় যুক্তরাষ্ট্রের জন্যেও খারাপ হবে না। সবচেয়ে খারাপ হলো আমেরিকা এই কল্পনা করা ভয় পায়, যদি তারা সহাবস্থান তৈরি করে। কল্পনা করুন তো ইরান-সৌদি আরব মিত্রতা কেমন হবে। আমার মতে সেটা হবে আরেকটি পরাশক্তির উদ্ভব।

জোন্স: ঠিক। কিন্তু এটা ঘটতে যাচ্ছে না, তাই না? মানে আমেরিকার দৃষ্টিকোণ থেকে ইরান-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কের উন্নয়নটাই বেশি যুক্তিযুক্ত। এই যুদ্ধটা অনেককেই লাভবান করছে। এমনকি ইসরাইলকেও। আমেরিকার ভাষায় বলতে গেলে বলতে হয়, কাদেরকে নিয়ে আমরা বেশি চিন্তিত শিয়া নাকি সুন্নিদের? কারণ মধ্যপ্রাচ্যে এটা আমেরিকানদের কৌশলগতভাবে ব্যস্ত রাখে। তাদেরকে জঙ্গিবাদ ব্যবস্থাপনা করতে হয় এবং বিপক্ষ দলগুলোর মধ্যে ক্ষমতার সাম্যাবস্থা নিশ্চিত করতে হয়। যদি আমেরিকানরা এই এলাকাকে ধর্মীয় গোত্রভিত্তিক দলগুলোর মধ্যে যুদ্ধাবস্থায় দেখে তাহলে দেখবে সবচেয়ে লাভবান হচ্ছে সৌদি আরব আর ইসরাইল। আর সেজন্যই এই যুদ্ধ যাতে

BanglaBook.org

চলমান থাকে তাই সুবিধা ও উৎসাহ দুই-ই তারা দিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সমস্যা হলো, আমরা আগেই আলোচনা করেছি যদি সৌদিদের সকল সম্পদ বা শক্তি ব্যবহার করতে হয় তাহলে তারা এটা চালিয়ে যেতে পারবে না।

পল জে: তার মানে সিরিয়ান, ইরাকি, লেবানিজদের জন্য আরও অনেক ভোগান্তি অপেক্ষা করছে। আমরা জানি যে, এটা প্রথম বিশ্বযুদ্ধ নয়, তবুও এটাকে অনেকটা ইউরোপীয়ান যুদ্ধের মতো লাগছে যা বছরের পর বছর চলবে। আর এক্ষেত্রে সাধারণ জনগণই সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। যদি সত্যিকার অর্থে আমেরিকার মধ্যপ্রাচ্য বিষয়ক একটি নীতিমালা থাকত যা তেল উৎপাদন শিল্পের স্বার্থ দেখবে না এবং আমেরিকার ভূ-রাজনৈতিক দাবা খেলা হবে না, শুধু ঐ এলাকার জনগণের স্বার্থ দেখবে, তাহলে নীতিমালাটি দেখতে কেমন হত? আমেরিকানরা তাহলে কী করত?

জোন্স: আমার মনে হয়, মধ্যপ্রাচ্য থেকে যুক্তরাষ্ট্রের সেনা প্রত্যাহার করা দরকার। কয়েক বছর ধরেই আমি এটা বলে আসছি। আমেরিকান শক্তি প্রদর্শনের জন্য পরিবেশের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে ও অনেক প্রাণ গেছে। সৌদি, বাহরাইন, বর্তমানের মিসরীয় সেনা ও অন্যান্য যে দেশগুলো এই এলাকার জন্য খারাপ তাদের ঠেকানো উচিৎ। আর ইরানের সঙ্গে খলনায়কসুলভ আচরণ অনেক ক্ষেত্রে হিতে বিপরীত হয়েছে—শক্তির দিক দিয়ে, মানবাধিকারের দিক দিয়ে ও ঐ এলাকার স্থিতিশীলতার দিক দিয়েও। যার কারণ অবিরাম যুদ্ধ।

আমি একজন বামপন্থী ও এইসব ব্যাপারে আমি অনেক স্বচ্ছ। কিন্তু আমার মতে মধ্যপ্রাচ্যের প্রতি আমেরিকার দৃষ্টিভঙ্গি অথবা তাদের সাথে আমেরিকার সম্পর্ক সুনির্দিষ্ট কিছু মানবিক স্বার্থের প্রতিফলন ঘটায়। মানবাধিকার খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু মানবাধিকার রক্ষার জন্য এই এলাকার নির্দিষ্ট কোনো কৌশল ছিল না। বৈশ্বিক আবহাওয়া পরিবর্তন আমাদেরকে বিকল্প শক্তি ব্যবহারের চিন্তা করতে বাধ্য করেছে। আমেরিকা সারা পৃথিবীতে নিজের অবস্থানকে ঢেলে সাজাতে পারে। তার অবশ্য একটা স্বল্পমেয়াদি প্রভাব পড়তে পারে। যার ফলে এখনকার মতো খারাপ অথবা তার চেয়েও বেশি খারাপ অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে।

পল জে: আমি শুধু একটা জিনিস যোগ করতে চাই—যদি পরিস্থিতি সত্যিই চরমে পৌঁছায় তা যে যুক্তরাষ্ট্রের কোনো ক্ষতি করবে না এটা ভাবা মতিভ্রম।

BanglaBook.org